আল-হিদায়া

প্রথম খণ্ড

শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী
ইব্‌ন আবূ বকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী (র)

মাওলানা আবূ তাহের মেছবাহ্
অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আল-হিদায়া (প্রথম খণ্ড)
শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আবূ বকর
আল-ফারগানী আল-মারগীনানী (র)
মাওলানা আবূ তাহের মেছবাহ্ অনূদিত

গ্রন্থস্বত্ব ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৫০
ইফাবা প্রকাশনা : ১৯০০/৩
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৩৪০.৫৯
ISBN : 984-06-0420-1

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৯৮

চতুর্থ সংস্করণ
মে ২০০৭
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪
রবিউস সানি ১৪২৮

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২২৭১

মূল্য: ১৯০.০০ টাকা মাত্র

AL-HIDAYA (1st. Volume) (A Commentary on the Islamic Laws) : Written by Shaikhul Islam Burhan Uddin Abul Hassan Ali Ibn Abu Bakar Al-Farganee Al-Marginanee (Rh.) in Arabic, translated into Bangla by Maulana Abu Taher Mesbah, Edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 May 2007

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 190.00 ; US Dollar : 7.00

সূচীপত্র

শিরোনাম পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ তাহারাত -৫

পরিচ্ছেদ ঃ	উযূ ভংগের কারণসমূহ	৮
পরিচ্ছেদ ঃ	গোসল	১৩
প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ	পানি	১৬
পরিচ্ছেদ ঃ	কূয়ার মাসআলা	২২
পরিচ্ছেদ ঃ	উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি	২৬
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ	তায়াম্মুম	৩০
তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ	মোজার উপর মাস্‌হ	৩৭
চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ	হায়য ও ইসতিহাযা	৪২
পরিচ্ছেদ ঃ	মুসতাহাযা	৪৬
পরিচ্ছেদ ঃ	নিফাস সম্বন্ধে	৪৭
পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ	বিভিন্ন নাজাসাত ও তা থেকে পবিত্রতা অর্জন	৪৯
পরিচ্ছেদ ঃ	ইসতিনজা	৫৫

অধ্যায় ঃ সালাত - ৫৭

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ	সালাতের সময়সমূহ	৫৯
পরিচ্ছেদ ঃ	সালাতের মুসতাহাব ওয়াক্ত	৬১
পরিচ্ছেদ ঃ	সালাতের মাকরূহ ওয়াক্ত	৬২
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ	আযান	৬৫
তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ	সালাতের পূর্ববর্তী শর্তসমূহ	৭০
চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ	সালাতের ধারাবাহিক বিবরণ	৭৫
পরিচ্ছেদ ঃ	কিরাত	৯০
পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ	ইমামত	৯৫
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ ঃ	সালাতের মধ্যে হাদাছ হওয়া	১০৩

শিরোনাম			পৃষ্ঠা
সপ্তম অনুচ্ছেদ	ঃ	যা সালাতকে ভংগ করে এবং যা সালাতকে মাকরূহ করে	১০৯
পরিচ্ছেদ	ঃ	সালাতের মাকরূহ	১১৪
পরিচ্ছেদ	ঃ	পায়খানায় কিবলামুখী বসা	১১৭
অষ্টম অনুচ্ছেদ	ঃ	সালাতুল বিত্‌র	১১৮
নবম অনুচ্ছেদ	ঃ	নফল সালাত	১২০
পরিচ্ছেদ	ঃ	কিরাত সংক্রান্ত	১২১
পরিচ্ছেদ	ঃ	কিয়ামে রমাযান	১২৬
দশম অনুচ্ছেদ	ঃ	জামা'আত পাওয়া	১২৭
একাদশ অনুচ্ছেদ	ঃ	কাযা সালাত	১৩১
দ্বাদশ অনুচ্ছেদ	ঃ	সাজদায়ে সাহ্‌ও	১৩৫
ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ	ঃ	অসুস্থ ব্যক্তির সালাত	১৪২
চতুর্দশ অনুচ্ছেদ	ঃ	তিলাওয়াতের সাজদা	১৪৬
পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ	ঃ	মুসাফিরের সালাত	১৫০
ষোড়শ অনুচ্ছেদ	ঃ	সালাতুল জুমুআ	১৫৫
সপ্তদশ অনুচ্ছেদ	ঃ	দুই ঈদের বিধান	১৬১
পরিচ্ছেদ	ঃ	তাকবীরে তাশরীক	১৬৪
অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ	ঃ	সালাতুল কুসূফ	১৬৬
ঊনবিংশ অনুচ্ছেদ	ঃ	ইসতিসকার সালাত	১৬৭
বিংশ অনুচ্ছেদ	ঃ	ভয়কালীন সালাত	১৬৯
একবিংশ অনুচ্ছেদ	ঃ	সালাতুল জানাযা	১৭১
পরিচ্ছেদ	ঃ	কাফন পরান	১৭২
পরিচ্ছেদ	ঃ	মাইয়েতের উপর সালাত আদায়	১৭৪
পরিচ্ছেদ	ঃ	জানাযা বহন	১৭৭
পরিচ্ছেদ	ঃ	দাফন	১৭৭
দ্বাবিংশ অনুচ্ছেদ	ঃ	শহীদ	১৭৯
ত্রয়োবিংশ অনুচ্ছেদ	ঃ	কা'বার অভ্যন্তরে সালাত	১৮২

অধ্যায় ঃ যাকাত - ১৮৩

প্রথম অনুচ্ছেদ	ঃ	গবাদি পশুর যাকাত	১৯১
পরিচ্ছেদ	ঃ	উটের যাকাত	১৯১

শিরোনাম পৃষ্ঠা

পরিচ্ছেদ ঃ গরুর যাকাত ১৯২
পরিচ্ছেদ ঃ বকরীর যাকাত ১৯৪
পরিচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার যাকাত ১৯৫
পরিচ্ছেদ ঃ যে সব পশুর ক্ষেত্রে যাকাত নেই ১৯৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ সম্পদের যাকাত ২০১
পরিচ্ছেদ ঃ রূপার যাকাত ২০১
পরিচ্ছেদ ঃ স্বর্ণের যাকাত ২০২
পরিচ্ছেদ ঃ পণ্যদ্রব্যের যাকাত ২০৩
তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ উশর উসূলকারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী ২০৫
চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ খনিজ-সম্পদ ও প্রোথিত-সম্পদ ২১০
পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ ফসল ও ফলের যাকাত ২১৪
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত-সাদাকা কাকে দেয়া জাইয বা জাইয নয় ২২০
সপ্তম অনুচ্ছেদ ঃ সাদাকাতুল ফিত্‌র ২২৭
পরিচ্ছেদ ঃ সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ ও সময় ২৩০

অধ্যায় ঃ সিয়াম - ২৩৩

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ যে কারণে কাযা ও কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় ২৪৪
পরিচ্ছেদ ঃ রোযা ভংগ ২৫১
পরিচ্ছেদ ঃ যে সিয়াম প্রসঙ্গে যা চান্দা নিজের উপর ওয়াজিব করে ২৬১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফ ২৬৪

অধ্যায় ঃ হজ্জ - ২৬৮

পরিচ্ছেদ ঃ ইহরামের স্থানসমূহ ২৭৪
প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ ইহরাম ২৭৬
পরিচ্ছেদ ঃ উকুফের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩০১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ কিরান ৩০৬
তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে তামাত্তু ৩১১
চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ অপরাধ ও ত্রুটি ৩২০
পরিচ্ছেদ ঃ ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী-সম্ভোগ ৩২৭
পরিচ্ছেদ ঃ তাহারাত ব্যতীত তাওয়াফ সংশ্লিষ্ট বিষয় ৩৩০
পরিচ্ছেদ ঃ শিকার ৩৩৬

শিরোনাম		পৃষ্ঠা
পঞ্চম অনুচ্ছেদ	ঃ ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা	৩৫২
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ	ঃ ইহরামের সম্পর্ক সম্বন্ধে	৩৫৬
সপ্তম অনুচ্ছেদ	ঃ অবরুদ্ধ হওয়া	৩৬০
অষ্টম অনুচ্ছেদ	ঃ হজ্জ ফউত হওয়া	৩৬৪
নবম অনুচ্ছেদ	ঃ অপরের পক্ষে হজ্জ করা	৩৬৬
দশম অনুচ্ছেদ	ঃ হাদী সম্পর্কে	৩৭২

বিবিধ মাসআলা - ৩৭৭

মহাপরিচালকের কথা

আল-হিদায়া হানাফী মাযহাবের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, নির্ভরযোগ্য এবং জনপ্রিয় প্রামাণ্য ফিকাহ্ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রণেতা ইমাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবূ বকর ৫১১ হিজরী মোতাবেক ১১১৭ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানের মারগীনান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ৫৯৩ হিজরী মোতাবেক ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

অসাধারণ প্রতিভাধর বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবূ বকর (র) ছিলেন একাধারে হাফেজে কুরআন, মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ্ এবং নীতিশাস্ত্রবিদ।

হিজরী ষষ্ঠ (দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দ) শতকে রচিত এই গ্রন্থটির বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা লেখকের ব্যাপক ও গভীর পাণ্ডিত্য, ফিকাহ্ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতার স্বাক্ষর বহন করে। বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবূ বকর (র)-এর সুদীর্ঘ ১৩ বছরের পরিশ্রমের ফসল এই 'আল-হিদায়া'ই তাঁকে বিশ্বের দরবারে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে তিনি তাঁর এই গ্রন্থটিতে অতি নিপুণভাবে সংক্ষিপ্ত বাক্যে গভীর ও ব্যাপক ভাব প্রকাশ করেছেন।

আল-হিদায়া ইসলামী আইন শাস্ত্রের একখানি নির্ভরযোগ্য মৌলিক গ্রন্থ। গ্রন্থকার বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবূ বকর (র) তাঁর এই গ্রন্থখানিতে ইসলামী আইনের বিভিন্ন ধারা ও উপধারায়, ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য ইমামের মতামত, দলিল-প্রমাণসহ উপস্থাপন করেছেন।

হানাফী মাযহাবের রায় ও সিদ্ধান্তসমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করে এ সবের সমর্থনে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের এমন সব অকাট্য প্রমাণ পেশ করেছেন, যাতে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত এবং রায়সমূহই সঠিক, অধিক গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে।

গ্রন্থখানিতে কোথাও ইমাম আবূ হানীফা (র), কোথাও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং কোথাও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সিদ্ধান্তকে যুক্তি-প্রমাণসহ প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই মূল্যবান গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে চার খণ্ডে প্রকাশ করেছে। এর প্রথম খণ্ডটি ১৯৯৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশের সাথে সাথে এর সকল কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। ব্যাপক পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এ মূল্যবান গ্রন্থটির বিজ্ঞ অনুবাদক, সম্পাদক এবং গ্রন্থখানি প্রকাশনার ক্ষেত্রে যাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই অসাধারণ কাজের জন্য বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবূ বকর (র)-কে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত নসীব করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

আল-হিদায়া হানাফী মাযহাবের একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ ফিকাহ্ গ্রন্থ। এটিকে হানাফী ফিকাহর বিশ্বকোষও বলা যেতে পারে। ইমাম বুরহান উদ্দীন আলী ইবনে আবূ বকর (র) কর্তৃক দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রণীত এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি ইসলামী আইনের একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে আদৃত হয়ে আসছে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম আইনের নির্ভরযোগ্য পাঠ্যবই হিসেবে পঠিত হচ্ছে।

আমাদের জানামতে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এ পর্যন্ত গ্রন্থটির ৩৬টি ভাষ্য, ৯টি টীকা ভাষ্য, ৫টি সার-সংক্ষেপ এবং ১৬টি পরিশিষ্ট রচিত হয়েছে। বৃটিশ শাসনামলে মুসলিম আইন প্রণয়ন এবং আইন শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বাংলার তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশে জর্জ হ্যামিল্টন এ মূল্যবান গ্রন্থটি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন।

বিশ্বের বহু ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হলেও বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। এই অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর অনুবাদ কার্যক্রম গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা ইতিমধ্যে এর অনুবাদের কাজ সমাপ্ত করে চার খণ্ড প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। প্রথম খণ্ডটি ১৯৯৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সাথে সাথে এর সকল কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

গ্রন্থটির এই খণ্ডের অনুবাদক মাওলানা আবূ তাহের মেছবাহ্, সম্পাদনা পরিষদের সদস্য মাওলানা ওবায়দুল হক ও ড. কাজী দীন মুহম্মদ এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের প্রচেষ্টায় আমাদের কোন প্রকার ত্রুটি ছিল না, তবুও সম্মানিত পাঠকদের কাছে কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে অনুগ্রহ করে আমাদের তা অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ভাল বই প্রকাশের তওফিক দিন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদকের শোকর

আল্‌হামদু লিল্লাহ্, বহু প্রতিক্ষার পর ইসলামী ফিকাহ্ শাস্ত্রের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ আল-হিদায়া আজ বাংলা ভাষার 'বর্ণ-অলংকারে' সজ্জিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে, নিজের যাবতীয় দৈন্যের সম্যক অনুভূতি সত্ত্বেও এজন্য আমি কৃতার্থ যে, আল্লাহ্ তা'আলা পরম অনুগ্রহে এ মহান খিদমতের তাওফীক দান করেছেন। সুতরাং আর কিছু বলতে নেই, শুধু শোকর আল্‌হামদু লিল্লাহ্।

নাম জানা ও নাম নাজানা যারা যারা এ মহৎ উদ্যোগে যুক্ত হয়েছেন আল্লাহ্ তাদের সকলকে আপন স্থান মুতাবিক জাযা দান করুন। আমীন!

বিনীত

অনুবাদক

অনুবাদ প্রসংগে

ফিকাহ্‌র জগতে আল-হিদায়া গ্রন্থের নির্ভরযোগ্যতা, খ্যাতি ও মর্যাদা অতুলনীয়। এর প্রশংসায় একজন বিশিষ্ট-মনীষী বলেছেন ঃ

ان الهداية كالقران قد نسخت ، ما صنفوا قبله فى الشرع من كتب
فاحفظ قواعدها واسلك مسالكها ، يسلم مقالك من زيغ ومن كذب

– অপ্রতিদ্বন্দ্বিতার দিক থেকে কুরআনের মতই আল-হিদায়া গ্রন্থ রচিত হয়েছে। শরীআতের বিষয়ে এর আগে এ ধরনের কোন কিতাব কেউ রচনা করেন নি।

– তুমি এ নীতিমালা সংরক্ষণ কর এবং এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ কর, তোমার অভিব্যক্তি বক্রতা ও মিথ্যার স্পর্শ থেকে নিরাপদ থাকবে।

গ্রন্থকার ফিকাহ্ শাস্ত্র বিষয়ে প্রথমে 'বিদায়াতুল মুবতাদী' শিরোনামে একখানি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন। পরে 'কিফায়াতুল মুনতাহী' নামে আশি বালামে এর বিরাট শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সাধারণ পাঠকের সুবিধার্থে তিনি সে আশি বালাম সম্বলিত গ্রন্থের নির্যাস হিসাবে আল-হিদায়া রূপে ফিকাহ্ অনুরাগীদের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। কাজেই গ্রন্থের ভাষ্য সহজ ও সুলভ মনে হলেও এ 'বিরাট মহাসমুদ্রকে একটি ক্ষুদ্র কজায় পুরে দেওয়ার প্রয়াসের কারণে এর মর্ম উদ্‌ঘাটন অতিশয় জটিল হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই আরবী ভাষার গ্রন্থাদির অনুবাদকদের মধ্যে অনেককেই আল-হিদায়ার অনুবাদে হিমশিম খেতে দেখা যায়।

এ প্রেক্ষিতে বর্তমান প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ আল-হিদায়ার অনুবাদক মাওলানা আবূ তাহের মেছবাহ বস্তুত একারণে প্রশংসাযোগ্য যে, তিনি মূল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ততা রক্ষা করে তার মর্ম অনুবাদে ব্যক্ত করতে, ইনশাআল্লাহ্, অনেকখানি সমর্থ হয়েছেন। তবে সাধারণ পাঠকের পক্ষে মূল গ্রন্থ পুরোপুরি বোধগম্য করে তোলার জন্য স্বতন্ত্র বিস্তারিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন রয়েছে, যা অনুবাদের সাথে সংযোজিত হলে এর কলেবর অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে। আর তা অনুবাদ প্রকাশনা পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ হবে না বলে এ বঙ্গানুবাদে কেবল অনুবাদের উপর নির্ভর করা হয়েছে। তবে অতি জটিল এবং সন্দেহ সৃষ্টির আশংকাজনক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত টীকা সংযোজিত হয়েছে।

অবশ্য কিতাবের মর্ম সহজে বোধগম্য হওয়ার জন্য পূর্বাহ্নেই কিছু পরিভাষা ও গ্রন্থকারের বিশেষ রীতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

১. ظاهر الرواية জাহিরে রিওয়ায়াত। গ্রন্থে এ শব্দটি গ্রন্থকার বহুবার ব্যবহার করেছেন। এর উদ্দেশ্য হল ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর রচিত প্রসিদ্ধ ছ'খানি কিতাব থেকে সংগৃহীত মাসআলা বা মতামত। এ 'ছ'খানি কিতাব হল ঃ (১) মাবসূত, (২) যিয়াদাত, (৩) জামেউস সগীর, (৪) জামে'উল কবীর, (৫) সিয়ারে সগীর, ও (৬) সিয়ারে কবীর।

২. اصل। আসল। নির্দেশের (ণিতণরণভডণ)-এর ক্ষেত্রে এ শব্দের উদ্দেশ্য হল উল্লেখিত

কিতাবসমূহের মধ্যে 'মবসূত' কিতাব থেকে উদ্ধৃত। এখানে 'আসল' শব্দ দ্বারা 'মবসূত' বুঝানো হয়েছে।

৩. المختصر। মুখ্‌তাসার। এ শব্দের দ্বারা সাধারণত 'মুখতাসার কুদূরী' বুঝানো হয়েছে।

৪. قال (বলেছেন)। বহু মাসআলার প্রারম্ভে গ্রন্থকার 'ক্বালা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর উদ্দেশ্য হল এ মাসআলা 'কুদূরী' বা 'জামে'উ সগীর' -এর মূল কিতাব থেকে উদ্ধৃত।

৫. صاحبين সাহেবাইন। অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে شيخين (শায়েখাইন) ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং طرفين (তারফাইন) ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এ অনুবাদে এ দু' পরিভাষার পরিবর্তে ইমামদ্বয়ের নামই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-হিদায়া গ্রন্থে অনুসৃত অন্যান্য পরিভাষাও বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত আলোচনা, ইনশাআল্লাহ্‌ শেষ দু'বালামের ভূমিকায় পাওয়া যাবে।

কাজী দীন মুহম্মদ
সদস্য
সম্পাদনা পরিষদ

উবায়দুল হক
সভাপতি
সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনা পরিষদ

১.	মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২.	ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	সদস্য
৩.	জনাব মুহাম্মদ লতফুল হক	সদস্য সচিব

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

১. ফিকাহ্ শাস্ত্রের জগতে, বিশেষতঃ হানাফী ফিকাহ্র পরিমণ্ডলে আল-হিদায়া একটি মৌলিক ও বুনিয়াদী গ্রন্থ। এক কথায় এ মহাগ্রন্থকে হানাফী ফিকাহ্ শাস্ত্রের বিশ্বকোষ বলা যায়। বস্তুতঃ সুদীর্ঘ অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ভাবে এ মহাগ্রন্থ ইসলামী ফিকাহ্ শাস্ত্রের হানাফী মাযহাবের প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। এমন কি পাক-ভারত উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক শাসনকালেও বিচার বিভাগে আল-হিদায়াকে সিদ্ধান্তমূলক গ্রন্থের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। পৃথিবীর বহু প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে আল-হিদায়ার ইংরেজী অনুবাদ অতিগুরুত্বের সাথে পড়ানো হয়ে থাকে। এ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত ফিকাহ্ শাস্ত্রের বিদ্যাংগনে আল-হিদায়া অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ মহাগ্রন্থকে কেন্দ্র করে ফিকাহ্ শাস্ত্রের উপর এ পর্যন্ত যত গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হয়েছে এবং যত ব্যাখ্যা, ভাষ্য, টীকা ও পর্যালোচনা গ্রন্থ রচিত হয়েছে তা অন্য কোন ফিকাহ্ গ্রন্থের ক্ষেত্রে হয়নি।

গবেষক ও আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মদর্শী আলিমগণ আল-হিদায়ার এ অসাধারণ জন-প্রিয়তার দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ কিতাবের নিজস্ব গুণ ও বৈশিষ্ট্য। সাহিবুল হিদায়া নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, হানাফী ফিকাহ্র 'মতন' (বা মূলগ্রন্থ)-গুলোর মাঝে প্রামাণ্যতা, ব্যাপকতা, সার্বিকতা ও সুসংক্ষিপ্ততার দিক থেকে مختصر القدورى এবং الجامع الصغير ছিলো শীর্ষস্থানীয়। তাই তিনি এদুটোকে সামনে রেখে بداية المبتدى নামে একটি متن (বা মূল গ্রন্থ) সংকলন করেছেন। ফলে তাতে দু'টি মূল গ্রন্থের যাবতীয় গুণ ও পূর্ণতার সমাবেশ ঘটেছে। এরপর তিনি প্রায় আশি খণ্ডে উক্ত মূল গ্রন্থটি সুবিশদ ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। كفاية المنتهى নামক এই সুবিশাল ব্যাখ্যা গ্রন্থে তিনি ইসলামী ফিকাহ্-ভাণ্ডারের যাবতীয় গবেষণালব্ধ ও ইজতিহাদভিত্তিক আলোচনার অবতারণা করেন। এই সুবিশাল গ্রন্থ বর্তমানে যদিও বিলুপ্ত কিন্তু তাঁর সম-সাময়িক যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ্গণ অতি উচ্ছ্বাসিত ভাষায় এর প্রশংসা করেছেন এবং একে 'মানব সাধ্যের চূড়ান্ত কালে' বলে অভিহিত করেছেন। এরপর আশি খণ্ডের এই সুবিশাল গ্রন্থের মহাসমুদ্রের নির্যাস নিয়ে তিনি সংক্ষিপ্ত কলেবরে চার খণ্ডের এ গ্রন্থখানি সংকলিত করেছেন। এখানিই এখন উম্মতের সম্মুখে আল-হিদায়া নামে বিদ্যমান। চার খণ্ডের এ আল-হিদায়া প্রণয়নে তিনি সুদীর্ঘ তের বছর ব্যয় করেছেন; তিনি এর রচনায় কী অসাধারণ সাধনা করেছেন, এতেই– তা প্রতীয়মান হয়। যার অমর ফসল রূপে আল-হিদায়ার মত মহামূল্য 'হাদিয়া' উম্মতের সম্মুখে উপস্থাপিত। তাছাড়া ফিকাহ্ শাস্ত্রের জগতে আল-হিদায়া হচ্ছে একমাত্র ব্যাখ্যা গ্রন্থ যেখানে পক্ষ-বিপক্ষ প্রত্যেক ইমামের প্রতিটি মাসআলার সমর্থনে دلائل نقلية অর্থাৎ উৎস-ভিত্তিক প্রমাণের পাশাপাশি دلائل عقلية অর্থাৎ যুক্তিগত প্রমাণ

উপস্থাপন করা হয়েছে। এবং তাতে এর যাবতীয় সূত্র ও পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক কারণেই কিতাবখানি সকল মহলে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এ প্রসংগে যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র.)-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, আল-হিদায়ার বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল কাদীরের মত উঁচুমানের কিতাবে রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর কিনা। তিনি বললেন, খুবই সম্ভব। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, আল-হিদায়ার মতো কোন কিতাব লেখা তার পক্ষে সম্ভবপর কিনা। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জবাব দিলেন, আমার পক্ষে এর এক ছত্র লেখাও সম্ভবপর নয়।

বলাবাহুল্য যে, যুগশ্রেষ্ঠ ইমামের এ মন্তব্য মোটেই অতিশয়োক্তি নয়, বরং এ ছিলো এ গ্রন্থের যথার্থ মূল্যায়ন।

দ্বিতীয় যে, কারণটি আলিম, ফকীহ্, ও বিদগ্ধ সমাজে বহু শতাব্দীব্যাপী অনন্য সাধারণ জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা এনে দিয়েছে তা হলো গ্রন্থকারের অনন্য সাধারণ ইখলাস, তাকওয়া ও আল্লাহ্ প্রেমে পূর্ণ আত্মনিবেদন। একটি মাত্র ঘটনা থেকে সাহিবুল-হিদায়ার জীবনের এই অত্যুজ্জ্বল দিক সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে।

আল্লামা আবদুল হাই লখনবী (র.) বলেন, আল-হিদায়া কিতাবের মাকবূলিয়াত ও সর্বস্বীকৃতির গূঢ়-রহস্য এই যে, সুদীর্ঘ তের বছর তিনি বিরতিহীন সিয়াম পালনে রত থেকে এ গ্রন্থ রচনায় নিমগ্ন ছিলেন। তাছাড়া তিনি তাঁর সিয়াম পালন এমনভাবে গোপন রাখার চেষ্টা করেছেন যাতে তাঁর নিজস্ব খাদিমও তা জানতে না পারে। খাদিম যখন খানা নিয়ে আসতো তখন তিনি বলতেন, রেখে যাও। পরে কোন তালিবুল ইল্ম, মুসাফির কিংবা আশে-পাশের কোন ফকির মিসকীনকে ডেকে সে খাবার দিতেন। খাদিম যথা সময়ে ফিরে এসে শূন্য বর্তন নিয়ে যেতো এবং ভাবতো যে, তিনি খেয়ে নিয়েছেন।

এই হলো সলফে সালেহীন এবং বর্তমান যুগের লেখক গবেষক ও পণ্ডিতদের মধ্যে পার্থক্য। আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী এ গূঢ়-রহস্য এ বলে ব্যক্ত করেছেনঃ কী যেন একটা তাঁদের মাঝে ছিলো আর কী যেন একটা আমাদের মাঝে নেই।

আল-হিদায়া সম্পর্কে অজ্ঞতাবশতঃ এরূপ সমালোচনা করা হয় যে, সাহিবুল হিদায়া হানাফী মাযহাবের পক্ষে প্রমাণ রূপে পেশ কৃত হাদীছের মধ্যে দুর্বল হাদীছও রয়েছে। এতে মনে হয়, হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞানের অভাব ছিলো। এই অভিযোগের উত্তরে হাদীছ শাস্ত্রের বহু ইমাম আল-হিদায়ার হাদীছসমূহের 'তাখরীজ' বিষয়ক বিভিন্ন মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং মূল সূত্র ও উৎস উল্লেখ করে প্রতিটি হাদীছের প্রামাণিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরেছেন।

২. الجواهر المضية গ্রন্থে আল-হাকিম আবদুল কাদির আল-কুরাশী (র.) সাহিবুল, হিদায়ার পরিচয় এভাবে পেশ করেছেন, আলী ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন আবদুল জলীল, তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বংশধর। ফারগানা প্রদেশের মারগীনান শহরের অধিবাসী

হিসাবে তাঁকে মারগীনানী বলা হয়, আবুল হাসান তাঁর উপনাম, এবং বুরহান উদ্দীন তাঁর উপাধি। পাঁচশ' এগার হিজরীর রজব মাসের আট তারিখ সোমবার আসরের পর তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। আর ৫৯৩ হিজরীর যিলহাজ্জ মাসের চৌদ্দ তারিখ মঙ্গলবার রাত্রে তিনি ইন্তিকাল করেন। 'সমরকন্দ' শহরে তাঁকে কবরস্থ করা (আল্লাহ্ তাঁর কবরকে নূরে পরিপূর্ণ করুন)।

আলী মারগীনানী হাদীছ, তাফসীর, ফিকাহ্, আদব, মানতিক, ফালসাফাসহ সে যুগে প্রচলিত শাস্ত্র, শীর্ষস্থানীয় বিশারদগণের নিকট অধ্যয়ন করেন এবং সম-সাময়িক আলিম ও বিদগ্ধ সমাজের প্রশংসা ও স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর বিখ্যাত কয়েকজন উস্তাদ ছিলেন ঃ

১. নাজমুদ্দীন আবূ হাফ্স উমর নাসাফী (ইনি আকাঈদ বিষয়ক বিশ্ববিখ্যাত নাসাফিয়া গ্রন্থের প্রণেতা)।

২. ইমাম দাদরুশ শাহীদ হুসামুদ্দীন উমর ইব্ন আবদুল আযীয।

৩. ইমাম যিয়াউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন।

৪. ইমাম কিয়ামুদ্দীন আহমদ ইব্ন আবদুর রশীদ।

৫. আবূ লায়ছ আহমদ নাসফী

৬. আবূ আমর উছমান আল-বায়কান্দী

৩. ফিকাহ্ শাস্ত্র জগতে ফকীহ্গণের সাতটি স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা –

প্রথম স্তর হলো মুজতাহিদে মতলক বা মুজতাহিদ ফিল উসূল। অর্থাৎ যাদের আল্লাহ্ তা'আলা ইজতিহাদের সর্বোচ্চ যোগ্যতা দান করেছেন, ফলে তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ্র উৎস থেকে মাসায়েল আহরণ এবং এর প্রয়োজনীয় নীতিমালা নির্ধারণ করছেন। তাঁরা হলেন, চার ইমাম ঃ ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.) এবং সে যুগের আরো কতিপয় ইমাম এ শ্রেণীভুক্ত।

দ্বিতীয় স্তর হলো মুজতাহিদ ফিল মাযহাব। অর্থাৎ যারা ইমামের নির্ধারিত মূলনীতি অনুসরণ করে সে আলোকে ইজতিহাদ– পূর্বক কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে মাসায়েল আহরণ করেন। ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার, ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদ (র.) প্রমুখ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় স্তর হলো মুজতাহিদ ফিল মাসায়েল। তাঁদের কাজ হলো প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের ইমামগণের পক্ষ থেকে যে সকল বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়নি সে সকল ক্ষেত্রে ইমামের নির্ধারিত মূলনীতি অনুসরণ করে মাসায়েল আহরণ করা। পক্ষান্তরে ইমামের বর্ণিত সিদ্ধান্ত ও মতামতের বিষয়ে দ্বিমত পোষণের অধিকার এই মুজতাহিদগণের নেই। ইমাম তাহাবী (র.) ইমাম কারখী (র.) ইমাম সারাখসী (র.) ও অন্যান্যরাও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ স্তর হলো আসহাবে তাখরীজ তাঁদের কাজ হলো পূর্ববর্তী ইমামগণের অস্পষ্ট

সিদ্ধান্তের বিশদ ব্যাখ্যাদান এবং দ্ব্যর্থবোধক বিবরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র নির্ধারণ। এই পর্যায়ে ফকীহ্ কোন প্রকার ইজতিহাদের অধিকারী হন না। ইমাম আবূ বকর জাস্‌সাস রাযীর মত ব্যক্তিত্ব এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম স্তর হলো আসহাবে তারজীহ (অগ্রাধিকার নির্ধারণকারী)। তাঁদের কাজ হলো, ইমামের পক্ষ থেকে কোন বিষয়ে বর্ণিত একাধিক মতামতের কোন একটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। ইমাম কুদূরী প্রমুখ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ স্তর হলো আসহাবে তামীয (পার্থক্য নির্ণয়য়ের অধিকারী)। তাঁদের কাজ হলো ইমামগণের সিদ্ধান্ত ও মতামতসমূহের দলীলের ভিত্তিতে কোন্‌টি সবল এবং কোন্‌টি দুর্বল তা নির্ণয় করা।

সপ্তম স্তর হলো নিছক মুকাল্লিদীনের স্তর। তাঁরা ফিকাহ্‌র নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবের অনুসরণে মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করেন।

এখন এ হলো সাহিবুল হিদায়া কোন স্তরের ফকীহ্ ছিলেন। এ প্রসংগে বিভিন্ন মুহাক্কিক ও গবেষকের বিভিন্ন মত দেখা যায়। আল্লামা ইব্‌ন কামাল পাশা তাকে পঞ্চম স্তরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারো কারো মতে তিনি চতুর্থ স্তরের ফকীহ্। পক্ষান্তরে আল্লামা আবদুল হাই লখনবী (র.) الفوائد البهية কিতাবে মুজতাহিদ ফিল মাযহাব পর্যায়ের ফকীহ্ ও মুজতাহিদ বলে মত প্রকাশ করেছেন, তবে বিশুদ্ধতম সম্ভবতঃ এই যে, তিনি চতুর্থ স্তরের সাহেবে তাখরীজ পর্যায়ের ফকীহ্ ছিলেন।

ফিকাহ্ শাস্ত্রের কতিপয় জরুরী জ্ঞাতব্য

বাংলাভাষায় ফিকাহ্ শাস্ত্র চর্চার যেহেতু কোন ভিত্তি এখনো পর্যন্ত গড়ে উঠেনি সেহেতু আল-হিদায়ার মত অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক গ্রন্থ (এর অনুবাদ) অধ্যয়নের বিষয় বেশ দুরূহ ও ঝুঁকিপূর্ণ বলেই মনে হয়। সে জন্য প্রাসংগিক কিছু বিষয় জেনে নেয়া জরুরী। নিম্নে আমরা অতি সংক্ষেপে সেগুলো আলোচনা করতে চাই।

ফিকাহ্ শাস্ত্রের সংজ্ঞা

فقه একটি আরবী শব্দ এর অভিধানিক অর্থ হলো জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও উপলব্ধি, শরীআতের পরিভাষায় যে শাস্ত্র দ্বারা বিশদ প্রমাণাদি যোগে শরীআতের 'অমৌল' আহকাম ও বিধান জানা যায় তাকে ইলমুল ফিকাহ্ বলে।

'অমৌল' অর্থ যে সকল আহকাম ও বিধানের সম্পর্ক হলো আমল ও মুআমালার সংগে, আকাঈদের সংগে নয়।

'বিশদ প্রমাণাদি' অর্থ কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াস এই চারটি সূত্র, প্রথম দু'টি হলো মূল সূত্র। পক্ষান্তরে শেষ সূত্র দু'টির ভিত্তি হলো প্রথম সূত্রদ্বয়। এগুলোকে اصول الفقه বা 'ইলমুল ফিকাহ্‌র' মূল উৎস চতুষ্টয় বলা হয়, এ প্রসংগে 'হাদীছে মু'আয' উল্লেখ করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন হযরত মু'আয (রা.)-কে ইয়ামান অঞ্চলের বিচারক নিযুক্ত করে পাঠালেন তখন তিনি (পরীক্ষামূলকভাবে) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে মু'আয! কিসের ভিত্তিতে তুমি 'সমাধান' করবে? তিনি বললেন, কিতাবুল্লাহ্‌র ভিত্তিতে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, যদি (কিতাবুল্লাহ্‌য়) কোন সমাধান না পাও? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র রাসূলের সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, যদি তাতে সমাধান না পাও? তিনি বললেন, তাহলে আমি ইজতিহাদ[১] ও কিয়াস[২] প্রয়োগ করবো। তখন তিনি হযরত মু'আয (রা.)-এর সিনায় হাত রেখে বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি তাঁর রাসূলের 'প্রেরিত জনকে' রাসূলের সন্তুষ্টি মুতাবিক সিদ্ধান্তের তাওফীক দান করেছেন।

ইলমুল ফিকাহ্‌র আত্মপ্রকাশ

ফিকাহ্ ও মাসায়েল সংক্রান্ত আলোচনা ও চর্চা তো স্বয়ং নবী (সা.)-এর পবিত্র যুগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। তিনি স্বয়ং সাহাবায়ে কিরামকে মাসায়েল শিক্ষা দান করতেন তবে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত মুস্তাহাব, শর্ত, রুকন ইত্যাদি বিভাজন ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ নবী (সা.)-এর উযূ দেখে সাহাবায়ে কিরাম উযূ শিক্ষা করতেন তদ্রূপ সাহাবায়ে কিরামের উযূ দেখে তাবেঈন উযূ শিক্ষা করতেন। নামায সম্পর্কেও একই কথা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইরশাদ ছিলো : صلوا كما رأيتمونى اصلى –আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখো তোমরা সেভাবেই

১. ইজতিহাদ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে গবেষণা করা।

২. কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজতিহাদের আলোকে কোনো বিষয়ে সাদৃশ্যমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

নামায পড়ো। তখনকার সহজ সরল জীবনে এর বেশী কিছুর প্রয়োজনও ছিলো না। কিন্তু ব্যাপক বিজয়াভিযানের মাধ্যমে যখন ইসলামী উম্মাহ্‌র পরিধি সুবিস্তৃত হলো এবং বিচিত্র সব সমস্যার উদ্ভব হলো এবং সমাধান ও সিদ্ধান্ত প্রদানের প্রয়োজন দেখা দিলো। ফলে ইজতিহাদ প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে উঠলো। এজন্য উসূল ও মূলনীতি নির্ধারণেরও প্রয়োজন দেখা দিলো। আর বলা বাহুল্য যে, ইজতিহাদের পন্থা ও পদ্ধতি এক ও অভিন্ন হওয়াও সম্ভব ছিলো না এবং শরীআতের সেটা চাহিদাও ছিলো না। কেননা, বনূ কুরায়যার অবরোধ ঘটনায় নবী (সা.) সকলকে আসরের নামায বনূ কুরায়যার বস্তিতে পড়ার আদেশ করেছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে কতিপয় সাহাবায়ে কিরামের আসরের নামায হয়ে গেলো। তখন একদল সাহাবা নবী (সা.)-এর বাহ্যিক আদেশের উপর আমল করে বনূ কুরায়যার বস্তিতে গিয়েই আসর পড়লেন। কিন্তু একদল সাহাবা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, নবী (সা.)-এর আদেশের উদ্দেশ্যে তো ছিলো এই যে. চেষ্টা করো যাতে আসরের সময় হওয়ার পূর্বে বস্তিতে পৌঁছতে পারো। এ উদ্দেশ্য ছিলো না যে, অনিবার্য কারণে পথি মধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেলেও নামায বিলম্বিত করতে। সুতরাং তাঁরা পথেই নামায পড়ে নিয়েছিলেন, নবী (সা.)-এর খিদমতে যখন বিষয়টি পেশ হলো তখন তিনি উভয় পক্ষের চিন্তাকেই অনুমোদন করেছিলেন কাওকে তিরস্কার করেন নি।

বিজয়াভিযান কালে যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন সেহেতু ইজতিহাদগত পার্থক্য দেখা দেয়াও স্বাভাবিক ছিলো। মোটকথা সাহাবা যুগেই নিত্য-নতুন ঘটনা. সমস্যাও জটিল উদ্ভূত হয়েছিলো এবং সাহাবায়ে কিরাম নিজ নিজ ইজতিহাদ মুতাবিক ফায়সালা ও সমাধান পেশ করেছিলেন। এভাবে সাহাবায়ে কিরামের যুগেই ফিকাহ্ ও মাসায়েলের একটা উল্লেখযোগ্য ভাণ্ডার তৈরী হয়ে গিয়েছিলো।

সাহাবায়ে কিরামের মাঝে ফিকাহ্ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাঁদের বিশিষ্ট স্থান ছিলো তাঁদের কয়েক জন হলেন, হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.)।

হানাফী ফিকাহ্‌র আত্মপ্রকাশ

ফিক্‌হে হানাফীর সনদ ও পরিচয় সূত্র এরূপ হযরত ইমাম আজম আবূ হানীফা হতে, তিনি হাম্মাদ হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি আলকামা হতে, তিনি ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) হতে। এরা সকলেই ছিলেন কূফার অধিবাসী। সেই হিসাবে কূফা হচ্ছে হানাফী ফিকাহ্‌র উৎসভূমি। সুতরাং এখানে আমরা প্রথমে হানাফী ফিকাহ্‌র উৎস ভূমি কূফার ইলমী মর্যাদা এবং ফিকাহ্ ও ইজতিহাদের জগতে তাঁর অনন্য সাধারণ ভূমিকা সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। এরপর হানাফী ফিকাহ্‌র সনদের সাথে সম্পৃক্ত পাঁচ-ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরবো, যাতে হানাফী ফিকাহ্‌র মৌলিকত্ব, উৎস-সম্পৃক্তি ও প্রকৃত স্বরূপ ফুটে উঠে।

কূফা

ইরাক বিজয়ের পর ১৭ হিজরীতে হযরত উমর (রা.)-এর আদেশে কূফা শহরে সেনা-ছাউনী হওয়ার সুবাদে স্বভাবতঃই কূফা হয়ে উঠে ছিলো বহু সাহাবায়ে কিরামের সমাবেশ ক্ষেত্রে। সমগ্র ইরাকের কথা বাদ দিলেও শুধু কূফা শহরে পনের 'শ' সাহাবী স্থায়ী অধিবাস গ্রহণ করেছিলেন বলে ইতিহাসগ্রন্থের বর্ণনা থেকে জানা যায়। তন্মধ্যে সত্তরজন ছিলেন বদরী সাহাবী, এছাড়া বহু সাহাবী তথায় সাময়িক অবস্থান করতেন। ২০ হিজরীতে হযরত উমর (রা.) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.)-কে দীন ও শরীআতের মুআল্লিম ও শিক্ষক রূপে কূফা প্রেরণ করেছিলেন। সে সময় তিনি কূফাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ঃ قد اثرتكم بعبد الله على نفسى –আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে আমার বড় প্রয়োজন ছিলো, কিন্তু আমি তোমাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করলাম।

তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান (রা.)-এর খিলাফাত কালের শেষ পর্যন্ত তিনি কূফায় কুরআন ও সুন্নাহ্‌র শিক্ষাদানে এমনই আত্ম-নিমগ্ন ছিলেন যে, কূফা শাব্দিক অর্থেই হাদীছে ফিকাহ্ ও কিরাত -এর শহরে পরিণত হয়েছিল। হযরত আলী (রা.) যখন কূফায় শুভাগমন করলেন তখন তিনি কূফার অবস্থা দর্শনে পুলকিত চিত্তে বলেছিলেন ঃ رحم الله ابن ام عبد قد ملا هذه القرية علما –আল্লাহ্ উম্মু আবদের পুত্রকে রহম করুন। তিনি এই জনপদকে ইল্‌ম দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

এরপর হযরত আলী (রা.)-এর শুভাগমনে তো কূফার ইলমী রওনক এমন পর্যায়ে পৌঁছে ছিলো যে, শীর্ষ পর্যায়ের চার ফকীহ্ সেখানে অবস্থান করতেন এবং চার হাজার শিক্ষার্থী ইলমুল হাদীছ অধ্যয়ন করতেন।

হযরত আবুদল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অন্যতম প্রিয় সাহাবী। তিনি ছিলেন হানাফী ফিকাহ্ শাস্ত্রের উৎসপুরুষ প্রথম পাঁচজনের পর ষষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বালক বয়সেই নবী (সা.) অতি সোহাগ ভরে ভবিষ্যদ্বাণী করে তাঁকে বলেছিলেনঃ انك غليم معلم –হে প্রিয় বাচ্চা তোমাকে অনেক ইল্‌ম দান করা হবে।

তিনি ও তাঁর আম্মা নবী (সা.)-এর গৃহে এত ঘনিষ্টভাবে যাতায়াত করতেন যে, ইয়ামান থেকে আগত হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বলেন, দীর্ঘদিন আমরা এটাই ভেবেছি, যে তারা নবী পরিবারেরই সদস্য। একবার তিনি তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন ঃ سل تعطه –প্রার্থনা করো দান করা হবে। তখন তিনি এই প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ্! আমি এমন ঈমান প্রার্থনা করি যা কখনো ফেরত নেওয়া হবে না এবং এমন নিয়ামত যা কখনো শেষ হবে না এবং অনন্ত জান্নাতে তোমার নবী (আ.)-এর সান্নিধ্য কামনা করি।

ইমাম নববী ও আল্লামা সুয়ূতী (র.) বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত মাসরূক (র.)-এর মন্তব্য বর্ণনা করেন ঃ

"আকাবির সাহাবায়ে কিরামের যাবতীয় ইল্‌ম ও প্রজ্ঞা ছয়জন সাহাবায়ে কিরামের মাঝে একত্র হয়েছিলো। এই ছয়জনের ইল্‌ম এরপর হযরত আলী ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.)-এর মাঝে সীমাবদ্ধ হয়েছিল।

হযরত আলকামা

হানাফী ফিকাহ্‌র দ্বিতীয় উৎসপুরুষ হযরত আলকামা হলেন শীর্ষস্থানীয় আকাবির তাবিঈ এবং ইরাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ্। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র যুগেই তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। চার খলীফাসহ বহু সাহাবায়ে কিরাম এবং বিশেষভাবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.)-এর নিকট তিনি কুরআন, সুন্নাত ও ফিকাহ্ শিক্ষা করেন এবং তাঁর বিশিষ্ট শিষ্যে পরিণত হন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, আমি যা কিছু পড়ি ও জানি তিনিও তা পড়েন ও জানেন। আল্লামা যাহাবী (র.) বলেন, সকল আচার-আচরণ এবং জ্ঞান ও গুণের ক্ষেত্রে হযরত আলকামা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.)-এর 'সাদৃশ্য' ছিলেন, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.)-এর যে বৈশিষ্ট্য ছিলো। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.)-এর দরবারে হযরত আলকামারও তদ্রূপ বৈশিষ্ট্য ছিলো। কাবুস ইব্‌ন আবূ মিবয়ান বলেন, আমি আমার আব্বাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবায়ে কিরামের পরিবর্তে আলকামার নিকট কেন আপনার যাতায়াত? তিনি বললেন, প্রিয় বৎস, বহু সাহাবায়ে কিরামও তাঁর নিকট মাসায়েল ও ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করেন তাই আমিও তাঁর নিকট হতে ইল্‌ম শিক্ষা করি। ৬৪ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইবরাহীম নাখঈ

শৈশবে তিনি হযরত 'আইশা (রা.)-এর খিদমতে হাযির হয়েছেন। তাহযীবুত্তাযীব কিতাবে বর্ণনা রয়েছে যে, জ্ঞানে-গুণে হযরত আলকামা যেমন হযরত ইব্‌ন মাস'উদ (রা.)-এর নমুনা ছিলেন তেমনি ইবরাহীম নাখঈ যাবতীয় ইলমের ক্ষেত্রে হযরত আলকামার নমুনা ছিলেন। ৯৫ হিজরীতে হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র.)-এর জানাযায় শরীক হয়ে ইমাম শাআবী (র.) বলেছিলেন তোমরা হাসান বসরীর চেয়ে বড় ফকীহ্‌কে এমন কি বসরা, কূফা, শাম ও হিজাযের শ্রেষ্ঠ ফকীহ্‌কে আজ দাফন করছো।

হাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান

তিনি ইমাম নাখঈ ও ইমাম শা'আবী (র.)-এর ঐ নিকট হতে ফিকাহ্ হাছিল করেছেন। হযরত হাম্মাদ (র.)-ই ছিলেন হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র.)-এর ফিকাহ্, ফাতওয়া ও ইজতিহাদের সর্বোত্তম আমানতদার, এ বিষয়ে সকলে একমত ছিলেন, তাই তাঁর ওফাতের পর সর্বসম্মতিক্রমে হাম্মাদ (র.) তাঁর মসনদে সমাসীন হয়েছিলেন, স্বয়ং হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র.) বলেছিলেন যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা হাম্মাদ এর নিকট ফাতওয়া ও মাসায়েল জিজ্ঞাসা করো।

মোট কথা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ (রা.) যিনি সকল সাহাবায়ে কিরামের ইল্‌ম নিজের মাঝে ধারণ করেছিলেন, তাঁর ফিকাহ্ ও ইজতিহাদ ফাতওয়া ও মাসায়েলের এক বিরাট

ভাণ্ডার হযরত আলকামা (র.) গ্রহণ করেছিলেন, হযরত আলকামা (র.)-এর ইজতিহাদগুলো তা আরো সমৃদ্ধ হয়ে হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র.)-এর নিকট অর্পিত হয়েছিল। এরপর হযরত হাম্মাদ (র.) যখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন তখন তা আরো সমৃদ্ধ হলো এবং হযরত হাম্মাদের মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয়তম শিষ্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) এক সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের এবং বহু যুগের সঞ্চিত এক সুসমৃদ্ধ ভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী হলেন।

ইমাম আবূ হানীফা

ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর যুগের সর্বজন স্বীকৃত ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলিম ও ফকীহ্ ছিলেন। এ যুগের প্রচলিত সকল জ্ঞান ও শাস্ত্রই তিনি চর্চা করেছিলেন এবং কালাম শাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। যুবক বয়সেই সমকালীন বিভিন্ন বাতিল ফিরকার বিরুদ্ধে বির্তক করে তাদের লা জবাব করেছেন। পরবর্তীতে অবশ্য সম্পূর্ণ রূপে ফিকাহ্ চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এবং ফিকাহ্ ও ইজতিহাদ জগতের দিকপালগণের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। সেক্ষেত্রেও তাঁর সহজাত যুক্তিজ্ঞান ও বির্তক-প্রতিভা তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলো। ইমাম মালিক (র.) বলেছেন আবূ হানীফা (র.) যদি এই মসজিদের খুঁটিকে সোনা বলে প্রমাণ করতে চান তাহলে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দিতে পারবেন।

পক্ষান্তরে তাঁর তাকওয়া পরহিযগারির অবস্থা জানার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, হযরত ফুযায়েল ইব্‌ন ইয়াসের মতো আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব বলেছেন ঃ

আবূ হানীফা হলেন মহান ফকীহ্, দিন রাত ইল্‌ম চর্চায় নিমগ্ন, ইবাদত গুজার, নীরবতা প্রিয়; তবে হারাম-হালালের বিষয়ে সত্য কথা বলে দিতে কখনও দ্বিধা করেন নি।

আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীছ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক বলতেন, আবূ হানীফা হলেন ইলমের নির্যাস। সত্যের জন্য তিনি ছিলেন আপোষহীন, হক ও সত্যকে সমুন্নত রাখার জন্য যে কোন পরিস্থিতির মুকাবিলা করার হিম্মত তাঁর ছিলো। ইমাম নফসে যাকিয়া যখন খলীফার বিরুদ্ধে জিহাদ করলেন তখন তিনি তাঁকে সমর্থন করেছিলেন এবং বিপুল অর্থ সাহায্য পেশ করেছিলেন। খলীফা আল-মানসূর যখন প্রধান বিচারকের পদ গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করলেন তখন তিনি এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন যে, যিনি এতটা সৎসাহসের অধিকারীকে খলীফার বিপক্ষেও শরীআতের ফায়সালা জারী করতে পারেন তিনিই এই পদের উপযুক্ত, আমার সেই সাহস নেই, সুতরাং আমি এ পদের উপযুক্ত নই। এজন্য তিনি খলীফার চাবুক খেয়েছেন জেল-জুলুম ভোগ করেছেন এমন কি জেলখানায় বিষ প্রয়োগের কারণে সিজদারত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেছেন কিন্তু আপন সিদ্ধান্ত হতে বিচ্যুত হন নি।

পারিবারিক সূত্রেই তিনি বিরাট ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকারী ছিলেন, তিনি التاجر الصدوق الامين (সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যবসায়ী)-এর বাস্তব নমুনা ছিলেন, যাদের সম্পর্কে

সুসংবাদ রয়েছে যে, জান্নাতে তারা নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সংগী হবেন। এ সম্পর্কে বহু চমকপ্রদ ঘটনা বর্ণিত রয়েছে, উল্লেখ্য যে, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন ও মুআমালা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা ফিকাহ্ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাঁর জন্য বেশ সহায়ক হয়েছিলো।

হানাফী মাযহাবের বুনিয়াদ শুরাতিত্তিক ইজতিহাদ আল্লামা সুয়ূতি (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ইলমে শরীআতকে সংকলন করেছেন এবং শাস্ত্রীয় রূপ দান করেছেন এবং তিনিই একমাত্র ইমাম যিনি ফিকাহ্ ও ইজতিহাদের জন্য চল্লিশ জন বিশিষ্ট ফকীহ্-এর এক মজলিস গঠন করেছিলেন, সেখানে সূক্ষ্ম গভীর আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে দালায়েল থেকে মাসায়েল আহরণের উসূল ও মূলনীতি নির্ধারণ করা হতো, কিয়াস প্রয়োগের নিয়মনীতি প্রণীত হতো। এরপর একেকটি মাসআলা সম্পর্কে দিনের পর দিন এমনকি মাসাধিককালও আলোচনা হতো, এরপর যখন পূর্ণ ইতমিনান হতো তখন তা লিপিবদ্ধ করা হতো। মুয়াফ্ফাক মক্কী (র.) বলেন ঃ

ইমাম আবূ হানীফা তাঁর মাহযাবের ক্ষেত্রে শুধু নিজস্ব মতামতের উপর নির্ভর করেন নি বরং মজলিসে শুরা গঠন করে সকলের মতামত ও যুক্তি গভীর মনোযোগের সাথে শুনতেন। সর্বশেষে নিজের মতামত ও সিদ্ধান্ত দিতেন, সাধারণতঃ তাঁর ইজতিহাদের উপর সকলেই আশ্বস্ত হতেন এবং তা লিপিবদ্ধ হতো। কিন্তু তারপরও যদি কারো দ্বিমত বজায় থাকতো তাহলে সেটাও লেখা হতো। এভাবে এই আজীমুশ্শান কাজ সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের চিন্তা গবেষণা এবং ইজতিহাদ ও মুজাহাদার মাধ্যমে আঞ্জাম পেয়েছে। এভাবে যে বিশাল ফিকাহ্ভাণ্ডার তৈরী হয়েছিলো তাতে কম করে হলেও তিরাশি হাজার মাসআলা অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বিখ্যাত ছয়টি গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ হয়েছে, এগুলো كتب ظاهر الرواية নামে পরিচিত।

বস্তুত ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর অনন্য সাধারণ ইজতিহাদের মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহ্র উৎস থেকে মাসায়েল আহরণের যে গৌরবপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন তার তুলনা ইসলামের ইতিহাসে তেমন নেই।

একটি ভ্রান্ত অভিযোগ

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর ফিকাহ্ সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত অতিযোগ করা হয়ে থাকে যে, ইমাম সাহেব হাদীছ শাস্ত্রের দুর্বল ছিলেন এবং তাঁর হাদীছ সংগ্রহ ছিলো নগণ্য তাই দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব বিশুদ্ধ হাদীছ নির্ভর নয় বরং দুর্বল হাদীছ নির্ভর।

এ অভিযোগের বিস্তারিত জবাব জানতে হলে মাযহাব কি ও কেন (প্রকাশ মুহাম্মদী লাইব্রেরী চকবাজার) গ্রন্থের হানাফী মাযহাবে হাদীছের স্থান অধ্যায়টি পড়ে দেখুন। এখানে শুধু সংক্ষেপে বলতে চাই যে, হাদীছের বিশুদ্ধতার মাপকাঠি হলো সনদ, সুতরাং কোন হাদীছ বুখারী, মুসলিম বা সিহাহ্ সিত্তাহ্য় বর্ণিত না হলেও সনদগত বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হলে অবশ্যই তা গ্রহণ করতে হবে। হানাফী ফিকাহ্র ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছে। ইমাম তাহাবী, আল্লামা, যায়লাঈ,

আল্লামা আয়নী, আল্লামা জা'ফর আহমদ উছমানী (র.) সহ বহু মুহাদ্দিছ তাঁদের হাদীছ সংকলনে এটা প্রমাণিত সত্য রূপে তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ইজতিহাদী দৃষ্টিকোণ এই যে, একটি বিষয়ের সমগ্র হাদীছের উপর তিনি আমল করতে চান। এজন্য প্রয়োজনে তিনি সনদগত বিচারে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হাদীছ মূল ধরে বিশুদ্ধ হাদীছের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পেশ করে থাকেন। পক্ষান্তরে অন্য মুজতাহিদগণ একটি মাত্র হাদীছকে আমলে এনে অন্যগুলোকে 'যঈফ' বলে এড়িয়ে যান। বলাবাহুল্য যে, মূলনীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ইমামেরই শরীআত সম্মত দলীল রয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র.) সংগৃহীত হাদীছ যেহেতু সুলাছী (বা ত্রিমাতৃক) সেহেতু সেগুলো বিশুদ্ধ হওয়াই ছিলো স্বাভাবিক, কিন্তু পরবর্তীদের হাদীছ সংগ্রহ ছিলো চার পাঁচ বা ছয় স্তরের দীর্ঘ সনদ বিশিষ্ট, ফলে আবূ হানীফা (র.)-এর বহু বিশুদ্ধ হাদীছ তাঁদের নিকট (পরবর্তী বর্ণনাকারীর দুর্বলতার কারণে) দুর্বল প্রমাণিত হয়েছে, বলাবাহুল্য যে, এটা ইমাম আবূ হানীফা বা হানাফী মাযহাবের দোষ নয়। তাছাড়া হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম সাহেবের অত্যুচ্চ মর্যাদা এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, যে যুগে বুখারী, মুসলিম দূরের কথা, হাদীছ শাস্ত্রের প্রাচীনতম প্রামাণ্য গ্রন্থগুলোর অস্তিত্ব ছিলো না। সে সময় ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রায় চল্লিশ হাজার হাদীছ থেকে চয়ন করে কিতাবুল আছার গ্রন্থটি সংকলন করেছিলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

॥ দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্ নামে (শুরু) ॥

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

যারা আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে তাদের জন্য তিনিই যথেষ্ট হন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি ইলমের নিদর্শন ও দৃষ্টান্তসমূহ 'সমুন্নত' করেছেন এবং যিনি শরীআতের বিধান ও নিদর্শনাবলী সুপ্রকাশিত করেছেন, আর সত্যের পথ প্রদর্শনকারী রূপে বহু নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, (তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রহমত বর্ষিত হোক) আর যিনি আলিমগণকে তাঁদের স্থলবর্তী করেছেন যাঁরা তাঁদের সুন্নতের পথের দিকে আহ্বান করেন। যে সকল বিষয়ে তাঁদের পক্ষ থেকে কোন বাণী বর্ণিত হয়নি সে সকল ক্ষেত্রে ইজতিহাদের নীতি অনুসরণ করেন এবং সে বিষয়ে আল্লাহ্‌র নিকট পথ-নির্দেশ প্রার্থনা করেন। আর আল্লাহ্ই সঠিক পথ প্রদর্শনের অধিকারী।

আর তিনিই প্রাথমিক যুগের মুজতাহিদগণকে বিশেষভাবে তাওফীক দান করেছেন, ফলে তাঁরা সুস্পষ্ট ও সূক্ষ্ম সকল প্রকার মাসআলা সন্নিবেশ করেছেন। তবে যেহেতু ঘটনাবলী পরম্পরায় ঘটমান এবং 'আলোচ্য বিষয় অব্যাহত সমস্যাবলী বেষ্টন করতে অক্ষম উপরন্তু উৎসস্থল থেকে বিচ্ছিন্ন মাসআলাসমূহ আহরণ করা এবং সদৃশ মাসআলাসমূহের উপর কিয়াস করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অতি কামিল লোকদের কীর্তি-রূপে স্বীকৃত। আর মাসায়েলের উৎসসমূহ সম্পর্কে অবগতির মূলে তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা সম্ভব হয়, উল্লেখ্য যে, 'বিদায়াতুল মুবতাদী' নামক কিতাবের ভূমিকা অংশে আমার পক্ষ থেকে এ প্রতিশ্রুতি যে, আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাওফীক দান করেন তাহলে "ফিকায়াতুল মুনতাহী' নাম- করণপূর্বক উক্ত কিতাবের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করবো। অতএব আমি শরাহ্ লেখতে আরম্ভ করলাম, যদিও কৃতপ্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য-বাধকতা ছিল না। অবশেষে যখন রচনা কার্য থেকে অবসর হওয়ার কাছাকাছি উপনীত হলাম তখন তাতে কিছু 'বিশদতা' অনুভব করলাম এবং আশংকা করলাম যে, একারণে গ্রন্থখানি পরিত্যাক্ত হতে পারে। তাই আল-হিদায়া নামকরণপূর্বক আর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক দিলে এর প্রতি অধ্যায়ে অতিরিক্ত বিষয় পরিহার করে আমি সুনির্বাচিত বর্ণনা এবং অকাট্য দলীলসমূহ সমাবিষ্ট করবো। এ জাতীয় বিষয়ে অতিবিশদ আলোচনা উপেক্ষা করে চলবো। তবে এমন সকল মূলনীতি তাতে

সন্নিবেশিত হবে যার উপর ভিত্তি করে বহু আনুষঙ্গিক বিষয় আহরিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাকে তা সম্পন্ন করার তাওফীক দান করেন এবং তার সমাপ্তির পর যেন সৌভাগ্যের সাথে আমার জীবনের অবসান ঘটান।

অতএব অধিক জ্ঞান অর্জনের উচ্চস্পৃহা যাদের হবে তারা সাগ্রহে সুদীর্ঘ ও বৃহত্তর ব্যাখ্যা গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করবে। আর যাদের সময়ের তাড়াহুড়া থাকবে তারা সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র পরিধির ব্যাখ্যা গ্রন্থের উপরই নির্ভর করবে। 'فللناس فيما يعشعون مداه' "পসন্দের ক্ষেত্রে মানুষের তো রুচি বৈচিত্র রয়েছে। আর এ ফিকাহ্ শাস্ত্র সর্বাধিক কল্যাণময়।

এরপর আমার কতিপয় সুহৃদ ভ্রাতা অনুরোধ করলেন, যেন আমি তাদের জন্য উক্ত দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করি। সুতরাং আমি আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য কামনা করে আবার তা আরম্ভ করলাম, তাঁর দরবারে সকাতর প্রার্থনা সহকারে, যেন আমার প্রয়াস সহজ করে দেন। তিনিই সকল কঠিনকে সহজ করেন। তিনি তো যা ইচ্ছা করেন,.তাঁর উপর ক্ষমতাবান এবং দু'আ কবূলের যোগ্য কেউ নেই। আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্ম-বিধায়ক।

كِتَابُ الطَّهَارَاتِ
অধ্যায় ঃ তাহারাত

অধ্যায় ঃ তাহারাত[১]

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوهَكُمْ الاية ـ

হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা সালাতে দাঁড়াতে মনস্থ কর তখন নিজেদের মুখমণ্ডল ধৌত কর .... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণ হলো যে, *উযূতে তিনটি অংগ ধোয়া এবং মাথা মাস্হ করা ফরয*[২]।

غسل ধোয়া, (পানি) প্রবাহিত করা। আর مسح (ভিজা হাত) লাগান। আর মুখমণ্ডলের সীমা (কপালের উপরের) চুলের গোড়া থেকে চিবুকের নীচ পর্যন্ত এবং উভয় কানের লতি পর্যন্ত। কেননা, وجه (মুখমণ্ডল) শব্দটি مواجهة (মুখোমুখি হওয়া) থেকে উদ্ভূত। আর এ পুরা অংশের দ্বারাই সামনা সামনি হওয়া সংগঠিত হয়।

কনুইদ্বয় ও গোড়ালিদ্বয় ধৌত করার বিধানের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের তিন ইমামের মতে। যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, সীমানা তার পূর্ববর্তী অংশের (مغيا) অন্তর্ভুক্ত হয় না, যেমন সাওম সম্পর্কিত বিধানে রাত্রি অন্তর্ভুক্ত নয়। আমাদের যুক্তি এই যে, এ সীমানার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার পরবর্তী অংশকে বহির্ভূত করা। কারণ, যদি সীমানার উল্লেখ না থাকত তবে ধোয়ার হুকুম পুরো হাতকে শামিল করতো। পক্ষান্তরে সাওমের ক্ষেত্রে সীমানা উল্লেখের উদ্দেশ্য হল সে পর্যন্ত হুকুমের বিস্তার ঘটানো। কেননা صيام শব্দটি সামান্য সময়ের বিরতির উপর ব্যবহার হয়।

---

১. طهارة শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা। পারিভাষিক অর্থ- শরীআত নির্ধারিত পন্থায় حدث ও نجاسة দূর করা।

২. فرض শব্দের আভিধানিক অর্থ নির্ধারণ। শরীআতের পরিভাষায় এমন বিধান, যা সুনিশ্চিত সন্দেহাতীত প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত এবং তা অস্বীকার করা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। একে اعتقادى فرض বলে; অর্থাৎ আকীদা ও আমল উভয় দিক দিয়ে বাধ্যতামূলক। অপরটি হল عملى فرض। এটি যা ওয়াজিব-এর উপরও ব্যবহার হয়- আমলের ক্ষেত্রে তা ফরয তুল্য এবং বর্জনকারী শাস্তিযোগ্য; কিন্তু বিশ্বাসের দিক দিয়ে অকাট্য নয়; তাই অস্বীকার করা কুফর নয়।

বিশুদ্ধ মতে كعب পায়ের গোড়ায় বের হয়ে থাকা হাড়। এ থেকে উদ্ভিন্ন স্তন তরুণীকে كاعب বলা হয়।

গ্রন্থকার বলেন, *মাথা মাস্‌হ-এর ক্ষেত্রে ناصية অর্থাৎ মাথার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ স্পর্শ করা ফরয।* কেননা মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একবার বস্তির আর্বজনা ফেলার স্থানে এসে পেশাব করে উযূ করলেন। তখন তিনি মাথার সম্মুখভাগ এবং মোজা মাস্‌হ করলেন।

যেহেতু আল-কুরআনের বক্তব্য এখানে পরিমাণের দিক থেকে অস্পষ্ট, সেহেতু আলোচ্য হাদীছটি তার ব্যাখ্যা রূপে যুক্ত করা হয়। এ হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.) কর্তৃক তিন চুলের দ্বারা নির্ধারণের বিপক্ষে প্রমাণ। অদ্রূপ ইমাম মালিক (র.) কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ মাস্‌হ শর্ত করার বিপক্ষে প্রমাণ।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, আমাদের ইমামদের মধ্যে কেউ কেউ ফরয মাসহ্‌র হাতের তিন আংগুল পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। কেননা তা প্রকৃতপক্ষে যে অঙ্গ দ্বারা মাস্‌হ করা হয়, তার সিংহভাগ।

গ্রন্থকার বলেন, *উযূর সুন্নত[৩] হলো ঃ*

(১) *পাত্রে হাত প্রবেশ করানোর আগে উভয় হাত ধোয়া, যখন উযূকারী তার নিদ্রা থেকে উঠে।* কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِى الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِىْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ-

তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে ওঠে, তখন সে যেন তার হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত পাত্রে না ডুবায়। কেননা, সে জানে না, নিদ্রিত অবস্থায় তার হাত কোথায় ছিলো (অর্থাৎ কোন অংগ স্পর্শ করেছিল)। তাছাড়া হাত হলো তাহারাত সম্পাদনের উপকরণ। সুতরাং তার পবিত্রকরণের মাধ্যমে শুরু করাই সুন্নত। এ ধৌত করার পরিমাণ কবজি পর্যন্ত। কেননা, তাহারাত সম্পাদনের জন্য অতটুকুই যথেষ্ট।

(২) *উযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলা।* কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ –যে বিসমিল্লাহ্ বলেনি, তার উযূ হয়নি। এখানে উদ্দেশ্য হল, উযূর ফযীলত হাসিল হবে না। বিশুদ্ধ মত হল। উযূতে বিসমিল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব। যদিও (মূল পাঠে) তাকে সুন্নত বলেছেন। এবং ইস্তিনজার আগে ও পরে বিসমিল্লাহ্ বলবে; এ-ই সঠিক মত।

(৩) *মিসওয়াক করা।* কেননা নবী (সা.) সব সময় তা করতেন। মিসওয়াক না থাকলে আংগুল ব্যবহার করবে। কেননা নবী (সা.) এরূপ করেছেন।

---

৩. سنة এর আভিধানিক অর্থ-পথ ও পন্থা। পারিভাষিক অর্থ হলো নবী (সা.) যা নিয়মিত পালন করেছেন, তবে মাঝে মধ্যে তরকও করেছেন যাতে উম্মতের জন্য বাধ্যতামূলক না হয়ে যায়।

(৪) ***কুলি করা*** ও (৫) ***নাকে পানি দেয়া।*** কেননা নবী (সা.) সবসময় উভয়টি করেছেন। এ দু'টির পদ্ধতি এই যে, তিনবার কুলি করবে এবং প্রতিবার নতুন পানি নিবে। একইভাবে নাকে পানি নিবে। নবী (সা.)-এর উযূতে এরূপ বর্ণনাই এসেছে।

(৬) ***উভয় কান মাসূহ করা।*** মাথা মাস্হ এর (অবশিষ্ট) পানি দ্বারা তা সম্পাদন করা সুন্নত। ইমাম শাফিঈ ভিন্নতম[৪] পোষণ করেন। আমাদের দলীল হলো নবী (সা.) বলেছেন ঃ الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ -কর্ণদ্বয় মাথারই অংশ বিশেষ। এর উদ্দেশ্য হল শরীআতের হুকুম বর্ণনা করা, সৃষ্টিগত অবস্থা বর্ণনা করা নয়।

(৭) ***দাড়ি খেলাল কর।*** কেননা হযরত জিবরীল নবী (সা.)-কে তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এটি আবূ ইউসুফের মতে সুন্নত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা (সুন্নত নয়) বৈধ মাত্র। কেননা, সুন্নত হল এমন কাজ, যা দ্বারা ফরযকে তার স্থানে পূর্ণতা দান করা হয়। অথচ দাড়ির ভিতরের অংশ (মুখমণ্ডল ধৌত করা) ফরযের স্থান নয়।

(৮) আংগুল খেলাল করা। কেননা নবী (সা.) বলেছেন, তোমরা তোমাদের আংগুলসমূহ খেলাল কর, যাতে জাহান্নামের আগুন তাতে প্রবেশ না করে। আর এ ভাষ্য যে, এ দ্বারা ফরযকে তার স্থানে পূর্ণতা দান করা হচ্ছে।

(৯) তিনবার পর্যন্ত পুনঃ ধৌত করা– কেননা, নবী (সা.) একেকবার করে ধৌত করেছেন এবং বলেছেন, এটা এমন উযূ, যা না হলে আল্লাহ্ সালাত কবূলই করবেন না। আবার দু' দু'বার করে ধৌত করেছেন এবং বললেন, এটি ঐ ব্যক্তির উযূ, যাকে আল্লাহ্ দ্বিগুণ বিনিময় দান করবেন। এরপর তিন তিন বার ধৌত করে বললেন, এটা আমার উযূ এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের উযূ। যে এর বেশী বা কম করবে, সে সীমালংঘন করল ও অন্যায় করল।

অবশ্য এই কঠোর হুঁশিয়ারি হচ্ছে তিনবার করে ধোয়াকে সুন্নত বলে বিশ্বাস না করার জন্য।

উযূকারীর জন্য মুস্তাহাব হলো ঃ

(১) পবিত্রতা অর্জনের নিয়্যত করা। আমাদের মতে উযূতে নিয়্যত হলো সুন্নত। আর ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে তা ফরয। কেননা, উযূ একটি ইবাদত, সুতরাং তায়াম্মুমের মতো উযূও নিয়্যত ছাড়া শুদ্ধ হবে না। আমাদের দলীল এই যে, নিয়্যত ছাড়া উযূ ইবাদতরূপে গণ্য হবে না ঠিকই, তবে সালাতের প্রবেশ-মাধ্যমরূপে অবশ্যই বিবেচিত হবে। কেননা, পবিত্রতার উপকরণ (পানি) ব্যবহারে পবিত্রতা অর্জিত হবে। তায়াম্মুমের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, সালাত আদায়ের নিয়্যত ছাড়া অন্য অবস্থায় মাটি মূলত পবিত্রতা সৃষ্টিকারী নয়। তাছাড়া تيمم শব্দটি ইচ্ছা ও নিয়্যতের অর্থবহ।

(২) সম্পূর্ণ মাথা মাসূহ করা। এটাই হচ্ছে সুন্নত। আর ইমাম শাফিঈ বলেন, সুন্নত হচ্ছে প্রত্যেকবার নতুন পানি নিয়ে তিনবার মাস্হ করা। মাস্হকে তিনি ধোয়ার অংগগুলোর উপর কিয়াস করেন। আমাদের দলীল এই যে, আনাস (রা.) মুখ, হাত, পা তিন তিনবার করে

৪. তাঁর মতে কানের ভিতরের ও বাইরের অংশ নতুন পানি দ্বারা মাস্হ করা সুন্নত।

ধুয়ে উযূ করলেন আর মাথা একবার মাস্‌হ করলেন। তারপর তিনি বললেন, এ হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উযূ। আর তিনবার মাস্‌হ করার যে হাদীছ বর্ণিত আছে, তা মূলত একবারের পানির ব্যবহারের উপর ধরা হয় এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত মত অনুযায়ী তাও শরীআত সম্মত।

তাছাড়া ফরয হলো মাস্‌হ করা। অথচ বারংবার মাস্‌হ করলে তা ধোয়াতেই পরিণত হয়ে যাবে। সুতরাং তা সুন্নত হতে পারে না। অতএব মাথা মাস্‌হ মূলতঃ মোজার উপর মাস্‌হ করার সদৃশ। অংগ ধৌত করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা বারংবার তা দ্বারা ধোয়ার হুকুমের ক্ষতি হচ্ছে না।

(৩) তরতীবের সাথে উযূ করা, অর্থাৎ আল্লাহ্ যেভাবে বর্ণনা শুরু করেছেন, সে ধারায় শুরু করা এবং

(৪) ডান দিক থেকে শুরু করা। আমাদের মতে উযূতে তরতীব রক্ষা করা সুন্নত। আর ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে তা করা ফরয। তাঁর দলীল এই যে, উযূর আয়াত (فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ الاية) -এ ف অব্যয়টি রয়েছে, যা পর্যায়ক্রম বোঝায়। আমাদের বক্তব্য এই যে, আয়াতে (উল্লেখিত প্রতিটি অংগের মাঝে) واو অব্যয়টি রয়েছে। আর ভাষাবিদদের সর্বসম্মত মতে এ অব্যয়টি নিছক একত্রীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আয়াতের চাহিদা হচ্ছে সবক'টি অংগের ধৌত কার্য পরবর্তী পর্যায়ে সম্পন্ন করা।

আর ডান দিক থেকে শুরু করা উত্তম। কেননা নবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ সব বিষয়ে ডান দিক থেকে শুরু করা পসন্দ করেন। এমনকি জুতা পরিধান করা চুল আঁচড়ানোর ক্ষেত্রেও।

পরিচ্ছেদ ঃ উযূ ভংগের কারণসমূহ

উযূ ভংগের কারণগুলো যথাক্রমে ঃ

(১) পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে যে কোন কিছু বের হওয়া। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ অথবা তোমাদের কেউ শৌচ স্থান থেকে আসে (৪ ঃ ৪৩)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো حَدَثٌ (উযূ ভংগের কারণ) কি? তিনি বললেন ঃ مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ-পেশাব ও পায়খানা দু'দ্বারে যা বের হয়।

আলোচ্য হাদীছের ما (যা কিছু) শব্দটি ব্যাপকতা জ্ঞাপক। সুতরাং প্রকৃতিগত ও অপ্রকৃতিগত সবকিছুই এর অন্তর্ভূক্ত।

(২) দেহের কোন অংশ থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে যদি পাক করার বিধান প্রযোজ্য হয় এমন স্থান অতিক্রম করে।

(৩) মুখ ভর্তি বমি। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, পেশাব পায়খানার রাস্তা ছাড়া (দেহের অন্য কোন স্থান থেকে) কিছু বের হলে উযূ ভংগ হবে না। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) বমি করে উযূ করে নি।

তা ছাড়া যে স্থানে নাজাসাত স্পর্শ করেনি, তা ধৌত করা যুক্তি-উর্ধ্ব করণীয় বিধান।[৫]

সুতরাং শরীআতের নির্দেশিত স্থানে তা সীমিত থাকবে। আর তা হল প্রকৃতিগত পথ। আমাদের প্রমাণ হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ (الدار قطنى) الوضوء من كل دم سائل –সকল প্রবাহিত রক্তের জন্যই উযূ আবশ্যক। তিনি আরো বলেছেন ঃ

مَنْ قَاءَ اَوْ رَعَفَ فِىْ صَلاَتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلٰى صَلاَتِهِ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ۔

(ابن ماجة)

–সালাত অবস্থায় কারো বমি হলে কিংবা নাকে রক্ত ঝরলে সে যেন ফিরে গিয়ে উযূ করে এবং পূর্ববর্তী সালাতের উপর 'বিনা'[৬] করে যতক্ষণ না কথা বলবে।

আর যুক্তি হল। নাজাসাত নির্গত হওয়া তাহারাত ও পবিত্রতা ভংগের কারণ মূল আয়াতের এতটুকু তো যুক্তিসংগত। অবশ্য নির্দিষ্ট চার অংগ ধোয়ার নির্দেশ যুক্তির উর্ধ্বে। কিন্তু প্রথম বিষয়টি স্থানান্তরিত হলে দ্বিতীয় বিষয়টিও স্থানান্তরিত হওয়া অনিবার্য হবে। তবে নির্গত হওয়া তখনই সাবস্ত হবে, যখন তা তাহারাতের হুকুমভুক্ত কোন অংশে গড়িয়ে পৌঁছবে। আর বমির ক্ষেত্রে যখন তা মুখ ভরে হবে। কেননা, 'আবরণত্বক' উঠে গেলে রক্ত বা পুঁজ স্বস্থানে প্রকাশ পায় মাত্র; নির্গত হয় না।

পক্ষান্তরে পেশাব-পায়খানার পথ দু'টি ব্যতিক্রম (অর্থাৎ সেখানে নাজাসাত দেখা গেলে উযূ ভংগ হয়েছে বলে ধরা হবে) কেননা, তা নাজাসাতের প্রকৃত স্থান নয়। সুতরাং সেখানে নাজাসাতের প্রকাশ থেকেই তার 'স্থানচ্যুতি' ও নির্গত হওয়া প্রমাণিত হবে।

মুখ ভরা বমির অর্থ হলো, অনায়াসে যা আটকানো সম্ভব নয়। কেননা, দৃশ্যতঃ তা নির্গত হতে বাধ্য। সুতরাং নির্গত হয়েছে বলেই গণ্য হবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, অল্প ও বিস্তর বমি সমপর্যায়ের। তদ্রূপ (রক্তের ক্ষেত্রেও তিনি) প্রবাহিত হওয়ার শর্ত আরোপ করেন না। পেশাব-পায়খানার স্বাভাবিক নির্গত হওয়ার স্থানের উপর কিয়াস করে।

তাছাড়া নবী করীম (সা.)-এর নিম্নোক্ত বাণী ঃ القلس حدث। (বমি উযূ ভংগের কারণ)[৭] হচ্ছে শর্তমুক্ত।

আমাদের প্রমাণ হল নবী করীম (সা.)-এর হাদীছ ঃ

---

৫. সাধারণ যুক্তির দাবী হচ্ছে, নাজাসাত লেগে যাওয়া অংগ ধোয়া। অথচ উযূর ক্ষেত্রে রয়েছে এর বিপরীত। তবে যেহেতু আমরা আল্লাহ্র বান্দা, সেহেতু বন্দেগীর স্বাভাবিক দাবী হচ্ছে; যুক্তি ও বুদ্ধিকে প্রাধান্য না দিয়া আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে নেওয়া। তবে এ ধরনের হুকুম শরীআতের প্রত্যক্ষ নির্দেশ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সুতরাং উযূর নির্দেশ সম্বলিত আয়াতে যেহেতু পেশাব-পায়খানার স্বাভাবিক পথে নির্গত নাজাসাতের কথা রয়েছে, তাই এর বাইরে উযূ ভঙ্গের বিধানকে প্রয়োগ করা যাবে না।

৬. পূর্ব তাহরীমার ভিত্তিতেই অবশিষ্ট সালাত আদায় করে নিবে। নতুন করে সালাত শুরু করতে হবে না। মধ্যবর্তী সময়টুকুতে কথা বলে ফেললে (বা উযূ ভংগের নতুন কোন কারণ দেখা দিলে) নতুন করে তাহরীমা বেঁধে পুরো সালাত আদায় করতে হবে, শুধু অবশিষ্ট অংশ আদায় করলে চলবে না।

৭. দারা-কুতনী।

لَيْسَ فِى الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوْءٌ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ سَائِلاً –প্রবাহিত না হলে এক দু' ফোঁটা রক্ত বের হলে উযূ আবশ্যক নয়।[৮]

এবং হযরত আলী (রা.) উযূ ভংগের সবক'টি কারণ গণনা প্রসংগে বলেছেন, اَوْ دَسْعَةً تَمْلأُ الْفَمَ (কিংবা মুখ ভরা বমি) এখানে যখন হাদীছগুলো পরস্পর বিরোধী তখন (সমন্বয়ের জন্য) ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছকে অল্প বমির উপর এবং ইমাম যুফার বর্ণিত হাদীছকে বেশী বমির উপর ধরা হবে। পক্ষান্তরে পেশাব-পায়খানার রাস্তা এবং অন্যান্য স্থান থেকে নাজাসাতে নির্গত হওয়ার পার্থক্য ইতোপূর্বে আমরা বলে এসেছি।

যদি বিভিন্ন দফায় এত পরিমাণ বমি করে যে, একত্র করা হলে তা মুখ ভর্তি পরিমাণ হবে, তখন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে স্থানের অভিন্নতা বিবেচ্য[৯] হবে। এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বমনোদ্রেককারী হেতু অর্থাৎ উদগারের অভিন্নতা বিবেচ্য।[১০]

ইমাম আবূ ইউসুফ থেকে বর্ণিত যে, যে নির্গত পদার্থ উযূ ভংগের কারণ নয়, তা নাপাকও গণ্য নয়; এবং এটাই বিশুদ্ধ মত। যেহেতু তার দ্বারা তাহারাত ভংগ হয় না, তাই শরীআতের বিধানে নাপাক না হওয়া প্রমাণিত হয়।

এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যখন পিত্ত বমি বা খাদ্যদ্রব্য বা সাধারণ পানি বমন হয়। আর শ্লেষ্মাবমন হলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা কোন অবস্থাই উযূ ভংগকারী নয়। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এটিও মুখ ভর্তি হলে উযূ ভংগের কারণ হবে।

এ মতপার্থক্য হচ্ছে উদর থেকে উঠে আসা শ্লেষ্মার ব্যাপারে। মাথা থেকে নেমে আসা শ্লেষ্মার ক্ষেত্রে কিন্তু সর্বসম্মত মতেই তা উযূ ভংগের কারণ নয়। কেননা, মাথা নাজাসাতের স্থান নয়। ইমাম আবূ ইউসুফের যুক্তি এই যে, (উদরস্থ) শ্লেষ্মা নাজাসাতের সংস্পর্শহেতু নাজাসাত রূপে গণ্য।

আর অন্য দুই ইমামের যুক্তি এই যে, এই শ্লেষ্মা যেহেতু পিচ্ছিল। কাজেই তাতে নাজাসাত প্রবেশ করে না। যাওবা এর সাথে লেগে থাকে তা অতি অল্প। আর বমির ক্ষেত্রে 'অল্প'ও উযূ ভংগকারী নয়।

আর যদি কেউ রক্তবমি করে এবং তা জমাট হয়, তবে এতে মুখ ভরতি বিবেচনা করা হবে। কেননা মূলতঃ তা পিত্ত-নিঃসৃত গাঢ় কাল পদার্থ। আর যদি তরল হয়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, অন্যান্য প্রকার বমির নিরিখে এক্ষেত্রেও অনুরূপ মুখ ভর্তি হওয়া বিবেচ্য।

অন্য দুই ইমামের মতে, যদি স্বতঃস্ফূর্ত বেগে প্রবাহিত হয় তাহলে অল্প হলেও উযূ ভেংগে যাবে। কেননা পাকস্থলী রক্তের স্থান নয়। সুতরাং তা উদরস্থ কোন ক্ষত থেকে নির্গত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

---

৮. দারা-কুতনী।

৯. অর্থাৎ একই কারণে বা বিভিন্ন কারণে একই মজলিসে যত দফাই বমি হোক সেগুলোর সম্মিলিত পরিমাণ বিবেচনা করা হবে।

১০. অর্থাৎ একই মজলিসে বা বিভিন্ন মজলিসে একই কারণে যত দফাই বমি হোক, সেগুলোর সম্মিলিত পরিমাণ বিবেচনা করা হবে।

(আর রক্ত) মাথার ভিতর থেকে গড়িয়ে নাকের নরম অংশ পর্যন্ত উপনীত হলে সর্বসম্মত মতে উযূ ভেংগে যাবে। কেননা তা তাহারাতের হুকুমভুক্ত অংশে চলে এসেছে। সুতরাং নির্গত হওয়া সাব্যস্ত।

(৪) *ঘুমানো– কাত হয়ে কিংবা হেলান দিয়ে কিংবা এমন কিছুতে ঠেস দিয়ে যে, তা সরিয়ে দিলে সে পড়ে যাবে।* কেননা, পার্শ্ব শয়ন শরীরের গ্রন্থিগুলোর শিথিলতার কারণ। ফলে এ অবস্থা স্বভাবতঃই কিছু (বায়ু) নির্গত হওয়া থেকে মুক্ত নয়। আর স্বভাবতঃ যা বিদ্যমান তা ইয়াকিনী বিষয় বলে গণ্য।

আর তা হেলান অবস্থায় ঘুম আসলে ভূমির সাথে নিতম্বের সংলগ্নতা না থাকার কারণে জাগ্রতাবস্থার নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত হয়। আর কিছুতে উক্ত প্রকার ঠেস দিয়ে ঘুমালে অংগ শৈথিল্য চরমে পৌঁছে যায়। ঠেকনাটি তার পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখে পক্ষান্তরে (সালাতে বা সালাতের বাইরে) দাঁড়ানো, বসা, রুকূ ও সাজদা অবস্থার ঘুম তেমন নয়। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা, আংশিক নিয়ন্ত্রণ তখনো বহাল থাকে, তা না হলে তো পড়েই যেতো। সুতরাং পুরোপুরি অঙ্গ শিথিল হয় না। এ বিষয়ে মূল ভিত্তি হলো নবী (সা.)-এর বাণী ঃ

لاَ وَضُوْءَ عَلٰى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعًا أَوْسَاجِدًا ، اِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا ، فَاِنَّهُ اِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ ـ

–দাঁড়িয়ে, বসে, রুকূতে বা সাজদায় যে ঘুমায়, তার উপর উযূ আবশ্যক নয়। উযূ আবশ্যক হলো তার উপর, যে পার্শ্বে ভর দিয়ে ঘুমায়, কেননা পার্শ্বের উপর ঘুমোলে তার গ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়ে।[১১]

(৫) এমন সংজ্ঞাহীনতা, যাতে বোধ-লোপ পায় এবং (৬) অপ্রকৃতিস্থতা। কেননা, এগুলো অংগ শৈথিল্যের ক্ষেত্রে পার্শ্ব শয়নের চাইতেও বেশী ক্রিয়াশীল। সংজ্ঞাহীনতা সর্বাবস্থায় উযূ ভংগের কারণ। ঘুমের ক্ষেত্রও কিয়াস ও যুক্তির দাবী এটাই ছিল। কিন্তু ঘুমের ক্ষেত্রে উক্ত পার্থক্য আমরা হাদীছ থেকে পেয়েছি। সংজ্ঞাহীনতা কে আবার নিদ্রার উপর কিয়াস করার সুযোগ নেই। কেননা তা নিদ্রার চাইতে বেশী প্রবল।

(৭) *রুকূ-সাজদাবিশিষ্ট সালাতে অট্টহাসি।* অবশ্য কিয়াস ও যুক্তির দাবী হল উযূ ভংগ না হওয়া। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতও তাই। কেননা তা নির্গত নাজাসাত নয়। এ কারণে সালাতুল জানাযায়, তিলাওয়াতের সাজদায় এবং সালাতের বাইরে তা উযূ ভংগের কারণ নয়।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ أَلاَ مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ قَهْقَهَةً فَلْيُعِدِ الْوُضُوْءَ وَالصَّلٰوةَ جَمِيْعًا শুনো, তোমাদের কেউ অট্টহাসি করলে উযূ ও সালাত উভয়ই পুনরায় আদায় করবে।[১২]

১১. ভিন্ন শব্দে সমার্থক হাদীছ আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে রয়েছে।

১২. দারা কুতনী ও তাবারানী।

বলাবাহুল্য যে, এ ধরনের (মশহূর হাদীছ) দ্বারা কিয়াস পরিহার করা হয়ে থাকে। তবে হাদীছটি যেহেতু পূর্ণ আকারের সালাত সম্পর্কিত, সেহেতু তার হুকুম তাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

قهقهه বা 'অট্টহাসি' হলো যা নিজে এবং পার্শ্ববর্তী শুনতে পায়। আর ضحك বা হাসি হলো যা নিজে শোনতে পায়, কিন্তু অন্যরা শুনতে পায় না। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, হাসি দ্বারা উযূ নষ্ট হয় না, কিন্তু সালাত ফাসিদ হয়ে যায়।

(৮) পিছনের রাস্তা দিয়ে কোন কীট বের হলে তা উযূ ভংগকারী হবে। তবে ক্ষতস্থান থেকে কীট বের হলে বা মাংসখণ্ড খসে পড়লে উযূ ভংগ হবে না।

মূল পাঠে 'দাব্বা' দ্বারা উদ্দেশ্য 'কীট' কেননা (মূলতঃ কীট নাজাসাত নয় বরং) তার দেহে লেগে থাকা পদার্থ হলো নাজিস বা নাপাক এবং তা অতি অল্প। আর অল্প নাজাসাত পেশাব-পায়খানার রাস্তায় নির্গত হওয়া উযূ ভংগের কারণ। কিন্তু অন্য স্থান থেকে অল্প বের হওয়া উযূ ভংগের কারণ নয়। তাই (অন্যস্থান থেকে অল্প বের হওয়া) ঢেকুরের সঙ্গে তুলনীয় এবং (পেশাব-পায়খানার রাস্তা থেকে অল্প বের হওয়া) নিঃশব্দ বাতকর্মের সাথে তুলনীয়।[১৩] পক্ষান্তরে নারী অথবা পুরুষের পেশাবের রাস্তা দিয়ে নির্গত বায়ু উযূ ভংগকারী নয়। কেননা তা নাজাসাতের স্থান থেকে সৃষ্ট নয়। তবে 'উভয় পথ সংযুক্ত এমন কোন নারীর বায়ু নির্গত হলে তার জন্য উযূ করে নেয়া মুসতাহাব। কেননা, সেটা পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান।

কোন ফোঁড়া-ফোস্কার চামড়া তুলে ফেলার কারণে তা থেকে পানি-পুঁজ ইত্যাদি গড়িয়ে যদি ক্ষতস্থানের মুখ অতিক্রম করে তাহলে উযূ ভংগ হবে, আর যদি অতিক্রম না করে তবে উযূ ভংগ হবে না।

ইমাম যুফার (রা.)-এর মতে উভয় অবস্থায় উযূ ভংগ হবে। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে উভয় অবস্থাতেই উযূ ভংগ হবে না। মূলতঃ এটা পেশাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়া ভিন্ন পথে নাজাসাত নির্গত হওয়ার মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত। এই সমস্ত পানি পুঁজ ইত্যাদি অবশ্যই নাজিস। কেননা এগুলো মূলতঃ রক্ত, যা পর্যায়ক্রমে পক্ক হয়ে নির্গত ক্লেদ এবং আরো বেশী পক্ক হওয়ার পর পুঁজ, এরপর এই পার্থক্য তখনই হবে যখন আবরণ-ত্বক সরিয়ে ফেলার কারণে তা আপনা আপনি বের হয়। পক্ষান্তরে চিপ দেওয়ার কারণে বের হলে উযূ ভংগ হবে না। কেননা (হাদীছে الخارج বা নির্গত শব্দ রয়েছে, অথচ) এটা خارج বা নির্গত নয়, বরং مخرج বা নিঃসরণ করা হয়েছে।[১৪] আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

---

১৩. অর্থাৎ মৃদু বাতকর্মে নির্গত নাজাসাত অতি অল্প হলেও পায়খানার রাস্তায় বলে তা উযূ ভংগকারী হয়। সুতরাং পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত কীটও উযূ ভংগকারী হবে। পক্ষান্তরে ঢেকুরের সাথে নির্গত অতি অল্প নাজাসাত উযূ ভংগকারী নয় সুতরাং পায়খানার রাস্তা ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে নির্গত কীট উযূ ভংগকারী হবে না।

১৪. বিশুদ্ধ মত এই যে নিঃসারিত হলেও তা উযূ ভংগের কারণ হবে। কেননা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস এই দলীল চতুষ্টয় যুগপৎ প্রমাণ করে যে, নির্গত পদার্থের নাপাকিত্বই হলো উযূ ভংগের কারণ, আর এই নাপাকিত্বের গুণ নিঃসারিত পদার্থেও বিদ্যমান।

পরিচ্ছেদ ঃ গোসল

গোসলের ফরয হল কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া এবং সমস্ত শরীর ধোয়া।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে গোসলের মধ্যে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া সুন্নত। কেননা নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ –দশটি বিষয় ফিতরাত অর্থাৎ সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে তিনি কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন ঃ এ কারণেই উযূতে এ দু'টিকে সুন্নত গণ্য করা হয়।

আমাদের দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا –যদি তোমরা জুনুবী[১৫] হও তাহলে পূর্ণ রূপে তাহারাত হাসিল কর।

এখানে পূর্ণরূপে তাহারাত হাসিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার মর্ম হল সমস্ত শরীর পবিত্র করা।[১৬] তবে যেখানে পানি পৌঁছানো দুষ্কর, সেগুলো (ধোয়ার আওতা থেকে) বহির্ভূত।

উযূর অবস্থা ভিন্ন। কেননা, উযূর মধ্যে وجه (চেহারা) ধোয়া ওয়াজিব। আর আভিধানিক অর্থে وجه (চেহারার) দ্বারা এতটুকু অংশ বুঝায়, যা মুখোমুখিতে প্রকাশ পায়।) আর মুখ ও নাকের অভ্যন্তরের মধ্যে মুখামুখির অবস্থা অনুপস্থিত।

(ইমাম শাফিঈ (র.) কর্তৃক) বর্ণিত হাদীছটির উদ্দেশ্য হচ্ছে উযূ ভংগের অবস্থা। এর প্রমাণ হল নবী.(সা.)-এর বাণী।

اِنَّهُمَا فَرْضَانِ فِى الْجَنَابَةِ سُنَّتَانِ فِى الْوُضُوْءِ -কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া উভয়টি জানাবাতের গোসলে ফরয এবং উযূতে সুন্নত।

গোসলের সুন্নত এই যে, গোসলকারী প্রথমে দুই হাত এবং লজ্জাস্থান ধুবে। আর শরীরে নাজাসাত লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করবে, অতঃপর সালাতের উযূর অনুরূপ উযূ করবে, তবে পদদ্বয় ধুবে না। এরপর মাথায় ও সারা শরীরে তিনবার পানি প্রবাহিত করবে। এরপর গোসলের স্থান থেকে সরে গিয়ে দু'পা ধুয়ে নেবে।

মায়মূনা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর গোসলের অনুরূপ বিবরণই দিয়েছেন। পা ধোয়া সর্বশেষে করার কারণ এই যে, পা দুটো ব্যবহৃত পানি জমা থাকার জায়গায় থাকে। তাই আগে ধোয়াতে কোন লাভ নেই। এমনকি তক্তার উপরে (বা উচু স্থানে) দাঁড়িয়ে গোসল করলে তখন পা ধোয়া বিলম্বিত করবে না।

প্রথমে হাকীকী নাজাসাত (নাপাক পদার্থ) দূর করে নেয়ার কারণ এই যে, পানি লেগে তা যেন আরো ছড়িয়ে না পড়ে।

স্ত্রী লোকের জন্য গোসলের সময় বেণী খুলে নেওয়া জরুরী নয়, যদি চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উম্মু সালামা (রা.)-কে বলেছেনঃ

---

১৫. অর্থাৎ যার উপর গোসল ফরয হয়েছে।

১৬. কেননা طهار ৷ মাসদারটি তাশদীদের কারণে প্রবণতা জ্ঞাপক।

(رواه مسلم) يَكْفِيْكِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعْرِكِ –চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

বেণী ভিজানোও স্ত্রীলোকের জন্য জরুরী নয়, এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা তা কষ্ট সাধ্য দাড়ির ব্যাপার অবশ্য ভিন্ন। কেননা দাড়ির ভিতরে পানি পৌঁছানো কষ্টদায়ক নয়।

ইমাম কুদূরী বলেন, *গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ হল ঃ*

(১) *জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় নারী বা পুরুষের সবেগ ও সকাম বীর্যস্খলন।*

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে, যে কোন অবস্থায় বীর্যস্খলনেই গোসল ওয়াজিব হয়। কেননা রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ (مسلم ، ابو داؤد) اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ –পানির কারণে পানি আবশ্যক; অর্থাৎ বীর্যস্খলনের কারণে গোসল আবশ্যক। আমাদের দলীল এই যে, পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ 'জুনুবীর' সাথে সম্পর্কিত। جنابة শব্দের আভিধানিক অর্থ 'সকাম অবস্থায় বীর্যস্খলন'। (উদাহরণতঃ) أَجْنَبَ الرَّجُلُ (লোকটি জুনুবী হয়েছে) তখনই বলা হয়, যখন লোকটি স্ত্রীর সাথে কাম-ইচ্ছা চরিতার্থ করে।

উক্ত হাদীছ সকাম বীর্যস্খলনের অর্থেই ব্যবহৃত। তবে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মূল স্থান থেকে বীর্যেরস্খলনকালে কামোত্তেজনা থাকাই যথেষ্ট।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বীর্যের প্রকাশ বা নির্গমন কামোত্তেজনাসহ হওয়া শর্ত। তিনি নির্গমন অবস্থাকে মূল স্থান থেকে স্খলন অবস্থার উপর কিয়াস করেন। কেননা গোসলের সম্পর্ক উভয়ের সাথে।

উক্ত দুই ইমামের যুক্তি এই যে, যখন গোসল ওয়াজিব হওয়ার এক কারণ বিদ্যমান তখন সতর্কতার চাহিদা হল গোসল ওয়াজিব সাব্যস্ত করা।[১৭]

(২) *বীর্যস্খলন ব্যতিরেকে দুই অংগের 'মিলন'।* কেননা নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ

(رواه ابن وهب فى مسنده) إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَغَابَتِ الْحَشَفَةُ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ

উভয় খাতনা স্থান[১৮] যখন মিলিত হয় এবং পুরুষাংগের মাথা 'অদৃশ্য' হয়ে যায় তখন গোসল ওয়াজিব হয়; বীর্যস্খলন ঘটুক কিংবা না ঘটুক।

আর এ জন্য যে, দুই অংগের মিলন হল বীর্যস্খলনের কারণ। আর পুরুষাঙ্গ রয়েছে তার দৃষ্টির অগোচরে। পরিমাণ অল্প হলে স্খলন তার অজ্ঞাতও থাকতে পারে। কাজেই কারণকে স্খলনের স্থলবর্তী ধরে নেওয়া হয়েছে। গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করানোরও একই হুকুম। কেননা স্খলনের কারণ এখানেও পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। আর যার সাথে একাজ করা হয়, সতর্কতা-স্বরূপ তার উপরও গোসল ওয়াজিব।

---

১৭. মত পার্থক্যের ফল এই যে, কেউ যদি স্খলিত বীর্য কোন উপায়ে রোধ করে রাখে এবং উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পর তা বেরিয়ে আসে তাহলে আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না এবং ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে গোসল ওয়াজিব হবে।

১৮. সেকালে আরবে মহিলাদের খাতনা করার রেওয়াজ ছিল।

পশু সংগম ও যৌনাঙ্গ ছাড়া মৈথুন এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে স্খলনের কারণ দুর্বল।

(৩) *ঋতুস্রাব (এর সমাপ্তি) কেননা– আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ*

(بالتَّشديد) حَتَّى يَطَّهَّرْنَ (ط -এর উপর تشديد এর কিরাত অনুযায়ী) যতক্ষণ না তারা উত্তমরূপ পবিত্রতা অর্জন করবে।

(৪) *তদ্রূপ সর্বসম্মত মতে নিফাস ও (প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাব) ঃ*

আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) গোসল সুন্নত করেছেন, জুমুআ, দুই ঈদ, আরাফায় অবস্থান ও ইহরামের জন্য গোসল।

মূল গ্রন্থকার (ইমাম কুদূরী) স্পষ্ট সুন্নত বলেছেন। কারো কারো মতে এই চার সময়ের গোসল মুসতাহাব। মূল (মাবসূত) গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) জুমুআর গোসলকে উত্তম বলেছেন। আর ইমাম মালিক বলেছেন ওয়াজিব। কেননা রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ من اتى الجمعة فليغتسل (ابن ماجة ، الترمذى) –জুমু'আয় যে শরীক হয়, সে যেন গোসল করে নেয়।

আমাদের দলীল এই যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنْ اغْتَسِلَ فَهُوَ أَفْضَلُ (ابو داود ترمذى)

–জুমুআর দিন যে উযূ করে, তা তার জন্য যথেষ্ট ও ভাল। আর যে গোসল করে তা উত্তম। (সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে) ইমাম মালেক বর্ণিত হাদীছের নির্দেশকে মুসতাহাব অর্থে নেওয়া হবে; কিংবা রহিত বলে গণ্য।

আর ইমাম আবূ ইউসুফের মতে এই গোসল হল সালাতুল 'জুমআর জন্য এবং এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা সময়ের তুলনায় তার ফযীলত অধিক। তাছাড়া সালাতের সাথেই তাহারাতের বিশেষ সম্পর্ক। এ বিষয়ে ইমাম হাসান এর ভিন্নমত রয়েছে।

দুই ঈদ ও জুমুআর মতই। কেননা, উভয় ঈদেই বড় সমাবেশ হয়। সুতরাং দুর্গন্ধজনিত কষ্ট দূর করার জন্য তাতে গোসল মুসতাহাব।

আরাফা ও ইহরামের গোসল সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ্ হজ্জের বিষয় প্রসংগে আলোচনা করবো।

কুদূরী (র.) বলেন, *'মযী' ও 'অদী' বের হলে তাতে গোসল আবশ্যক নয়, তবে উযূ আবশ্যক।*

কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ كُلُّ فَحْلٍ يُمْذِى وَفِيْهِ الْوُضُوْءُ (ابو داود ، احمد) –সকল পুরুষেরই মযী নির্গত হয়। আর তাতে উযূ আবশ্যক। ودى হলো পেশাবের পর নির্গত অপেক্ষাকৃত গাঢ় তরল পদার্থ। তাই তা পেশাবের হুকুমের মধ্যেই গণ্য হবে। منى হচ্ছে সাদা আঠাল পদার্থ, যার স্খলন পুরুষাংগকে নিস্তেজ করে দেয়। مذى হল সাদাটে তরল পদার্থ, যা স্ত্রীর সঙ্গে আদর-আহলাদের সময় নির্গত হয়। এ ব্যাখ্যা 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত।

পানি

যে পানিতে উযূ জাইয এবং যে পানিতে উযূ জাইয নয়।

আসমানের (বৃষ্টির) পানি দ্বারা, উপত্যকায় জমা পানি দ্বারা, ঝরনার পানি দ্বারা, কূপের পানি দ্বারা ও সমুদ্রের পানি দ্বারা অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা জাইয। কেননা আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ وَاَنْـزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً –আসমান থেকে আমি অতি পবিত্র পানি বর্ষণ করেছি। (২৫ ঃ ৪৮)

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

الماءُ طَهُوْرٌ لاَيُنَجِّسُه شَيْءٌ اِلاَّ مَا غَيَّر لَوْنَه اَوْ طَعْمَه اَوْ ريحه غريب بهذا اللفظ ، وروى ابن ماجة مافى معناه۔

-পানি পবিত্র, কোন কিছু তাকে না পাক করে না, কিন্তু যে অপবিত্র বস্তু তার বর্ণ, স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তন করে দেয়।

অন্য হাদীছে সমুদ্র সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُه وَالحِلُّ مَيْتَتُهُ (رواه السنة) –সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মরা হালাল। আর সাধারণভাবে বিশেষণ ছাড়া পানি শব্দটি এই সকল পানির উপর প্রয়োজ্য।

বৃক্ষ কিংবা ফল থেকে নিংড়ানো পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জাইয নয়। কেননা, তা সাধারণ পানি নয়।[১] আর সাধারণ পানি না পাওয়া গেলে (পবিত্রতা অর্জনের) হুকুম তায়াম্মুমে রূপান্তরিত। আর এ সকল অংগ ধৌত করার হুকুম কিয়াস বহির্ভূত। সুতরাং তা نص বা শরীআতের বাণীতে উল্লেখিত বস্তুকে অতিক্রম করবে না। তবে আংগুর বৃক্ষ থেকে ফোঁটা ফোঁট যে পানি পড়ে, তা দ্বারা উযূ জাইয হবে। কেননা তা হস্তক্ষেপ ছাড়া নির্গত হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ جوامع গ্রন্থে এ মাসআলা উল্লেখ করেছেন। মূল কুদূরী কিতাবেও এ দিকে ঈংগিত রয়েছে। কেননা তাতে নিঃসারণের শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

এমন পানি দ্বারা (পবিত্রতা অর্জন) জাইয নয়, যাতে অন্য কোন বস্তু প্রভাব বিস্তার করে পানির প্রকৃত গুণ দূরীভূত করে দিয়েছে। যেমন, শরবত, সিরকা, গোলাব জল, সবজির পানি, শুরুয়া পানি। কেননা এগুলোকে সাধারণ পানি বলা হয় না। সবজির পানির উদ্দেশ্য হল যা জ্বাল দেওয়ায় পরিবর্তিত হয়েছে। আর যদি বিনা জ্বালে তাতে পরিবর্তন আসে তাহলে তা দ্বারা উযূ জাইয হবে।

---

১. অর্থাৎ শুধু পানি বললে এ ধরনের পানি বুঝায় না; অথচ শরীআতের হুকুম হচ্ছে 'পানি' দ্বারা ধোয়া।

যে পানির সাথে কোন পাক জিনিস মিশ্রিত হয় আর তা পানির (তিনটি গুণে) কোন একটিকে পরিবর্তন করে দেয়, সে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জাইয।[২] যেমন বন্যার ঘোলা পানি এবং জাফরান, সাবান ও 'উশনান'[৩] মিশ্রিত পানি।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কুদূরীতে লোধ্র ভিজিয়ে রাখা পানিকে ঝোলের পর্যায়ের ধরা হয়েছে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত মতে তা জাফরান মিশ্রিত পানির সমপর্যায়ের। এ-ই বিশুদ্ধ। নাতিফী ও ইমাম সারখসী এ মতই গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, জাফরান ও এর অনুরূপ এমন পদার্থ মিশ্রিত পানি যা মাটি জাতীয় নয়, তা দ্বারা উযূ জাইয নয়। তুমি লক্ষ্য করছ না যে তাকে (শুধু পানি না বলে) জাফরানের পানি বলা হয়ে থাকে। মাটি জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত পানি এর ব্যতিক্রম। কেননা পানি সাধারণত তা থেকে মুক্ত হয় না।

আমাদের যুক্তি এই যে, এক্ষেত্রে 'পানি' নামটি এখনও সাধারণভাবেই অক্ষুণ্ন আছে। এজন্য তার ক্ষেত্রে আলাদা নতুন কোন নাম যুক্ত হয়নি। জাফরানের দিকে সম্বোধন করে (জাফরানের পানি বলা) মূলতঃ কুয়া ও ঝরনার দিকে সম্বোধন করার মত।

তা ছাড়া সামান্য মিশ্রণ পরিহার করা সম্ভব নয় বিধায় তা ধর্তব্যও নয়, যেমন মাটি জাতীয় পদার্থের ক্ষেত্রে। সুতরাং প্রবলতাই বিবেচ্য বিষয় হবে। আর প্রবলতা সাব্যস্ত হবে অংশগত পরিমাণ দ্বারা; রং -এর পরিবর্তন দ্বারা নয়। এই বিশুদ্ধ মত।

মিশ্রণের পর যদি জ্বাল দ্বারা পানি পরিবর্তিত হয় তবে সে পানি দ্বারা উযূ জাইয নয়। কেননা তা আসমান থেকে বর্ষিত পানির স্বভাবে বহাল নেই। অবশ্য যদি পানিতে এমন কিছু জ্বাল দেয়া হয় যা দ্বারা অধিক পরিষ্করণ, উদ্দেশ্য হয়। যেমন, পটাশ (বা বড়ই পাতা) তা হলে ভিন্ন কথা। কেননা মাইয়েতকে বড়ই পাতার জ্বাল দেওয়া পানি দ্বারা গোসল দেয়া হয়। হাদীছেও তা আছে।[৪] তবে যদি তা পানির উপর প্রবল হয়ে ছাতু (মিশ্রিত পানির) মত হয়ে যায় (তাহলে জাইয হবে না) কেননা তখন পানি নামটি তা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

যে কোন (নিশ্চল ও অল্প) পানিতে নাপাকি পড়লে তা দ্বারা উযূ জাইয নয়। নাপাকি অল্প হোক বা বেশী হোক।

---

২. উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বাহ্যতঃ এটাই মনে হয় যে, মিশ্রণের কারণে পানির দু'টি গুণের পরিবর্তন ঘটলে পবিত্রতা অর্জন বৈধ হবে না। অথচ দেখা গেছে পুকুরে গাছের পাতা পড়ে পানির স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও মাশায়েখগণ তা দ্বারা উযূ করেছেন। ইমাম তাহাবীও বলেছেন যে, পানির স্বাভাবিক তরলতা অক্ষুণ্ন থাকলে তা দ্বারা উযূ জাইয হবে। ইমাম কুদূরী ঢলের পানির যে উদাহরণ দিয়েছেন তা থেকেই বোঝা যায় যে, এক বা দু'টি গুণের পরিবর্তন উদ্দেশ্য নয়, বরং স্বাভাবিক তরলতা অক্ষুণ্ন থাকাই উদ্দেশ্য। কেননা ঢলের পানির স্বাদ ও বর্ণ সাধারণতঃ পরিবর্তিতই থাকে। তদ্রূপ সাবান মিশ্রিত পানির স্বাদ, গন্ধ এমনকি বর্ণও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

৩. উশনান এক ধরনের লবণাক্ত ঘাস, যা কাপড়ের ময়লা দূর করে।

৪. বুখারী-মুসলিমে শুধু আছে اغسلوا بماء السدر। বড়ই পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দাও। কিন্তু তা থেকে জ্বাল দেয়ার কথা বোঝায় না। আল্লাহই উত্তম জানেন– ফাতহুল কাদীর।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, যতক্ষণ পানির তিনটি গুণের কোন একটির পরিবর্তন না হয় ততক্ষণ উযূ জাইয। উপরে আমাদের বর্ণিত হাদীছ (الماءُ طَهُورٌ لاَيُنَجِّسهُ شَىْءٌ) দ্বারা তিনি দলীল গ্রহণ করেন।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, পানি দুই মটকা পরিমাণ হলে উযূ জাইয হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لاَيَحْمِلُ خَبَثًا –পানির যদি দুই মটকা পরিমাণ হয়, তাহলে তা নাপাকি গ্রহণ করে না।

আমাদের দলীল হল ঘুম থেকে জেগে উঠা ব্যক্তি সম্পর্কিত হাদীছ[৫] এবং নিম্নোক্ত হাদীছ– لاَيَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلاَ يَغْتَسِلَنَّ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ –তোমাদের কেউ যেন নিশ্চল পানিতে পেশাব না করে এবং তাতে জানাবতের গোসল না করে। এখানে (মটকা পরিমাণে) পার্থক্য করা হয়নি।

ইমাম মালিক (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তা বুযা'আ' নামক কূপ সম্পর্কিত। তার পানি ছিল প্রবাহিত বিভিন্ন বাগানে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ বর্ণিত হাদীছকে ইমাম আবূ দাউদ 'দুর্বল' বলেছেন। অথবা (لايحمل خبثا)-এর অর্থ নাপাকি গ্রহণে দুর্বল (অর্থাৎ নাপাক হয়ে যাবে)।

প্রবহমান পানিতে নাজাসাত পড়লে সে পানি দ্বারা উযূ জাইয, যদি তাতে নাজাসাতের কোন আলামত দেখা না যায়। কেননা, পানির প্রবাহের কারণে তা স্থির থাকে না। আর আলামত হল স্বাদ, গন্ধ বা বর্ণ। প্রবহমান ঐ পানিকে বলা হয় যা পুনঃ পুনঃ ব্যবহার আসে না। কেউ কেউ বলেন, যা 'খড়কুটা' ভাসিয়ে নেয়।

এক পার্শ্ব নাড়া দিলে অপর পার্শ্বের পানি তরংগায়িত হয় না, এমন বড় পুকুরের এক পার্শ্বে নাজাসাত পড়লে অপর পার্শ্বে উযূ করা জাইয। কেননা এটাই স্বাভাবিক যে, অপর পার্শ্বে নাজাসাত পৌঁছবে না। কারণ, ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে তরঙ্গের প্রভাব নাজাসাত -এর প্রভাবের চেয়ে বেশী।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি গোসলের দ্বারা সৃষ্ট তরঙ্গ গ্রহণ করেন। এই ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত। আবূ হানীফা (র.) থেকে অন্য এক বর্ণনায় তিনি হাত দিয়ে নাড়ার তরঙ্গ গ্রহণ করেন। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত মতে তিনি উযূ দ্বারা সৃষ্ট 'তরঙ্গ' গ্রহণ করেন।

প্রথম মতের যুক্তি এই যে, হাউজ ও পুকুরে উযূর তুলনায় গোসলের প্রয়োজনই বেশী।

কোন কোন ফকীহ্ বিষয়টিকে সাধারণ মানুষের জন্য সহজ করার উদ্দেশ্য মাপের দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ কাপড় মাপার হাতে দশ দশ হাত (চতুর্দিকে)। -এর উপরই ফাতওয়া। গভীরতার ক্ষেত্রে বিবেচ্য এই যে, তা এমন পরিমাণ হবে যে, অঞ্জলি ভরে পানি তোলার সময় তলা জেগে উঠবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত।

৫. অর্থাৎ 'তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠলে সে যেন পাত্রে হাত না ঢুকায় তিনবার ধৌত করা ব্যতীত'।

মূল কিতাবের এ কথা "অন্য পার্শ্বে উযূ জাইয হবে" ইংগিত করে যে, নাজাসাত পড়ার স্থান নাপাক হয়ে যাবে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, উক্ত স্থানও নাপাক হবে না, যতক্ষণ না নাজাসাত প্রকাশ পায়; যেমন প্রবহমান পানির হুকুম।

মশা, মাছি, বোলতা, বিচ্ছু ইত্যাদি যে সকল প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত নেই সেগুলোর মৃত্যুর পানি নাপাক হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এটি পানিকে নষ্ট-করে দিবে। যা হারাম করা হয়েছে, কিন্তু সম্মানার্থে নয় তা নাজিস হওয়ার পরিচায়ক।[৬] তবে মৌমাছি ও ফলের পোকার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা তাতে মানবীয় প্রয়োজন বিদ্যমান।

আমাদের দলীল এই যে, এ ধরনের পানি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ هَـذَا هُوَ الْـحَلاَلُ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَالْـوُضُوءُ مِنْهُ (الدار قطنى) –এটা খাওয়া ও পান করা এবং তা দ্বারা উযূ করা জাইয। এমন কি, যবাহ্কৃত জন্তু হালাল করা হয়েছে, প্রবাহিত রক্ত তা থেকে দূরীভূত হওয়ার কারণে অথচ সে সকল জন্তুর মধ্যে রক্ত নেই। (ইমাম শাফিঈ (র.)-এর জবাব এই যে) হারাম হওয়ার জন্য নাজিস হওয়া অনিবার্য নয়। যেমন মাটি হারাম কিন্তু তা নাজিস নয়।

মাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়া ইত্যাদি যা পানিতে থাকে, পানিতে তার মৃত্যু, পানি নষ্ট (নাপাক) করবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, পূর্বোল্লেখিত যুক্তির আলোকে মাছ ব্যতীত অন্যান্য জন্তুর মৃত্যু পানি নষ্ট করে দিবে। তার দলীল উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমাদের দলীল এই যে, এগুলো নিজ উৎপত্তিস্থলে মারা গেছে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে নাজাসাতের হুকুম প্রয়োগ করা হবে না। যেমন ডিমের কুসুম রক্তে পরিবর্তিত হলেও (তা নাপাক হয় না)।

তাছাড়া এগুলোতে রক্ত নেই, কেননা রক্তবাহী প্রাণী পানিতে বাস করে না। আর রক্তই হল নাজিস। পানি ছাড়া অন্য কিছুতে এগুলো মারা গেলে, কেউ বলেছেন, মাছ ব্যতীত অন্যান্য জন্তু তা নাপাক করে দিবে, সেসব উৎপত্তিস্থল না থাকার কারণে। আবার কেউ বলেছেন তা নষ্ট করবে না রক্ত না থাকার কারণে। এ মতই বিশুদ্ধ। জলজ ব্যাঙ ও স্থল ব্যাঙ দু'টির হুকুম সমান। আর কেউ কেউ বলেছেন, স্থল জাতীয় ব্যাঙ পানি নষ্ট করে দিবে, কেননা এতে রক্ত বিদ্যমান। এবং যেহেতু তা উৎপত্তিস্থলে মারা যায় নি।

জলজ প্রাণী দ্বারা সে সকল প্রাণী বুঝায়, যার জন্ম ও বাস পানিতে। যে প্রাণী পানিতে অবস্থান করে কিন্তু জন্ম পানিতে নয়, তা পানি নষ্ট করে।

ইমাম কুদূরী বলেন, ***ব্যবহৃত পানি 'হাদাছ' থেকে পবিত্রতা দান করে না।***

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, (কুরআনে বর্ণিত) طهور অর্থ যা অন্যকে বারবার পাক করতে পারে, যেমন قطوع বলে তাকে, যা বারবার কর্তন করতে সক্ষম।

---

৬. যেমন মানব দেহকে খাদ্য রূপে ব্যবহার হারাম করা হয়েছে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, –এবং এটা ইমাম শাফিঈ (র.)-এর দ্বিতীয় মত– পানি ব্যবহারকারী যদি উযূ অবস্থায় থেকে থাকে তাহলে তার ব্যবহারকৃত পানি দ্বারা আবার তাহারাত হাসিল করা যাবে। আর যদি পানি ব্যবহারকারী ব্যক্তি অপবিত্র থেকে থাকে তাহলে তার ব্যবহৃত পানি পবিত্র থাকবে, কিন্তু পবিত্রকারী থাকবে না।

কেননা অংগ বাহ্যত পবিত্র। সে হিসাবে পানি পবিত্র থাকা চাই। কিন্তু বিধান অনুযায়ী সে অংগ নাপাক। সে হিসাবে পানি নাপাক হয়ে যাওয়া চাই। তাই উভয় অবস্থা বিবেচনা করে আমরা পানির পবিত্রকরণ গুণের বিলুপ্তি এবং পবিত্র থাকার পক্ষে মত পোষণ করেছি।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, –আর তা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও বর্ণিত– ব্যবহৃত পানি পবিত্র কিন্তু পবিত্রকারী নয়। কেননা দুই পবিত্র বস্তুর সংস্পর্শ অপবিত্র হওয়ার কারণ হতে পারে না। তবে যেহেতু তা দ্বারা একটি ইবাদাত আদায় করা হয়েছে, সেহেতু তার গুণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যেমন, সাদাকার মাল।[৭]

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এ পানি নাপাক। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

لَايَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَايَغْتَسِلَنَّ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ

–তোমাদের কেউ যেন নিশ্চল পানিতে পেশাব না করে এবং তাতে জানাবাতের গোসল না করে।

তাছাড়া এ পানি দ্বারা হুকমী নাজাসাত[৮] দূর করা হয়েছে। সুতরাং তা ঐ পানির সমতুল্য হবে, যা দ্বারা হাকীকী নাজাসাত দূর করা হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে ইমাম হাসান (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত মতে হাকীকী নাজাসাত দূর করার জন্য ব্যবহৃত পানির সমতুল্য গণ্য করে এ পানিও নাজাসাতে গালীজা (গুরু নাপাক)।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত মতে এ পানি নাজাসাতে খাফীফা (লঘু নাপাক)। কেননা, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

ব্যবহৃত পানি অর্থ, যে পানি দ্বারা হাদাছ দূর করা হয়েছে কিংবা সাওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে শরীরে ব্যবহার করা হয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা ইমাম আবূ ইউসুফের মত। কেউ কেউ বলেছেন, যে, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এরও মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, শুধু সাওয়াব হাসিলের নিয়্যতেই পানি 'ব্যবহৃত' গণ্য হবে।[৯]

---

৭. অর্থাৎ ফরয যাকাত আদায় করার কারণে মালের প্রকৃত পবিত্রতা কিছুটা লোপ পায়, সে কারণে নবী (সা.) ও তাঁর বংশধরদের জন্য তা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

৮. হুকমী নাজাসাত অর্থ যা পদার্থগত ভাবে নাপাক নয় বরং শরীআত নাপাক সাব্যস্ত করেছে বলেই গুণগতভাবে শুধু নাপাক; যেমন উযূ বা গোসল ফরয হওয়ার কারণ পাওয়া গেলে শরীরকে না পাক বলা হয়। পক্ষান্তরে হাকীকী নাজাসাত অর্থ কোন বস্তুর পদার্থগতভাবেই নাপাক হওয়া, যেমন পেশাব পায়খানা।

৯. আর মুজতাহিদের মতভেদ হুকুমকে লঘু করে।

কেননা গুনাহের নাজাসাত স্থানান্তরিত হওয়ার কারণেই পানি 'ব্যবহৃত' সাব্যস্ত হবে। আর গুনাহ্ দূর হয় সাওয়াবের নিয়্যত দ্বারা। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, (পানির মধ্যে) ফরয আদায় করারও প্রভাব রয়েছে। সুতরাং উভয় কারণেই (পানির) নষ্ট হওয়া সাব্যস্ত হবে।

কখন পানি 'ব্যবহৃত' রূপে গণ্য হবে? বিশুদ্ধমত এই যে, (ধৌত) অংগ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র তা 'ব্যবহৃত' বলে গণ্য হবে। কেননা (পানি শরীর থেকে) বিচ্ছিন্ন হওয়া পূর্বে প্রয়োজনের তাকীদে 'ব্যবহৃত' হওয়ার হুকুম দেওয়া হয় না। আর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর প্রয়োজন নেই।

জুনুবী ব্যক্তি যদি বালতি তালাশ করার জন্য কূপের মধ্যে ডুব দেয় তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফের মতে সে জুনুবী থেকে যাবে। কেননা সে তার গায়ে পানি ঢালে নি। আর তাঁর মতে ফরয গোসল আদায় হওয়ার জন্য তা শর্ত। আর পানিও পূর্ব অবস্থায় পাক থাকবে; কেননা, উভয় কারণই এখানে অনুপস্থিত। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে (পানি ও মানুষ) উভয়ই পাক। লোকটি পবিত্র হয়ে গেল পানি ঢালার শর্ত না হওয়ার কারণে, আর পানি পবিত্র থাকল সাওয়াবের নিয়্যত না থাকার কারণে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উভয়ই অপবিত্র। পানি একারণে অপবিত্র যে, (পানির সাথে) প্রথম সংস্পর্শের সাথে সাথে শরীরের অংশবিশেষ থেকে জানাবাত দূরীভূত করা হয়েছে। আর লোকটি অপবিত্র এজন্য যে, অবশিষ্ট অংগে হাদাছ বিদ্যমান রয়ে গেছে। আর কেউ কেউ বলেন, তাঁর মতে লোক অপবিত্র থাকার কারণ হলো 'ব্যবহৃত' পানির অপবিত্র হওয়া। তাঁর থেকে বর্ণিত আরেকটি মত হলো, লোকটি পবিত্র হয়ে যাবে। কেননা (শরীর থেকে) বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে পানির উপর 'ব্যবহৃত' হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয় না। তাঁর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বর্ণনাগুলোর মাঝে এটিই অধিক যুক্তিসংগত।

শূকর ও মানুষের চামড়া ব্যতীত যে কোন চামড়া 'পাকা করা হয় তা পাক হয়ে যায়। তাতে সালাত আদায় করা এবং তা থেকে (তৈরী পাত্রের পানি দিয়ে) উযূ জাইয। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ –যে কোন চামড়া পাকা করা হয়, তা পাক হয়ে যায়।

এ হাদীছটি তার অর্থ ব্যাপকতার ভিত্তিতে মৃত পশুর চামড়ার ব্যাপারে ইমাম মালিক (র.)-এর বিপক্ষে দলীল। আর মৃত পশুকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে বর্ণিত নিষেধবাণী ঃ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ –তোমরা মৃত পশুর চামড়া থেকে উপকার গ্রহণ কর না। এ হাদীছ উপরোল্লেখিত হাদীছের বিপরীতে পেশ করা যাবে না। কেননা যে চামড়া পাকা করা হয়নি, তাকেই إهاب বলা হয়।

অদ্রূপ আলোচ্য হাদীছ কুকুরের চামড়ার ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলীল কেননা, কুকুর (শূকরের মত) সত্তাগত ভাবে নাপাক নয়। তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না যে, পাহারা দেওয়া ও শিকার করার ক্ষেত্রে তার থেকে উপকার গ্রহণ করা হয়? আর শূকর হলো সত্তাগত ভাবেই নাপাক। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَإِنَّهُ رِجْسٌ (নিঃসন্দেহে তা নাজাসাত) এর ه সর্বনাম নিকটবর্তী خنزير এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। মানব দেহের কোন অংশ

দ্বারা উপকার লাভ হারাম হওয়ার কারণ (নাপাকি নয় বরং) তার মর্যাদাও। সুতরাং এ দু'টি আমাদের বর্ণিত হাদীছের আওতার বাইরে।

যা দুর্গন্ধ ও পচন রোধ করে, তাকেই পাকা করা বলে; রোদে শুকিয়ে হোক বা মাটি মেখে হোক। কেননা মূল উদ্দেশ্য এর দ্বারা অর্জিত হয়। সুতরাং অন্য কোন শর্ত আরোপ করার কোন যুক্তি নেই।

যে চামড়া পাকা করলে পাক হয়, তা যবাহ্ করার মাধ্যমেও পাক হয়। কেননা, যবাহ্ দ্বারা নাপাক আর্দ্রতা দূর করার ক্ষেত্রে পাকা করার ক্রিয়া পাওয়া যায়। এইরূপ যবাহ্ দ্বারা গোশতও পাক হয়ে যায়। এটাই বিশুদ্ধ মত। যদিও তা খাওয়া হালাল নাও হয়।

মৃতপশুর পশম ও হাড় পাক।

ইমাম শাফিঈ (র.) নাপাক বলেন, কেননা এগুলো মৃত পশুরই অংশ।

আমাদের দলীল এই যে, তাতে প্রাণ নেই, এজন্য এগুলো কাটলে ব্যথা অনুভূত হয় না। সুতরাং এ দুটোতে মৃত্যু প্রবেশ করে না। কেননা মৃত্যু অর্থ প্রাণের বিলোপ।

মানুষের চুল ও হাড় পাক।

ইমাম শাফিঈ (র.) নাপাক বলেন। কেননা, এ দ্বারা উপকার লাভ করা বৈধ নয় এবং তা বিক্রি করাও জাইয নয়।

আমাদের দলীল এই যে, তার ব্যবহার ও বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ মানুষের মর্যাদা রক্ষা। সুতরাং তা তার নাজাসাতের পারিচায়ক নয়।

পরিচ্ছেদ ঃ কুয়ার মাসআলা

কুয়াতে কোন নাজাসাত পড়লে (যদি ১০ x ১০ হাতের কম হয়) তার পানি বের করে নিতে হবে। আর তাতে বিদ্যমান পানি নিষ্কাশনই তার জন্য তাহারাত বলে গণ্য। এর দলীল হল সলফে সালেহীনের ইজমা। আর কুয়া সংক্রান্ত মাসআলার ভিত্তি হচ্ছে সলফে সালেহীনের ফাতওয়া, কিয়াস নয়।

কূপে উট বা বকরীর দু' একটি লাদি পড়লে পানি নষ্ট হবে না। এ হুকুম সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। আর সাধারণ কিয়াসের চাহিদা হল পানি নষ্ট হয়ে যাওয়া। কেননা, নাজাসাত পড়েছে অল্প পানিতে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, খোলা মাঠের কুয়ার উপরে বাধাদানকারী কোন কিছু থাকে না, আর গবাদিপশু তার আশেপাশে মল ত্যাগ করে, ফলে বাতাসে তা কুয়ায় ফেলে। তাই প্রয়োজনের তাকীদে অল্প পরিমাণ ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত। আর অধিক পরিমাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাকীদ নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে 'দর্শক' যা অধিক মনে করে, তা-ই অধিক। এ মতই নির্ভরযোগ্য। শুষ্ক ও তাজা বিষ্ঠা এবং গোটা ও টুকরা বিষ্ঠা আর উটের লাদা ও ঘোড়ার বা গরু গোবরের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেননা, প্রয়োজন সবগুলোতেই ব্যাপ্ত।

দোহন পাত্রে বকরী দু'এক গোটা বিষ্ঠা ত্যাগ করলে সে সম্পর্কে ফকীহ্গণ বলেছেন, বিষ্ঠা

ফেলে দিয়ে দুধ পান করা যাবে। কেননা, এখানে প্রয়োজন রয়েছে। কারো কারো মতে সাধারণ পাত্রে অল্পও মা'ফযোগ্য নয়। কেননা, এক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দু'এক গোটা বিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটাও কুয়ার অনুরূপ।

যদি কুয়ায় কবুতর বা চড়ুইর বিষ্ঠা পড়ে তাহলে পানি নষ্ট হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর দলীল এই যে, (বিষ্ঠা) পচা ও দূষিত পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং তা মুরগীর বিষ্ঠার অনুরূপ।

আমাদের দলীল এই যে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত সত্ত্বেও মসজিদে কবুতরের অবাধ বিচরণের অনুকূলে মুসলমানদের সাধারণ ঐকমত্য রয়েছে। আর উহার রূপান্তর দুর্গন্ধযুক্ত পচা পদার্থের দিকে নয়। সুতরাং তা কালো কাদা সদৃশ।

যদি কূপে বকরী পেশাব করে দেয় তাহলে *ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সবটুকু পানি ফেলে দিতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যতক্ষণ তা পানির উপর প্রভাব বিস্তার না করে এবং পানির পবিত্র করার গুণ নষ্ট না করে, ততক্ষণ পানি ফেলতে হবে না।*

আলোচ্য মতপার্থক্যের ভিত্তি এই যে, হালাল পশুর পেশাব ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পাক আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফের মতে নাপাক।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলীল এই যে, নবী করীম (সা.) উরায়নাবাসী একদল লোককে উটের দুধ ও পেশাব পানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আর তাঁদের উভয়ের দলীল এই যে, হালাল পশু ও হারাম পশুর মাঝে কোন পার্থক্য নির্দেশ না করে নবী (সা.) বলেছেন ঃ اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ –তোমরা পেশাব থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, কবরের অধিকাংশ আযাব এ কারণেই হয়ে থাকে।

তাছাড়া উক্ত পেশাব পচন ও দুর্গন্ধে পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং এমন পশুর পেশাবের মত গণ্য হবে, যার গোশ্ত খাওয়া নিষেধ।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ওয়াহীর মাধ্যমে (উটের পেশাবে) তাদের রোগ আরোগ্য জানতে পেরেছিলেন।

তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে চিকিৎসা হিসাবেও তা পান করা হালাল নয়। কেননা তাতে আরোগ্য লাভ নিশ্চিত নয়। সুতরাং হারাম হওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করা যাবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে (উরায়না গোত্রের) ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তা পান করা হালাল।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উক্ত পেশাব পাক হওয়ার কারণে চিকিৎসা হিসাবে এবং সাধারণভাবে তা পান করা হালাল।

যদি কুয়ায় ইঁদুর, চড়ুই, কোয়েল, দোয়েল, টিকটিকি ইত্যাদি মারা যায়[১০] তাহলে বালতির বড়ত্ব ও ছোটত্ব হিসাবে বিশ থেকে ত্রিশ বালতি পর্যন্ত পানি তুলে ফেলতে হবে।

অর্থাৎ ইঁদুরটি বের করে নেয়ার পর। এর প্রমাণ হল, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছে ইঁদুর সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, তা কুয়াতে মারা গেলে এবং তৎক্ষণাৎ তা বের করে নিলে কুয়া থেকে বিশ বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলতে হবে।

চড়ুই ও অনুরূপ জন্তু যেহেতু দৈহিক পরিমাণে ইঁদুরের সমান তাই এসবের ব্যাপারে একই হুকুম প্রযোজ্য। বিশ বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলা ওয়াজিব আর ত্রিশ বালতি পরিমাণ মুস্তাহাব।

যদি কবুতর কিংবা তার মত প্রাণী যেমন, মুরগী, বিড়াল ইত্যাদি কুয়ায় পড়ে মারা যায়, তাহলে চল্লিশ থেকে বিশ বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলতে হবে।

الجامع الصغير গ্রন্থে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এর কথা আছে। আর তাই অধিক নির্ভরযোগ্য। কেননা আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছে তিনি মুরগী সম্পর্কে বলেছেন, তা কুয়ায় পড়ে মারা গেলে সেখান থেকে চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে। এ পরিমাণ হলো ওয়াজিবের বিবরণ। আর পঞ্চাশ হলো মুস্তাহাব।

প্রত্যেক কুয়ার ক্ষেত্রে সেই বালতিই বিবেচ্য হবে, যা তা থেকে পানি তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়। কারো কারো মতে এমন আকারের বালতি হতে হবে, যাতে এক সা'আ পরিমাণ পানি ধরে। আর যদি বৃহৎ বালতি দ্বারা একবার বিশ বালতি পরিমাণ পানি ধরে, এমন পানি তুলে ফেলা হয়; তাহলে মূল উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার কারণে তা জাইয হবে।

যদি তাতে বকরী, মানুষ বা কুকুর[১১] পড়ে মারা যায়, তাহলে তাতে বিদ্যমান সবটুকু পানি তুলে ফেলতে হবে। কেননা ইব্‌ন 'আব্বাস ও ইব্‌ন যুবায়র (রা.) যমযম কূপে জনৈক নিগ্রোর মৃত্যুর কারণে সবটুকু পানি তুলে ফেলার ফাতওয়া দিয়েছিলেন।

যদি মৃত প্রাণী কুয়ার মধ্যে ফুলে পচে গলে যায়, তাহলে প্রাণী বড় হোক বা ছোট হোক, কুয়ার সবটুকু পানি তুলে ফেলতে হবে। কেননা পানির সর্বাংশে মৃত দেহের নিঃসৃত রস ছড়িয়ে পড়েছে।

কূপ যদি এমন প্রস্রবণ প্রকৃতির হয় যে, তার পানি তুলে ফেলা অসম্ভব হয়, তাহলে তাতে বিদ্যমান পানির সমপরিমাণ তুলে ফেলতে হবে।

এর পরিমাপ জানার উপায় এই যে, কূয়ার পানির সমতল পরিমাণ অনুরূপ একটি গর্ত খোড়া হবে এবং পানি তুলে তা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাতে ফেলতে হবে। কিংবা তাতে একটি বাঁশ

---

১০. বাইরে মরে কুয়ায় পড়লেও একই হুকুম। তবে যদি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে তাহলে রক্তের কারণে সব পানি নাপাক হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, সীমিত পানি উত্তোলনের তখনই হবে, যখন মৃত প্রাণী ফেটে গলে না গিয়ে থাকে।

১১. কুকুরের ক্ষেত্রে মৃত্যু শর্ত নয়। জীবিত অবস্থায় বের হয়ে আসলেও একই হুকুম হবে, যদি মুখ ভিজে গিয়ে থাকে। কেননা কুকুরের লালা নাপাক।

নামিয়ে পানির উচ্চতা পরিমাণ স্থানে তাতে দাগ কাটা হবে। তারপর ধরুন, দশ বালতি তুলে আবার বাঁশ নামিয়ে দেখা হবে, কি পরিমাণ হ্রাস পেলো। এরপর প্রত্যেক এই পরিমাণের জন্য দশ বালতি করে পানি উত্তোলন করা হবে।

এ দু'টি উপায় আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দু'শ' থেকে তিনশ' বালতি তুলে ফেললেই হবে। সম্ভবতঃ তিনি নিজ শহরের (বাগদাদে দেখা কুয়াগুলোর) উপরই তার সিদ্ধান্তের ভিত্তি করেছেন। الجامع الصغير গ্রন্থে এ ধরনের ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পানি অনবরত তুলতেই থাকবে, যতক্ষণ না পানি তাদের পরাজিত করে ফেলে। তবে পরাজিত করার নির্দিষ্ট সীমা তিনি নির্ধারণ করেননি। (এ ধরনের ক্ষেত্রে) এটাই তাঁর অনুসৃত নীতি। কারো কারো মতে পানির (গভীরতা) সম্পর্কে অভিজ্ঞ দু'জন লোকের মতামত গ্রহণ করা হবে। এ মত ফিক্‌হী দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যদি লোকেরা ইঁদুর বা এ ধরনের অন্য কোন প্রাণী কুয়াতে দেখতে পায় এবং কখন পড়েছে তা জানা না যায়, আর তা ফুলে গিয়ে না থাকে আর যদি তারা সে কুয়ার পানি দ্বারা উযূ করে থাকে, তাহলে একদিন এক রাত্রের সালাত দোহরাবে আর ঐ কুয়ার পানি লেগেছে এমন প্রতিটি জিনিস ধুয়ে ফেলতে হবে। আর যদি ফুলে বা পচে গলে গিয়ে থাকে তাহলে তিন দিন তিন রাত্রের সালাত দোহরাবে। ইহা আবূ হানীফা (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, পতিত হওয়ার সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া তাদের উপর কিছুই দোহরান জরুরী নয়। কেননা নিশ্চিত অবস্থা সন্দেহ দ্বারা দূরীভূত হয় না। এটা হল ঐ ব্যক্তির অবস্থার মত যে তার কাপড়ে নাজাসাত দেখতে পেলো, কিন্তু কখন লেগেছে তা সে জানে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, এখানে মৃত্যুর একটি প্রকাশ্য কারণ রয়েছে। তা হল পানিতে পতিত হওয়া। সুতরাং এর সাথে মৃত্যুকে সম্পৃক্ত করা হবে। তবে যেহেতু ফুলে উঠা সময়ের দীর্ঘতার প্রমাণ, সেহেতু সময় সীমা তিন দিন নির্ধারণ করা হবে। আর ফুলে ফেটে না যাওয়া যেহেতু সময়ের নৈকট্যের প্রমাণ; সেহেতু তার সময়সীমা আমরা একদিন একরাত্র নির্ধারণ করেছি। কেননা, এর নীচে হচ্ছে মুহূর্তসমূহ, যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য (কাপড়ে) নাজাসাত (লেগে থাকার) বিষয়টি সম্পর্কে মুআল্লার বক্তব্য হল, এর মধ্যেও মতভেদ রয়েছে। অর্থাৎ পুরাতন লাগা নাজাসাতের জন্য তিন দিনের সময় সীমা নির্ধারণ করা হবে। আর তাজা নাজাসাতের বেলায় একদিন এক রাত্রের। আর যদি মতভেদ না থাকার দাবী স্বীকার করেও নেওয়া হয়, তা হলে যেহেতু কাপড় তার দৃষ্টির সম্মুখে থাকে আর কুয়া থাকে দৃষ্টির আড়ালে। সুতরাং দু'টোর মাসআলা আলাদা।

পরিচ্ছেদ ঃ উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি

প্রত্যেক প্রাণীর ঘাম তার উচ্ছিষ্টের সাথে বিবেচ্য। কেননা (লালা ও ঘাম) দু'টোরই জন্ম তার গোশত থেকে। সুতরাং একটিতে অপরটির বিধান প্রযোজ্য।

মানুষের উচ্ছিষ্ট এবং যে প্রাণীর গোশত খাওয়া যায়, তার উচ্ছিষ্ট পাক। কেননা তাঁর সাথে লালা মিশ্রিত হয়েছে। আর তা সৃষ্ট হয়েছে পাক গোশত থেকে। জুনুবী, ঋতুমতী এবং কাফিরও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

কুকুরের উচ্ছিষ্ট নাপাক। সে কোন পাত্রে মুখ দিলে তা ধুতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন– (الدارقطنى) يُغْسَلُ الإِنَاءُ مِنْ وُلُوْغِ الْكَلْبِ ثَلْثًا –কুকুরের মুখ দেওয়ার কারণে পাত্র তিনবার ধুতে হবে।

কুকুরের জিহ্বা (সাধারণত) পানি স্পর্শ করে, পাত্র নয়। সুতরাং পাত্র যখন নাপাক হয়ে যায়, তখন পানি নাপাক হওয়াত অনিবার্য।

এ হাদীছে নাপাক হওয়া এবং ধোয়ার সংখ্যা প্রমাণিত হয়। সুতরাং এ হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.)-এর সাতবার ধোয়ার শর্ত আরোপের বিপক্ষে দলীল।

তা ছাড়া, যে বস্তুতে কুকুরের পেশাব লাগে, তা তিনবার ধুইলে পাক হয়ে যায়। কাজেই যে বস্তুতে তার উচ্ছিষ্ট লাগে– যা পেশাবের চেয়ে সাধারণ, তা পাক হওয়া তো আরো স্বাভাবিক। আর সাতবার ধোয়া সম্পর্কে বর্ণিত নির্দেশ ইসলামের প্রথম যুগের অবস্থায় প্রয়োজ্য।

শূকরের উচ্ছিষ্ট নাপাক। কেননা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শূকর সত্তাগতভাবেই নাপাক।

হিংস্র পশুর উচ্ছিষ্ট নাপাক। শূকর ও কুকুর ছাড়া অন্যান্য হিংস্র পশুর উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপরীত মত রয়েছে।

আমাদের দলীল হল, কেননা হিংস্র পশুর গোশত নাপাক এবং তা থেকেই লালা সৃষ্ট। আর লালার হুকুম গোশতের উপরই নির্ভরশীল।

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পাক কিন্তু (তা ব্যবহার করা) মাকরূহ।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তা মাকরূহও নয়। কেননা, নবী (সা.) বিড়ালের জন্য পাত্র কাত করে ধরতেন। বিড়াল তা থেকে পানি পান করতো, পরে তা দ্বারা তিনি উযূ করতেন। (দারা কুতনী)

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, الهرة سَبُعٌ (الحاكم عن ابى هريرة) –বিড়াল হিংস্রপ্রাণী। এ হাদীছের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিধান বর্ণনা করা।[১২] তবে নাকেস হওয়ার হুকুম রহিত করা হয়েছে (গৃহের অভ্যন্তরে) সর্বদা ঘুরাফেরার কারণে। সুতরাং মাকরূহ হওয়ার হুকুম বাকী থেকে যায়। আর পাত্র কাত করে ধরার বর্ণনা হারাম হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ের উপর ধর্তব্য।

---

১২. অর্থাৎ নিছক বিড়ালের আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং বিড়ালের উচ্ছিষ্টের হুকুম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কেননা নবী (সা.)-কে সৃষ্টিগত প্রকৃতি বর্ণনা করার জন্য প্রেরণ করা হয়নি, বরং শরীআতী হুকুম বর্ণনা করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কারো[১৩] মতে তার উচ্ছিষ্ট মাকরূহ হওয়ার কারণ, গোশত নাপাক হওয়া। আর কারো মতে নাজাসাত পরিহার না করার কারণে। আর শেষোক্ত মতে তানযীহের এবং প্রথম মতে হারামের কাছাকাছি হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে।

বিড়াল যদি ইঁদুর খেয়ে সাথে সাথে পানি পান করে, তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। তবে কিছু সময় বিলম্ব করার পর হলে নাপাক হবে না। কেননা সে লালা দ্বারা মুখ পরিষ্কার করে ফেলে। এ ব্যতিক্রম শুধু ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানুযায়ী। আর অনিবার্য প্রয়োজনবশতঃ পাক হওয়ার জন্য পানি ঢালার শর্তটি রহিত হয়ে যাবে।

ছেড়ে দেয়া মুরগীর উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। কেননা ছাড়া মুরগী নাজাসাত ঘাটে। তবে যদি এমন ভাবে বাঁধা থাকে যে, তার পায়ের নীচ পর্যন্ত তার চঞ্চু পৌঁছে না, তাহলে নাজাসাতের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত থাকার কারণে মাকরূহ হবে না।

হিংস্র পাখীর উচ্ছিষ্টও তদ্রূপ নাপাক। কেননা এরা মরা খায়, সুতরাং ছাড়া মুরগীর মতই হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, হিংস্র পাখী যদি আবদ্ধ থাকে এবং মালিক জানে যে, পাখীর ঠোঁটে ময়লা নেই, তাহলে (নাজাসাতের) সংস্পর্শ থেকে সংরক্ষিত থাকার কারণে (তার উচ্ছিষ্ট) মাকরূহ হবে না। মাশায়েখগণ এ মতই উত্তম বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সাপ, ইঁদুর ইত্যাদি গৃহে অবস্থানকারী প্রাণীর উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। কেননা (এগুলোর) গোশত হারাম হওয়ার অবশ্যম্ভাবী চাহিদা হল উচ্ছিষ্ট নাপাক হওয়া। তবে সর্বদা গৃহে বিচরণের কারণে নাজাসাতের হুকুম রহিত হয়ে যায় এবং মাকরূহ হওয়ার হুকুম অবশিষ্ট থাকে। আর বিচরণের কারণটি বিড়ালের ব্যাপারে (হাদীছে) উল্লেখ করা হয়েছে।[১৪]

গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট সন্দেহযুক্ত।[১৫] কারো মতে সন্দেহটি পবিত্রতা সম্পর্কে। কেননা উচ্ছিষ্ট পানি পবিত্র হলে অবশ্যই পবিত্রকারীও হবে, যতক্ষণ না লালা পানির চেয়ে অধিক হয়।

অন্য মতে সন্দেহটি পানির পবিত্রকরণ গুণ সম্পর্কে। কেননা সে যদি পানি পায়, তবে তার মাথা ধোয়া তার জন্য ওয়াজিব নয়।[১৬] তদ্রূপ তার দুধ পাক। তার ঘাম নামাযের বৈধতাকে বাধাগ্রস্ত করে না, যদিও পরিমাণে তা বেশী হয়। সুতরাং তার উচ্ছিষ্ট অনুরূপ হবে। এ মতই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

---

১৩. এ হেতু নিম্নোক্ত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে ঃ انها ليست بنجسة . لانها من الطوافين عليكم والطوافات —এদের উচ্ছিষ্ট নাপাক নয়, কেননা এরা তোমাদের চারপাশে ঘুরঘুরকারী প্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত।

১৪. নবী (সা.) বিড়ালের উচ্ছিষ্ট থেকে নাজাসাতের হুকুম রহিত হওয়ার হেতু স্বরূপ গৃহে বিচরণ করার কথা বলেছেন। আর এটা ইঁদুর, সাপ ইত্যাদি গৃহচারী প্রাণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১৫. মাশায়েখগণ বলেছেন, সন্দেহযুক্ত হওয়ার কারণ হলো পরস্পর বিরোধী দলীল বিদ্যমান রয়েছে।

১৬. যদি উক্ত উচ্ছিষ্ট পানির পবিত্রতা অনিশ্চিত হতো তাহলে ধুয়ে ফেলা আবশ্যক হতো।

গাধার উচ্ছিষ্ট পাক হওয়ার সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদের স্পষ্ট মত বর্ণিত রয়েছে। সন্দেহের কারণ হচ্ছে গাধার গোশত হালাল বা হারাম হওয়া দলীলগুলো পরস্পর বিরোধী কিংবা তার উচ্ছিষ্ট পাক বা নাপাক হওয়া সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে।

আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হারাম ও নাপাক হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে গাধার উচ্ছিষ্টকে নাজিস বলেছেন। খচ্চর যেহেতু গাধার প্রজননভুক্ত, সুতরাং সেও গাধার পর্যায়ের হবে। যদি গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট পানি ছাড়া অন্য পানি না পাওয়া যায়, তাহলে তা দ্বারা উযূ করবে এবং তায়াম্মুম করবে। এবং যে কোনটা আগে করা জাইয।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, উযূকে অগ্রবর্তী না করলে জাইয হবে না। কেননা তা এমন পানি (শরীআতের হুকুম মতে) যার ব্যবহার করা ওয়াজিব। সুতরাং তা সাধারণ পানির সদৃশ।

আমাদের দলীল এই যে, যেহেতু পবিত্রকারী হল দু'টির যে কোন একটি, ফলে উভয়ের একত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়; এর চাহিদা ক্রমবিন্যাস নয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ঘোড়ার উচ্ছিষ্ট পাক। কেননা তার গোশত হালাল। বিশুদ্ধ বর্ণনায় ইমাম আবূ হানীফার মতও অনুরূপ। কেননা গোশত মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো তার মর্যাদা প্রকাশ করা।[১৭]

যদি খোরমা ভিজানো পানি ছাড়া কোন পানি পাওয়া না যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, তা দ্বারা উযূ করবে, তায়াম্মুম করবে না। কেননা জিন[১৮] সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাতের রাত্রি সর্ম্পকীয় হাদীছ রয়েছে যে, নবী (সা.) পানি না পেয়ে খোরমা ভিজানো পানি দ্বারা উযূ করেছেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তায়াম্মুম করবে, তা দিয়ে উযূ করবে না। আবূ হানীফা (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র.)ও এমত পোষণ করেন; তায়াম্মুমের আয়াতের[১৯] উপর আমলের পরিপ্রেক্ষিতে। কেননা আয়াত অধিক শক্তিশালী। অথবা হাদীছ আয়াতের দ্বারা রহিত। কেননা তায়াম্মুমের আয়াত মাদানী আর জিনের রাত্রির ঘটনা হল মাক্কী।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উযূ ও তায়াম্মুম দু'টোই করবে। কেননা হাদীছের বর্ণনায় স্ববিরোধিতা রয়েছে। আর (ঘটনাটির) তারিখ (সঠিক) জানা নয়। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বনে উভয়টির উপর আমল করা ওয়াজিব।

---

১৭. অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) ঘোড়ার গোশত মাকরূহ বলেছেন জিহাদের বাহন হিসাবে তার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য; গোশতের নাজাসাতের কারণে নয়। সুতরাং উচ্ছিষ্টের ক্ষেত্রে এটা কোন প্রভাব ফেলবে না।

১৮. এক রাত্রে রাসূল (সা.) জিনদের একটি জামাআতকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ (র.)-কে নিয়ে গমন করেছিলেন, সে সম্পর্কে বর্ণনা লায়লাতুল জিন নামে খ্যাত। (দেখুন তাহাবী শরীফ)।

১৯. অর্থাৎ তায়াম্মুমের আয়াতের নির্দেশ হলো সাধারণ পানি না পেলে তায়াম্মুম করা। আর খোরমা ভিজানো পানি সাধারণ পানির অন্তর্ভুক্ত নয়।

আমাদের পক্ষ থেকে জবাব এই যে, লায়লাতুল জিনের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছিলো। সুতরাং রহিত হওয়ার দাবী সঠিক নয়। আর হাদীছটি মশহূর পর্যায়ের, যার উপর সাহাবায়ে কিরাম আমল করেছেন। এধরনের মশহূর হাদীছ দ্বারা কিতাবুল্লাহ্ (এর হুকুমে) বাড়ানো যায়।

আর তা দ্বারা গোসল করার ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা জাইয আছে, উযূর উপর কিয়াস করে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, গোসল জাইয নয়। কেননা গোসল উযূর চেয়ে উপরের স্তরের।

ঐ নাবীয সম্পর্কে বিরোধ রয়েছে, যা মিষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে এমন তরল যে, সাধারণ পানির মত অংগে প্রবাহিত হয়। আর যা গাঢ় হয়ে গেছে, তা হারাম হবে; তা দ্বারা উযূ জাইয হবে না। আর যদি আগুনে জ্বাল দেয়ার কারণে তাতে পরিবর্তন আসে, তাহলে মিষ্ট থাকা পর্যন্ত অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। আর যদি গাঢ় হয়ে যায় তাহলেও আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা দ্বারা উযূ জাইয। কেননা, তাঁর মতে তা পান করা হালাল। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা পান করা হারাম বিধায় তা দ্বারা উযূ করা যাবে না।

'নাবীযুত্তামর' ছাড়া অন্য সকল নাবীয দ্বারা কিয়াসের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে উযূ জাইয হবে না।[২০]

তায়াম্মুম[১]

মুসাফির অবস্থায় কিংবা শহরের বাইরে থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি পানি না পায় আর তার ও শহরের[২] মাঝে এক মাইল বা ততোধিক দূরত্ব হয়, তাহলে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا –আর যদি তোমরা পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ التُّرَابُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ اِلَى عَشْرِ حِجَجٍ –মাটি হলো মুসলমানের জন্য পবিত্রকারী, যতক্ষণ পানি না পাওয়া যায়, এমন কি দশ বছরও যদি হয়।

দূরত্বের পরিমাণের ক্ষেত্রে 'মাইল'ই হলো গ্রহণযাগ্য। কেননা (এতটুকু দূরত্ব থেকে) শহরে প্রবেশ করতে তার কষ্ট হবে। আর প্রকৃতপক্ষে পানিতো অনুপস্থিত।[৩] দূরত্বই হলো বিবেচ্য, নামায ফউত হওয়ার আশংকা বিবেচ্য নয়। কেননা ত্রুটি এর পক্ষ থেকেই এসে থাকে।[৪]

যদি পানি পেয়ে যায় কিন্তু সে অসুস্থ থাকে এবং আশংকা করছে যে, পানি ব্যবহার করলে অসুস্থতা বেড়ে যাবে, তবে তায়াম্মুম করবে।

ঐ আয়াতের তিত্তিতে যা ইতোপূর্বে আমারা উল্লেখ করেছি।[৫] তাছাড়া অসুস্থতা বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি পানির মূল্যবৃদ্ধিজনিত ক্ষতির চেয়ে বেশী। অথচ এতে তায়াম্মুমের অনুমতি রয়েছে। সুতরাং তাতে অনুমতি হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত।

---

১. تيمم এর আভিধানিক অর্থ হলো ইচ্ছা করা। শরীআতের পরিভাষায় অর্থ হলো তাহারাত লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র মাটির ইচ্ছা করা (অর্থাৎ ব্যবহার করা)।

২. শহর দ্বারা পানির স্থান উদ্দেশ্যে। সাধারণতঃ শহরে বস্তিতে পানি সহজলভ্য বলে শহর বলা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ লোকটি যেখানে আছে, সেখানে তো পানি নেই। অথচ আমরা জানি যে, সর্বসম্মত মাযহাব হলো, দরজার সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় যদি কেউ তায়াম্মুম করে আর বাড়ীর ভিতরে পানি থাকে তাহলে তায়াম্মুম হবে না। কেননা সে সহজেই পানি লাভ করতে পারতো। সুতরাং বুঝা গেল যে, কষ্ট হওয়া না হওয়াই হলো মাপকাঠি। আর সাধারণত এক মাইলের অধিক দূরত্ব হলে কষ্ট হবে। তাই এক মাইল দূরত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪. যদি তার পক্ষ থেকে ত্রুটি না হয়ে থাকে তবু তায়াম্মুম জাইয় হবে না। ভিন্ন এক কারণে যা সামনে আসছে।

৫. وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ

আর রোগ বৃদ্ধির আশংকা নড়াচড়ার কারণে হোক কিংবা পানির ব্যবহারের কারণে হোক এতে কোন পার্থক্য নেই। ইমাম শাফিঈ (র.) তায়াম্মুম জাইয হওয়া অংগহানী বা প্রাণহানীর আশংকার উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা তা অগ্রাহ্য।

জুনুবী ব্যক্তি যদি আশংকা করে যে, সে গোসল করলে ঠাণ্ডায় মারা যাবে কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়বে, তাহলে সে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতে পারবে।

এ হুকুম ঐ অবস্থায় যখন সে শহরের বাইরে। এর কারণ (ইতোপূর্বে) আমরা বর্ণনা করেছি।[৬] আর যদি শহরেই থাকে তাহলে আবূ হানীফা (র.)-এর মতে একই হুকুম। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। তাঁরা বলেন, শহরে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়া বিরল। সুতরাং তা বিবেচ্য নয়।

ইমাম সাহেবের যুক্তি এই যে, অক্ষমতা বাস্তবে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তা বিবেচনা করা জরুরী।

তায়াম্মুম হল (মাটিতে) দু'বার উভয় হাত লাগান। একবারের দ্বারা মুখ মাসহ করবে এবং দ্বিতীয় বারের দ্বারা কনুই পর্যন্ত উভয় হাত মাসহ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ، ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ। তায়াম্মুম হলো (মাটিতে) দু'বার হাত লাগান, একবার হাত লাগান হলো মুখমণ্ডলের জন্য। আরেক বার হাত লাগান হলো উভয় হাতের জন্য।

আর উভয় হাত এমন ভাবে ঝাড়া দিবে, যেন মাটি ঝরে যায়। যাতে তার আকৃতি বিকৃত না হয়ে যায়।

যাহিরী রিওয়ায়াত মতে মাসহ পূর্ণাংগ হওয়া জরুরী। কেননা তায়াম্মুম উযূর স্থলবর্তী। এ জন্যই ফকীহ্গণ বলেছেন যে, আংগুলগুলো খেলাল করবে এবং আংটি খুলে নিবে, যাতে মাসহ পূর্ণাঙ্গ হয়।

তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে হাদাছ ও জানাবত দু'টোই সমান। অদ্রূপ হায়য ও নিফাছের তায়াম্মুম। কেননা বর্ণিত আছে যে এক সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে এসে আরয করলো, আমরা মরুভূমিতে বাস করি, ফলে এক দু'মাস আমরা পানি পাই না। অথচ আমাদের মাঝে জুনুবী এবং হায়য-নিফাসগ্রস্ত থাকে। তিনি (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ عَلَيْكُمْ بِاَرْضِكُمْ (اخرجه احمد) –তোমরা তোমাদের মাটির সাহায্য নিবে (অর্থাৎ তায়াম্মুম করবে)।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে *মৃত্তিকা জাতীয় যে কোন বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জাইয। যেমন- মাটি, বালু, পাথর, সুরকি চুনা, সাধারণ চুনা, সুরমা, ও হরিতাল।*

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, মাটি ও বালু ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তায়াম্মুম জাইয হবে না।

---

৬. অর্থাৎ অসুস্থতা জনিত ক্ষতি, পানির অধিক মূল্য জনিত ক্ষতির চেয়ে গুরুতর। সুতরাং এটা তায়াম্মুমের বৈধতার কারণ হলে এর কারণে বৈধ হওয়া আরো যুক্তিযুক্ত।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, উৎপাদনকারী মাটি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তায়াম্মুম জাইয হবে না। আবূ ইউসুফ থেকেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا –তোমরা পবিত্র (অর্থাৎ উৎপাদনকারী) মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। অর্থাৎ উৎপাদনকারী মাটি দ্বারা। এ কথা ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) বলেছেন।

তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) আমাদের বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীছের কারণে মাটির সাথে বালু বর্ধিত করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলীল এই যে, صَعِيْدًا ভূ-পৃষ্ঠের নাম. (صعيد শব্দের অর্থ উঁচু) ভূ-পৃষ্ঠের উঁচুত্বের কারণেই তার এ নামকরণ করা হয়েছে। আর طيب শব্দটি 'পবিত্র' অর্থও বহন করে। সুতরাং সে অর্থেই তাকে প্রয়োগ করা হবে। কেননা, তাহারাতের ক্ষেত্রে এ অর্থই অধিক উপযোগী। অথবা ইজমার দ্বারা এ অর্থ গৃহীত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মৃত্তিকার উপর ধুলা থাকা শর্ত নয়। কেননা, আমাদের উল্লেখিত আয়াতটি নিঃশর্ত।

তদ্রূপ ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মাটি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ধুলা দ্বারা তায়াম্মুম জাইয। কেননা তা মিহি মাটি।

তায়াম্মুমে নিয়্যত ফরয।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, ফরয নয়। কেননা, তায়াম্মুম উযূর স্থলবর্তী। সুতরাং গুণের দিক থেকে তার বিপরীত হতে পারে না।

আমাদের দলীল এই যে,[৭] (আভিধানিক ভাবে) তায়াম্মুম শব্দ দ্বারা ইচ্ছা বুঝায়। সুতরাং ইচ্ছা (নিয়্যত) করা ছাড়া তা সঠিক হবে না।

কিংবা মাটিকে বিশেষ অবস্থায় পবিত্রকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পানি স্বকীয়ভাবেই পবিত্রকারী। তবে যদি তাহারাতের কিংবা সালাতের বৈধ হওয়ার নিয়্যত করে তাহলে তা যথেষ্ট। হাদাছের বা জানাবাতের তায়াম্মুমের (আলাদা) নিয়্যত করা শর্ত নয়। এটিই বিশুদ্ধ মাযহাব।

কোন খৃষ্টান (বিধর্মী) যদি ইসলাম গ্রহণের নিয়্যতে তায়াম্মুম করে, তারপর ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে তায়াম্মুমকারী গণ্য হবে না। আর আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, সে তায়াম্মুমকারী গণ্য হবে। কেননা সে একটি উদ্দিষ্ট ইবাদতের নিয়্যত করেছে। পক্ষান্তরে মসজিদে প্রবেশের এবং কুরআন শরীফ স্পর্শ করার জন্য তায়াম্মুম করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা এটা উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়।[৮]

---

৭. ইবাদত হওয়ার বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই। কেননা ইসলাম গ্রহণ হচ্ছে যাবতীয় ইবাদতের মূল। আর مقصودة বা উদ্দিষ্ট হওয়ার অর্থ হলো অন্য কোন ইবাদতের অনুগামী না হওয়া, যেমন বিভিন্ন ইবাদতের শর্তগুলো সংশ্লিষ্ট ইবাদতের অনুগামী রূপেই ইবাদত রূপে গণ্য হয়েছে।

৮. সুতরাং এই উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করলে তাতে সালাত আদায় করা যাবে না। বলা বাহুল্য যে, কুরআন শরীফ স্পর্শ করা উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়। ইবাদত হচ্ছে কুরআন শরীফ পড়া। তদ্রূপ মসজিদে প্রবেশ করা উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়। ইবাদত হচ্ছে মসজিদে সালাত আদায় করা।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলীল এই যে, তাহারাত ছাড়া বিশুদ্ধ হয় না এমন উদ্দিষ্ট ইবাদতের নিয়্যত করার অবস্থা ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে মাটিকে পবিত্রকারী সাব্যস্ত করা হয়নি। আর ইসলাম হলো এমন উদ্দিষ্ট ইবাদত যা তাহারাত ছাড়া বিশুদ্ধ হয়। তিলাওয়াতের সিজদার বিষয়টি এর বিপরীত।[৯] কেননা তা এমন উদ্দিষ্ট ইবাদত, যা তাহারাত ছাড়া বিশুদ্ধ হয় না।

আর যদি সে ইসলাম গ্রহণের নিয়্যত না করেই উযূ করে তারপর ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সে উযূকারী গণ্য হবে। নিয়্যত শর্ত হওয়ার ভিত্তিতে ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।[১০]

কোন মুসলমান যদি তায়াম্মুম করে তারপর আল্লাহ্ না করুন মুরতাদ হয়ে যায় তার পর পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার পূর্ব তায়াম্মুম অক্ষুণ্ন থাকবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, তার তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। কেননা কুফর তায়াম্মুমের বিপরীতধর্মী। সুতরাং এতে প্রথম অবস্থা ও শেষ অবস্থা উভয়ই সমান হবে। যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার ব্যাপার।[১১]

আমাদের দলীল এই যে, (তায়াম্মুম তো আর স্ব-সত্তায় বিদ্যমান থাকে না যাকে কুফ্র এসে দূর করে দিবে, বরং) তায়াম্মুমের পর ব্যক্তির মাঝে পবিত্র হওয়ার গুণই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং তার উপর কুফর আরোপিত হলে তা পবিত্রতার বিপরীতধর্মী নয়। যেমন, উযূর উপর যদি কুফর আরোপিত হয়।

উল্লেখ্য যে, কাফিরের নিয়্যত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণে প্রাথমিক অবস্থায় তার তায়াম্মুম দুরস্ত হয় না।

উযূ ভংগকারী সকল বিষয় তায়াম্মুমও ভংগ করে। কেননা, তায়াম্মুম উযূর স্থলবর্তী। সুতরাং তা উযূর হুকুম গ্রহণ করবে।

আর পানির দেখা পাওয়াও তায়াম্মুম ভংগ করে; যদি পানি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। কেননা পানি পাওয়া দ্বারা ব্যবহার সক্ষমতাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। যে প্রাপ্যকে মাটির পবিত্রীকরণের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

হিংস্র প্রাণী, শত্রু বা পিপাসার আশংকায় শংকিত ব্যক্তি কার্যতঃ অক্ষম। আর আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ঘুমন্ত ব্যক্তি বস্তুত সক্ষম। তাঁর মতে তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় পানির নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে তার তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে।

---

৯. অর্থাৎ এ উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করলে সে তায়াম্মুম পরবর্তীতে গ্রহণযোগ্য হবে এবং তা দ্বারা সালাত আদায় করা যাবে।

১০. যেহেতু কাফির নিয়্যত করার যোগ্য নয়। সেহেতু তার তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে না।

১১. অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় নিকাহের পূর্বে হারাম হওয়ার কারণ সংঘটিত হলে নিকাহ বৈধ হয় না। তেমনি পরবর্তী অবস্থায় নিকাহের পর হারামের কারণ সংঘটিত হলে নিকাহ বাতিল হয়ে যায়।

(পানি দেখতে পাওয়ার) অর্থ হলো ঐ পরিমাণ (পানি) যা উযূর জন্য [১২] যথেষ্ট হয়। কেননা প্রথম অবস্থায়ই এর চেয়ে কম পরিমাণ ধর্তব্য নয়। সুতরাং শেষ অবস্থায়ও তা ধর্তব্য হবে না।[১৩]

পবিত্র মাটি ছাড়া তায়াম্মুম করবে না। কেননা আয়াতের طيب শব্দ দ্বারা পবিত্র বুঝানো হয়েছে। তা ছাড়া মাটি হলো পবিত্রীকরণের উপাদান। সুতরাং পানির মতো তার পবিত্র হওয়া জরুরী।

পানি যে পাচ্ছে না, অথচ পাওয়ার আশা করছে, তার জন্য আখেরি ওয়াক্ত পর্যন্ত সালাত বিলম্বিত করা মুসতাহাব। তারপর পানি পেয়ে গেলে উযূ করবে; অন্যথায় তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে নিবে।

যাতে দু'টি পবিত্রতার পূর্ণতমটি দ্বারা সালাত সম্পাদন হয়। সুতরাং বিষয়টি জামাআত পাওয়ার আশায় অপেক্ষমান ব্যক্তির মতো হলো।[১৪]

মূল ছয় গ্রন্থের বহির্ভূত বর্ণনা মতে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে বিলম্ব করা ওয়াজিব। কেননা প্রবল ধারণা বাস্তবতুল্য।

যাহেরুর রিওয়ায়াতের দলীল এই যে, অপারগতা প্রকৃতই বর্তমান। সুতরাং অনুরূপ নিশ্চয়তা ছাড়া অপারগতার বিধান রহিত হবে না।

তায়াম্মুমকারী তার তায়াম্মুম দ্বারা যত ইচ্ছা ফরয, নফল সালাত আদায় করতে পারবে।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে প্রতিটি ফরয[১৫] *সালাতের জন্য আলাদা* তায়াম্মুম করতে হবে। কেননা, তা জরুরী অবস্থার তাহারাত।[১৬]

আমাদের দলীল এই যে, পানির অনুপস্থিতিতে মাটি পবিত্রকারী। সুতরাং যতক্ষণ তার শর্ত বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ তা কার্যকর থাকবে।

শহর এলাকায় যদি জানাযা উপস্থিত হয় এবং (জানাযার) ওয়ালী সে ছাড়া অন্য কেউ হয়, আর উযূ করতে গেলে জানাযা ফউত হয়ে যাওয়ার আশংকা হয়, তাহলে সুস্থ ব্যক্তি তায়াম্মুম করতে পারবে। কেননা জানাযার কাযা নেই। সুতরাং অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়।

অনুরূপ ভাবে যে ব্যক্তি ঈদের জামা'আতে হাযির হল এবং উযূ করতে গেলে ঈদের সালাত ফউত হয়ে যাওয়ার আশংকা করে, তবে তায়াম্মুম করতে পারে। কেননা ঈদের জামা'আত দোহরানো হয় না।

---

১২. আর গোসলের ক্ষেত্রে গোসলের জন্য।

১৩. সামান্য পরিমাণ পানি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম শুরু করতে বাধা দিল না। সুতরাং তায়াম্মুম বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সামান্য পরিমাণ পানি লাভ করার কারণে তায়াম্মুম ভংগ হবে না।

১৪. বিলম্বে সালাত আদায় করলে জামা'আতের সাথে পড়া যাবে, এরূপ আশাবাদী ব্যক্তির পক্ষে সালাত শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব।

১৫. তাঁর মতে, এক তায়াম্মুমে বহু নফল নামায পড়া যায়।

১৬. সুতরাং জরুরী অবস্থা (অর্থাৎ ফরয নামাযের প্রয়োজন) অন্তর্হিত হলে ফরয নামাযের ক্ষেত্রে তার কার্যকারিতা রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম কুদূরী (র.)-এর বক্তব্য আর ওয়ালী সে ছাড়া অন্য কেউ কথাটির উদ্দেশ্য হল, ওয়ালীর জন্য তায়াম্মুম করা জাইয নয়। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ইমাম হাসান ইব্‌ন যিয়াদের বর্ণনা। এবং এটাই শুদ্ধ। কেননা, ওয়ালীর অধিকার আছে সালাত দোহরানোর। সুতরাং তার পক্ষে ফউত প্রযোজ্য নয়।

ইমাম কিংবা মুকতাদী যদি ঈদের সালাতের (মধ্যে) হাদাছগ্রস্ত হয়। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সে তায়াম্মুম করবে এবং বিনা[১৭] করবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, সে তায়াম্মুম করতে পারবে না। কেননা لاحق ব্যক্তি ইমামের ফারেগ হওয়ার পর অবশিষ্ট সালাত আদায় করতে পারে। সুতরাং তার ফউত হওয়ার আশংকা নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আশংকা বিদ্যমান আছে। কেননা সেদিন হলো ভিড়ের দিন। ফলে এমন কোন পরিস্থিতি উদ্ভুত হতে পারে, যা তার সালাত ফাসিদ করার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এ মত-পার্থক্য ঐ ক্ষেত্রে, যখন উযূ দ্বারা সালাত শুরু করে থাকে। আর তায়াম্মুম দ্বারা শুরু করে থাকলে সকলের মতেই তায়াম্মুম 'বিনা' করবে। কেননা যদি আমরা তার উপর উযূ ওয়াজিব করি, তাহলে সালাতের মধ্যে সে পানি পেয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় তো সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।[১৮]

জুমুআর সালাতের ব্যাপারে যদি আশংকা করে যে, উযূ করলে তা ফউত হয়ে যাবে, তাহলেও তায়াম্মুম করবে না। বরং (উযূ করার পর) যদি জুমুআর সালাত পায় তাহলে জুমুআ আদায় করবে। অন্যথায় চার রাকাআত যুহর আদায় করবে। কেননা তা স্থলবর্তী রেখে ফউত হয়। আর তা হল যুহরের সালাত। আর ঈদের সালাত এর বিপরীত।

তদ্রূপ যদি উযূ করার ব্যাপারে সালাতের সময় ফউত হওয়ার আশংকা করে তাহলে তায়াম্মুম করতে পারবে না; বরং উযূ করবে এবং যে সালাত ফউত হয়েছে তা কাযা করবে। কেননা এ সালাত স্থলবর্তী রেখে ফউত হচ্ছে। আর তা হলো কাযা।

মুসাফির যদি তার বাহনে রক্ষিত পানির কথা ভুলে যায় এবং তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে নেয়। এর পরে পানির কথা স্মরণ হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও

---

১৭. অর্থাৎ তায়াম্মুম করে অবশিষ্ট সালাত আদায় করে নিবে। নতুন ভাবে সালাত শুরু করতে হবে না।

১৮. অর্থাৎ যদি তায়াম্মুম করে ঈদের সালাত শুরু করে থাকে এবং সালাতের মধ্যে হাদাছগ্রস্ত হয়ে থাকে আর আমরা এই যুক্তিতে তার উপর উযূ বাধ্যতামূলক করে দেই যে, لاحق হিসাবে ইমামের ফারেগা হওয়ার পরও সে অবশিষ্ট সালাত পড়তে পারবে, তাহলে শরীআতের পক্ষ থেকে উযূর এই বাধ্যতামূলক নির্দেশ পানির অস্তিত্ব ঘোষণারই ফলশ্রুতি হবে। কেননা শরীআতের পক্ষ থেকে পানির অনস্তিত্ব সাব্যস্ত করার পর উযূ ওয়াজিব হতে পারে না। আর শরীআতের পক্ষ থেকে পানির অস্তিত্ব সাব্যস্ত হওয়ার পর তায়াম্মুম দ্বারা শুরুকৃত সালাত ফাসিদ হওয়া অনিবার্য। ফলে সালাত ফউত হওয়ার পরিস্থিতি দেখা দিবে। অথচ এই আশংকার কারণেই শরীআতের পক্ষ থেকে পানির অনস্তিত্ব সাব্যস্ত করে তাকে তায়াম্মুমের মাধ্যমে সালাতের শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো।

মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উক্ত সালাত দোহরাবে না। আর আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, উক্ত সালাত দোহরাবে।

এ মত-পার্থক্য হলো ঐ অবস্থায়, যখন পানি সে নিজে কিংবা তার নির্দেশে অন্য কেউ রেখে থাকে। ওয়াকতের ভিতরে এবং ওয়াকতের পরে স্মরণ হওয়ার একই হুকুম।

ইমাম আবূ ইউসুফের দলীল এই যে, সে পানিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। সুতরাং সে হলো ঐ ব্যক্তির মত, যে তার বাহনে রাখা কাপড়ের কথা ভুলে যায়। তাছাড়া মুসাফিরের বাহনে সাধারণতঃ পানির মওজুদ রাখা হয়; সুতরাং পানির খোঁজ করা ফরয।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর দলীল এই যে, জানা না থাকলে সক্ষমতা প্রযোজন হয় না। আর পানির প্রাপ্তির দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। আর বাহনে (সাধারণত) খাওয়ার পানি রাখা হয়, ব্যবহারের জন্য নয়।

আর বস্ত্রের মাসআলাটিরও অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে। আর যদি এ মাসআলায় ঐকমত্যও থাকে, তাহলে উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সতরের ফরয ফউত হচ্ছে স্থলবর্তীহীন ভাবে। আর পানি দ্বারা তাহারাত এর বিষয়টি ফউত হচ্ছে একটি স্থলবর্তী রেখে, আর তা হলো তায়াম্মুম।

তায়াম্মুমকারীর অন্তরে যদি প্রবল ধারণা হয় যে, কাছেই পানি আছে, তবে তার জন্য পানির খোঁজ নেওয়া জরুরী নয়। কেননা বিশাল প্রান্তরে পানি না থাকারই সম্ভাবনা বেশী। আর পানির অস্তিত্বের কোন প্রমাণ বিদ্যমান নেই। সুতরাং সে ব্যক্তি পানিপ্রাপ্ত নয়।

আর যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, সেখানে পানি আছে, তাহলে খোঁজ না নিয়ে তায়াম্মুম করা তার জন্য জাইয হবে না। কেননা (প্রবল ধারণা-জনিত) প্রমাণের প্রেক্ষিতে সে পানিপ্রাপ্ত বল সাব্যস্ত হবে। তবে পানির অনুসন্ধানের ব্যাপার এক তীরের দূরত্ব পর্যন্ত (কেউ কেউ বলেন, অর্থাৎ তিনশ গজ) খোজ করবে। এক মাইল দূরত্ব পর্যন্ত যেতে হবে না, যাতে সে তার কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে।

যদি তার সফর সংগীর কাছে পানি থাকে, তাহলে তায়াম্মুমের আগে তার কাছে পানি চাইবে। কেননা, সাধারণত পানি দিতে অসম্মতি থাকে না। যদি সে তাকে পানি না দেয় তাহলে অপরাগতা সাব্যস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে তায়াম্মুম করে নিবে।

যদি চাওয়ার আগেই তায়াম্মুম করে নেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তায়াম্মুম তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা অন্যের মালিকানা থেকে চাওয়া জরুরী নয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, তায়াম্মুম তার জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা পানি সাধারণতঃ এমনিই দেওয়া হয়ে থাকে।

যদি ন্যায্য মূল্য ছাড়া দিতে অস্বীকার করে আর তার কাছে পানির মূল্য থেকে থাকে তাহলে তার জন্য তায়াম্মুম যথেষ্ট হবে না। সক্ষমতা সাব্যস্ত হওয়ার কারণে। তবে অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্য বহন করা তার জন্য জরুরী নয়। কেননা ক্ষতিগ্রস্ততা হুকুম রহিতকারী। আল্লাহই অধিক জানেন।

মোজার উপর মাস্‌হ[১]

মোজার উপর মাস্‌হ করার বৈধতা 'সুন্নাহ' দ্বারা প্রমাণিত। এ সংক্রান্ত হাদীছসমূহ প্রসিদ্ধ।[২] এমন কি বলা হয় যে, যে ব্যক্তি মাস্‌হ এর বৈধতা বিশ্বাস করবে না সে বিদআতপন্থী। তবে যে ব্যক্তি মাস্‌হ এর বৈধতা বিশ্বাস করার পর আযীমত-এর উপর আমলের উদ্দেশ্যে মাস্‌হ তরক করে, সে সাওয়াবের অধিকারী হবে।

উযূ ওয়াজিবকারী যে কোন হাদাছের জন্য মোজার উপর মাস্‌হ করা জাইয। যদি পূর্ণাংগ তাহারাতের অবস্থায় তা পরিধান করে থাকে এবং পরবর্তীতে হাদাছগ্রস্ত হয়ে থাকে।

ইমাম কুদূরী (র.) মোজার উপর মাস্‌হকে উযূ ওয়াজিবকারী হাদাছের সাথে বিশিষ্ট করেছেন, কেননা জানাবাতের ক্ষেত্রে মাস্‌হ বৈধ নয়, যা যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ্ বর্ণনা করবো।

সেই সাথে (মাস্‌হকে তিনি) পরবর্তী হাদাছ-এর সাথে (বিশিষ্ট করেছেন)। কেননা, শরীআতের দৃষ্টিতে মোজা হাদাছ রোধকারী। এখন যদি আমরা পূর্ববর্তী হাদাছ বলায় মাস্‌হ জাইয বলি, যেমন মুস্তাহাযা নারী মোজা পরলো তারপর সালাতের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলো। তদ্রূপ তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি মোজা পরলো, তারপর পানি দেখতে পেলো তাহলে তো মাস্‌হ (বিদ্যমান হাদাছ) দূরকারী হবে।

যখন পূর্ণাংগ তাহারাত অবস্থায় মোজা পরবে। ইমাম কুদূরীর এ বক্তব্য মোজা পরিধানের সময় (তাহারাতের) পূর্ণাংগতার শর্ত উদ্দেশ্য নয়, বরং (পরবর্তী) হাদাছের সময়ের জন্য।

এটা হলো আমাদের মাযহাব।[৩] সুতরাং কেউ যদি আগে দু'পা ধুয়ে মোজা পরে নেয় তারপর তাহারাত পূর্ণ করে তারপর হাদাছগ্রস্ত হয় তাহলে সে মাস্‌হ করতে পারে।[৪]

---

১. মোজার উপর মাস্‌হ প্রসংগে কয়েকটি বিষয় জানা জরুরী, যথা, মূল মাস্‌হ এর পরিচয়, দ্বিতীয়তঃ মাস্‌হ-এর সময়সীমা, তৃতীয়তঃ মোজার পরিচয়, চতুর্থতঃ মাস্‌হ ভংগকারী বিষয়, পঞ্চমতঃ মাস্‌হ এর সূরত।

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, দিবালোকের মতো পরিষ্কার হওয়ার পরই আমি মোজার উপর মাস্‌হ করার কথা বলেছি। হাসান বসরী (র.) বলেন, সত্তরজন সাহাবী আমাকে মোজার উপর মাস্‌হ-এর পক্ষে হাদীছ শুনিয়েছেন।

৩. শাফিঈ (র.)-এর মতে মোজা পরিধানের সময় তাহারাতের পূর্ণাংগতা জরুরী। সুতরাং কেউ যদি এক পা ধুয়ে মোজা পরে নেয় এরপর অন্য পা ভুলে মৌজা পরে তাহলে এ মোজার উপর মাস্‌হ করা জাইয হবে না।

৪. কেননা মোজা পরার সময় পূর্ণাঙ্গ তাহারাত না থাকলেও পরবর্তী হাদাছ-এর সময় তাহারাত পূর্ণাংগ ছিলো।

এ হুকুমের কারণ এই যে, মোজা পায়ের ভিতরে হাদাছের অনুপ্রবেশ রোধ করে। সুতরাং রোধ করার সময় তাহারাতের পূর্ণাংগতা লক্ষণীয় হবে। কেননা, সে সময় যদি তাহারাত অসম্পূর্ণ থাকে, তবে মোজা হাদাছ রোধকারীর পরিবর্তে দূরকারী হবে ।

মুকীমের জন্য একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিনরাত মাস্‌হ করা জাইয। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ يَمْسَحُ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا (مسلم) –মুকীম একদিন একরাত্র এবং মুসাফির তিনদিন তিনরাত্র মাস্‌হ করবে।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন ঃ সময়সীমার শুরু হবে হাদাছ-এর পর থেকে। কেননা, মোজা হাদাছের অনুপ্রবেশ রোধকারী, সুতরাং রোধ করার সময় থেকে সময় ধর্তব্য হবে।

মাস্‌হ করা হবে উভয় মোজার উপরাংশে আংগুল দ্বারা রেখা টানা রূপে (পায়ের) আংগুলের দিক থেকে শুরু করে পায়ের 'সাক' (টখ্‌নু থেকে হাঁটু)-এর দিকে নিবে। কেননা মুগীরাহ্ (রা.) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, নবী (সা.) তাঁর উভয় মোজার উপর নিজের দুই হাত রেখে পায়ের আংগুল থেকে উপরের দিকে একবার মাস্‌হ করলেন। আমি এখনো যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মোজার উপর আংগুল রেখা রূপে মাস্‌হ-এর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।[৫]

উপরাংশে মাস্‌হ করা ওয়াজিব। সুতরাং মোজার তলায়, গোড়ালীতে বা গোড়ায় মাস্‌হ করা জাইয় হবে না। কেননা মাস্‌হ (এর মাসআলা) কিয়াস বহির্ভূত।[৬] সুতরাং শরীআত নির্দেশিত যাবতীয় বিষয়ের অনুসরণ করতে হবে।

আঙ্গুল থেকে মাস্‌হ শুরু করা মুস্তাহাব আসল হুকুম ধৌত করণের অনুসরণে (ক্ষেত্রে)।

মাসহ্‌র ফরয হল হাতের আংগুলের তিন আংগুল পরিমাণ। ইমাম কারখী (র.) বলেন, পায়ের আঙ্গুলের পরিমাণ। প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ যেহেতু *মাসহ্‌র* উপকরণ বিবেচনা বাঞ্ছনীয়।

ঐ মোজায় মাস্‌হ করা জাইয হবে না, যাতে প্রচুর ছেঁড়া আছে এবং তা দিয়ে পায়ের তিন আংগুল পরিমাণ জায়গা দেখা যায়। যদি তার চেয়ে কম হয় তাহলে জাইয হবে।

---

৫. এ বর্ণনা বিরল, তবে সমার্থক একটি বর্ণনা রয়েছে মুসান্নাফে ইব্‌ন আবী শায়বাতে (তাখরীযে যায়লায়ী)।

৬. কেননা কিয়াসের দাবী এই যে, মাস্‌হ যা নাজাসাত দূর করতে পারে না, ধোয়ার স্থলবর্তী হতে পারে না, যা নাজাসাত দূর করতে সক্ষম। এ জন্যই আলী (রা.) বলেছেন, দীন যদি মানবীয় মতামত নির্ভর হতো তাহলে মোজার উপরের চেয়ে তলায় মাস্‌হ করাই উত্তম হতো। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূলকে আমি মোজার উপরেই মাস্‌হ করতে দেখেছি (আয়নী)।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, সামান্য ছেঁড়া হলেও মাস্‌হ জাইয হবে না। কেননা প্রকাশিত অংশটি ধোয়া যখন ওয়াজিব হয়ে গেলো তখন অবশিষ্ট অংশও ধোয়া ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলীল এই যে, মোজা সাধারণতঃ সামান্য ছেঁড়া থেকে মুক্ত থাকে না। সুতরাং খুলতে গেলে পরিধানকারিগণ কষ্টের সম্মুখীন হয়। বেশী ছেঁড়া থেকে সাধারণত মুক্ত থাকে, সুতরাং এর কারণে কষ্ট হবে না।

আর 'অধিক' এর পরিমাণ হলো পায়ের কনিষ্ঠ আংগুলগুলোর তিন আংগুল পরিমাণ। এটিই বিশুদ্ধ মত। কেননা, পায়ের পাতার মধ্যে আংগুলই হলো আসল। আর তিন হলো অধিকাংশ। তাই তিনকে সমগ্রের স্থলবর্তী গণ্য করা হবে। আর সতর্কতা অবলম্বনে কনিষ্ঠকে বিবেচনা করা হয়েছে। হাঁটার সময় যদি ছেঁড়াটা ফাঁক না হয় তাহলে শুধু আংগুলের অগ্রভাগ ঢুকে যাওয়াটা ধর্তব্য নয়। প্রতিটি মোজায় আলাদাভাবে এই পরিমাণ হিসাব করা হবে। অর্থাৎ একটি মোজার সবকটি ফুটো একত্রে (হিসাব) করা হবে। কিন্তু উভয় মোজার ফুটোগুলো একত্র করা হবে না। কেননা, এক মোজার ফুটো অন্য মোজার দ্বারা সফর করতে বাধা সৃষ্টি করে না। কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে লেগে থাকা নাজাসাত এর বিষয়টি এর বিপরীত।[৭] কেননা, সে তো সমগ্র নাজাসাত-ই বহনকারী। ছতর খুলে যাওয়ার বিষয়টি (বিক্ষিপ্তভাবে লেগে থাকা) নাজাসাতের নজীর[৮] হিসাবে গণ্য।

যার উপর গোসল ওয়াজিব হয়েছে, তার জন্য মাস্‌হ করা জাইয নয়। কেননা, সাফওয়ান ইব্‌ন আস্‌সাল (র.) বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সফরের সময় আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন, যাতে আমরা জানাবাত ছাড়া পেশাব, পায়খানা ও ঘুম ইত্যাদি হাদাছের ক্ষেত্রে তিনদিন তিনরাত আমাদের মোজা না খুলি।

তাছাড়া জানাবাত সাধারণত বারংবার ঘটে না। সুতরাং মোজা খোলায় তেমন কোন অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে হাদাছের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা বারংবার ঘটে।

উযূ ভংগ করে এমন প্রতিটি বিষয় মাস্‌হ ভংগ করে। কেননা মাস্‌হ তো উযূরই অংশ বিশেষ।

মোজা খুলে ফেলাও মাস্‌হকে ভংগ করে। কেননা রোধকারী না থাকার কারণে পায়ের পাতায় হাদাছ অনুপ্রবেশ করবে। তদ্রূপ একটি মোজা খুললেও (হাদাছ ভংগ হবে।) কেননা একই নির্দেশনায় মাস্‌হ ও ধোয়ার হুকুম একত্র করা অসম্ভব।

তদ্রূপ সময় উত্তীর্ণ হওয়া (মাস্‌হ ভংগের কারণ)। (এ হুকুম) পূর্ব বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী।

সময়সীমা যখন পূর্ণ হবে তখন উভয় মোজা খুলে ফেলবে এবং উভয় পা ধুয়ে

---

৭. অর্থাৎ উভয় মোজায় সামান্য সামান্য নাজাসাত লেগে থাকলে পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে উভয় মোজায় নাজাসাত একত্র করা হবে।

৮. অর্থাৎ কাপড়ের বিভিন্ন স্থানে ফুটো থাকলে এবং তা দিয়ে সতর দেখা গেলে পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সতরের সব অংশের ফুটো একত্র করা হবে।

সালাত আদায় করতে পারবে। উযূর অবশিষ্ট কার্য দোহরানো জরুরী নয়। সময়ের আগে খুলে ফেলারও একই হুকুম। কেননা, খোলার সময় পূর্ববর্তী হাদাছ পায়ের পাতায় অনুপ্রবেশ করে, যেন সে তা ধোয়ইনি। মোজা খুলে যাওয়ার হুকুম সাব্যস্ত হবে পায়ের পাতা মোজার সাক পর্যন্ত (খাড়া অংশে) এসে গেলে। কেননা মাস্‌হের ক্ষেত্রে এ অংশটা ধর্তব্য নয়। পায়ের পাতার অধিকাংশ বের হয়ে গেলেও একই হুকুম। এটাই বিশুদ্ধ মত।

মুকীম অবস্থায় যে ব্যক্তি মাস্‌হ শুরু করেছে, অতঃপর একদিন একরাত্র পূর্ণ হওয়ার আগেই সফরে বের হয়ে যায়, সে তিনদিন তিন রাত্র মাস্‌হ করবে।

এ হুকুম হাদীছের শর্তহীন থাকার কারণে এটাই কার্যকর। তাছাড়া মাস্‌হর হুকুম হল সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং তার ক্ষেত্রে শেষ সময় বিবেচ্য হবে।মুকীম অবস্থার সময়সীমা পূর্ণ করার পরে সফর করার বিষয় এর বিপরীত। কেননা, (সময় সীমা পার হওয়া মাত্র) হাদাছ পায়ের পাতায় অনুপ্রবেশ করে যায়। আর মোজা হাদাছ দূরকারী নয়।[৯]

মুকীমের মুদ্দত (এক দিন এক রাত) পূর্ণ করার পর যদি কোন মুসাফির মুকীম হয় তাহলে মোজা খুলে ফেলবে। কেননা, সফর শেষ হওয়ার পর সফরের সুবিধামূলক হুকুম অব্যাহত থাকবে না।

আর যদি মুকীমের মুদ্দত পূর্ণ না করে থাকে তাহলে তা পূর্ণ করবে। কেননা, এ হল মুকীম অবস্থার মুদ্দত। আর বর্তমানে সে মুকীম। মোজার উপর যে ব্যক্তি 'জারমুক' (আবরণী মোজা) পরে[১০] সে তার উপরই মাস্‌হ করতে পারবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, বিকল্পের আরেক বিকল্প হতে পারে না।

আমাদের দলীল এই যে, নবী (সা.) আবরণী মোজা দু'টির উপর মাস্‌হ করেছেন। তাছাড়া ব্যবহারে ও উদ্দেশ্যে এ হল মোজারই আনুসাঙ্গিক বস্তু। সুতরাং এটা দু'পরত মোজার মতোই গণ্য।

আর মূলতঃ 'জারমুক' পায়ের বিকল্প, মোজার নয়। অবশ্য হাদাছগ্রস্ত হওয়ার পর জারমুক পরার হুকুমটি এর বিপরীত। কেননা, হাদাছ মোজায় পৌছে গেছে। সুতরাং অন্য কিছুর দিকে তা স্থানান্তরিত হবে না।

আর যদি জারমুক মোটা কাপড়ের হয়, তাহলে তার উপর মাস্‌হ জাইয হবে না। কেননা তা পায়ের স্থলবর্তী হওয়ার উপযুক্ত নয়।[১১] তবে আর্দ্রতা মোজা পর্যন্ত পৌছলে জাইয হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে 'জওরব' (চামড়া ছাড়া অন্য কিছুর তৈরী মোজা)-এর উপর মাস্‌হ করা জাইয নয়,[১২] তবে যদি উপরে-নীচে বা শুধু নীচে চামড়া যুক্ত হয়, তবে জাইয

৯. সুতরাং সফরের মধ্যে মোজার উপর মাস্‌হ করলেও মুকীম অবস্থার সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে অনুপ্রবিষ্ট হাদাছ দূর হবে না।

১০. অর্থাৎ মোজা পরার পর আবরণী মোজা পরার পূর্বে যদি হাদাছ দেখা না দিয়ে থাকে।

১১. কেননা আলাদা ভাবে তা পরে হাঁটা সম্ভব নয়।

১২. হাফ মোজার উপর মাস্‌হ করার তিন সূরত। এক সূরতে সকলের মতেই মাস্‌হ জাইয হবে। অর্থাৎ যখন তা মোটা হয়। এক সূরতে কারো মতেই জাইয নেই। অর্থাৎ যদি তা মোটাও না হয় এবং চামড়াযুক্তও না হয়। এক সূরতে মত পার্থক্য আছে, অর্থাৎ মোটা হয় কিন্তু চামড়াযুক্ত না হয়।

হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি 'জওরব' এমন পুরো হয় যে, অপর দিক প্রকাশ না পায়, তাহলে এতে মাস্‌হ জাইয হবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (স.) তাঁর 'জওরবের' উপর মাস্‌হ করেছেন।

তাছাড়া এটা যখন মোটা হয় তখন তা পরে হাঁটা যায়। পুরো হওয়ার পরিমাণ এই যে, কিছু দ্বারা না বাঁধা সত্ত্বেও তা পায়ের গোছার সাথে আটকে থাকে। এমতাবস্থায় তা মোজার সদৃশ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, এটি মোজার সম-মানের নয়। কেননা তা পরে অব্যাহতভাবে চলা সম্ভব নয়, যদি না তা চামড়াযুক্ত হয়। অনুরূপ 'জওরব'ই হলো হাদীছের প্রয়োগ ক্ষেত্র। তাঁর নিকট থেকে আর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর এর উপরই ফতওয়া দেয়া হয়।

পাগড়ী, টুপি, বোরকা ও হাত মোজার উপর মাস্‌হ জাইয নয়। কেননা এগুলো খুলে নিতে তেমন কোন অসুবিধা হয় না। আর অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যেই অবকাশ দেওয়া হয়েছে।

জখমের পট্টির উপর মাস্‌হ করা জাইয। যদিও তা উযূ ছাড়া অবস্থায় বাঁধা হয়ে থাকে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরূপ করেছেন এবং আলী (রা.)-কেও তা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তাছাড়া এ ক্ষেত্রের অসুবিধা মোজা খোলার অসুবিধার চেয়ে বেশী। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মাস্‌হ এর বৈধতা অধিক যুক্তিযুক্ত।

আর পট্টির অধিকাংশ স্থান মাস্‌হ করাই যথেষ্ট। ইমাম হাসান (ইব্‌ন যিয়াদ) তা উল্লেখ করেছেন। এটা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কেননা এর নির্দিষ্ট সময় শরীআতের মাধ্যমে অবহিত করা হয়নি।

যদি জখমের পট্টি নিরাময় ছাড়াই খুলে পড়ে যায়, তাহলে মাস্‌হ বাতিল হবে না। কেননা, ওযর অব্যাহত আছে, আর যতক্ষণ ওযর অব্যাহত আছে, ততক্ষণ তার উপর মাস্‌হ করা তার নীচের অংশ ধোয়ারই সমতুল্য।

আর যদি নিরাময় হওয়ার পর পট্টি পড়ে যায়, তাহলে মাস্‌হ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ওযর দূর হয়ে গেছে। যদিও তখন সে সালাতে থেকে থাকে, তাহলে সে সালাত নতুনভাবে আদায় করবে। কেননা বিকল্প দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জনের পূর্বেই সে আসল কর্মের ক্ষমতা লাভ করেছে।

হায়য ও ইসতিহাযা[১]

হায়যের সর্বনিম্ন মুদ্দত হলো তিনদিন তিনরাত। এর চেয়ে কম হলে সেটা হবে ইসতিহাযা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

اَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَاَكْثَرُهُ عَشَرَةُ اَيَّامٍ

–কুমারী ও বিবাহিতা নারীর হায়যের সর্বনিম্ন মুদ্দত হলো তিনদিন ও তিনরাত এবং তার সর্বোচ্চ মেয়াদ দশদিন।

এ হাদীছ একদিন একরাত্র মেয়াদ নির্ধারণের ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলীল।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার মেয়াদ দুইদিন এবং তৃতীয় দিনের অধিকাংশ। এ হল অধিকাংশকে সমগ্রের স্থলবর্তী করার ভিত্তি অনুযায়ী।

আমাদের দলীল এই যে এটা শরীআত নির্ধারিত সময়সীমা হ্রাস করার শামিল। তার সর্বোচ্চ মেয়াদ হলো দশদিন। এর অতিরিক্ত হবে ইসতিহাযা।

এর দলীল হল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ। আর এ হাদীছ পনের দিন মেয়াদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপক্ষে প্রমাণ। পূর্ববর্তী মেয়াদের অতিরিক্ত বা এর কম রক্ত স্রাব হচ্ছে ইসতিহাযা। কেননা শরীআতের নির্ধারিত মেয়াদ অন্য কিছুকে তার সাথে যুক্ত করতে বাধা দেয়।

স্বচ্ছ-শুভ্রতা দেখার পূর্ব পর্যন্ত ঋতুগ্রস্ত নারী লাল হলদে বা ঘোলা রংয়ের যে কোন স্রাব দেখতে পাবে, তা হায়য।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) *বলেন, ঘোলা বর্ণের স্রাব হায়য বলে গণ্য হবে না রক্ত প্রবাহের পর না হলে।* কেননা, উক্ত রক্ত জরায়ু থেকে নির্গত হলে অবশ্যই ঘোলা স্রাব স্বচ্ছ রক্তের পরে বের হতো। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর দলীল হলো 'আইশা (রা.) সম্পর্কে এই বর্ণনা যে, তিনি স্বচ্ছ-শুভ্রতা ব্যতীত সব কিছুকে হায়য বলে গণ্য করেছেন। আর এ ধরনের বিষয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে শ্রবণ ছাড়া অবগত হওয়া সম্ভব নয়। আর (আবূ ইউসুফ (রা.)-এর দলীলের জবাব এই যে) জরায়ুর মুখ যেহেতু নিম্নমুখী, সেহেতু খোলা রক্তটাই আগে বের হয়, কলসের নীচ দিক দিয়ে ফুটো করলে যেমন (নীচের গাদ আগে বের হয়)।

সবুজ রংয়ের স্রাব সম্পর্কে বিশুদ্ধ মত এই যে, স্ত্রী লোকটি ঋতুমতী হলে তা হায়য বলে গণ্য হবে আর রঙের পরিবর্তন খাদ্যের দোষের কারণে হয়েছে বলে ধরা হবে। আর যদি অধিক

১. ঋতুস্রাব ও ঋতুদোষ।

রকম হয় যে, সবুজ রং ছাড়া কিছু দেখে না, তাহলে তা উৎসের দোষ বলে ধরা হবে। সুতরাং তা হায়য বলে গণ্য হবে না।

হায়য হায়যগ্রস্তার থিকা থেকে সালাত রহিত করে দেয় এবং সিয়াম পালন তার উপর হারাম করে দেয়। ফলে সাওমের কাযা করবে এবং সালাতের কাযা করবে না। কেননা, 'আইশা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যামানায় আমাদের কেউ যখন হায়য থেকে পবিত্র হতো তখন সে সাওমের কাযা করতো কিন্তু সালাতের কাযা করত না।

আর এ কারণে যে, দ্বিগুণ হওয়ার কারণে সালাতের কাযা করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে সিয়ামের কাযা করা তেমন কষ্টসাধ্য নয়।

আর ঋতুমতী মসজিদে প্রবেশ করবে না। জুনুবী ব্যক্তিরও একই হুকুম। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ –হায়যগ্রস্ত ও জুনুবী-এর জন্য মসজিদে প্রবেশ আমি হালাল রাখি না।

শুধু পার হওয়া ও অতিক্রম করার জন্য প্রবেশের বৈধতা দানের ব্যাপারে এ হাদীছের ব্যাপক ভাষ্য ইমাম শাফিঈ (রা.)-এর বিপক্ষে দলীল।

আর সে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করবে না। কেননা তাওয়াফ মসজিদের অভ্যন্তরে হয়ে থাকে।

আর তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ আর তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত তোমরা স্ত্রী সঙ্গম করবে না।

হায়য, জানাবাত ও নিফাসগ্রস্তদের জন্য কুরআন পাঠ বৈধ নয়। কেননা, নবী (সা.) বলেছেন : لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ –হায়যগ্রস্ত ও জুনুবী কুরআনের কোন অংশ পাঠ করবে না। হায়যগ্রস্তকে অনুমতি দানের ব্যাপারে এ হাদীছ ইমাম মালিক (র.)-এর বিপক্ষে দলীল।

আর এ হাদীছের ব্যাপক ভাষ্য এক আয়াতের কম পরিমাণকেও শামিল করে। সুতরাং উক্ত পরিমাণ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে এ হাদীছ ইমাম তাহাবীর বিপক্ষে দলীল।

এদের জন্য গিলাফ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করার অনুমতি নেই। আর যে মুদ্রায় কুরআনের কোন সূরা লিখিত রয়েছে, থলি ছাড়া তা স্পর্শ করা বৈধ নয়। তেমনি যার উযূ নেই, তার জন্য গিলাফ ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করা বৈধ নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ –পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না। যেহেতু হাদাছ ও জানাবাত দু'টোই হাতে অনুপ্রবেশ করে থাকে, তাই স্পর্শের বিধানের ব্যাপারে দু'টোই সমান আর জানাবাত মুখে প্রবেশ করে, কিন্তু হাদাছ প্রবেশ করে না। তাই পাঠের বিধানে দু'টোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

আর এ ক্ষেত্রে গিলাফ তা-ই, যা কুরআন থেকে আলাদা থাকে। তা নয়, কুরআনের সাথে জড়িত থাকে। যেমন, বাঁধাই কৃত চামড়া। এ-ই বিশুদ্ধ মত।

আস্তিন দ্বারা কুরআন শরীফ স্পর্শ করা[২] মাকরূহ। এ-ই সহীহ্। কেননা, আস্তিন তো ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত। শরীআত সম্পর্কিত (হাদীছ ও ফিকাহ) গ্রন্থাদির বিধান এর বিপরীত। তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য আস্তিন দ্বারা স্পর্শ করার অনুমতি রয়েছে। এর কারণ, এতে প্রয়োজন রয়েছে। আর (উযূ না থাকা সত্ত্বেও নাবালকের) হাতে কুরআন তুলে দেওয়ায় কোন দোষ নেই। কেননা, তাদের বেলায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে হিফযে কুরআন আর পবিত্রতার নির্দেশ তাদের জন্য কষ্টকর। এটাই সহীহ্ মত।

হায়যের রক্তস্রাব যদি দশ দিনের কম সময়ে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে গোসল করা পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা জাইয নয়। কেননা, রক্ত কখনো নামে কখনো থামে, সুতরাং থামার দিকটির অগ্রাধিকারের জন্য গোসল করা জরুরী।

আর যদি সে গোসল না করে আর তার উপর সালাতের সর্বনিম্ন সময় অতিবাহিত হয়, -এ পরিমাণ যে, সে গোসল করে তাহরীমা বাঁধতে সক্ষম হতো, তাহলে তার সাথে সহবাস করা বৈধ। কেননা, উক্ত সালাতের ঋণ তার যিম্মায় আরোপিত হয়ে গেছে। বিধান অনুযায়ী সে পবিত্র বলে সাব্যস্ত।

যদি তিন দিনের উপরে কিন্তু পূর্ব অভ্যাসের কম সময়ে রক্তস্রাব বন্ধ হয়, তাহলে অভ্যস্ত সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বামী তার সাথে সঙ্গম করবে না, যদিও সে গোসল করে থাকে। কেননা, অভ্যস্ত সময়ের ভিতরে পুন: স্রাব হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। সুতরাং পরিহার করার মধ্যেই সতর্কতা।

আর যদি দশদিন পূর্ণ হয়ে রক্ত বন্ধ হয়, তাহলে গোসলের পূর্বেই তার সাথে সহবাস জাইয। কেননা, হায়য দশদিনের অতিরিক্ত হতে পারে না। তবে গোসলের পূর্বে সহবাস পসন্দনীয় নয়।[৩] কেননা তাশদীদযুক্ত কিরাতের প্রেক্ষিতে এ অবস্থাও নিষেধের আওতাভুক্ত হায়যের মেয়াদের মধ্যবর্তী সময়ে দুই রক্তস্রাবের মাঝে যদি পবিত্রতা দেখা দেয় তাহলে তা অব্যাহত রক্তস্রাব বলে গণ্য।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম।

এর কারণ এই যে, সর্বসম্মত মত অনুযায়ী হায়যের পূর্ণ মেয়াদব্যাপী রক্তস্রাব অব্যাহত থাকা শর্ত নয়। সুতরাং মেয়াদের শুরু ও শেষটাই বিবেচ্য; যেমন, যাকাতের মাসআলায় নিসাবের হুকুম।[৪]

ইমাম আবূ ইউসুফ সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত অন্য এক রিওয়ায়াত মতে যদি পনের দিনের কম হয়, তাহলে তা (উভয় স্রাবকে) বিচ্ছিন্নকারী হবে না। বরং পূর্ণ মেয়াদ

---

২. অর্থাৎ হায়য অবস্থায় অতিক্রান্ত করা।

৩. حَتَّى يَطَّهَّرْنَ —অর্থ যতক্ষণ না খুব উত্তম রূপে পবিত্রতা অর্জিত হয়। সুতরাং দশদিন পূর্ণ হওয়ার পর খুব উত্তম রূপে পবিত্রতা গোসল করার পরই অর্জিত হবে।

৪. অর্থাৎ বছরের শুরুতে ও শেষে নিসাবের পূর্ণতা শর্ত। মধ্যবর্তী সময়ে নিসাবের পূর্ণতা শর্ত নয়।

অব্যাহত স্রাব বলে গণ্য হবে। কেননা, এটা তুহুরে ফাসিদ। সুতরাং তা স্রাবের স্থলবর্তী হবে। এ মতামত গ্রহণ আমলের জন্য অধিকতর সহজ। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটি আবূ হানীফা (র.)-এর সর্বশেষ মত। এ মাসআলার পূর্ণ বিবরণ হায়য অধ্যায়ে জানা যাবে।

তুহর -এর সর্বনিম্ন মেয়াদ পনের দিন।

ইবরাহীম নাখঈ থেকে এরূপই বর্ণিত। আর এ বিষয়ে শারে' (আ.)-এর নিকট থেকে অবহিত করণ ব্যতীত জানা সম্ভব নয়।[৫]

আর তার সর্বোচ্চ মুদ্দতের সীমা নেই। কেননা, তা এক বছর দু'বছর পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। সুতরাং তা কোন মেয়াদের দ্বারা নির্ণয় করা যাবে না। তবে যে মহিলার স্রাব অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হতে থাকে তার জন্য মেয়াদ ধার্য করা হয়।[৬] এ সম্পর্কিত বিধি-বিধান কিতাবুল হায়যে জানা যাবে।

ইসতিহাযার রক্ত স্রাবে হুকুম নাক থেকে রক্তক্ষরণের অনুরূপ। যা সিয়াম, সালাত ও সহবাস কোনটিকেই বাধা দেয় না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) (ইসতিহাযাগ্রস্তকে) বলেছেন ঃ تَوَضَّئِى وَصَلِّى وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ –চাটাইয়ে রক্তের ফোঁটা পড়তে থাকলেও তুমি উযূ করবে ও সালাত আদায় করবে।

সালাতের হুকুম যখন জানা গেল, তখন ইজমাই ফয়সালার ফলশ্রুতিতে সিয়াম ও সহবাসের হুকুমও সাব্যস্ত হয়ে যায়।

রক্তস্রাব যদি দশদিনের বেশী হয়, আর যদি তার দশদিনের কম প্রচলিত অভ্যাস জানা থেকে থাকে তাহলে তার হায়যকে অভ্যস্ত দিনগুলোতেই সীমিত রাখা হবে। আর অভ্যাসের অতিরিক্ত যা তা ইসতিহাযা হবে।

কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا (ابو داود) –মুসতাহাযা নারী তার হায়যের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে সালাত বর্জন করবে। তা ছাড়া অভ্যাসের অতিরিক্ত দিনগুলো দশের অতিরিক্ত দিনগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং তার সাথেই তা যুক্ত হবে।

আর যদি বালেগ হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ কোন মেয়ের রক্ত স্রাব আরম্ভ হওয়ার পর সে মুসতাহাযা হয়ে যায় (অর্থাৎ দশদিন থেকে বেশী স্রাব দেখা যায়) তবে প্রতি মাসের দশদিন তার হায়য গণ্য হবে, অবশিষ্ট দিনগুলো হবে ইতিহাযা। কেননা, তার প্রারম্ভের রক্তস্রাবকে আমরা হায়য হিসাবে জেনেছি, সুতরাং সন্দেহের কারণে (পরবর্তী দিনগুলো) হায়য থেকে বহির্ভূত হবে না। আল্লাহ্ই উত্তম জানেন।

---

৫. সুতরাং ধরে নেয় হবে যে, তিনি কোন সাহাবী থেকে শুনেছেন, আর সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে শুনেছেন।

৬. অর্থাৎ তখন তুহরের সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। তবে মেয়াদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে।

পরিচ্ছেদ ঃ মুসতাহাযা

মুসতাহাযা নারী, অব্যাহত মূত্রক্ষরণ ও সার্বক্ষণিক নাক থেকে রক্তক্ষরণের রোগী এবং এমন ক্ষতগ্রস্ত ব্যক্তি, যার ক্ষতস্থান থেকে নিঃসরণ থামে না। এরা সকলে প্রত্যেক সালাতের ওয়াক্তের জন্য আলাদা উযূ করবে। তারপর সে ওয়াক্তের ভিতরে ঐ উযূ দ্বারা যত ইচ্ছা ফরয ও নফল পড়বে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, মুসতাহাযা নারী প্রত্যেক ফরয সালাতের জন্য উযূ করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ। –মুসতাহাযা প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করবে।

তাছাড়া তার তাহারাতের গ্রহণ যোগ্যতা হচ্ছে ফরয আদায়ের প্রয়োজনে। সুতরাং ফরয থেকে ফারিগ হওয়ার পর তা বহাল থাকবে না।

আমাদের দলীল এই যে, নবী (সা.) বলেছেন ঃ

الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلٰوةٍ। –মুসতাহাযা নারী প্রত্যেক সালাতের ওয়াক্তের জন্য উযূ করবে।

শাফিঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত প্রথম হাদীছের উদ্দেশ্যও এটাই। কেননা, لام অব্যয়কে ওয়াক্তের অর্থেও ব্যবহার করা হয়। বলা হয় ঃ آتِيكَ لِصَلٰوةِ الظُّهْرِ অর্থাৎ আমি তোমার কাছে আসবো যুহরের সালাতের সময়। তাছাড়া সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে ওয়াক্তকে আদায় এর স্থলবর্তী করা হয়েছে। সুতরাং তার উপরই বিধান আবর্তিত হবে।[৭]

যখন ওয়াক্ত শেষ হবে, তখন তাদের উযূ বাতিল হয়ে যাবে। এবং অন্য সালাতের জন্য নতুন উযূ করবে। এ হলো আমাদের তিন ইমামের মাযহাব। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, সময় প্রবেশ করার পর নতুন উযূ করবে।

সুতরাং সূর্যোদয়ের সময় যদি তারা উযূ করে তাহলে যুহরের সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত এ উযূ তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। এ ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রা.)-এর মত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও যুফার (র.) বলেন, যুহরের সময় প্রবেশ করা পর্যন্ত তাদের জন্য উযূ কার্যকর হবে।

আলোচ্য মাসআলার খোলাসা এই যে, ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রা.) -এর মতে পূর্ববর্তী হাদাছ দ্বারা মা'যূরের তাহারাত ভেংগে যায় ওয়াক্ত শেষ হওয়ার কারণে। আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার কারণে। আর ইমাম আবূ ইউসুফের মতে দু'টোর যে কোন একটির কারণে ।

এ মতপার্থক্যের ফলাফল ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই শুধু প্রকাশ পাবে, যে মধ্যাহ্নের পূর্বে উযূ করেছে, যেমন আমরা আগে উল্লেখ করেছি, কিংবা সূর্যোদয়ের পূর্বে উযূ করেছে।

৭. অর্থাৎ মুস্তাহাযা নারী ও অন্যান্য মা'যূরদের উযূকে অনুমোদন করা হয়েছে মূলতঃ ঐ ওয়াক্তের ফরয নামায আদায় করার জন্য। তবে ওয়াক্তে আদায়ের স্থলবর্তী করে ওয়াক্তের জন্যই উযূর অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যাতে মা'যূর ব্যক্তি একই ওয়াক্তে একই উযূতে পিছনের কাযা নামাযও পড়তে পারে। সুতরাং যতক্ষণ ওয়াক্ত বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ হুকুম বিদ্যমান থাকবে।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলীল এই যে, বিপরীত অবস্থা সত্ত্বেও তাহারাতের গ্রহণযোগ্যতা হচ্ছে সালাত আদায়ের প্রয়োজনে, আর ওয়াকতের আগে সে প্রয়োজন নেই। সুতরাং ওয়াকতের আগের তাহারাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলীল এই যে, প্রয়োজন ওয়াকতের সাথে সীমিত। সুতরাং ওয়াকতের পূর্বে ও পরে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রা.)-এর দলীল হলো; ওয়াকতের আগে তাহারাত অর্জন করা জরুরী, যাতে সময় হওয়া মাত্র সালাত আদায় করতে সক্ষম হয়। আর ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া প্রয়োজন শেষ হওয়ার প্রমাণ। সুতরাং ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর পূর্ববর্তী হাদাছের ক্রিয়া প্রকাশ পাবে।

এখানে ওয়াক্ত দ্বারা ফরয সালাতের ওয়াক্ত উদ্দেশ্য। সুতরাং মা'যূর ব্যক্তি যদি ঈদের সালাতের জন্য উযূ করে থাকে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উক্ত উযূ দ্বারা সে যুহরের সালাত আদায় করতে পারবে। এটিই বিশুদ্ধ মত। কেননা, ঈদের সালাত চাশতের সালাতের ন্যায়।

আর কেউ যদি একবার যুহরের ওয়াকতে যুহরের সালাতের জন্য উযূ করে আর যুহরের সময় থাকতে আরেকবার আসরের সালাতের জন্য উযূ করে, তাহলে ইমামদ্বয়ের মতে সে উযূ দ্বারা সে আসরের সালাত আদায় করতে পারবে না। কেননা, ফরয সালাতের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার কারণে তার উযূ ভেংগে গিয়েছে।

মুসতাহাযা হচ্ছে ঐ স্ত্রীলোক যার উপর দিয়ে সালাতের পূর্ণ ওয়াক্ত হাদাছ আক্রান্ত অবস্থা ছাড়া অতিক্রান্ত হয় না। মুসতাহাযার সমগোত্রীয় অন্যান্য মা'যূরদেরও একই হুকুম অর্থাৎ যাদের আলোচনা পূর্বে আমরা করেছি। আর বিরামহীন দাস্ত ও বাতকর্মের রোগীরও ঐ হুকুম। কেননা, এ সকল ওযর দ্বারা প্রয়োজন সাব্যস্ত হয় আর প্রয়োজনই সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত।

পরিচ্ছেদ ঃ নিফাস সম্বন্ধে

নিফাস হচ্ছে প্রসব পরবর্তী সময়ে নির্গত রক্তস্রাব। কেননা, শব্দটি হয় تنفس الرحم بالدم (জরায়ু রক্ত ত্যাগ করেছে) থেকে কিংবা خروج النفس (সন্তান বের হওয়া) থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে; অথবা (نفس)-এর অর্থ রক্ত।

গর্ভবতী প্রসব-পূর্ব সময়ে কিংবা প্রসবকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে যে রক্ত দেখতে পায়, তা ইসতিহাযা, যদিও তা দীর্ঘ সময় প্রবাহিত হয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) নিফাসের উপর কিয়াসের করে এটাকে হায়য বলেন। কেননা- উভয় রক্তই জরায়ু থেকে নির্গত হয়।

আর আমাদের দলীল হল, প্রাকৃতিক নিয়মে গর্ভসঞ্চার দ্বারা জরায়ুর মুখ বন্ধ হয়ে যায়। আর নিফাস হয়ে থাকে সন্তান নির্গমনের মাধ্যমে জরায়ু-মুখ উন্মুক্ত হওয়ার পরে। এজন্যই ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর বর্ণনা মতে সন্তান আংশিক বের হয়ে আসার পর নির্গত রক্ত নিফাস রূপে গণ্য। কেননা জরায়ু-মুখ উন্মুক্ত হওয়ার ফলে তা রক্ত ত্যাগ করে।

গর্ভপাতিত শিশু যা আংশিক আকৃতি স্পষ্ট হয়েছে, তা সন্তান রূপে গণ্য। সুতরাং এর মাধ্যমে স্ত্রী লোকটি নিফাসগ্রস্ত গণ্য হবে এবং দাসী উম্মু ওয়ালাদ(মনিব সন্তানের মাতা) সাব্যস্ত হবে। তদ্রূপ এ ভূমিষ্ঠ হওয়া দ্বারা ইদ্দতের সমাপ্তি হবে।

নিফাসের সর্বনিম্ন সময়ের কোন সীমা নেই। কেননা, ভূমিষ্ঠ সন্তানের অগ্রবর্তিতা স্রাব জরায়ু থেকে নির্গত হওয়ার প্রমাণ। সুতরাং সময়ের দীর্ঘতাকে প্রমাণ হিসাবে নির্ধারণ করার কোন প্রয়োজন নেই। হায়যের বিষয় এর ব্যাতিক্রম।[৮]

নিফাসের সর্বোচ্চ মুদ্দত হলো চল্লিশ দিন এবং এর অতিরিক্ত হলে ইসতিহাযা। কেননা, উম্মু সালামা (রা.) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, নবী করীম (সা.) নিফাসগ্রস্ত নারীদের জন্য চল্লিশ দিন সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। ষাটদিন ধার্য করার ব্যাপারে এ হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলীল।

রক্তস্রাব যদি চল্লিশ দিন ছাড়িয়ে যায় আর স্ত্রী লোকটি ইতোপূর্বে সন্তান প্রসব করে থাকে এবং নিফাসের ব্যাপারে তার নির্ধারিত অভ্যাস থেকে থাকে, তাহলে নিফাসকে তার অভ্যস্ত সংখ্যক দিনগুলোতে প্রত্যাবৃত্ত করা হবে। এর কারণ আমরা হায়য প্রসংগে বর্ণনা করেছি।

আর যদি তার পূর্ব অভ্যাস না থেকে থাকে তাহলে তার এই প্রথম নিফাসকে ধরা হবে চল্লিশ দিন। কেননা, উক্ত সময়কে নিফাস সাব্যস্ত করা সম্ভব।

আর যদি একই গর্ভে দুই সন্তান প্রসব করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তার নিফাস গণ্য হবে প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে। এমন কি দুই সন্তানের মাঝে চল্লিশ দিনের ব্যবধান থাকলেও। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, শেষ সন্তানটির পর থেকে।

এটি ইমাম যুফার (র.)-এরও মত। কেননা প্রথম প্রসবের পর তো সে গর্ভবতী রয়ে গেছে। সুতরাং সে নিফাসগ্রস্ত বলে গণ্য হবে না। যেমন গর্ভবতী হায়যগ্রস্ত হয় না। এ জন্যই ইজমায়ী মতে শেষ প্রসব দ্বারাই তার ইদ্দত শেষ হবে।

বড় ইমামদ্বয়ের দলীল হল, আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, গর্ভবতী ঋতুগ্রস্ত হয় না জরায়ুর মুখ বন্ধ থাকার কারণে। আর সেটা তো প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই উন্মুক্ত হয়ে গেছে এবং রক্তক্ষরণ শুরু করেছে, সুতরাং তা নিফাস রূপেই গণ্য হবে। পক্ষান্তরে ইদ্দতের সম্পর্ক হলো তার সাথে সম্পর্কিত গর্ভের সাথে। সুতরাং গর্ভ শব্দটি সমগ্রকেই অন্তর্ভুক্ত করবে।[৯]

---

৮. অর্থাৎ হায়যের ক্ষেত্রে সময়ের প্রলম্বনকে শর্ত করা হয়েছিলো, যাতে বোঝা যায় যে, এটা জরায়ু থেকে নির্গত। কেননা, এ ক্ষেত্রে অন্য কোন প্রমাণ বিদ্যমান ছিলো না।

৯. কেননা, আয়াতে ইরশাদ হয়েছে : أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ এখানে حمل বা গর্ভকে গর্ভবতীদের দিকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর حمل বা গর্ভ বলা হয় জরায়ুতে বিদ্যমান সমগ্র ভ্রূণকে। সুতরাং ঐ সমগ্রের প্রসব ছাড়া ইদ্দত শেষ হবে না।

বিভিন্ন নাজাসাত ও তা থেকে পবিত্রতা অর্জন

মুসল্লীর শরীর, তার কাপড় এবং সালাত আদায়ের স্থান নাজাসাত থেকে পবিত্র করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ –তোমার বস্ত্রাদি পবিত্র করো।

এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَلَا يَضُرُّكِ اَثَرُهُ প্রথমে তা চেঁছে নাও। তারপর রগড়িয়ে নাও, তারপর পানি দ্বারা তা ধুয়ে নাও। তার দাগ থেকে গেলে তোমার ক্ষতি হবে না।

কাপড়ের ক্ষেত্রে যখন পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব, তখন শরীর ও স্থানের ক্ষেত্রেও তা ওয়াজিব হবে। কেননা সালাতের অবস্থায় সবগুলো ব্যবহারে আসছে।

নাজাসাত থেকে পবিত্রতা অর্জন জাইয হবে পানি দ্বারা, এমন সকল তরল পদার্থ দ্বারা, যার মধ্য নাজাসাত দূর করা সম্ভব। যেমন সিরকা গোলাব জল ইত্যাদি, যা নিংড়ালে নিংড়ে পড়ে।

এটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফের মত। আর ইমাম মুহাম্মদ, যুফার ও শাফিঈ (র.) বলেন, পানি ছাড়া জাইয হবে না। কেননা প্রথম স্পর্শেই তা নাপাক হয়ে যায়. আর নাপাক জিনিসে পবিত্রতা অর্জন হয় না; তবে পানির ক্ষেত্রে প্রয়োজনবশতঃ এই কিয়াস পরিহার করা হয়েছে।

বড় ইমামদ্বয়ের দলীল এই যে, তরল পদার্থ বিদূরণকারী। আর বিদূরণ ও পরিষ্করণের কারণেই তাহারাত অর্জিত হয়। আর মিশ্রিত হওয়ার কারণে নাপাকীর হুকুম আসে। সুতরাং নাজাসাতের অংশগুলো যখন কোষ হয়ে যাবে তখন তা পবিত্র থেকে যাবে।

কুদূরীর বক্তব্যে কাপড় ও শরীরের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয় নি। তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত দু'টি রিওয়ায়াতের একটি। আর ইমাম আবূ ইউসুফের রিওয়ায়াত মতে উভয়ের মাঝে তিনি পার্থক্য করেছেন। অর্থাৎ শরীরের ক্ষেত্রে পানি ছাড়া জাইয বলেননি।

মোজাতে যদি স্থূলশরীর বিশিষ্ট কোন নাজাসাত লাগে, যেমন গোবর, পায়খানা, রক্ত ও বীর্য আর তা শুকিয়ে যায় এরপর তা মাটি দ্বারা ঘষে নেয়। তাহলে জাইয হবে।

এটা সূক্ষ্ম কিয়াস। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জাইয হবে না। এ-ই হলো সাধারণ কিয়াসের চাহিদা। তবে বিশেষভাবে শুক্র ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কেননা মোজাতে যা প্রবেশ করে, তাকে তো শুষ্কতা ও ঘসা দ্বারা দূর করতে পারে না। শুক্র এর ব্যতিক্রম। এ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো।

বড় ইমামদ্বয়ের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

فَانْ كَانَ بِهَا اَذًى فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْاَرْضِ فَانَّ الْاَرْضَ لَهَا طَهُوْرٌ –যদি মোজাদ্বয়ে কোন নাপাকি থাকে তা হলে উভয় দিকে মাটি দ্বারা মুছে ফেলবে। কেননা মাটি মোজাদ্বয়ের জন্য পবিত্রকারী।

তাছাড়া চামড়া শক্ত হওয়ার দরুন তাতে নাজাসাতের খুব সামান্য অংশই ঢুকতে পারে। পরে স্থূল নাজাসাত যখন শুকিয়ে যায়, তখন সেই আর্দ্রতাও শুষে নেয়। সুতরাং যখন স্থূল নাজাসাত দূর হবে। তখন তার সাথে যুক্ত সে আর্দ্রতাও দূর হয়ে যাবে।

ভিজা নাজাসাতের ক্ষেত্রে ধোয়া ছাড়া জাইয হবে না। কেননা মাটি দিয়ে নাজাসাত প্রসারিত করবে, তা পাক করবে না।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি তা মাটি দিয়ে এমনভাবে মুছে যে, নাজাসাতের চিহ্নই অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে তা পাক হয়ে যাবে। কারণ, এ ধরনের ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটে থাকে আর উল্লিখিত হাদীছে শর্ত আরোপ করা হয়নি। আর এ মতের উপর আমাদের ফকীহ্গণের ফ‌তওয়া রয়েছে।

আর যদি মোজায় পেশাব লাগে এবং শুকিয়ে যায় তাহলে তা ধোয়া ছাড়া জাইয হবে না। অদ্রূপ ঐ সমস্ত নাজাসাত, যার স্থূলতা নেই– যেমন, মদ। কেননা, নাজাসাতের অংশ মোজাতে শোষিত হয়ে যায়। আর তা চুষে তুলে আনার মত কোন চোষণকারী নেই। কারো কারো মতে তার সাথে লেগে থাকা ধূলা তার স্থূলতা হিসাবে গণ্য।

কাপড় শুকিয়ে গেলেও ধোয়া ছাড়া যথেষ্ট হবে না। কেননা, কাপড় ফাঁক ফাঁক হওয়ার কারণে তাতে নাজাসাতের অংশ অধিক পরিমাণে প্রবেশ করে। সুতরাং ধোয়া ছাড়া তা বের হবে না।

শুক্র নাপাক; আর্দ্র অবস্থায় তা ধোয়া ওয়াজিব। যদি কাপড়ে শুকিয়ে যায় তাহলে রগড়িয়ে ফেললেও যথেষ্ট হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ‘আইশা (রা.)-কে বলেছেন ঃ فَاغْسِلِيهِ اِنْ كَانَ رَطْبًا وَافْرُكِيهِ اِنْ كَانَ يَابِسًا –আর্দ্র হলে তা ধুয়ে ফেলো আর শুষ্ক হলে তা রগড়িয়ে ফেলো।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, শুক্র পাক; আমাদের বর্ণিত হাদীছ তাঁর বিপক্ষে দলীল।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, পাঁচটি জিনিস থেকে কাপড় ধুইয়ে নিতে হয়। তার মধ্যে তিনি শুক্রও উল্লেখ করেছেন।

শুক্র যদি শরীরে লাগে তাহলে আমাদের মাশায়েখগণ[১] বলেছেন, রগড়ালে তা পাক হয়ে যাবে। কেননা এ ধরনের ঘটনা আরো অধিক ব্যাপক।

১. আমু দরিয়ার পশ্চাদ-অঞ্চলের আলিমগণ।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ধোয়া ছাড়া তা পাক হবে না। কেননা, শরীরের তাপ তা শোষণ করে নেয়। সুতরাং শোষিত অংশ শুষ্ক স্থলে ফিরে আসবে না। আর শরীরকে তো রগড়ানো সম্ভব নয়।[২]

আয়না, তলোয়ার ইত্যাদিতে যদি নাজাসাত লেগে থাকে, তাহলে তা মুছে ফেলাই যথেষ্ট। কেননা নাজাসাত তাতে প্রবিষ্ট হয় না। আর তার উপরাংশে যা আছে, তা মোছার মাধ্যমেই বিদূরিত হয়ে যায়।

মাটিতে নাজাসাত লাগাবার পর যদি সে মাটি রোদের তাপে শুকিয়ে যায় এবং তার চিহ্ন চলে যায় তাহলে উক্ত স্থানে সালাত আদায় করা জাইয হবে।

ইমাম যুফার ও শাফিঈ (র.) বলেন, জাইয হবে না। কেননা, নাজাসাত দূরকারী কিছু পাওয়া যায়নি। এ জন্যই তো ঐ মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জাইয নয়।

আমাদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ زَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا –শুষ্কতাই হলো ভূমির পবিত্রতা।

তবে তায়াম্মুম জাইয না হওয়ার কারণ এই যে, কিতাবুল্লাহ্র বাণী দ্বারা মাটির পবিত্রতার শর্ত সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং হাদীছ দ্বারা যে মাটির পবিত্রতা প্রমাণিত হয়েছে, তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হবে না।

রক্ত, পেশাব, মদ, মুরগীর পায়খানা, গাধার পেশাব ইত্যাদি গলীয নাজাসাত পরিমাণে এক দিরহাম বা তার কম হলে তা সহ সালাত জাইয হবে। কিন্তু এর বেশী হলে জাইয হবে না।

ইমাম যুফার ও শাফিঈ (র.) বলেন, অল্প নাজাসাত ও অধিক নাজাসাত সমান। কেননা পবিত্রতা ওয়াজিবকারী শরীআতের বাণী কোন পার্থক্য করেনি।

আমাদের দলীল এই যে, অল্প পরিমাণ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং তা ক্ষমাই।[৩] আর মল নির্গমন স্থলের উপর ভিত্তি করে দিরহামের পরিমাণ দ্বারা আমরা স্বল্পতার পরিমাণ নির্ধারণ করেছি।[৪]

বিশুদ্ধ মতে দিরহামের হিসাব করা হয়েছে আয়তনের দিক থেকে। অর্থাৎ হাতের তালুর মধ্যভাগ পরিমাণ। তবে ওযনের দিক থেকে বিবেচনা করার কথাও বর্ণিত আছে। অর্থাৎ বড় দিরহাম, যার ওজন এক মিছকাল (প্রায় পঁচাশি গ্রাম)। উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান প্রসংগে বলা হয়েছে যে, প্রথমটি হলো তরল নাজাসাতের ক্ষেত্রে আর দ্বিতীয়টি হলো গাঢ় নাজাসাতের ক্ষেত্রে।

---

২. এখানে আপত্তি আছে। কেননা, শরীরের উপর বিদ্যমান নাজাসাত রগড়িয়ে ফেলে দেওয়া সম্ভব। স্বয়ং শরীর রগড়ানোর প্রশ্ন অবান্তর।

৩. কেননা ইব্‌ন উমর (রা.) এ রকম ফাতওয়া দিয়েছেন, (নিহায়াহ)।

৪. অর্থাৎ এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, পাথর দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা যথেষ্ট অথচ তাতে নাজাসাত সমূলে বিদূরিত হয় না। এ জন্য অল্প পানিতে বসলে পানি নাপাক হয়ে যায়। সুতরাং বুঝা গেল যে, অতটুকু পরিমাণ মা'ফ ধরা হয়েছে।

এ জিনিসগুলোর গলিজ নাজাসাত হওয়ার কারণ এই যে, তা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর নাজাসাত যদি লঘু হয়, যেমন হালাল পশুর পেশাব, তাহলে কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ হওয়া পর্যন্ত তা নিয়ে সালাত জাইয হবে।

তা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত। কেননা, এ ক্ষেত্রে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় 'অনেক বেশী' দ্বারা আর কতিপয় বিধানের ক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশকে সমগ্রের সহিত সংযুক্ত করা হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, সালাত জাইয হওয়ার সর্বনিম্ন পরিমাণ কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ। যেমন, লুংগী।

কোন কোন মতে কাপড়ের যে অংশে নাজাসাত লেগেছে, তার এক-চতুর্থাংশ। যেমন, আঁচল, কলি।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে 'এক বর্গ বিঘত' পরিমাণ হলে সালাত জাইয হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এর নাপাকি লঘু হওয়ার কারণ হলো এর নাপাকী সম্পর্কে মতভেদ থাকা, কিংবা দুই হাদীছের বিপরীতমুখী হওয়া। দুই নীতির ভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে।[৫]

ঘোড়ার বা গরুর গোবর যদি এক দিরহামের বেশী কাপড়ে লেগে যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ঐ কাপড়ে নামায জাইয হবে না। কেননা গোবরের নাপাকী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছের সাথে অন্য কোন হাদীছের বিরোধ নেই। হাদীছটি এই যে, নবী (স.) এক খণ্ড গোবর ছুঁড়ে ফেলে বলেছিলেন ঃ هذا رجس او ركس (بخارى) (এটা নাপাকী)। আর ইমাম সাহেবের মতে এতেই গলীয নাজাসাত প্রমাণিত হয়। আর বাণী বিরোধ দ্বারা লঘুত্ব প্রমাণিত হয়।

সাহেবাইন বলেন, অনেক বেশী পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত জাইয হবে। কেননা এ বিষয়ে ইজতিহাদের অবকাশ আছে, আর তাঁদের মতে এতেই লঘুত্ব প্রমাণিত হয়।

তাছাড়া রাস্তাঘাট গোবর ভরা থাকার কারণে তাতে (সম্পৃক্ত হওয়ার) প্রয়োজন রয়েছে। আর লঘুত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োজনের প্রভাব স্বীকৃত। গাধার পেশাবের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা ভূমি তা শুষে নেয়। (সুতরাং তাতে প্রয়োজন নেই।)

আমরা বলি, প্রয়োজন (মূলতঃ) জুতার মধ্যে। আর হুকুম লঘু হওয়ার ব্যাপারে একবার তা ভূমিকা রেখেছে। সুতরাং মুছে নিলেই পাক হয়ে যায়। এতেই প্রয়োজনের দাবী পূর্ণ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে হালাল পশু ও হারাম পশুর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু ইমাম যুফার (র.) উভয়ের মাঝে পার্থক্য করেছেন। অর্থাৎ হারাম পশুর ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে একমত পোষণ করেছেন এবং হালাল পশুর ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন।

---

৫. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মূলনীতি হলো, শরীআতের দু'টি বাণীর মাঝে বিরোধ দেখা দিলে বিধানটি লঘু হয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফের মূলনীতি হলো মুজতাহিদদের পরস্পর মতভেদ।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন 'রায়' শহরে প্রবেশ করলেন এবং ব্যাপকভাবে লিপ্ততা দেখতে পেলেন, তখন তিনি 'অনেক বেশী' পরিমাণও সালাত আদায়ে বাধা হবে না বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। মাশায়েখগণ এর উপর বুখারার (গোবর মিশ্রিত) কাদা মাটিকে কিয়াস করেছেন।[৬] এখান থেকে মোজার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.) পূর্ব শর্ত প্রত্যাহার করেছেন বলে বর্ণনা করা হয়।[৭]

যদি কাপড়ে ঘোড়ার পেশাব লেগে যায় তাহলে আবূ হানীফা (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বেশী পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত তা কাপড় নষ্ট করবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বেশী পরিমাণ হলেও তা (সালাত আদায়ে) বাধা সৃষ্টি করবে না।

কেননা, তার মতে হালাল পশুর পেশাব পাক। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা লঘু নাজাসাত। আর উভয়ের মতে তার গোশত হালাল। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দৃষ্টিতে তাতে লঘুত্ব এসেছে হাদীছের পরস্পর বিরোধের কারণে।

হারাম পাখীর পায়খানা যদি কাপড়ে দিরহাম পরিমাণের বেশী লেগে যায় তাহলে আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তাতে সালাত জাইয হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জাইয হবে না।

কারো কারো মতে এ মতপার্থক্য হলো নাজাসাতের ব্যাপারে[৮] আর কারো কারো মতে পরিমাণের ব্যাপারে।[৯] এটাই বিশুদ্ধতম মত।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) যুক্তি দিয়ে বলেন, লঘুত্ব আরোপ করা হয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে। কিন্তু সাধারণত এদের সাথে মেলামেশা না থাকার কারণে এখানে প্রয়োজন নেই। সুতরাং লঘুত্ব আরোপিত হবে না।

শায়খাইনের যুক্তি এই যে, পাখীরা শূন্য থেকে বিষ্ঠা ত্যাগ করে। আর তা থেকে বেঁচে থাকা দুষ্কর। সুতরাং এ প্রেক্ষিতে প্রয়োজন সাব্যস্ত হয়েছে। যদি তা (হারাম পাখীর পায়খানা) পাত্রে পড়ে, তাহলে কোন কোন মতে তা পাত্রকে নষ্ট করে দিবে। আর কোন কোন মতে নষ্ট করবে না। কেননা পাত্রাদি তা থেকে রক্ষা করা দুষ্কর।

যদি কাপড়ে মাছের রক্ত বা গাধা ও খচ্চরের লালা দিরহামের বেশী পরিমাণও লেগে যায়, তাহলে তাতে সালাত দুরস্ত হবে।

---

৬. অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উপরোক্ত ফাতওয়ার ভিত্তিতে তারা বলেছেন, বুখারা কাদা মাটি প্রচুর পরিমাণে লাগলেও নামাযে অসুবিধা হবে না। যদিও তা গোবর মিশ্রিত, কেননা এটা এমন ব্যাপক সমস্যা, যা থেকে বেঁচে থাকার উপায় নেই।

৭. অর্থাৎ মোজা সম্পর্কে তার প্রসিদ্ধ মত ছিলো এই যে, তা মাটিতে ঘষে নিলে পাক হবে না। তাতে প্রমাণিত হয় যে, গোবর তার দৃষ্টিতে নাপাক। কিন্তু রায় শহরের ফাতওয়া থেকে মনে হয়, তিনি তার মত পরিবর্তন করে এটাকে পাক সাব্যস্ত করেছেন।

৮. শায়খাইনের মতে উক্ত পাখীর পায়খানা পাক; আর ইমাম মুহাম্মদের মতে নাপাক।

৯. অর্থাৎ সকলের মতেই তা নাপাক, তবে আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা লঘু নাপাক, পক্ষান্তরে অন্য দুই ইমামের মতে গলীয নাপাক।

মাছের রক্তের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে তা রক্তই নয়। সুতরাং তা নাপাক হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক্ষেত্রে তিনি অত্যধিক পরিমাণের উপর নির্ভর করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এটাকে তিনি নাজাসাত গণ্য করেছেন।

গাধা ও খচ্চরের লালা সম্পর্কে কারণ এই যে, তা নাপাক হওয়ার ব্যাপারেই সন্দেহ রয়েছে। সুতরাং কোন পাক বস্তু তা দ্বারা নাপাক হতে পারে না।

যদি কাপড়ে সূঁচের মাথার মতো পেশাবের ছিটা এসে পড়ে তাহলে তা ধর্তব্য নয়। কেননা, তা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

নাজাসাত দু'প্রকার ঃ দৃশ্য ও অদৃশ্য[১০] *সুতরাং যে নাজাসাত দৃশ্য হয়, তা থেকে পবিত্রতা অর্জিত হবে নাজাসাতের মূল পদার্থ দূর হওয়া দ্বারা।* কেননা নাজাসাত সত্তাগতভাবে স্থানটিতে প্রবেশ করেছে। সুতরাং তার সত্তা দূর হলে নাজাসাত বিদূরিত হবে। তবে দূর করা কষ্টকর, এমন দাগ থেকে গেলে দোষ নেই। কেননা, (শরীআতে) কষ্ট থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে।

এ হুকুম ইংগিত করে যে, একবার ধোয়ার দ্বারাও যদি নাপাক পদার্থ দূর হয়ে যায় তাহলে পুনরায় ধোয়ার (তিনবার ধোয়ার) শর্ত নেই। অবশ্য এ সম্পর্কে (মাশায়েখদের) মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

আর যে নাজাসাত দৃশ্য নয় (যেমন, পেশাব ও মদ), তা থেকে তাহারাতের উপায় হলো এমনভাবে ধোয়া, যাতে ধৌতকারীর প্রবল ধারণা হয় যে, তা পাক হয়ে গেছে। কেননা নাপাকির নিষ্কাশনের জন্য (ধোয়ার ক্ষেত্রে) বারংবারতা অপরিহার্য। আর নাজাসাত দূরীভূত হওয়ার নিশ্চয়তা লাভ সম্ভব নয়। সুতরাং প্রবল ধারণাই হবে বিবেচ্য যেমন কিবলার মাসআলায় রয়েছে।[১১]

ফকীহ্গণ তিন বারের সীমা নির্ধারণ করেছেন এ কারণে যে, তাতে (নিষ্কাশনের) প্রবল ধারণা লাভ হয়ে থাকে। সুতরাং সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রকাশ্য কারণকে প্রবল ধারণার স্থলবর্তী করা হয়েছে। নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া সংক্রান্ত হাদীছ দ্বারা এ মতামতের সমর্থন পাওয়া যায়।[১২] যাহিরী বর্ণনা মতে প্রতিবার ধোয়ার পর নিংড়ানো জরুরী। কেননা নিংড়ানোই (নাজাসাত) নিষ্কাশনকারী।

---

১০. অর্থাৎ শুকিয়ে যাবার পর যে নাজাসাতের পদার্থ দেখা যায়, তা দৃশ্য নাজাসাত, যেমন পায়খানা। আর যা দেখা যায় না, তা অদৃশ্য নাজাসাত, যেমন, পেশাব।

১১. অর্থাৎ যদি কেবলা না জানা থাকে এবং জিজ্ঞাসা করার মত উপযুক্ত লোকও না থাকে তাহলে নিজস্ব প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে কেবলা নির্ধারণ করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

১২. কেননা তাতে তিনবার হাত ধোয়ার কথা রয়েছে।

পরিচ্ছেদ ঃ ইসতিনজা[১৩]

ইসতিনজা হলো সুন্নত। কেননা নবী কারীম (সা.) তা সর্বদা করেছেন। আর তাতে পাথর ও এর গুণের স্থলবর্তী জিনিস ব্যবহার করা জাইয আছে। এর দ্বারা মুছে ফেলবে যাতে নাজাসাতের স্থানটি পরিষ্কার হয়ে যায়। কেননা পরিষ্কার হওয়াই হলো মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং যা মূল উদ্দেশ্য, সেটাই বিবেচ্য হবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তিন সংখ্যা হওয়া জরুরী। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ وليستنج منكم بثلثة احجاد (البيهقى) –তোমাদের প্রত্যেকে যেন তিনটি পাথর দ্বারা ইসতিনজা করে।

আমাদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَحَسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ (ابو داود وابن ماجة)

–যে ব্যক্তি ইস্তিন্জায় পাথর ব্যবহার করবে, সে যেন বেজোড় (অর্থাৎ তিন) সংখ্যা ব্যবহার করে। যে তা করলো, সে ভাল করলো। আর যে করল না, তার কোন ক্ষতি নেই।

শাফিঈ (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তার বাহ্যিক অর্থ বর্জন করা হয়েছে। কেননা কেউ তিনকোণ বিশিষ্ট একটি পাথর ব্যবহার করলে সর্বসম্মতিক্রমেই তা যথেষ্ট হবে।[১৪]

(পাথর বা ঢেলা ব্যবহার করার পর) পানি ব্যবহার করা উত্তম। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَتَطَهَّرُوْا –সেখানে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা উত্তমভাবে তাহারাত লাভ করা পছন্দ করে।

আলোচ্য আয়াত ঐ লোকদের শানে নাযিল হয়েছিলো, যারা পাথর ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করতো।

মোটকথা পানি ব্যবহার করা ইসতিনজার আদব। কারো কারো মতে আমাদের যুগে এটা সুন্নত। আর পানি ততক্ষণ ব্যবহার করতো, যতক্ষণ তার প্রবল ধারণা হয় যে, তা পাক হয়ে গেছে। 'কতবার হবে' তা নির্ধারণ করা হয়নি। তবে কেউ খুঁতখুঁতে স্বভাবের হলে তার ক্ষেত্রে তিনবার এবং মতান্তরে সাতবার নির্ধারণ করা হবে।

নাজাসাত যদি নির্গমন স্থান থেকে ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে পানি ছাড়া যথেষ্ট হবে না। কুদূরীর কোন কোন সংস্করণে الا الماء এর পরিবর্তে الا المائع রয়েছে। অর্থাৎ তরল পদার্থ ছাড়া যথেষ্ট হবে না। উভয় নুসখার এ পার্থক্য পানি ছাড়া (অন্য তরল পদার্থ দ্বারা) অংগ পাক করার ক্ষেত্রে ভিন্ন দু'টি মত থাকা প্রমাণ করে।

পানি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এ জন্য যে, শুধু মোছা (নাজাসাত) দূরীভূত করে না। তবুও নাজাসাতের নির্গমন স্থানের ক্ষেত্রে (প্রয়োজনের পেক্ষিতে) সেটাকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত হুকুমকে অন্যত্র প্রলম্বিত করা যাবে না।

---

১৩. ইসতিনজা অর্থ পেশাব, পায়খানার পর নাজাসাতের স্থান পরিষ্কার কর।

১৪. সুতরাং বোঝা গেল যে, তিন সংখ্যা আসলে উদ্দেশ্য নয়।

আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে নাজাসাতের মূল স্থান বাদ দিয়ে নামাযে বাধাদানকারী পরিমাণ বিবেচনা করা হবে।[১৫] কেননা (শরীআতের বিধান মতেই) উক্ত স্থান ধর্তব্য হওয়া রহিত হয়ে গেছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে অন্য সকল স্থানের উপর কিয়াস করে এখানেও নাজাসাতের স্থানসহ হিসাব করা হবে।

হাড়, ও শুকনো গোবর দ্বারা ইসতিনজা করবে না। কেননা, নবী করীম (সা.) তা করতে নিষেধ করেছেন। আর যদি কেউ তা করে, তাহলে মূল উদ্দেশ্য হাছিল হওয়ার কারণে জাইয হয়ে যাবে। গোবরের ক্ষেত্রে নিষেধের কারণ তা নাপাক হওয়া। আর হাড়ের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, তা জিন জাতির খাদ্য।

খাদ্যদ্রব্য দ্বারাও ইসতিনজা করবে না। কেননা এটা খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করা এবং অপচয়ের শামিল।

ডান হাতেও ইসতিনজা করবে না। কেননা নবী করীম (সা.) ডান হাতে ইসতিনজা করতে নিষেধ করেছেন।

১৫. এক দিরহামের পরিমাণ হলে তা নামাযের জন্য বাধাদানকারী হয়। তবে তাদের মতে নাজাসাতের মূল স্থানকে হিসাবে থেকে বাদ দেয়া হবে।

كِتَابُ الصَّلَواةِ

অধ্যায় ঃ সালাত

প্রথম অনুচ্ছেদ

সালাতের সময়সমূহ

ভোরের দ্বিতীয় আলো যখন উদিত হয়, আর দ্বিতীয় আলো হলো যা দিগন্তে বিস্তৃত হয়, আর তার শেষ সময় হলো যতক্ষণ না সূর্য উদিত হয়। কেননা হযরত জিবরীল (আ.) ইমামতি সম্পর্কিত হাদীছে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রথম দিন ফজরের নামাযে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইমাম হয়ে সালাত আদায় করেন যখন আলো উদ্ভাসিত হয়। আর দ্বিতীয় দিন (সালাত আদায় করেন) যখন খুব ফরসা হয়ে গেলো, এমন কি সূর্য উদিত হওয়ার উপক্রম হল। হাদীছের শেষে রয়েছে– এরপর হযরত জিবরীল (আ.) বললেন ঃ مَابَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ لَكَ وَلِأُمَّتِكَ –এ দুই সময়ের মধ্যবর্তী সময়টি হলো আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য সময়।

الفجر الكاذب ধর্তব্য নয়। ফজরুল কাযিব হচ্ছে লম্বা-লম্বিতে উদ্ভাসিত আলো, যার পর অন্ধকার থেকে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলছেন ঃ

لَايَغُرَّنَّكُمْ اَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرِ الْمُسْتَطِيْلُ وَاِنَّمَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْرُ فِى الْاُفُقِ

–বিলালের আযান যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে। তদ্রূপ লম্বালম্বি আলো (যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে।) দিগন্তে উদ্ভাসিত অর্থাৎ বিস্তৃত আলোই হলো ফজরের সময়।

যুহরের প্রথম সময় হলো যখন সূর্য হেলে পড়ে। কেননা জিবরীল (আ.) প্রথম দিন সূর্য হেলে পড়ার সময় ইমামতি করেছেন।

আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যুহরের শেষ সময় হলো যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া মধ্যাহ্ন ছায়ার বাদ দিয়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় ইমামদ্বয় বলেন, যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার সমান হয়। ইহাও ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত, আরেকটি মত।

فى الزوال (মধ্যাহ্ন ছায়া) হলো ঠিক মধ্যাহ্নকালে কোন বস্তুর যে ছায়া হয়, তাই। দ্বিতীয় ইমামদ্বয়ের দলীল এই যে, জিব্রীল (আ.) প্রথম দিন এ সময় আসরের ইমামতি করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

اَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

–যুহরকে তোমরা শীতল করে পড়ো।[১] কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের তীব্রতা থেকেই আসছে।

আর আরব দেশে (প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমান হওয়ায়) এ সময়টাতেই গরম প্রচণ্ডতম হয়। সুতরাং হাদীছ যখন পরস্পর বিরোধপূর্ণ হলো তখন সন্দেহবশতঃ সময় শেষ হবে না।

---

১. অর্থাৎ রোদের প্রখরতা হ্রাস পেলে তখন যুহর পড়বে।

আসরের প্রথম সময় হলো যখন উভয় মত অনুসারে যুহরের সময় পার হয়ে যায়। আর তার শেষ সময় হলো যতক্ষণ না সূর্য ডুবে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا –যে ব্যক্তি সূর্য অস্তের আগে আসরের এক রাকাআত পেয়ে গেল, সে আসরের সালাত পেয়ে গেলো।

মাগরিবের প্রথম সময় হলো সূর্য যখন ডুবে যায় এবং তার শেষ সময় হলো যতক্ষণ না شَفَقْ অদৃশ্য হয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তিন রাকাআত পড়ার পরিমাণ সময় হলো মাগরিবের সময়। কেননা জিবরীল (আ.) দু'দিন একই সময়ে মাগরিবের ইমামতি করেছেন।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

أَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغْرِبُ الشَّمْسُ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا حِيْنَ تَغِيْبُ الشَّفَقُ –মাগরিবের প্রথম সময় হলো যখন সূর্য ডুবে এবং তার শেষ সময় হলো যখন شفق অদৃশ্য হয়।

ইমাম শাফিঈ (র.)-কে হাদীছ প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেছেন, তাতে বিলম্ব না করার কারণ হল মাকরূহ থেকে বেঁচে থাকা। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর شفق অর্থ দিগন্তের ফরসা আলো, যার লালিমা পরে দেখা দেয়। পক্ষান্তরে ইমাম ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে লালিমাটিই হল شفق। এরই অনুরূপ একটি বর্ণনা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও পাওয়া যায়। আর এ-ই হল ইমাম শাফিঈ (র.)-এরও (পূর্ববর্তী) অভিমত। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ اَلشَّفَقُ الْحُمْرَةُ –শাফাক হলো দিগন্ত লালিমা।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিম্নোক্ত বাণী ঃ وَاٰخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ اِذَا اَسْوَدَّ الْاُفُقُ –মাগরিবের শেষ সময় হলো, যখন দিগন্ত কালো হয়ে যায়।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বর্ণিত হাদীছটি ইব্‌ন উমর (রা.)-এর উপর মওকুফ ইমাম মালিক মু'আত্তা গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন, আর এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

'ঈশার প্রথম সময় হলো যখন شفق অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তার শেষ সময় হলো যতক্ষণ না ফজর (সুবহি সাদিক) উদিত হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ وَاٰخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِيْنَ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ 'ঈশার শেষ সময় হলো যতক্ষণ না ফজর উদিত হয়। রাত্রের তৃতীয়াংশ অতিক্রান্তি দ্বারা ঈশার শেষ সময় নির্ধারণের ব্যাপারে এ হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলীল।

বিতরের প্রথম সময় হলো 'ঈশার পরে এবং তার শেষ সময় হলো যতক্ষণ না ফজর উদিত হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিতর সম্পর্কে বলেছেন ঃ فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ –'ঈশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে তোমরা তা আদায় কর।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা সাহেবাইনের মত। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে 'ঈশার সময়ই হচ্ছে বিতরের সময়। তবে তারতীব ওয়াজিব হওয়ার কারণে স্মরণ থাকা অবস্থায় বিতরকে 'ঈশার আগে আদায় করা যাবে না।

পরিচ্ছেদ ঃ সালাতের মুসতাহাব ওয়াক্ত

ফজর ফরসা হওয়ার পরে আদায় করা মুসতাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ –তোমরা ফজর ফরসা হয়ে যাওয়ার পর আদায় কর। কেননা, এতেই রয়েছে অধিক সাওয়াব।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, প্রত্যেক সালাত অবিলম্বে আদায় করা মুসতাহাব। আমাদের বর্ণিত এ হাদীছ আগামীতে বর্ণিতব্য হাদীছ তাঁর বিপক্ষে দলীল।

গ্রীষ্মকালে যুহরের সালাত সূর্যের তাপ কমে আসলে এবং শীতকালে আউয়াল ওয়াকতে আদায় করা মুসতাহাব। প্রমাণ ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ। আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছ যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শীতকালে যুহর অবিলম্বে আদায় করতেন এবং গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপ কমে আসলে আদায় করতেন।

শীত-গ্রীষ্ম উভয় মৌসুমে সূর্য বিবর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আসর বিলম্ব করা মুস্তাহাব। কেননা, যেহেতু আসরের পরে নফল সালাত মাকরূহ; সুতরাং বিলম্বে আদায় অধিক নফল আদায়ের অবকাশ পাওয়া যায়। আর ধর্তব্য হলো সূর্যের গোলক বিবর্ণ হওয়া। অর্থাৎ এমন অবস্থা হওয়া, যাতে চোখ না ধাঁধায়। এই বিশুদ্ধ মত। আর এ পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরূহ।

মাগরিবের সালাত জলদি আদায় করা মুস্তাহাব। কেননা ইয়াহূদীদের সাথে সাদৃশ্য হয় বিধায় তা বিলম্ব করা মাকরূহ।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ لَا يَزَالُ أُمَّتِيْ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْمَغْرِبَ وَأَخَّرُوْا الْعِشَاءَ –আমার উম্মত যতদিন মাগরিব অবিলম্বে এবং 'ঈশা বিলম্বে আদায় করবে, ততদিন তারা কল্যাণের পথে থাকবে।

'ঈশাকে রাত্রের তৃতীয়াংশের পূর্ব পর্যন্ত বিলম্বিত করা মুস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ –যদি আমার উম্মতের উপর কষ্ট হবে মনে না করতাম তাহলে অবশ্যই আমি 'ঈশার সালাত রাত্রের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্বিত করতাম।

তাছাড়া তা, 'ঈশার পরে হাদীছে নিষিদ্ধ আলাপ-আলোচনা করা থেকে বিরত থাকার উপায়। কারো কারো মতে গ্রীষ্মকালে তাড়াতাড়ি করতে হবে, যাতে জামাআতে মুসল্লীর সংখ্যা

কমে না যায়। মধ্যরাত পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ; কেননা, মাকরূহ হওয়ার দলীল অর্থাৎ জামাআত ছোট হওয়া এবং মুস্তাহাব হওয়ার দলীল অর্থাৎ আলাপচারিতা থেকে বিরত থাকা পরস্পর বিরোধী। সুতরাং মধ্যরাত পর্যন্ত বৈধতা প্রমাণিত হবে এবং দ্বিতীয় অর্ধেক পর্যন্ত মাকরূহ হওয়া প্রমাণিত হবে। কেননা তাতে জামা'আত ছোট হয়। পক্ষান্তরে আলাপচারিতা এর আগেই বন্ধ হয়ে যায়।

তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ে অভ্যস্ত ব্যক্তির জন্য বিতরের ক্ষেত্রে রাত্রের শেষ ভাগ পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব। আর যে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চিত, সে ঘুমের আগেই বিতর আদায় করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

مَنْ خَافَ أَنْ لاَيَقُوْمَ أٰخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ أٰخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أٰخِرَ اللَّيْلِ-

–যে ব্যক্তি আশংকা করে যে, শেষ রাত্রে জাগ্রত হতে পারবে না, সে যেন (আগে-ভাগেই) বিতর আদায় করে। আর যে শেষরাত্রে জাগ্রত হওয়ার আশা করে, সে যেন শেষ রাত্রেই বিত্র আদায় করে।

মেঘলা দিন হলে ফজর, যুহর ও মাগরিব বিলম্বে আদায় করা এবং আসর ও 'ঈশা জলদি আদায় করা মুস্তাহাব। কেননা মেঘ-বৃষ্টির কারণে 'ঈশা বিলম্ব করায় জামাআত ছোট হবে। আর আসর বিলম্ব করলে মাক্রূহ ওয়াক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর ফজরে সে সম্ভাবনা নেই। কেননা সে সময় দীর্ঘ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে সতর্কতার জন্য সকল সালাতে বিলম্বের নির্দেশ বর্ণিত আছে। কেননা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে (কাযা হলেও) সালাত আদায় জাইয আছে। কিন্তু সময়ের আগে জাইয নেই।

পরিচ্ছেদ ঃ সালাতের মাকরূহ ওয়াক্ত

সূর্যোদয়ের সময়, মধ্যাহ্নে সূর্যের মধ্যাকাশে অবস্থানকালে এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত জাইয নেই। কেননা, 'উকবা ইব্ন 'আমির (রা.) বলেছেন ঃ

ثَلٰثَةُ أَوْقَاتٍ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ وَأَنْ نَقْبِرَ فِيْهَا مَوْتَانَا ، عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَعِنْدَ زَوَالِهَا حَتّٰى تَزُوْلَ وَحِيْنَ تَضَيَّفَ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرِبَ-

–তিনটি ওয়াকতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে সালাত আদায় করতে এবং আমাদের মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন ঃ সূর্যোদয় কালে, সূর্য উপরে উঠে যাওয়া পর্যন্ত; মধ্যাহ্ন কালে সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত; আর যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

তাঁর বক্তব্য وان نقبر এর উদ্দেশ্য হলো জানাযার সালাত। কেননা (ইজমা দ্বারা প্রামাণিত যে, উক্ত সময়ে) দাফন করা মাকরূহ নয়। আলোচ্য হাদীছ তার অর্থ-ব্যাপকতার কারণে ইমাম

শাফিঈ (র.)-এর বিপক্ষে প্রমাণ। ফরযসমূহ এবং মক্কাকে বিশিষ্ট করার উদ্দেশ্য[২] এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বিপক্ষে প্রমাণ জুমুআর দিন মধ্যাহ্ন কালে নফল সালাত জাইয করার উদ্দেশ্য।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *জানাযার সালাত জাইয হবে না।*

আমাদের বর্ণিত হাদীছের দলীল মুতাবিক।

সাজদায়ে তিলাওয়াতও জাইয হবে না। কেননা, তা সালাতেরই অংশ বিশেষ।

তবে সূর্যাস্তের সময় সে দিনের আসর আদায় করা যাবে। সালাত ওয়াজিব হওয়ার سبب বা হেতু হচ্ছে সময়ের সেই অংশ, যা বিদ্যমান আছে। (অর্থাৎ সালাত শুরুর পূর্ব মুহূর্ত।), কেননা سبب বা হেতুর সম্পর্ক যদি সমগ্র সময়ের সাথে হয়, তাহলে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে সালাত আদায় করা ওয়াজিব হয়।[৩] আর সময়ের বিগত অংশের সাথে যদি সম্পর্কিত হয়, তাহলে শেষ সময়ে সালাত আদায়কারী হয় সালাত কাযাকারী।[৪] বিষয়টি যখন এমনই হলো,[৫] তবে তো সে যেমন তার উপর ওয়াজিব হয়েছে, তেমনই আদায় করেছে। আর অন্যান্য সালাত এর ব্যতিক্রম। কেননা সেগুলো পূর্ণাংগ সময়ে ওয়াজিব হয়েছে, সুতরাং অপূর্ণাংগ সময়ে তা আদায় হতে পারে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, জানাযার সালাত ও তিলাওয়াতের সাজদা সম্পর্কে উল্লেখিত নাজাইযের অর্থ হলো মাকরূহ হওয়া। সুতরাং ঐ সময়ে কেউ যদি জানাযার সালাত আদায় করে কিংবা তখন সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করে উক্ত তিলাওয়াতের সাজদা করে তাহলে জাইয হবে।[৬] কেননা, যেমন নাকিস সময়ে তা ওয়াজিব হয়েছে, তেমনি নাকিস সময়ে তা আদায় করা

---

২. অর্থাৎ হাদীছে তো নিঃশর্তভাবে নামায থেকে নিষেধ করা হয়েছে ঃ নফল হোক বা ফরয হোক। অদ্রূপ মক্কা ও অন্যত্র সর্বত্রই এ নিষেধ প্রযুক্ত। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে ফরয নামায এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়, অর্থাৎ এই তিন সময়ে নফল পড়া যাবে না, ফরয পড়া যাবে। অদ্রূপ মক্কাও আলোচ্য নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ মক্কাতে উক্ত তিন সময়ে ফরযের সাথে নফলও পড়া যাবে।

৩. কেননা কার্য ও কারণের ক্ষেত্রে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, কারণের অস্তিত্ব লাভ হয় প্রথমে এবং কার্য সংঘটিত হয় তারপরে। সুতরাং সমগ্র সময়কে কারণ সাব্যস্ত করলে সমগ্র সময়ের অস্তিত্ব লাভের পরেই শুধু সালাত আদায় করা যাবে।

৪. কেননা যে সময় খণ্ডটা কারণ বা سبب ছিলো, তাতে তো সালাত আদায় করেনি, বরং সে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে এমন এক সময়ে তা আদায় করলো, যা সালাত ওয়াজিবকারী নয়, বরং সালাত ওয়াজিবকারী যে বিগত সময় খণ্ডের কারণে সালাত তার যিম্মায় ওয়াজিব হয়েছিলো, সেটাই এখন সে আদায় করছে। আর এটাই তো হলো কাযার হাকীকত।

৫. অর্থাৎ যখন এটা প্রমাণিত হলো যে, সালাত শুরুর পূর্ব মুহূর্তটি যা বর্তমান, সেটাই হচ্ছে কারণ, তাহলে তো তার আজকের আসর অপূর্ণাংগ ও নাকিস সময়েই ওয়াজিব হলো এবং নাকিছ সময়েই সে আদায় করলো।

৬. কেননা সময়ের মধ্যে আসরের সালাত যখন আদায় করা হলো না, তখন সমগ্র সময়টাই হবে কারণ। আর সমগ্র সময়টা হলো পূর্ণাংগ, সুতরাং পূর্ণাংগ সময়ের মাধ্যমে তা ফরয হয়েছে।

হয়েছে। কেননা জানাযা উপস্থিত হওয়া ও তিলাওয়াত করার মাধ্যমেই তা ওয়াজিব হয়।[৭]

ফজরের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত নফল পড়া এবং আসরের পরে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত নফল আদায় করা মাকরূহ। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) তা নিষেধ করেছেন। তবে এই দুই সময়ে কাযা সালাত ও তিলাওয়াতের সাজদা আদায় করতে পারে এবং জানাযার সালাত আদায় করতে পারে। কেননা, এই মাকরূহ হওয়া ছিলো ফরযের মর্যাদার ভিত্তিতে, যেন সম্পূর্ণ সময়টা সালাতে মশগুল-তুল্য হয়ে যায়। (এই মাকরূহত্ব) সময়ের নিজস্ব কোন প্রকৃতির কারণে নয়। সুতরাং ফরযসমূহের ক্ষেত্রে এবং যে সকল ইবাদত স্বকীয়ভাবে ওয়াজিব হয়েছে,[৮] যেমন, তিলাওয়াতের সাজদা, সেগুলোর ক্ষেত্রে সময়ের মাকরূহ হওয়ার হুকুম প্রকাশ পাবে না। আর সালাত (ও মানতকৃত নামায)এর ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পাবে। কেননা উক্ত ইবাদতে আবশ্যকতা তার নিজের পক্ষ থেকে সৃষ্ট কারণের সাথে সম্পৃক্ত।[৯] তাওয়াফের রাকাআতদ্বয়ের ক্ষেত্রেও মাকরূহ হওয়া প্রকাশ পাবে। এবং ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও মাকরূহ হওয়া প্রকাশ পাবে, যে নফল সালাত শুরু করে তা ভংগ করেছে। কেননা উক্ত সালাতের ওয়াজিব হওয়া তার নিজ কারণে নয়, অন্য কারণে। আর তা হলো তাওয়াফ খতম করা এবং শুরু করা সালাতকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা।

ফজরের উদয়ের পর ফজরের দু'রাকাআতের অধিক নফল আদায় মাকরূহ। কেননা সালাতের প্রতি আগ্রহ সত্ত্বেও উক্ত দুই রাকাআতের অতিরিক্ত কিছু নবী করীম (সা.) আদায় করেন নি।

সূর্যাস্তের পর ফরযের পূর্বে কোন নফল আদায় করবে না। কেননা তাতে মাগরিবকে বিলম্ব করা হয়।

তদ্রূপ জুমুআর দিন ইমাম যখন খুতবার জন্য (হুজ্‌রা থেকে) বের হবেন, তখন থেকে খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নফল আদায় করবে না। কেননা তাতে খুতবা শোনা থেকে অন্য-মনস্কতা হয়।

---

৭. সুতরাং মাকরূহ সময়ের আগে জানাযা হাযির হলে এবং তিলাওয়াত করলে মাকরূহ সময়ে তা আদায় করা যাবে না।

৮. অর্থাৎ যা শুরু থেকেই ওয়াজিব ছিলো, ওয়াজিব রূপেই অস্তিত্ব লাভ করেছে।

৯. কেননা এটা মূলতঃ নফল ছিলো, তার পক্ষ থেকে নযর বা মানত করার কারণেই তা ওয়াজিবরূপ লাভ করেছে।

আযান

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমুআর জন্য আযান সুন্নত, অন্য কোন সালাতের জন্য নয়। এ বিধান মুতাওয়াতির (অর্থাৎ সুপ্রচুর সংখ্যক ধারাবাহিক ও নিশ্চিত সূত্রে প্রাপ্ত) হাদীছের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

আযানের বিবরণ সুপরিচিত। অর্থাৎ আসমান থেকে অবতরণকারী ফেরেশতা যেভাবে আযান দিয়েছিলেন এবং তাতে ترجيع (বা কালিমা-ই-শাহাদতের পুনঃ উচ্চারণ) নেই। ترجيع অর্থ উভয় কালিমা-ই-শাহাদাতকে (প্রথমে দু'বার করে) অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে উচ্চারণ করার পর উচ্চস্বরে (দু'বার করে) পুনঃ উচ্চারণ করা।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, আযানে ترجيع রয়েছে। আমাদের যুক্তি এই যে, মশহূর হাদীছগুলোতে ترجيع নেই।

ইমাম শাফিঈ (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেন, তা ছিলো (কালিমা-ই-শাহাদাত) শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। সেটাকেই তিনি ترجيع ধারণা করেছেন।[১]

ফজরের আযানে **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** ***এর পরে দু'বার*** **اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ** ***যোগ করবে।*** কেননা বিলাল (রা.) একবার যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়েছিলেন, তখন اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ বলেছিলেন। তখন নবী করীম (সা.) বলেছিলেন ঃ হে বিলাল, কতনা সুন্দর কথা এটা! একে তোমার আযানের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। এর সাথে ফজরের আযানকে বিশিষ্ট করার কারণ এই যে, এটা ঘুম ও গাফলতের সময়।

ইকামাত আযানের মতো। তবে তাতে **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** ***এর পরে*** **قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ** ***দু'বার যোগ করবে।*** আসমান থেকে অবতীর্ণ ফেরেশতা এমনই করেছিলেন, এবং এ-ই মশহূর বর্ণনা– (আবূ দাঊদ)।

এ হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলীল। কেননা তিনি বলেন, ইকামাত হচ্ছে এক এক শব্দবিশিষ্ট। قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ বাক্যটি বাদে। (এটা শুধু দু'বার বলা হবে।)

আযান ধীরলয়ে থেমে থেমে উচ্চারণ করবে। আর ইকামাত না থেমে দ্রুতলয়ে উচ্চারণ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ اِذَا اَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَاِذَا اَقَمْتَ فَاحْدُرْ –যখন আযান দেবে, তখন ধীরলয়ে দেবে। আর যখন ইকামাত বলবে, তখন দ্রুতলয়ে বলবে।

---

১. ইমাম তাহাবী (র.)-এর মতে এমন হতে পারে যে, আবূ মাহযূরা (রা.) নবী (সা.) যতটা চাচ্ছিলেন, ততটা উচ্চস্বরে কালিমা-ই-শাহাদাত উচ্চারণ করেন নি। তাই তিনি তাঁকে আদেশ করেছিলেন ঃ ارجع فامدد من صوتك -পুনঃ উচ্চারণ করো এবং স্বর উচ্চ করো।

এ হলো মুস্তাহাবের বর্ণনা। আযান ও ইকামাত উভয়ই কেবলামুখী হয়ে দেবে। কেননা, আসমান থেকে অবতীর্ণ ফেরেশতা কিবলামুখী হয়ে আযান দিয়েছিলেন। তবে কেবলামুখী না হয়ে আযান দিলেও মূল উদ্দেশ্য হাছিল হওয়ার কারণে তা জাইয হবে; তবে সুন্নতের বিরোধিতা করার কারণে তা মাকরূহ হবে।

এবং حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় মুখমণ্ডলকে যথাক্রমে ডানে ও বামে ফেরাবে। কেননা তা লোকদের উদ্দেশ্যে সম্বোধন। সুতরাং তাদের দিকে মুখ করেই তাদের সম্বোধন করবে।

আর যদি আযানখানায় প্রদক্ষিণ করে, তবে তা উত্তম। একথার উদ্দেশ্য হলো মিনারা প্রশস্ত হওয়ার কারণে যদি সুন্নত মুতাবিক পদদ্বয় স্বস্থানে রেখে মুখমণ্ডল ডানে ও বামে ফেরাতে না পারে[২] কিন্তু বিনা প্রয়োজনে তা করবে না।

মুআয্যিনের জন্য উত্তম হলো তার উভয়কানে দুই আংগুল স্থাপন করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিলাল (রা.)-কে এমনই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া ঘোষণা প্রচারের ক্ষেত্রে এটা অধিক কার্যকর। *আর যদি তা না করে তাহলেও ভালো।* কেননা এটা মূলত, সুন্নত নয়।[৩]

ফজরে আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'বার حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলে তাসবীব (বা পুনঃ ঘোষণা দান) উত্তম। কেননা এটা ঘুম ও গাফলাতের সময়। অন্যান্য নামাযে তা মাকরূহ।

تثويب অর্থ পুনঃ ঘোষণা দান। এবং তা লোকদের মধ্যে প্রচলিত পন্থায় করতে হবে।[৪]

এই তাছবীবের প্রথাটি কূফার আলিমগণ মানুষের অবস্থার পরিবর্তনের কারণে সাহাবা যুগের পর আবিষ্কার করেছেন। এবং উপরোল্লেখিত কারণে এটাকে ফজরের সাথেই খাস করেছেন। তবে পরবর্তী আলিমগণ দীনের সকল বিষয়ে শৈথিল্য দেখা দেওয়ায় সকল সালাতেই তাছবীব উত্তম মনে করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, মুআয্যিন প্রত্যেক সালাতের সময় আমীর ও শাসককে উদ্দেশ্য করে একথা বলায় কোন দোষ নেই : "হে আমীর! আস্সালামু আলায়কুম, সালাতে আসুন, আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন।"

ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ মত গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। কেননা জামা'আতের ব্যাপারে সকল মানুষ সমান। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) মুসলমানদের বিষয়াদিতে অধিক ব্যস্ততার কারণে তাদের এ ব্যাপারে বিশিষ্ট করেছেন, যেন তাদের জাম'আত ফউত না হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কাযীদের জন্য একই হুকুম।

মাগরিব ছাড়া অন্য সময় আযান ও ইকামাতের মাঝে কিছু সময় অপেক্ষা করবে। এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। ইমামদ্বয় বলেন, মাগরিবের সময়ও স্বল্পক্ষণ অপেক্ষা করবে। কেননা আযান ও ইকামাতে ব্যবধান করা আবশ্যক আর উভয়কে মিলিয়ে দেওয়া মাকরূহ। আর স্বর-বিরতি ব্যবধান বলে গণ্য হবে না। কেননা তা তো আযানের বাক্যগুলোর

---

২. অর্থাৎ তাতে আওয়াজ ঠিকমত পৌঁছে না।

৩. অর্থাৎ আযান সম্পর্কিত মূল হাদীছটিতে এটা নেই। শুধু আওয়াজ উঁচু করার উদ্দেশ্যে এটা বলা হয়েছে।

৪. কেননা মানুষের অবগতিই হলো উদ্দেশ্য, সুতরাং মানুষের বোধগম্য পন্থায় ও ভাষায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মাঝেও বিদ্যমান। সুতরাং স্বল্পক্ষণ বসা দ্বারা ব্যবধান করতে হবে। যেমন দুই খুতবার মাঝে হয়ে থাকে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো; (মাগরিবে) বিলম্ব মাকরূহ। সুতরাং তা পরিহার করার জন্য নূন্যতম ব্যবধানই যথেষ্ট হবে। আর আমাদের আলোচ্য মাসআলাতে স্থানও ভিন্ন এবং স্বরও ভিন্ন। সুতরাং স্বল্প বিরতি দ্বারাই ব্যবধান গণ্য হবে। পক্ষান্তরে খুতবা সেরূপ নয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) অন্যান্য সালাতের উপর কিয়াস করে বলেন, দুই রাকাআত নফলের মাধ্যমে ব্যবধান করবে। (অন্য সালাত থেকে মাগরিবের পার্থক্য আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি)।

ইমাম ইয়া'কূব (আবূ ইউসুফ (র.)) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে আযান ও ইকামাত দিতে দেখেছি। তিনি আযান ও ইকামাতের মাঝে বসতেন না। আমরা যা বলেছি এটি তার সমর্থন করে।[৫] আর এতে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, মুআয্যিনের শরীআত সংক্রান্ত বিষয়ে আলিম হওয়া মুস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ وَيُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ -তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তোমাদের জন্য আযান দিবে।

কাযা সালাতের জন্য আযান ও ইকামাত দিবে।[৬] কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সফর শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার কারণে পরবর্তী সকালে আযান ও ইকামাত দিয়ে ফজরের সালাত কাযা করেছেন।[৭]

শুধু ইকামতকে যথেষ্ট মনে করার ব্যাপারে এ হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলীল।

যদি কয়েক ওয়াক্ত সালাত কাযা হয়ে থাকে, তাহলে প্রথম সালাতের জন্য আযান দিবে ও ইকামাত বলবে। আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছটির কারণে অবশিষ্টগুলোর ক্ষেত্রে তার ইখতিয়ার রয়েছে। ইচ্ছা করলে আযান ও ইকামাত দিবে, যাতে কাযা সালাত আদায় সালাতের

---

৫. অর্থাৎ তাঁর মতে মাগরিবের আযান ও ইকামাতের মাঝ বসার অবকাশ নেই।

৬. অর্থাৎ কাযা নামায একা আদায় করা হোক বা জামাআতের সাথে, উভয় অবস্থাতেই আযান দেয়া ও ইকামাত বলা মুস্তাহাব।

৭. বুখারীতে আবূ কাতাদা সূত্রে সংক্ষেপে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক রাত্রে আমরা নবী (সা.)-এর সাথে সফর করছিলাম। শেষ রাত্রের দিকে কেউ কেউ এই বলে আবেদন জানালো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদেরকে একটু যাত্রা বিরতি করালে ভালো হতো। তিনি বললেন, আমার আশংকা হয় যে, তোমরা নামায ফেলে ঘুমিয়ে যাবে। বিলাল (রা.) বললেন, আমি আপনাদের জাগিয়ে দেবো। সেই কথা মতে সবাই শুয়ে পড়লেন। এদিকে বিলাল (রা.) একটি বাহনে হেলান দিয়ে বসলেন, তখন তার চোখে ঘুম চেপে বসলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এমন সময় জেগে উঠলেন, যখন সূর্যের প্রান্তভাগ উদিত হয়ে গেছে। তিনি বললেন, কি বিলাল, তোমার ওয়াদা কোথায় গেলো? বিলাল বললেন, এমন ঘুম আর কখনো আমাকে পায়নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা তোমাদের রূহ কবয করেছেন, আবার যখন ইচ্ছা ফিরিয়ে দিয়েছেন। হে বিলাল, দাঁড়িয়ে আযান দাও। অতঃপর তিনি উযূ করলেন। সূর্য যখন উপরে উঠলো, তখন তিনি ইকামাতসহ নামায পড়লেন।

অনুরূপ হয়।[৮] আর ইচ্ছা করলে শুধু ইকামাতের উপর নির্ভর করবে। কেননা আযান দেয়া হয় উপস্থিত করার জন্য। আর তারা তো উপস্থিত আছেই।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পরবর্তী সালাতসমূহের জন্য শুধু ইকামাতই দেওয়া হবে। মাশায়েখও বলেন, হতে পারে যে এটি তাঁদের (ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ র.)-এর সর্বসম্মত মত।

পবিত্র অবস্থায় আযান ও ইকামাত দেয়া উচিত। তবে উযূ ছাড়া আযান দিলে জাইয। কেননা এটা (আল্লাহ্‌র) যিকির, নামায নয়। সুতরাং তাতে উযূ মুস্তাহাব মাত্র। যেমন কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে।

উযূ ছাড়া ইকামাত বলা মাকরূহ। কেননা তাতে ইকামাত ও সালাতের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি হয়। অবশ্য বর্ণিত আছে যে, ইকামাতও মাকরূহ হবে না। কেননা এটা তো দুই আযানের অন্যতম। আরেক বর্ণনা মতে আযানও (উযূ ছাড়া) মাকরূহ হবে। কেননা সে এমন বিষয়ের প্রতি আহবান জানাচ্ছে, যার প্রতি সে নিজেই সাড়া দেয়নি।

জুনুবী অবস্থায় আযান দেওয়া মাকরূহ। এ সম্পর্কে একটি মাত্র বর্ণনাই আছে। মুহদিছের আযান সম্পর্কীয় দুইটি রিওয়ায়াতের মধ্যে মাকরূহ না হওয়ার রিওয়ায়াতটির মাসআলার সাথে পার্থক্য এই যে, সালাতের সাথে আযানের সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং উভয় সাদৃশ্যের উপর আমল হিসাবে দুই হাদীছের যেটি সবচাইতে কঠোর, তা থেকে পবিত্রতা অর্জনের শর্ত আরোপ করা হবে, জুনুবীর জন্য নয়।

الجامع الصغير গ্রন্থে রয়েছে, উযূ ছাড়া আযান এবং একামাত দিলে তা দোহরাতের হবে না। আর জানাবাতের বেলায় দোহরানোই আমার কাছে অধিক প্রিয়। তবে না দোহারালেও চলে। প্রথমটির কারণ হাদাছের লঘুতা, আর দ্বিতীয়টির অর্থাৎ জানাবাতের কারণে দোহরানোর ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। তবে অধিকতর যুক্তিপূর্ণ এটি যে, আযান দোহরানো উচিত, কিন্তু ইকামাত দোহরাতে হবে না। কেননা পুনঃ আযান শরীআত অনুমোদিত; পুনঃ ইকামাত অনুমোদিত নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর এ বক্তব্যের অর্থ হল সালাত হয়ে যাবে। কেননা, সালাত তো আযান-ইকামাত ছাড়াও জাইয হয়।

গ্রন্থকার বলেন ঃ ***স্ত্রীলোক যদি আযান দিয়ে থাকে তবে এরূপ হুকুম।*** অর্থাৎ দোহরানো মুসতাহাব, যাতে আযান সুন্নত মুতাবিক হয়ে যায়।[৯]

সময় হওয়ার পূর্বে কোন সালাতের আযান দেওয়া বৈধ নয়। ওয়াকত হওয়ার পর আবার দিতে হবে। কেননা, আযান দেওয়া হয় মানুষের অবগতির জন্য। অথচ সময়ের পূর্বে হলে সেটা হবে মানুষকে অজ্ঞতায় ফেলার মধ্যে শামিল।

---

৮. যেমন জুমুআর ক্ষেত্রে।

৯. আযানের ক্ষেত্রে সুন্নত হলো মুআয্যিন পুরুষ হওয়া।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আর ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমতও তাই– ফজরের ক্ষেত্রে রাত্রের শেষার্ধে (আযান দেয়া) বৈধ। কেননা, হারামাইন শরীফের অধিবাসীদের যুগ পরম্পরায় তা চলে আসছে।

এ সকলের বিপক্ষে দলীল হল বিলালের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ নির্দেশ ঃ لَا تُؤَذِّنْ حَتّٰى يَسْتَبِيْنَ لَكَ الْفَجْرُ هٰكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا –ফজর এরূপ ফরসা হওয়ার পূর্বে আযান দিও না। একথা বলে তিনি উভয় হাত চওড়াভাবে প্রসারিত করলেন।

মুসাফির আযান ও ইকামত দিবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আবূ মুলায়কার দুই পুত্রকে বলেছিলেন ঃ اِذَا سَافَرْتُمَا فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا –যখন তোমরা সফর করবে তখন (তোমাদের একজন) আযান দিবে এবং ইকামাত বলবে।

যদি আযান ও ইকামাত দু'টোই তরক করে তাহলে তা মাকরূহ হবে। আর যদি শুধু ইকামাতের উপরই ক্ষান্ত হয়, তাহলে তা জাইয হবে। কেননা, আযান (মূলতঃ) অনুপস্থিতদের উপস্থিত করার জন্য; অথচ সফর-সংগীরা তো উপস্থিতই আছে। পক্ষান্তরে ইকামাত হলো (নামাযের) আরম্ভের ঘোষণার জন্য, আর উপস্থিতদের জন্য তার প্রয়োজন রয়েছে।

যদি নগরীতে নিজের ঘরে সালাত আদায় করে, তাহলে আযান-ইকামাত দিয়েই সালাত আদায় করবে, যাতে জামাআত অনুযায়ী সালাত আদায় হয়। আর তা তরক করাও জাইয আছে। কেননা ইবন মাস'উদ (রা.) বলেছেন, মহল্লার আযান আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

সালাতের পূর্ববর্তী শর্তসমূহ

মুসল্লীর জন্য যাবতীয় হাদাছ ও নাজাসাত থেকে প্রাক-পবিত্রতা অর্জন ওয়াজিব। সে পদ্ধতিতে, যা ইতোপূর্বে আমরা বলে এসেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ –তুমি তোমার কাপড় পাক রাখো।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন ঃ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا –যদি তোমরা জুনুবী হও তাহলে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করো।

আর ছতর ঢাকবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ অর্থাৎ প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা এমন পোশাক পরিধান করো, যাতে তোমাদের সতর ঢাকে। এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ لَاصَلٰوةَ لِحَائِضٍ اِلاَّ بِخِمَارٍ –যার ঋতু হয়েছে, এমন (বালেগা) নারীর সালাত শুদ্ধ হবে না ওড়না ছাড়া।

পুরুষের সতর হলো নাভির নীচে থেকে হাঁটু পর্যন্ত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَابَيْنَ سُرَّتِه اِلٰى رُكْبَتِه –পুরুষের সতর হলো নাভি থেকে হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশ। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ مَادُوْنَ سُرَّتِه حَتّٰى تجَاوَزَ رُكْبَتَهُ –তার নাভির নীচ থেকে তার হাঁটু অতিক্রম করে যাওয়া পর্যন্ত। এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কেও ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। হাদীছের الى কে আমরা مع (সহ) এর অর্থে গ্রহণ করেছি। দ্বিতীয় হাদীছের حتى শব্দের উপর আমল করার প্রেক্ষিতে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিম্নোক্ত হাদীছের উপর আমল করার উদ্দেশ্যে ঃ الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ –হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত।

স্বাধীন নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি ছাড়া সমস্ত শরীর সতর। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُوْرَةٌ –স্ত্রীলোক আওরত, যা ঢেকে রাখা কর্তব্য। দু'টি অংগকে ব্যতিক্রম করার কারণ হলো তা প্রকাশ করা অনিবার্য।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ ব্যতিক্রম স্পষ্ট নির্দেশ করে যে, পায়ের পাতা সতর আর এক বর্ণনায় আছে যে, তা সতর নয়। এ-ই বিশুদ্ধ মত।[১]

যদি কোন স্ত্রী লোক পায়ের গোছার এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ খোলা

১. মন্তব্যটি অগ্রহণযোগ্য। কেননা পায়ের পাতা সতর হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট হাদীছ রয়েছে (দেখুন আবূ দাউদ, হাকিম ও তাহাবী) ইমাম তাহাবীর বক্তব্যই এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ হাদীছের আলোকে সালাতের মধ্যে তা সতর এবং প্রয়োজনের আলোকে সালাতের বাইরে সতর নয়।

অবস্থায় সালাত আদায় করে তাহলে সে তার সালাত দোহরাবে। এ হল ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। আর যদি তা এক-চতুর্থাংশের কম হয়, তাহলে সালাত দোহরাবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, অর্ধেকের কম হলে দোহরাবে না; যেহেতু কোন কিছুকে তখনই অধিক বলে আখ্যায়িত করা হয়, যখন তার বিপরীত বস্তুটি পরিমাণে তার চেয়ে কম হয়। কেননা, কম ও বেশী শব্দ দু'টি তুলনামূলক।

'অর্ধেক' সম্পর্কে তাঁর পক্ষ হতে দু'টি বর্ণনা রয়েছে ঃ এক বর্ণনায় 'কম' এর গণ্ডি বহির্ভূত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। অপর বর্ণনায় 'বেশী' এর গণ্ডীভুক্ত না হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর যুক্তি এই যে, চতুর্থাংশ সম্পূর্ণের স্থলবর্তী হয়ে থাকে। যেমন 'মাথা মাস্‌হের ক্ষেত্রে এবং ইহরামে 'মাথা মুড়ানোর' ক্ষেত্রে। এবং যে ব্যক্তি কারো চেহারা দেখে সে ঐ ব্যক্তিকে দেখেছে বলে খবর দেয়। যদিও সে উক্ত ব্যক্তির চারপাশের একপাশ মাত্র দেখেছে।

চুল, পেট ও উরুও অনুরূপ অর্থাৎ এতেও উক্ত মতভেদ রয়েছে।[২] কেননা প্রতিটিই আলাদা অংগ।

চুল দ্বারা এখানে মাথা থেকে ঝুলে থাকা অংশ উদ্দেশ্য। এ-ই বিশুদ্ধ মত। তবে জানাবাতের গোসলে এটা ধোয়া মা'ফ হওয়ার কারণ হল কষ্ট আরোপ হওয়া।

লজ্জাস্থান দু'টিতেও অনুরূপ বিরোধ রয়েছে। অবশ্য পুরুষলিঙ্গকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হবে। তদ্রূপ অণ্ডকোষ দু'টিও আলাদা অংগরূপে বিবেচ্য হবে। উভয়টিকে এক গণ্য করা হবে না। এ-ই বিশুদ্ধ মত।

পুরুষের যতটুকু অংশ সতর, দাসীরও তাই সতর। আর তার পেট ও পিঠও সতর। এছাড়া তার শরীরের অন্যান্য অংগ সতর নয়। কেননা, উমর (রা.) (জনৈকা দাসীকে লক্ষ্য করে) বলেছিলেন, এই ছেমড়ি! মাথা থেকে ওড়না সরিয়ে নে, স্বাধীন স্ত্রী লোকদের মত হতে চাস বুঝি!

তাছাড়া তাকে তার মনিবের প্রয়োজনে কাজের পোশাকে বাইরে বের হতে হয়। সুতরাং অসুবিধা লাঘবের উদ্দেশ্যে অন্যান্য পুরুষের ক্ষেত্রে তাকে মাহরেমের ন্যায় গণ্য করা হবে।

যদি নাজাসাত দূর করার মতো কিছু না পায়, তাহলে তা সহই সালাত আদায় করবে। এবং সালাত দোহরাতে হবে না। এর দু'ই সুরত। যদি কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ বা তার চাইতে বেশী অংশ পাক হয়, তাহলে ঐ কাপড় পরেই সালাত আদায় করবে। যদি বিবস্ত্র হয়ে সালাত আদায় করে, তাহলে জাইয হবে না। কেননা এক-চতুর্থাংশ সম্পূর্ণের স্থলবর্তী

---

২. অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফের মতে অর্ধেকের বেশী খোলা থাকা সালাত ভংগের কারণ; পক্ষান্তরে প্রস্ত ইমামদ্বয়ের মত হচ্ছে চতুর্থ।

হয়।[৩] যদি এক-চতুর্থাংশেরও কম পাক হয় তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একই হুকুম। আর এটা ইমাম শাফিঈ (র.) ও দু'টি মতের একটি। কেননা ঐ কাপড়ে সালাত আদায়ে একটি ফরয তরক হয়। পক্ষান্তরে উলংগ হয়ে সালাত আদায়ে একাধিক ফরয তরক হয়।[৪]

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সে ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা হলে উলংগ হয়ে সালাত আদায় করুক, কিংবা নাপাক কাপড়ে সালাত আদায় করুক। তবে দ্বিতীয়টাই উত্তম। কেননা, সক্ষম অবস্থায় প্রতিটি সালাতের প্রতিবন্ধক। এবং (মা'ফ হওয়ার) পরিমাণের ক্ষেত্রে দুটোই সমান।[৫] সুতরাং সালাতের হুকুম ও দুটোই সমান হবে।

তাছাড়া কোন কিছুকে তার স্থলবর্তী রেখে তরক করায় তরক গণ্য হয় না।[৬]

(কাপড় পরে সালাত আদায়) উত্তম হওয়ার কারণ এই যে, সতর সালাতের সাথে খাস নয়। পক্ষান্তরে তাহারাত সালাতের সাথে খাস।

কেউ যদি সতর ঢাকার কাপড় না পায় তাহলে উলংগ অবস্থায় বসে ইশারায় রুকূ সাজদা করে সালাত আদায় করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীগণ এরূপই করেছিলেন।[৭]

যদি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তাহলেও তার জন্য জাইয হবে। কেননা বসার মধ্যে লজ্জাস্থানের সতর হয়। আর দাঁড়িয়ে পড়লে উল্লেখিত রুকনগুলো আদায় হয়। সুতরাং দুটোর যে কোন একটি সে গ্রহণ করতে পারে।

তবে প্রথমটিই উত্তম। কেননা, সতর ঢাকা ফরয হয়েছে সালাতের হক হিসাবে এবং মানুষের হক হিসাবে। তাছাড়া এর কোন স্থলবর্তী নেই। আর ইশারা হয়েছে রুকনের স্থলবর্তী।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***যে সালাত শুরু করতে যাচ্ছে, সে এমনভাবে নিয়্যত করবে যে, নিয়্যত ও তাহরীমার মাঝে কোন কর্ম[৮] দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি করবে না।***

এ শর্তটির মূল দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ ঃ الاعمال بالنيات। (যাবতীয় আমল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল)।

তাছাড়া সালাতের শুরু হয় কিয়াম বা দাঁড়ানো অবস্থা দ্বারা। আর তা অভ্যাস ও ইবাদত উভয়ের মধ্যে দোদুল্যমান। সুতরাং নিয়্যত ছাড়া এতে পার্থক্য সৃষ্টি হবে না।

---

৩. সুতরাং ধরে নেয়া হবে যে, সম্পূর্ণ কাপড়ই নাপাক।

৪. কেননা বিবস্ত্র অবস্থায় সালাত আদায় করলে রুকূ সাজদা ইশারায় আদায় করতে হবে এবং বসে সালাত আদায় করতে হবে। ফলে অন্ততঃ তিনটি ফরয ছুটে যাবে।

৫. অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই অল্প পরিমাণ মা'ফ ধরা হয়। অবশ্য অল্পের মাত্রা ভিন্ন।

৬. রুকূ-সাজদার স্থলবর্তী হলো ইশারার মাধ্যমে আদায় করা। সুতরাং রুকূ-সাজদা তরক করা হয়েছে বলা যায় না।

৭. বর্ণিত আছে যে, একদল সাহাবী একবার সমুদ্র যাত্রা করলেন এবং নৌকা ডুবার ফলে উলংগ অবস্থায় তীরে উঠলেন এবং সেই অবস্থায় বসে নামায পড়লেন (বিনায়া)। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে কাতাদা থেকে এ মর্মে ফাতওয়া বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে একদল উলংগ লোক জামা'আত পড়লে ইমাম কাতারের মাঝে দাঁড়াবে

৮. অর্থাৎ এমন কাজ যা নামায সংশ্লিষ্ট নয়, যেমন, পানাহার বা কথোপকথন, মসজিদের দিকে হাঁটা বা উযূ করা ইত্যাদি

আর যে নিয়্যত তাকবীরের পূর্বে করা হয়, তা তাকবীরের সময়ও বিদ্যমান আছে বলে গণ্য। যদি তাকে বিচ্ছিন্নকারী কোন কিছু না পাওয়া যায়। অর্থাৎ এমন কোন কাজ, যা সালাতের উপযোগী নয়। আর তাকবীরের পরবর্তী নিয়্যত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা নিয়্যতের পূর্বে যা বিগত হয়েছে, তা নিয়্যতহীনতার কারণে ইবাদত হবে না। সিয়ামের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজনের কারণে তা কায়েম রাখা হয়েছে।[৯]

নিয়্যত অর্থ ইচ্ছা, তবে শর্ত এই যে, নিজে অন্তরে জ্ঞাত হতে হবে যে, কোন সালাত সে আদায় করছে। মুখে উচ্চারণ করা ধর্তব্য নয়। তবে উচ্চারণ করা উত্তম। কেননা, তা ইচ্ছাকে সংহত করে।

উল্লেখ্য যে, সালাত যদি নফল হয় তাহলে সাধারণ নিয়্যতই যথেষ্ট। বিশুদ্ধ মতে সুন্নত সালাতেরও এ হুকুম। আর যদি ফরয সালাত হয় তবে ফরয নির্ধারিত হওয়া জরুরী। উদাহরণ স্বরূপ, যেমন, যুহর। কেননা ফরয বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে।

আর যদি অন্য কারো মুকতাদী হয়, তাহলে সালাতের এবং ইমামের অনুগমনের নিয়্যত করবে। কেননা, ইমামের দিক থেকে তার সালাতে ফাসাদ আরোপিত হয়ে থাকে। সুতরাং তার পক্ষ থেকে এই বাধ্যবাধকতা গ্রহণ আবশ্যক।

গ্রন্থকার বলেন ঃ আর কিবলামুখী হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ –তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল মুসজিদুল হারাম অভিমুখী কর। তবে যে ব্যক্তি মক্কায় অবস্থান করছে, তার জন্য স্বয়ং কা'বামুখী হওয়া ফরয। আর মক্কায় অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য ফরয হলো কা'বার দিকের প্রতি মুখ করা। এ-ই বিশুদ্ধমত। কেননা, দায়িত্ব অর্পিত হয় সাধ্য অনুসারে।

যে ব্যক্তি ভীতিগ্রস্ত হয়, সে যেদিকেই সক্ষম হয় সেদিকেই মুখ করে সালাত আদায় করবে। কেননা, ওযর বিদ্যমান থাকার কারণে। সুতরাং কিবলা অজ্ঞাত হওয়ার অনুরূপ হবে।

যদি কারো জন্য কিবলা অজ্ঞাত (ও সন্দেহপূর্ণ) হয়ে পড়ে এবং তার কাছে এমন কেউ না থাকে, যাকে কেবলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারে। তাহলে সে সাধ্যানুযায়ী চিন্তা করে কিবলা স্থির করে নেবে। কেননা সাহাবায়ে কিরাম চিন্তা করে (কিবলা নির্ধারণ পূর্বক) সালাত আদায় করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদের কাজ প্রত্যাখ্যান করেননি।

তাছাড়া অধিকতর শক্তিশালী দলীলের অবর্তমানে প্রকাশ্য প্রমাণের উপর আমল করাই ওয়াজিব। আর সংবাদ জিজ্ঞাসা চিন্তা-ভাবনার চেয়ে অগ্রাধিকার রাখে।

সালাত আদায়ের পর যদি সে জানতে পারে যে, সে ভুল করেছিলো, তাহলে সালাত দোহরাতে হবে না।

---

৯. কেননা সিয়ামের শুরুর সময়টা হচ্ছে ঘুম ও গাফলতের সময়। সুতরাং সূচনা লগ্ন থেকে নিয়্যতের শর্ত আরোপ করলে তা কষ্টদায়ক হবে। পক্ষান্তরে সালাত শুরু হয় সচেতন অবস্থায়। সুতরাং এখানে সূচনা লগ্নে নিয়্যতের শর্ত আরোপ করায় অসুবিধার কিছু নেই।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যদি কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে থাকে, তাহলে ভুল নিশ্চিত হওয়ার কারণে সালাত দোহরাবে।

আর আমাদের দলীল হল, চিন্তা-ভাবনা দ্বারা নির্ধারিত দিকের অভিমুখী হওয়া ছাড়া অন্য কিছু তার সাধ্যে ছিল না। আর দায়িত্ব অর্পণ সাধ্যের উপর নির্ভরশীল।

আর যদি সে সালাতের মধ্যেই তা জানতে পারে, তাহলে কিবলার দিকে ঘুরে যাবে। কেননা, কুবাবাসীরা যখন কিবলা পরিবর্তনের খবর শুনতে পেলেন তখন তাঁরা সালাতের অবস্থাতেই ঘুরে গেলেন এবং নবী করীম (সা.) তা পসন্দ করেছিলেন। অদ্রূপ যদি তার সিদ্ধান্ত অন্যদিকে পরিবর্তিত হয়ে যায় তাহলে সে সেদিকের অভিমুখী হবে। কেননা, পরবর্তী ক্ষেত্রে নতুন ইজতিহাদের উপর আমল করা আবশ্যক; তবে তাতে ইতোপূর্বে আদায়কৃত অংশ ভংগ হবে না।

যে ব্যক্তি অন্ধকার রাতে কোন জামা'আতের ইমামতি করল এবং চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে কিবলা নির্ধারণ করে পূর্বমুখী হয়ে সালাত আদায় করল, আর তার পিছনে যারা রয়েছে তারাও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে প্রত্যেকে একেক দিকে সালাত আদায় করল, এমন অবস্থায় যে, প্রত্যেকে ইমামের পশ্চাতে আছে এবং ইমাম কী করছেন তা তাদের জানা নেই, তাহলে তা সবার জন্য জাইয হবে। কেননা, চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে নির্ধারিত দিকে অভিমুখী হওয়া তো পাওয়া গেছে। আর ইমামের সাথে এই বিরোধ বাধা সৃষ্টি করে না। যেমন কা'বার অভ্যন্তরের মাসআলা।

কিন্তু তাদের মধ্যে যে ইমামের বিপরীত অবস্থা জানতে পাবে, তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা আপন ইমাম ভুলের উপর আছে বলে সে বিশ্বাস করছে।

আর এ হুকুম সে ইমামের সম্মুখে হলেও। কেননা সে তার স্থানগত ফরয তরক করেছে।

সালাতের ধারাবাহিক বিবরণ

সালাতের ফরয ছয়টি

(প্রথমতঃ) তাহরীমা। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (তুমি তোমার প্রতিপালকের নামে তাকবীর বলো)। আর (মুফাসসিরদের সর্বসম্মতিক্রমে) আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমা।

(দ্বিতীয়তঃ) *কিয়াম।* কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ (তোমরা একাগ্র চিত্তে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হও।)

(তৃতীয়তঃ) *কিরাআত।* কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ। –কুরআনের যে অংশ সহজে সম্ভব হয় তোমরা পড়ো, রুকূ ও সাজদা করা, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا (তোমরা রুকূ করো এবং সাজদা করো)।

সালাতের পরে তাশাহহুদ পরিমাণ বৈঠক। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইব্‌ন মাস'উদ (রা.)-কে তাশাহহুদ শিক্ষাদান কালে বলেছেন ঃ اِذَا قُلْتَ هٰذَا اَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ (তুমি যখন এ বললে বা এ করলে তখন তোমার সালাত সমাপ্ত হল)।

এখানে সালাতের সম্পূর্ণতাকে তিনি বসার কাজের সাথে যুক্ত করেছেন (তাশাহ্‌হুদ) পাঠ করুক বা না করুক।

ইমাম কুদূরী বলেন, এছাড়া আর যা কিছু, তা সুন্নত।

ইমাম কুদূরী এখানে সুন্নত শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অথচ তাতে বিভিন্ন ওয়াজিব বিষয় রয়েছে। যেমন, ফাতিহা পাঠ, তার সাথে সূরা যোগ করা, যে কাজ শরীআত কর্তৃক একাধিকবার নির্ধারিত হয়েছে, সেগুলোর মাঝে তারতীব রক্ষা করা।[১] প্রথম বৈঠক, শেষ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ পাঠ, সালাতের কুনূত, দুই ঈদের তাকবীরসমূহ এবং যে সকল সালাতে উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ করা সে সকল সালাতে উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ এবং যে সকল সালাতে অনুচ্চস্বরে কিরাত পাঠ করা হয়, সে সকল সালাতে অনুচ্চস্বরে কিরাত পাঠ। এজন্যই এগুলোর কোন একটি তরক করলে তার উপর দু'টি সাজদাসহ ওয়াজিব হয়। এ-ই বিশুদ্ধ

১. যেমন সাজদা সুতরাং প্রথম রাকাআতের সাজদা যদি ছুটে যায় এবং পরবর্তীতে স্মরণ হয় তাহলে সাজদা সাহু দিবে। তদ্রূপ যদি দ্বিতীয় রাকাআতের রুকূতে মনে পড়ে যে, প্রথম রাকাআতের একটি সাজদা ছুটে গেছে আর সংগে সংগে সে রুকূ থেকেই সাজদায় চলে যায়, তাহলে উক্ত রুকূ তাকে দোহরাতে হবে না। কেননা তারতীব ফরয নয়। তাই রুকূটি ভংগ হবে না। পক্ষান্তরে যে সকল কাজ শরীআত কর্তৃক একাধিকবার নির্ধারিত হয়নি, তাতে তারতীব ওয়াজিব নয় ফরয। সুতরাং রুকূ থেকে সূরায় ফিরে আসলে তার রুকূ ভংগ হয়ে যাবে (الحميدية)।

মত। কুদূরীতে এগুলোকে সুন্নাত বলার কারণ এই যে, এগুলোর ওয়াজিবত্ব সুন্নাহ্ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

যখন সালাত শুরু করবে তখন তাকবীর বলবে। ইতোপূর্বে আমাদের পঠিত আয়াতের কারণে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ। তাকবীর হলো সালাতের তাহরীমা[২]। আমাদের মতে তাকবীরে তাহরীমা হলো সালাতের শর্ত। ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন (তাঁর মতে এটা রুকন)। (আমাদের মতে শর্ত হওয়ার কারণেই) যে ফরযের তাহরীমা বাঁধবে, সে ঐ তাহরীমা দ্বারা নফল সালাত আদায় করতে পারবে।

তিনি বলেন, অন্যান্য রুকনের জন্য যে সব শর্ত রয়েছে, তাহারীমার জন্যও সেসব শর্ত রয়েছে। আর এটি রুকন হওয়ার আলামত।

আমাদের যুক্তি এই ঃ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى (সে তার প্রতিপালকের নাম নিলো অতঃপর সালাত আদায় করল।)

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকবীরের উপর সালাতকে عطف করেছেন। আর عطف এর দাবী হলো উভয়ের বৈপরীত্য। আর একারণেই অন্যান্য রুকনের পুনঃ পৌনিকতার মতো এইটা পুনঃ পৌনিক হয় না।

(রুকনসমূহের) যাবতীয় শর্ত এখানে বিবেচনা করার কারণ এই যে, কিয়াম রুকনটি তার সংলগ্ন।[৩]

তাকবীরের সাথে উভয় হাত উত্তোলন করবে। এটি সুন্নত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এটা নিয়মিত করেছেন।[৪] এই (مع) শব্দটি এদিকে ইংগিত করে যে, তাকবীর ও হস্তদ্বয়ের উত্তোলন একত্রে হওয়া শর্ত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এ মতামত বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম তাহাবী (র.) এ আমল করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, প্রথমে উভয় হাত উঠাবে। তারপর তাকবীর বলবে। কেননা তার একাজ গায়রুল্লাহ্ থেকে বড়ত্বের অস্বীকৃতি জ্ঞাপক। আর অস্বীকৃতি স্বীকৃতির উপর অগ্রবর্তী হয়ে থাকে।

উভয় হাত এতটা উপরে উঠাবে, ***যাতে বৃদ্ধাংগুলি দু'টো উভয় কানের লতিকার বরাবর হয়।***

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে হাত উভয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। কুনূতের তাকবীর, ঈদের তাকবীর ও জানাযার তাকবীর সম্পর্কেও একই মতপার্থক্য।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর দলীল হলো আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা.) বর্ণিত হাদীছ। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন তাকবীর বলতেন, তখন উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন।

---

২. নামাযের বাইরে যা কিছু হালাল ছিলো, সেগুলোকে নিজের উপর হারাম করে সালাত প্রবেশের মাধ্যম হলো তাকবীর।

৩. সুতরাং কিয়ামের শর্তগুলো তাকবীরের আগেই সম্পন্ন হওয়া অপরিহার্য।

৪. এটি সরাসরি হাদীছ নয় তবে বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত বিভিন্ন হাদীছ থেকে ভাব ও মর্ম রূপে গৃহীত।

আমাদের দলীল হলো, ওয়াইল ইব্ন হাজার, বারা ও আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছ। তাঁরা বলেন, নবী (সা.) যখন তাকবীর বলতেন, তখন উভয় হাত তাঁর কান পর্যন্ত উঠাতেন।

তাছাড়া হাত উঠানোর উপকারিতা হলো বধিরদেরকে অবহিত করণ। আর তা ঐ ভাবেই সম্ভব, যেভাবে আমরা বলেছি।

আর ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছকে অপারগতার অবস্থার উপর আরোপ করা হবে।[৫]

স্ত্রীলোক তার উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা এটা তার সতর রক্ষার জন্য অধিক উপযোগী।

যদি তাকবীরের পরিবর্তে اَللّٰهُ اَجَلُّ বা اَللّٰهُ اَعْظَمُ বা اَلرَّحْمٰنُ اَكْبَرُ কিংবা আল্লাহ্র অন্যান্য নাম (ও গুণ) উচ্চারণ করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা যথেষ্ট হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, যদি সে তাকবীরের শুদ্ধ উচ্চারণে সক্ষম হয়, তাহলে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বা اَللّٰهُ الْاَكْبَرُ অথবা اَللّٰهُ الْكَبِيْرُ ছাড়া অন্য কিছু জাইয হবে না।[৬]

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, প্রথম দু'টি ছাড়া (অর্থাৎ الله اكبر ও الله الاكبر ছাড়া) অন্য কিছু জাইয হবে না।

আর ইমাম মালিক (র.) বলেন, প্রথমটি ছাড়া (অর্থাৎ الله اكبر ছাড়া) অন্য কিছু জাইয হবে না। কেননা (নবী সা.-এর আমল রূপে) এটিই বর্ণিত হয়েছে। আর এক্ষেত্রে শুধু বর্ণিত হাদীছ থেকে জ্ঞান লাভ করাই আসল।

ইমাম শাফিঈ (র.) (নীতিগতভাবে ইমাম মালিকের যুক্তি স্বীকার করে) বলেন, ال যুক্ত করা প্রশংসার ক্ষেত্রে অধিক অর্থবহ। সুতরাং এটি তার স্থলবর্তী।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আল্লাহ্র গুণাবলীর ক্ষেত্রে افعل ও فعيل উভয় 'মাপের' শব্দ সমার্থক।[৭] তবে তাকবীরের শুদ্ধ উচ্চারণে অক্ষমতার বিষয়টি ব্যতিক্রম।[৮] কেননা তখন তো সে মর্ম প্রকাশেই শুধু সক্ষম।[৯]

---

৫. অর্থাৎ কোন ওযর ও অপারগতার কারণে কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন কেননা ওয়াইল ইব্ন হাজার (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা মদীনায় আগমন করলাম। তখন দেখলাম যে, তারা কান পর্যন্ত হাত উঠাচ্ছেন। পরবর্তী বছর যখন আসলাম তখন দেখলাম, প্রচণ্ড শীতের কারণে তারা কাপড়-চোপড় পরে আছেন এবং কাঁধ পর্যন্ত হাতে উঠাচ্ছেন।

৬. মূল মতপার্থক্য এই যে, তাহরীমার মূল রুকন কি স্বয়ং 'তাকবীর' না 'মুখ থেকে প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ।'

৭. সুতরাং اكبر ও كبير উভয় শব্দেই তাকবীর বৈধ হবে।

৮. অর্থাৎ তখন অন্যান্য শব্দে তাকবীর বলার সুযোগ দেওয়া হবে।

৯. সুতরাং যে কোনভাবে মর্ম প্রকাশই তার জন্য যথেষ্ট হবে। এবং নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণে বাধ্যবাধকতা তার উপর থেকে তুলে নেয়া হবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর যুক্তি এই যে, তাকবীরের আভিধানিক অর্থ হলো মর্যাদা প্রকাশ। আর তা প্রকাশিত হয়েছে।

যদি ফার্সীতে সালাত শুরু করে। কিংবা ফারসী ভাষায় সালাতের কিরাত পাঠ করে কিংবা যবাহ্ করার সময় ফারসী ভাষায় বিসমিল্লাহ্ পড়ে অথচ সে শুদ্ধ আরবী বলতে পারে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা যথেষ্ট হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, পশু যবাহ্ ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট হবে না। তবে যদি শুদ্ধ আরবী বলতে অক্ষম হয়, তাহলে যথেষ্ট হবে।

সালাতের উদ্বোধন (তথা তাকবীর) প্রসংগে আরবী ভাষায় হলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সংগে একমত।[১০] পক্ষান্তরে ফারসী ভাষার হলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সংগে একমত।[১১] কেননা আরবী ভাষার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য ভাষার নেই।

আর কিরাত সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্যের দলীল এই যে, কুরআন আরবী শব্দসমষ্টির নাম, যেমন কুরআনের আয়াতে তা বলা হয়েছে।[১২] তবে আপারগতার সময় শুধু ভাব ও মর্মকেই যথেষ্ট মনে করা হবে। যেমন (রুকূ সাজদা আদায়ে অপারগতার সময়) ইশারাকে যথেষ্ট মনে করা হয়। (তবে যবাহের সময়) বিসমিল্লাহ্র বিষয়টি ব্যতিক্রম। কেননা আল্লাহ্র যিকির যে কোন ভাষায় হতে পারে।[১৩]

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী ঃ وَاِنَّهٗ لَفِیْ زُبُرِ الْاَوَّلِیْنَ –নিঃসন্দেহে এ কুরআন পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহে বিদ্যমান ছিল আর সেখানে তা এ ভাষায় অবশ্যই ছিলো না। একারণেই অপারগতার সময় অন্য ভাষায় জাইয রয়েছে। ক্রমাগত অনুসৃত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণের কারণে সে গুনাহ্গার হবে। আর আমাদের পেশকৃত আয়াতের আলোকে ফারসীসহ অন্য যেকোন ভাষায়ও জাইয হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা ভাষার ভিন্নতার কারণে মর্ম ভিন্ন হয় না।

আর মতপার্থক্যটি হলো গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে। সালাত ফাসিদ না হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।[১৪] বর্ণিত আছে যে, মূল মাসআলায় ইমাম সাহেব উক্ত ইমামদ্বয়ের বক্তব্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর তা-ই নির্ভরযোগ্য।[১৫] খুৎবা ও তাশাহ্হুদ সম্পর্কেও অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে। আর আযানের ব্যাপারে স্থানীয় প্রচলন বিবেচ্য হবে।[১৬]

---

১০. অর্থাৎ আরবী ভাষায় হলে বড়ত্ব জ্ঞাপক যে কোন বাক্য যথেষ্ট হবে।

১১. অর্থাৎ ফারসী ভাষায় তাকবীরে তাহরীমা বৈধ হবে না।

১২. কেননা কুরআনে রয়েছে قرانا عربيا

১৩. অর্থাৎ সেখানে আল্লাহ্র যিকিরই হলো মূল লক্ষ্য। শব্দ ও ভাষা মুখ্য নয়।

১৪. অর্থাৎ মূল মতপার্থক্য হলো এই যে, অন্য ভাষায় পঠিত কিরাত দ্বারা কিরাতের ফরয আদায় হবে কি না। সাহেবাইনের মতে অন্য ভাষায় জাইয হবে না, অর্থাৎ কিরাতের ফরয আদায় হবে না। বরং আরবী শব্দসহ পুনঃ কিরাত পড়তে হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর মতে কিরাতের ফরয আদায় হয়ে যাবে, পুনঃ কিরাত পড়তে হবে না। তবে এ বিষয়ে সকলেই একমত। এ কারণে নামায ফাসেদ হবে না।

১৫. কেননা ইমাম সাহেবের প্রথম বক্তব্য দৃশ্যতঃ কিতাবুল্লাহ্র সাথে বিরোধপূর্ণ, কেননা কুরআন নিজেকে القران العربى আখ্যায়িত করেছে।

১৬. অর্থাৎ আযানের ভাষা রূপে যা প্রচলিত এবং মানুষের কাছে আযান রূপে যা পরিচিত, সেটাই হবে আযানের ভাষা। তবে সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণের কারণে ভীষণ গুনাহ্ হবে।

যদি اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ বলে সালাত আরম্ভ করে, তাহলে তা জাইয হবে না। কেননা এতে তার স্বার্থের 'মিশ্রণ' রয়েছে। সুতরাং তা খালিস তা'যীম থাকেনি। আর যদি শুধু اَللّٰهُمَّ বলে আরম্ভ করে তাহলে কারো কারো মতে তা জাইয হবে। কেননা এর অর্থ হলো يَا اَللّٰهُ হে আল্লাহ! অপর এক মতে তা জাইয হবে না। কেননা এর অর্থ হলো يَا اَللّٰهُ اُمَّنَا بِخَيْرٍ (হে আল্লাহ! আমাদের কল্যাণ করুন) সুতরাং এটা প্রার্থনা হলো।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *সে তার নাভির নীচে বাম হাতের উপর ডান হাত স্থাপন করবে।* কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : اِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ —নাভির নীচে বাম হাতের উপর ডান হাত স্থাপন সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

এ হাদীছ হাত ছেড়ে রাখার ব্যাপারে ইমাম মালিক (র.)-এর বিপক্ষে দলীল এবং হাত বুকের উপর রাখার ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলীল।

তাছাড়া হাত নাভির নীচে রাখা তা'যীম প্রকাশের অধিকতর নিকটবর্তী এবং তা-ই হলো উদ্দেশ্য।

আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফের মতে 'হাত বাঁধা' হচ্ছে কিয়ামের সুন্নাত। সুতরাং ছানা পড়ার সময় তা ছেড়ে রাখবে না।[১৭] মূল নীতি এই যে, যে কিয়ামের মধ্যে কোন যিকির সুন্নত রয়েছে, তাতে হাত বেঁধে রাখা হবে, অন্যথায় নয়। এ-ই বিশুদ্ধ মত। সুতরাং কুনূতের অবস্থায় এবং জানাযার সালাতে হাত বেঁধে রাখবে, পক্ষান্তরে রুকূর পর দাঁড়ানো অবস্থায় এবং ঈদের তাকবীরসমূহের মধ্যবর্তী সময়ে হাত ছেড়ে রাখবে।

তারপর سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ থেকে শেষ পর্যন্ত ছানা পড়বে।

ইমাম আবূ ইউসুফ থেকে বর্ণিত আছে যে, এর সাথে اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ থেকে শেষ পর্যন্ত দু'আটি যোগ করবে। কেননা, হযরত 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) তা বলতেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলীল হলো, আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) যখন সালাত আরম্ভ করতেন, তখন তাকবীর বলতেন এবং سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তেন। এর অতিরিক্ত কিছু পাঠ করতেন না। ইমাম আবূ ইউসুফ বর্ণিত হাদীছটি তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মশহূর হাদীছগুলোতে جَلَّ ثَنَاؤُكَ বাক্যটি নেই। সুতরাং ফরয সালাতে তা বলবে না।

তাকবীরের পূর্বে انى وجهت وجهى বলবে না, যাতে নিয়্যত তাকবীরের সাথে যুক্ত থাকে। এ-ই বিশুদ্ধ মত।

আর বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ —যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো।

---

১৭. কথিত আছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এটা কিরাতের সুন্নত। সুতরাং কিরাত শুরু করার সময় হাত বাঁধবে।

এর অর্থ হল, যখন কুরআন পাঠের ইচ্ছা করবে। استعيذ بالله বলাই হলো উত্তম, যাতে কুরআনের শব্দের সাথে মিল হয়। اعوذ بالله শব্দটিও এর কাছাকাছি।

যা হোক, ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে تعوذ হচ্ছে কিরাতের সাথে সংযুক্ত, ছানার সাথে নয়। আমাদের পেশকৃত আয়াত এর দলীল। তাই মসবূক تعوذ বলবে, কিন্তু মুক্তাদি বলবে না। এবং ঈদের সালাতের তাকবীরসমূহের পরে বলবে। আবূ ইউসুফ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। এবং بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়বে। মশহূর হাদীছগুলোতে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

(আউযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্) দু'টোই অনুচ্চস্বরে পড়বে। কেননা ইব্ন মাস'উদ (রা.) বলেছেন ঃ اربع يخفيهن الامام –চারটি বাক্য ইমাম নীরবে পড়বে। তন্মধ্যে তিনি আউযুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্ ও আমীন উল্লেখ করেছেন।[১৮]

ইমামা শাফিঈ (র.) বলেন, কিরাত উচ্চৈঃস্বরে পড়ার সময় বিসমিল্লাহ্ও উচ্চস্বরে পড়বে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) তাঁর সালাতে বিসমিল্লাহ্ উচ্চৈঃস্বরে পড়েছেন।

এর জবাবে আমরা বলি যে, তা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ছিলো। কেননা, আনাস (রা.) অবহিত করেছেন যে, নবী (সা.) বিসমিল্লাহ্ উচ্চৈ-স্বরে পড়তেন না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা এরূপ আছে যে, تعوذ এর ন্যায় বিসমিল্লাহ্ও প্রত্যেক রাকাআতের শুরুতে বলবে না (বরং শুধু সালাতের শুরুতে বলবে।) তবে তাঁর থেকে আরেকটি বর্ণনা আছে যে, সতর্কতামূলক[১৯] প্রত্যেক রাকাআতে বিসমিল্লাহ্ পড়বে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতও তাই।

সূরা ও ফাতিহার মাঝে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নীরব কিরাত বিশিষ্ট সালাতে তা পড়বে।

তারপর সূরাতুল ফাতিহা পড়বে এবং অন্য একটি সূরা কিংবা যে কোন সূরা থেকে ইচ্ছা তিনটি আয়াত।

মোট কথা, আমাদের মতে ফাতিহা পাঠ রুকন হিসাবে নির্ধারিত নয়। তদ্রূপ তার সাথে সূরা মিলানোও।[২০] ফাতিহা সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। এবং উভয়টি সম্পর্কে ইমাম মালিক (র.)-এর ভিন্ন মত রয়েছে।

---

১৮. ইব্ন আলী শায়বার বর্ণনা মতে চতুর্থটি হলো ربنا لك الحمد

১৯. কেননা বিসমিল্লাহ্ ফাতিহার অন্তর্ভুক্ত আয়াত কি না, সে সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ফাতিহা অন্তর্ভুক্ত হলে তো প্রত্যেক রাকাআতের ফাতিহার সাথে তা পড়া উচিত, না পড়লে ফাতিহা পাঠ সম্পূর্ণ হবে না। সুতরাং মতপার্থক্য এড়ানোর জন্য পড়ে যাওয়া উচিত।

২০. অর্থাৎ ফাতিহা পাঠ করা রুকন নয়। কুরআনের অংশবিশেষ পাঠ করা রুকন। তবে ফাতিহাও কুরআনের অংশ বিধায় তা পাঠ করবে। রুকন আদায় হয়ে যাবে। তদ্রূপ কুরআনের যে কোন অংশ পাঠ করলেও রুকন আদায় হবে। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে ফাতিহা পাঠ হলে রুকন। ইমাম মালিক (র.)-এর মতে ফাতিহা পাঠ ও সূরা মিলানো উভয়ই রুকন।

ইমাম মালিক (র.)-এর দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ لاَصَلَوٰةَ اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مَعَهَا –ফাতিহা এবং তার সাথে সংযুক্ত একটি সূরা ছাড়া সালাত হয় না।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ لاَ صَلَوٰةَ اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ –সূরাতুল ফাতিহা ছাড়া সালাত হয় না।

আমাদের দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْانِ –কুরআনের যে অংশ সহজে সম্ভব হয়, তোমরা পড়ো। আর 'খাবরুল ওয়াহিদ' হাদীছ দ্বারা কিতাবুল্লাহ্র সাথে অতিরিক্ত বিষয় যোগ করা বৈধ নয়। তবে তার উপর আমল ওয়াজিব। তাই আমরা সূরাতুল ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলানোকে ওয়াজিব বলি।

ইমাম যখন وَلاَ الضَّالِّيْنَ ***বলবে তখন*** اٰمِيْنَ ***বলবে। এবং মুক্তাদিও তা বলবে।*** কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَامِنُوْا –ইমাম যখন আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বলো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْن –ইমাম যখন وَلاَ الضَّالِّيْنَ বলে তখন তোমরা আমীন বলবে।

এটা 'কর্ম-বন্টন' হিসাবে গণ্য করার ব্যাপারে ইমাম মালিক (র.)-এর দলীল হতে পারে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হাদীছের শেষে বলেছেন ঃ فَاِنَّ الاِمَامِ يَقُوْلُهَا (কেননা ইমাম তা বলেন)।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***মুক্তাদিরা তা অনুচ্চৈঃস্বরে বলবে।*** কেননা আমাদের পূর্ব বর্ণিত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদের হাদীছে এরূপ আছে।

তাছাড়া এটা দু'আ বিশেষ। সুতরাং গোপন করার উপরই তার ভিত্তি হবে।

শব্দটিতে দীর্ঘ আলিফ ও হ্রস্ব আলিফ দুটো উচ্চারণই রয়েছে। শব্দে (মীমের) উপর তাশদীদ প্রয়োগ মারাত্মক ভুল।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***তারপর তাকবীর বলবে ও রুকূ করবে।***

الجامع الصغير গ্রন্থে রয়েছে যে, নত হওয়ার সংগে তাকবীর বলবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নামাযে প্রত্যেক উঠা-নামার সময় তাকবীর বলতেন।

তাকবীরকে খাটোভাবে উচ্চারণ করবে। কেননা তাকবীরের প্রথমাংশে লম্বা করা দীনের দৃষ্টিতে ভুল। কেননা তা প্রশ্নবোধক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে শেষাংশে লম্বা করা ভাষাগত দিক থেকে ভুল।

উভয় হাত দুই হাঁটুতে স্থাপন করবে এবং আংগুলগুলোর মাঝে ফাঁক রাখবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আনাস (রা.)-কে বলেছেন ঃ اِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلٰى رُكْبَتَيْكَ وَفَرِّجْ بَيْنَ اَصَابِعِكَ –যখন তুমি রুকূ করবে তখন তোমার দু'হাত হাঁটুতে রাখবে। এবং তোমার আংগুলগুলোর মাঝে ফাঁক করবে।

এ অবস্থা ছাড়া অন্য কখনো আংগুল ফাঁক রাখা মুস্তাহাব নয়, যেন শক্ত করে ধরা হয়। তদ্রূপ সাজদার অবস্থা ছাড়া অন্য কখনো আংগুলগুলো মিলিয়ে রাখা মুস্তাহাব নয়। এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিবে।

আর পিঠকে সমতল ভাবে রাখবে। কেননা নবী (সা.) যখন রুকূ করতেন তখন তাঁর পিঠ সমতলভাবে রাখতেন।

এবং নিজ মাথা উপরের দিকে উঠাবে না এবং ঝুকাবেও না। কেননা নবী (সা.) যখন রুকূ করতেন তখন তিনি মাথা উপরের দিকে উঠাতেন না এবং ঝুঁকিয়েও রাখতেন না।

আর তিনবার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ বলবে। আর এটা হলো তাসবীহের সর্বনিম্ন পরিমাণ। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِىْ رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ –তোমাদের কেউ যখন রুকূ করে তখন সে যেন তার রুকূতে তিনবার سبحان ربى العظيم বলে। আর এটা হলো তার সর্বনিম্ন পরিমাণ।

অর্থাৎ বহুবচন পূর্ণ করার সর্বনিম্ন পরিমাণ।

তারপর মাথা তুলবে এবং سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে আর মুক্তাদি رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইমাম তা বলবেন। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, ইমাম তা মনে মনে বলবেন। কেননা আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা.) উভয় যিকিরকে একত্র করতেন।

তাছাড়া ইমাম অন্যকে (তা বলতে) উদ্বুদ্ধ করছেন। সুতরাং তিনি নিজেকে তা বলতে পারেন না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

ইমাম যখন বলেন ..... سمع বলেন তখন তোমরা ... ربنا বলো। এ হল বন্টন, যা শরীকির পরিপন্থী। এজন্যই তো আমাদের মতে মুক্তাদি سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে না। অবশ্য ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

তাছাড়া ইমামের তাহমীদ[২১] মুক্তাদির তাহমীদের পরে হয়ে যাবে, যা ইমামত পদবীর পরিপন্থী।

আর আবূ হুরায়রা (র.) বর্ণিত হাদীছ মুনফারিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশুদ্ধ মতে মুনফারিদ উভয়টিকে একত্র করবে। যদিও শুধু سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলা এবং অপর রিওয়ায়াতে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

আর ইমাম মুক্তাদিকে তাহমীদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তা পালন করেছেন।[২২]

ইমাম কুদূরী বলেন ঃ *অতঃপর যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে এবং সাজদায় যাবে।*

তাকবীর ও সাজদার কারণ তা যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি। তবে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবশ্য ফরয নয়। তদ্রূপ দুই সাজদার মাঝে বসা এবং রুকূ ও সাজদায় সুস্থির হওয়াও ফরয নয়। এটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত।

---

২১. অর্থাৎ ربنا لك الحمد বলা।

২২. অর্থাৎ নবী (সা.) নামাযের প্রত্যেক উঠা-নামার সময় তাকবীর বলতেন, এই হাদীছ এবং তোমরা রুকূ কর ও সাজদা করো এই আয়াত।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এগুলো সবই ফরয। ইমাম শাফিঈ (র.)-এরও এইমত। কেননা দ্রুততার সাথে সালাত আদায়কারী জনৈক বেদুঈন সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, قُمْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ –দাঁড়াও এবং (পুনঃ) সালাত আদায় কর। কেননা তুমি সালাত আদায় করনি।[২৩] ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর দলীল এই যে, رُكُوْع -এর অভিধানিক অর্থ মাথা ঝুঁকানো এবং سجود -এর আভিধানিক অর্থ মাথা পূর্ণ অবনত করা। সুতরাং রুকূ ও সাজদার সর্বনিম্ন পরিমাণের সাথে রুকনের সম্পর্ক হবে।[২৪] তদ্রূপ (রুকূ থেকে সাজদায় বা সাজদা থেকে সাজদায়) গমনের ক্ষেত্রেও সর্বনিম্ন পরিমাণ বিবেচ্য হবে। কেননা তা উদ্দেশ্য নয়।[২৫]

আর বর্ণিত হাদীছের শেষাংশে বেদুঈন সাহাবীর আমলকে সালাত আখ্যায়িত করা হয়েছে কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন وما نَقَصْتَ مِنْ هٰذَا شَيْئًا فَقَدْ نَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ –তা থেকে যে পরিমাণ তুমি কম করলে, মূলতঃ তুমি তোমার সালাত থেকে সেই পরিমাণ ক্ষতি করলে।[২৬]

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, তারপর 'কাওমাহ' ও 'জালছা'[২৭] সুন্নাত। অদ্রূপ ইমাম (আবূ আবদুল্লাহ্) জুরজানী (র.)-এর তাখরীজ (মাসআলা বিশ্লেষণ) মুতাবিক সুস্থিরতা অবলম্বন করাও সুন্নত। আর ইমাম কারখী (র.)-এর তাখরীজ মুতাবিক তা ওয়াজিব। সুতরাং তাঁর মতে সুস্থিরতা বর্জন করলে সাজদা সাহ্ ওয়াজিব হবে। ***আর উভয় হাত মাটিতে রাখবে।*** কেননা ওয়াইল ইব্‌ন হুজ্‌র (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সালাতের স্বরূপ দেখাতে গিয়ে সাজদা করেছেন এবং উভয় হাতের তালুর উপর ভর দিয়েছেন এবং নিতম্ব উঁচু করে রেখেছেন।

আর মুখমণ্ডল দুই হাতের তালুর মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করবে। এবং উভয় হাত উভয় কান বরাবর রাখবে। কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) এরূপ করেছেন।

ইমাম কুদূরী বলেন ঃ ***আর নিজের নাক ও কপালের উপর সাজদা করবে।*** কেননা নবী (সা.) নিয়মিত এরূপ করেছেন।

তবে যদি দু'টির একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে তাহলে তা ইমাম আবূ হানীফা

---

২৩. বোঝা গেলো যে, যাবতীয় রুকন সুস্থিরতার সাথে আদায় না করলে সালাত দুরস্ত হবে না। সুতরাং আলোচ্য হাদীছের আলোকে 'সুস্থিরতা' একটি ফরয বলে প্রমাণিত হলো।

২৪. অর্থাৎ اركعوا واسجدوا। আয়াত দ্বারা রুকূ ও সাজদা নামাযের অংশ বা রুকন সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং যে ন্যূনতম পরিমাণ দ্বারা রুকূ ও সাজদা সম্পন্ন হবে, ততটুকুই রুকন হবে। পক্ষান্তরে 'সুস্থিরতা' অবলম্বনের অর্থ হচ্ছে রুকূ ও সাজদাকে প্রলম্বিত করা। আর তা আয়াতের দাবী নয়।

২৫. রুকূ ও সাজদা হলো উদ্দেশ্য। সাজদায় গমনকালের যে অংগ সঞ্চালন, সেটা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং ঐ পরিমাণ অংগ সঞ্চালনই যথেষ্ট হবে, যা দ্বারা রুকূ-সাজদা থেকে এবং এক সাজদা অন্য সাজদা থেকে পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে।

২৬. 'সুস্থিরতা' বর্জন করা যদি নামায নষ্টের কারণ হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এটাকে নামায আখ্যায়িত করতেন না।

২৭. কাওমাহ অর্থ রুকূ ও সাজদার মধ্যবর্তী সময়ের দাঁড়ানো। জালসাহ অর্থ দুই সাজদার মধ্যবর্তী বসা।

(র.)-এর মতে জাইয। ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, ওযর ছাড়া শুধু নাকের উপর সীমাবদ্ধ করা জাইয হবে না।

আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে প্রাপ্ত আরেক রিওয়ায়াত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ –আমাকে 'সপ্ত প্রত্যঙ্গের উপর সাজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তন্মাধ্য কপালকেও তিনি গণ্য করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, ভূমিতে মুখমণ্ডলের অংশ বিশেষ স্থাপন দ্বারাই সাজদা সম্পন্ন হয়। আর তাই আদিষ্ট বিষয়। তবে সর্বসম্মতিক্রমে গণ্ডদেশ ও চিবুক এর থেকে বহির্ভূত।

আর আলোচ্য হাদীছের প্রসিদ্ধ বর্ণনায় (جبهة এর স্থলে)। وجه (মুখমণ্ডল) শব্দটি রয়েছে।[২৮]

উভয় হাত এবং উভয় হাঁটু মাটিতে স্থাপন করা আমাদের নিকট সুন্নাত। কেননা এ দু'টো ছাড়াও সাজদা সম্পন্ন হয়।

আর দুই পা মাটিতে রাখা সম্পর্কে ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন যে, সাজদায় তা ফরয।[২৯]

আর যদি পাগড়ীর 'প্যাঁচ' এর উপর বা বাড়তি কাপড়ের উপর সাজদা করে তবে তা জাইয হবে। কেননা নবী (সা.) তাঁর পাগড়ীর প্যাঁচের উপর সাজদা করতেন। আরো বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) এক কাপড়ে সালাত আদায় করেছেন এবং বাড়তি অংশ দ্বারা ভূমির গরম ও ঠাণ্ডা থেকে নিজেকে রক্ষা করেন।

এবং নিজের উভয় বাহু খোলা রাখবে। কেননা নবী (সা.) বলেছেন ঃ وَأَبْدِ ضَبْعَيْكَ –তুমি তোমার উভয় বাহু খোলা রাখবে। কোন কোন বর্ণনায় (أبد এর স্থলে) أَبِدَّ রয়েছে। এটা ابداد থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ প্রসারিত করা। আর প্রথমটি ابداء থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ প্রকাশ করা।

এবং তার পেট উভয় উরু থেকে পৃথক রাখবে। কেননা নবী (সা.) সাজদা করার সময় এতটা পৃথক রাখতেন যে, বকরীর ছোট বাচ্চা ইচ্ছা করলে তাঁর নীচে দিয়ে অতিক্রম করতে পারতো। বলা হয়েছে যে, কাতারে সালাত আদায়ের সময় বাহু বেশী পৃথক করবে না, যাতে পার্শ্ববর্তী মুসল্লী কষ্ট না পায়।

আর পায়ের আংগুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ

إِذَا سَجَدَ الْمُؤْمِنُ سَجَدَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ فَلْيُوَجِّهْ مِنْ أَعْضَائِهِ الْقِبْلَةَ مَا اسْتَطَاعَ

---

২৮. সুতরাং কপাল ও নাক উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

২৯. কেননা সাজদা সম্পন্ন হয় মাটিতে মাথা রাখা এবং মাটি থেকে মাথা তোলার মাধ্যমে। আর পায়ের পাতা মাটিতে রাখা ছাড়া এ কাজ দু'টো সহজে পালন করা সম্ভব নয়। আর যা ব্যতিরেকে সহজে ফরয আদায় করা যায় না, তা ফরযের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং কেউ যদি সাজদায় গিয়ে পা মাটি থেকে আলগা করে রাখে, তাহলে তার সাজদা হবে না। অবশ্য এক পা উঠিয়ে রাখলে জাইয হবে কিন্তু মাকরূহ হবে। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে, ফরয না হওয়ার ব্যাপারে হাতের তালু ও পায়ের পাতা দুটোই সমান। –মাবসূত।

–মু'মিন যখন সাজদা করে তখন তার প্রতিটি অংগ সাজদা করে। সুতরাং সে যেন তার অংগগুলোকে যতদূর সম্ভব কিবলামুখী করে রাখে।

আর সাজদার মধ্যে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى ***বলবে। আর তাহল তার সর্বনিম্ন পরিমাণ।*** কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

وَاِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِيْ سُجُوْدِهٖ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ثَلٰثًا وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ –তবে তোমাদের কেউ যখন সাজদা করে তখন সে যেন তার সাজদার তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى বলে। আর এটি হলো তার সর্বনিম্ন পরিমাণ।

অর্থাৎ পূর্ণ বহুবচনের সর্বনিম্ন পরিমাণ। রুকূ ও সাজদার ক্ষেত্রে বেজোড় সংখ্যায় শেষ করা সহ তিনবারের অধিক বলা মুসতাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বেজোড় সংখ্যায় শেষ করতেন।

আর যদি কেউ ইমাম হয় তাহলে সংখ্যা এত বৃদ্ধি করবে না যা মুসল্লিগণের ক্লান্তির কারণ হয় এবং অবশেষে (জামাআতের প্রতি) তা বিরক্তি সৃষ্টি করে।

রুকূ ও সাজদায় তাসবীহ্ পাঠ সুন্নাত। কেননা আয়াতে উভয়টি তাসবীহ্ ব্যতিরেকেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের উপর বৃদ্ধি করা যাবে না।

আর স্ত্রীলোক নীচু হয়ে সাজদা করবে এবং তার পেট উরুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা এটি তার জন্য সতরের অধিক উপযোগী।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***অতঃপর সে তার মাথা উঠাবে এবং তাকবীর বলবে।*** এর দলীল ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ যখন সুস্থির হয়ে বসবে তখন তাকবীর বলবে ও সাজদায় যাবে। কেননা বেদুঈন (কে নামায শিক্ষাদান) সম্পর্কিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ ثُمَّ ارْفَعْ رَاْسَكَ حَتّٰى تَسْتَوِيَ جَالِسًا –তারপর তুমি তোমার মাথা তুলবে এমনকি সোজা হয়ে বসবে।

যদি সোজা হয়ে না বসে তাকবীর বলে আর এক সাজদায় চলে যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। পূর্বেই আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

মাথা তোলার পরিমাণ সম্পর্কে মাশায়েখগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, যদি সে সাজদার অধিক নিকটবর্তী থেকে যায়, তাহলে জাইয হবে না। কেননা, তাকে (পূর্ববর্তী) সাজদায় রয়ে গেছে বলে গণ্য করা হবে। আর যদি বসার অধিক নিকটবর্তী হয় তাহলে জাইয হবে। কেননা তাকে উপবিষ্ট গণ্য করা হবে। তাতে দ্বিতীয় সাজদা হয়ে যাবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***যখন সাজদায় গিয়ে সুস্থির হবে এরপর তাকবীর বলবে।*** এর দলীল আমরা বলে এসেছি।

আর উভয় পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, বসবে না এবং উভয় হাত দ্বারা যমীনের উপর ভর দিবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, সামান্য সময় বসার পর যমীনের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবে। কেননা, নবী (সা.) এরূপ করেছেন।

আমাদের দলীল হলো আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছ। নবী (সা.) সালাতে তাঁর উভয় পায়ের সম্মুখ ভাগের উপর ভর করে দাঁড়াতেন।

ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছটি বার্ধক্যের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। তাছাড়া এটি বিশ্রাম বৈঠক। আর সালাত তো বিশ্রাম লাভের জন্য প্রবর্তিত হয়নি।

প্রথম রাকাআতে যা করেছে, দ্বিতীয় রাকাআতে তাই করবে। কেননা দ্বিতীয় রাকাআত হচ্ছে রুকানসমূহের পুনরাবৃত্তি।

তবে ছানা পড়বে না এবং আউযুবিল্লাহ্ পড়বে। কেননা উভয়টি একবারই পাঠ করা শরীআতে প্রমাণিত।

প্রথম তাকবীর ছাড়া আর কখনো দুই হাত উঠাবে না। রুকূতে যাওয়া এবং রুকূ থেকে উঠার ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

আমাদের দলীল এই যে, নবী (সা.) বলেছেন ঃ

لَاتُرْفَعُ الاَيْدِى اِلاَّ فِى سَبْعِ مَوَاطِنَ تَكْبِيْرَةَ الافتتاح وَتَكْبِيْرِةِ الْقُنُوْتِ وَتَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ

–সাতটি স্থান ছাড়া অন্য কোথাও হাত তোলা হবে না। তাকবীরে তাহরীমা, কুনূতের তাকবীর ও ঈদের তাকবীরসমূহ।

বাকী চারটি স্থান হজ্জ প্রসংগে উল্লেখ করেছেন।

হাত তোলা সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণনা করা হয়, তা ইসলামের প্রথম যুগের উপর ধর্তব্য। এরূপ ইব্ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।[৩০]

দ্বিতীয় রাকাআতের দ্বিতীয় সাজদা থেকে যখন মাথা তুলবে, তখন বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা সম্পূর্ণ দাঁড় করায়ে রাখবে এবং আংগুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে।

সালাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বসার এরূপ বিবরণই আইশা (রা.) দিয়েছেন।

আর উভয় হাত উরুদ্বয়ের উপর রাখবে ও আংগুলগুলো বিছিয়ে রাখবে এবং তাশাহ্হুদ পড়বে।

ওয়াইল (রা.)-এর হাদীছে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এতে হাতের আংগুলগুলো কিবলামুখী হয়।

---

৩০. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র জনৈক ব্যক্তিকে মাসজিদুল হারামে নামায পড়তে দেখলেন। সে রুকূতে যাওয়া এবং রুকূ থেকে উঠার সময় হাত তুলছিল। সে লোকটি নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর ইব্ন যুবায়র (রা.) তাকে বললেন, এটা করো না। কেননা নবী (সা.) প্রথমে এটা করেছেন কিন্তু পরে বাদ দিয়েছেন,–নিহায়াহ।

আর যদি সালাত আদায়কারী মহিলা হয়, তবে সে বাম নিতম্বের উপর বসবে এবং ডান দিক দিয়ে উভয় পা বের করে দেবে। কেননা এটা তার সতরের জন্য অধিক উপযোগী। আর তাশাহ্হুদ হলো এই ঃ

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الخ۔

–যাবতীয় মৌখিক ইবাদাত আল্লাহ্র জন্য এবং যাবতীয় দৈহিক ইবাদাত আল্লাহ্রই জন্য এবং যাবতীয় আর্থিক ইবাদাত আল্লাহ্রই জন্য। হে নবী আপনার উপর সালাম ... শেষ পর্যন্ত। (অর্থাৎ আল্লাহ্র রহমত ও বরকত হোক।[৩১] আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাদের উপর সালাম হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।)

এটা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা.) বর্ণিত তাশাহ্হুদ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিলেন; যেমন তিনি আমাকে কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বললেন ঃ قل التحيات لله الى اخره (বলো, আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ...... ইলা আখেরিহি)। ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর তাশাহ্হুদ গ্রহণ করা উত্তম ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বর্ণিত তাশাহ্হুদ থেকে। তাঁর তাশাহ্হুদ হচ্ছে ঃ

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ، سَلَامٌ عَلَيْنَا اِلَى اخره۔

কেননা, ইব্ন মাস'উদের হাদীছে قُلْ আদেশবাচক ক্রিয়া রয়েছে, যার ন্যূনতম চাহিদা হলো মুস্তাহাব হওয়া। তাছাড়া السلام -এ الف ও لام যুক্ত রয়েছে, যা সামগ্রিকতা বুঝায়। আর মধ্যে واو অতিরিক্ত রয়েছে, যা বক্তব্যের নবায়ন বুঝায়। যেমন কসমের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।[৩২] তাছাড়া শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এতে অধিক জোর দেওয়া হয়েছে।[৩৩]

প্রথম বৈঠকে এর উপর কিছু অতিরিক্ত করবে না। কেননা ইব্ন মাস'উদ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে সালাতের মাঝের এবং সালাতের শেষের তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন। যখন সালাতের মধ্যবর্তী তাশাহ্হুদ হতো, তখন তিনি তাশাহ্হুদ শেষ করে দাঁড়িয়ে

---

৩১. মি'রাজের পবিত্র রাত্রে আমাদের প্রিয় নবী (সা.) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাহিয়্যা পেশ করলেন; তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে সালাম হাদিয়া দিলেন। তার উত্তরে নবী (সা.) উম্মাতের নেক বান্দাদেরকেও সেই সালামের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

৩২. অর্থাৎ এখানে التحيات ও الصلوات ও الطيبات প্রতিটি আলাদা প্রশংসা বাক্য হবে। পক্ষান্তরে واو ছাড়া হলে সবগুলো মিলে একটা মাত্র প্রশংসা বাক্য হবে। কেননা তখন শব্দগুলো معطوف ও معطوف عليه না হয়ে একটা অন্যটার صفت হবে। যেমন কেউ কসম করে বললো والله والرحمن لافعلن كذا তাহলে কসম ভংগ হওয়ার সুরতে দু'টো কাফ্ফারা দিতে হবে। কেননা واو এর কারণে দুটো কসম হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি والله الرحمن বলতো তাহলে একটা কসম হতো।

৩৩. শিক্ষাদানের কথা অবশ্য ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছেও রয়েছে; তবে ইব্ন মাস'উদকে শিক্ষা দানে অধিক গুরুত্ব দান করা হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইব্ন মাস'উদ (রা.)-কে হাত ধরে শিক্ষা দিয়েছেন আর তিনিও আলকামা এবং তিনি ইবরাহীম নাখঈকে এবং তিনি পরবর্তী রাবীকে হাত ধরে শিখিয়েছেন।

যেতেন। আর যখন সালাতের শেষদিকের তাশাহ্হুদ হতো তখন (এরপর) নিজের জন্য যা ইচ্ছা তা দু'আ করতেন।

শেষ দুই রাকাআতে শুধু সূরাতুল ফাতিহা পড়বে। কেননা, আবূ কাতাদা (রা.) বর্ণিত হাদীছে আছে যে, নবী (সা.) শেষ রাকাআতে কেবল সূরাতুল ফাতিহা পড়েছেন।

এ বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো ফাতিহা পাঠ উত্তম।[৩৪] এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা প্রথম দুই রাকাআতেই কিরাত ফরয, যার বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ পরে আসবে।

আর শেষ বৈঠকে ঐ অবস্থাতেই বসবে, যে অবস্থায় প্রথম বৈঠকে বসেছিলো। কেননা ওয়াইল (রা.) ও 'আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছে এরূপই আছে।

তাছাড়া এরূপ বসা শরীরের জন্য কষ্টদায়ক। সুতরাং তা উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসা, যা ইমাম মালিক (রা.) গ্রহণ করেছেন, তার তুলনায় উত্তম হবে।

আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিতম্বের উপর বসেছেন বলে বর্ণিত হাদীছকে ইমাম তাহাবী (র.) দুর্বল বলেছেন, অথবা তা বার্ধক্যের অবস্থার উপর আরোপ করা হবে।

আর তাশাহ্হুদ পড়বে। আমাদের নিকট তা ওয়াজিব।

আর নবী (সা.)-এর উপর দুরূদ পড়বে। আমাদের নিকট তা ফরয নয়।

উভয় ক্ষেত্রেই শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। (আমাদের দলীল) কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

اِذَا قُلْتَ هٰذَا اَوْ فَعَلْتَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ ، اِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ وَاِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ ـ

–যখন তুমি এটা বলবে বা করবে[৩৫] তখন তোমার সালাত পূর্ণ হয়ে গেলো। যদি তুমি উঠে পড়তে চাও তাহলে উঠে পড়ো আর যদি আরো বসতে চাও তাহলে বসো।

আর সালাতের বাইরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর দুরূদ পাঠ ওয়াজিব। ইমাম কারখী (র.)-এর মতে শুধু একবার আর ইমাম তাহাবী (র.)-এর মতে যখনই নবী (সা.)-এর আলোচনা হয়। সুতরাং আমাদের উপর অর্পিত আদেশের দায়িত্ব পালিত হয়ে যায়[৩৬] এর মাধ্যমে। আর তাশাহ্হুদের ক্ষেত্রে فرض শব্দটি যে বর্ণিত হয়েছে, (তার উত্তর এই যে,) তার অর্থ হলো নির্ধারিত সময়।[৩৭]

---

৩৪. অর্থাৎ শেষ দুই রাকাআতে সূরাতুল ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব নয়, বরং উত্তম মাত্র।

৩৫. অর্থাৎ যখন তুমি তাশাহ্হুদ পাঠ করবে বা তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসবে। এখানে সালাতের পূর্ণতাকে দু'টি বিষয়ের যে কোন একটির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর এটা সর্বসম্মত যে, তাশাহ্হুদ পরিমাণ বৈঠক ফরয। অর্থাৎ সালাতের পূর্ণতা এর সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং দ্বিতীয়টির সাথে অর্থাৎ তাশাহ্হুদ পড়ার সাথে সালাতের পূর্ণতা সম্পৃক্ত হতে পারে না।

৩৬. অর্থাৎ আয়াতে কারীমায় নবী (সা.)-এর উপর দুরূদ পাঠের যে নির্দেশ রয়েছে, তার দাবী তো হলো জীবনে মাত্র একবারের জন্য ওয়াজিব হওয়া, সে দাবী তো পূরণ হয়ে গেছে। সুতরাং সালাতের ভিতরেও একই আয়াতের প্রেক্ষিতে দুরূদ ওয়াজিব করার অবকাশ নেই।

৩৭. ইমাম শাফিঈ (র.) তাশাহ্হুদ ফরয হওয়ার দলীল হিসাবে ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর হাদীছ পেশ করেছেন। তিনি বলেন, ... كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد আমাদের বক্তব্য হলো এখানে يفرض শব্দটিকে সুপরিচিত অর্থে গ্রহণ করলে اذا قلت هذا أو فعلت এর সাথে সংঘর্ষপূর্ণ হয়। সুতরাং শব্দটির আভিধানিক অর্থই গ্রহণ করতে হবে, যাতে উভয়ের মাঝে সাযুজ্য বিধান হয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *এবং কুরআনের শব্দাবলী ও হাদীছে বর্ণিত দু'আসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দু'আ করবে।*

প্রমাণ, ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত ইব্‌ন মাস'উদ (রা.)-এর হাদীছ। নবী (সা.) তাঁকে বলেছেন, এরপর তুমি তোমার কাছে উত্তম ও পসন্দনীয় দু'আ নির্বাচন করে নাও।

আর এ দু'আর আগে নবী (সা.)-এর উপর দুরূদ পাঠ করবে, যাতে দু'আ কবুলিয়াতের অধিক সম্ভাবনাপূর্ণ হয়।

মানুষের কথাবার্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ভাষায় দু'আ করবে না যাতে সালাত নষ্ট না হয়। সুতরাং হাদীছে বর্ণিত ও সংরক্ষিত শব্দদ্বারাই দু'আ করা উচিত।

আর যে সকল প্রার্থনা মানুষের কাছে করা অসম্ভব নয়, সেগুলোই মানুষের কালামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেমন এ কথা বলা, হে আল্লাহ্! আমাকে অমুক নারী বিয়ে করিয়ে দিন। পক্ষান্তরে যা মানুষের কাছে চাওয়া সম্ভব নয়, তা মানুষের কালামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। যেমন এ কথা বলা, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ (হে আল্লাহ্ আমাকে মা'ফ করুন)। আর اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ বলাটা প্রথম শ্রেণীভুক্ত।[৩৮] কেননা মানুষের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার রয়েছে। বলা হয় رَزَقَ الْاَمِيْرُ الْجَيْشَ (শাসক বাহিনীকে বেতন বা রেশন দিলেন।

এরপর اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ বলে নিজের ডান দিকে সালাম ফিরাবে। এবং বাম দিকে অনুরূপভাবে সালাম ফিরাবে। কেননা ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা.) তাঁর ডান দিকে এমন ভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর ডান গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেতো এবং তাঁর বাম দিকে এমন ভাবে সালাম ফেরাতেন যে, তাঁর বাম গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেতো।

প্রথম সালাম দ্বারা তার ডান দিকের নারী-পুরুষ ও ফেরেশতাদের নিয়্যাত করবে। তদ্রূপ দ্বিতীয় সালামে। কেননা আমল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান যুগে স্ত্রী লোকদের নিয়্যত করবে না।[৩৯] এবং তাদেরও নিয়্যত করবে না, যারা তার শরীক নয়। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা সম্বোধন উপস্থিতদের প্রাপ্য।[৪০]

(সালামের সময়) মুক্তাদির জন্য তার ইমামের নিয়্যত করা জরুরী। সুতরাং ডানে বা বামে থাকলে তাদের সাথেই তার নিয়্যত করে নিবে।

আর যদি তার বরাবরে থাকেন, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ডান দিকের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম সালামের সময় তার নিয়্যত করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর

---

৩৮. কোন কোন মতে এটা মানবীয় কথা নয়। কেননা রিযিকদাতা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ হতে পারে না।

৩৯. কেননা যামানা খারাপ হয়ে গেছে। সুতরাং নারী প্রসংগ চিন্তা করে সেদিকে মনোযোগী হওয়া ইমামের পক্ষে সমীচীন হবে না।

৪০. পক্ষান্তরে তাশাহহুদের সালাম উপস্থিত অনুপস্থিত সকল নেক বান্দার প্রাপ্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন মুসল্লী যখন السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين বলেন তখন আসমান যমীনের মাঝে সকল নেকবান্দা তাতে শামিল হয়।

মতে– আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে প্রাপ্ত একটি মত– উভয় সালামে তার নিয়্যত করবে। কেননা তিনি উভয় দিকের অংশীদার।

আর একা একা সালাত আদায়কারী শুধু ফেরেশতাদের নিয়্যত করবে, অন্য কারো নিয়্যত করবে না। কেননা, তার সাথে তাঁরা ব্যতীত অন্য কেউ নেই। *আর ইমাম উভয় সালামে উক্ত (মুক্তাদি ও ফেরেশতাদের) নিয়্যত করবে।*

এ-ই বিশুদ্ধ মত। ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যার নিয়্যত করবে না। কেননা তাদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছ বর্ণিত আছে। সুতরাং তা আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি ঈমান আনয়নের সদৃশ।[৪১]

আমাদের মতে 'সালাম' শব্দ উচ্চারণ করা ওয়াজিব, ফরয নয়। এ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা প্রমাণ পেশ করেনঃ

تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ –সালাত শুরু করবে তাকবীর দ্বারা আর তা থেকে বের হবে সালাম দ্বারা ।

আমাদের দলীল হলো বর্ণিত ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর হাদীছ (যাতে শেষ বৈঠকের পর বসে থাকার কিংবা উঠে পড়ার ইখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে) আর এই ইখতিয়ার প্রদান ফরয বা ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থী। তবে আমরা সতর্কতা অবলম্বনে ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত করেছি। আর এ পর্যায়ের হাদীছ দ্বারা ফরয হওয়া প্রমাণিত হয় না। আর আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

পরিচ্ছেদ ঃ কিরাত

ইমাম হলে ফজরে এবং মাগরিব ও ঈশার প্রথম দুই রাকাআতে উচ্চৈঃস্বরে কিরাত পড়বে এবং শেষ দুই রাকাআতে অনুচ্চৈঃস্বরে পড়বে। এটাই পরম্পরায় চলে এসেছে। *আর যদি মুনফারিদ হয় তা হলে সে ইচ্ছাধীন। চাইলে সে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করবে এবং নিজকে শোনাবে।*[৪২] কেননা নিজের ব্যাপারে সে নিজের ইমাম। আর চাইলে চুপে চুপে পাঠ করবে। কেননা, তার পিছনে এমন কেউ নেই, যাকে সে শোনাবে। তবে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করাই উত্তম। যাতে জামা'আতের অনুরূপ আদায় হয়।

---

৪১. কোন বর্ণনায় দুইজন, কোন বর্ণনায় পাঁচজন, কোন বর্ণনায় ষাটজন এবং কোন বর্ণনায় একশ' ষাটজনের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান পোষণের ক্ষেত্রে যেমন আমরা নির্দিষ্ট কোন সংখ্যার নিয়্যত করি না তেমনি এখানেও ফেরেশতাদের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নিয়্যত করবো না।

৪২. অর্থাৎ মুনফারিদ এক হিসাবে ইমাম। কেননা সে অন্য কারো জন্য না হলেও নিজের জন্য তো ইমামের দায়িত্ব পালন করছে। আর উচ্চস্বরে কিরাত হলো ইমামতির বৈশিষ্ট্য সুতরাং তাকে উচ্চস্বরে পড়ার অধিকার দেয়া হবে। তবে ন্যূনতম পরিমাণ উচ্চস্বরে পড়বে। অর্থাৎ শুধু নিজেকে শুনিয়ে পড়বে। কেননা উচ্চস্বরে পাঠ করার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ পাকের আয়াত সম্পর্কে চিন্তার জন্য মনোযোগ নিবদ্ধ করা। আর তার ক্ষেত্রে শুধু নিজেকে শুনিয়ে পড়লেই তা হাসিল হয়ে যায়। তবে ইমাম না হওয়ার দিকটি বিবেচনা করে ইচ্ছা করলে অনুচ্চস্বরে পড়তে পারে।

যুহর ও আসরে ইমাম কিরাত চুপে চুপে পড়বে। এমন কি আরাফাতে হলেও। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ –দিবসের সালাত নির্বাক। অর্থাৎ তাতে শ্রুত কিরাত নেই।

আরাফা সম্পর্কে ইমাম মালিক (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে।[৪৩] আর আমাদের বর্ণিত হাদীছটি তাঁর বিপক্ষে দলীল।

আর জুমুআ ও দুই ঈদে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করবে। কেননা উচ্চৈঃস্বরে পাঠের বর্ণনা মশহুর ভাবে চলে এসেছে। দিবসে নফল সালাতে চুপে চুপে পাঠ করবে। আর ফরয সালাতের উপর কিয়াস করে রাত্রের সালাতে মুনফারিদের ইখতিয়ার রয়েছে। কেননা, নফল সালাত হলো ফরযের সম্পূরক। সুতরাং (কিরাআতের বেলায়) নফল ফরযের অনুরূপ হবে।

যে ব্যক্তির ঈশার সালাত ফউত হয়ে যায় এবং সূর্যোদয়ের পর তা পড়ে, সে যদি উক্ত সালাতে ইমামতি করে তাহলে উচ্চস্বরে কিরাত পড়বে।

ليلة التعريس এর সকালে[৪৪] জামা'আতের সাথে ফজরের সালাত কাযা করার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেমন করেছিলেন।

আর যদি সে একা সালাত পড়ে, তাহলে অবশ্যই নীরবে কিরাত পড়বে। (উভয় রকম পড়ার) ইখতিয়ার থাকবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা উচ্চৈঃস্বরে কিরাত সম্পৃক্ত রয়েছে জামা'আতের সাথে অবশ্যম্ভাবীরূপে, কিংবা সময়ের সাথে স্বেচ্ছামূলকভাবে মুনফারিদের ক্ষেত্রে। অথচ এখানে দু'টোর কোনটাই পাওয়া যায় নি।

যে ব্যক্তি ঈশার প্রথম দুই রাকা'আতে সূরা পাঠ করল কিন্তু সূরাতুল ফাতিহা পাঠ করেনি, সে শেষ দুই রাকাআতে তা দোহরাবে না। পক্ষান্তরে যদি সূরাতুল ফাতিহা পড়ে থাকে কিন্তু তার সাথে অন্য সূরা যোগ না করে থাকে, তাহলে শেষ দুই রাকাআতে ফাতিহা ও সূরা দুটোই পড়বে এবং উচ্চৈঃস্বরে পড়বে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মত। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, দুটোর মধ্যে কোনটাই কাযা করবে না। কেননা ওয়াজিব যখন নিজ সময় থেকে ফউত হয়ে যায়, তখন পরবর্তীতে বিনা দলীলে সেটাকে কাযা করা যায় না।

উল্লেখিত ইমামদ্বয়ের পক্ষে দলীল– যা উভয় অবস্থার পার্থক্যের সাথে সম্পৃক্ত যে, সূরাতুল ফাতিহাকে শরীআতে এমন অবস্থায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, তার পরে সূরা সংযুক্ত হবে। সুতরাং যদি ফাতিহাকে শেষ দুই রাকাআতে কাযা করা হয় তাহলে তরতীবের দিক থেকে সূরার পর সূরাতুল ফাতিহা এসে যাবে। অর্থাৎ এটা নির্ধারিত অবস্থানের বিপরীত। আর (প্রথম দুই রাকাআতে) সূরা ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা শরীআত নির্ধারিতরূপে কাযা করা সম্ভব।

---

৪৩. তিনি জুমুআ ও সালাতুল ঈদের উপর কিয়াস করে উচ্চৈঃস্বরে কিরাতের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

৪৪. এক সফরে শেষ রাতে আরাম করার ফলে সাহাবাসহ নবী (সা.)-এর ফজর কাযা হয়ে যায়। এ ঘটনাকে 'লাইলাতুল তা'রীস' বলে উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, এখানকার পাঠে এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে (কাযা করা) ওয়াজিব হওয়া বুঝায়। আর মূল গ্রন্থের উল্লেখিত শব্দে মুস্তাহাব হওয়া বুঝায়। কেননা সূরার কাযা যদিও ফাতিহার পরে হচ্ছে তবু এ সূরা নিজ ফাতিহার সাথে সংযুক্ত হচ্ছে না। সুতরাং নির্ধারিত অবস্থান সর্বাংশে বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

আর উভয়টিকে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করবে।

এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা একই রাকাআতে সরব ও নীরব পাঠ একত্র করা মানায় না। আর নফল তথা ফাতিহার মধ্যে পরিবর্তন আনা উত্তম।

অনুচ্চৈঃস্বরে পাঠ হল যেন নিজে শোনতে পায়। আর উচ্চৈঃস্বরের পাঠ হল অপরে শোনতে পায়। এ হল ফকীহ্ আবূ জা'ফর হিন্দওয়ানীর মত। কেননা, আওয়াজ ব্যতীত শুধু জিহ্বা সঞ্চালনকে কিরাত বলা হয় না।

ইমাম কারখী (র.)-এর মতে উচ্চৈঃস্বরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো নিজেকে শোনানো আর অনুচ্চৈ-স্বরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো হরফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ। কেননা, কিরাত বা পাঠ মুখের কাজ, কানের কাজ নয়। কুদূরী গ্রন্থের শব্দে এর প্রতি ইংগিত রয়েছে।[৪৫]

তালাক প্রদান, আযাদ করা, ব্যতিক্রম যোগ করা ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণমূলক যাবতীয় মাসআলার মধ্যে মতপার্থক্যের ভিত্তি হল উক্ত নীতির পার্থক্যের উপর।

সালাতে যে পরিমাণ কিরাত যথেষ্ট হয়, তার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এক আয়াত আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ছোট তিন আয়াত অথবা দীর্ঘ এক আয়াত। কেননা, এর চেয়ে কম পরিমাণ হলে তাকে কারী বলা হয় না। সুতরাং তা এক আয়াতের কম পাঠ করার সমতুল্য।[৪৬]

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ –কুরআনের যতটুকু পরিমাণ সহজ হয়, তা তোমরা পড়ো। এখানে (এক আয়াত বা তার অধিকের মাঝে) কোন পার্থক্য করা হয়নি। তবে এক আয়াতের কম পরিমাণ (সর্বসম্মতিক্রমেই কুরআন গণ্য হওয়ার হুকুমের) বহির্ভূত। আর পূর্ণ আয়াত আয়াতের অংশবিশেষের সমার্থক নয়।

---

৪৫. কেননা ইমাম কুদূরী جهر এর ব্যাখ্যা করেছেন واسمع نفسه (নিজেকে শোনাবে) দ্বারা। সুতরাং অনুচ্চস্বরীয় পাঠের অর্থ হবে নিঃশব্দ উচ্চারণ।

৪৬. অর্থাৎ এক আয়াতের কম পরিমাণকে শরীআত কিরাত রূপে গণ্য করেনি তাই ঋতু অবস্থায় স্ত্রী লোকে খণ্ড আয়াত পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং এক হিসাবে খণ্ড আয়াত কুরআন নয়। সুতরাং তাতে কুরআন পড়ার ফরয আদায় হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) যে এক আয়াতের কথা বলেছেন সে সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, আয়াত যদি দুই বা ততোধিক শব্দ বিশিষ্ট হয়। যেমন فقتل كيف قدر ইত্যাদি। তবে সকল মাশায়েখের মতেই তা যথেষ্ট হবে। পক্ষান্তরে যদি এক শব্দ বিশিষ্ট আয়াত পড়ে; যেমন, مدهامتان বা এক হরফ বিশিষ্ট আয়াত পড়ে; যেমন ق ، ص ، ن ইত্যাদি তবে তাতে মাশায়েখদের দ্বিমত রয়েছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) এক আয়াতের যে কথা বলেছেন, সেখানে পূর্ণ আয়াত হওয়া জরুরী নয়। বরং অর্ধেক আয়াত যদি ছোট তিন আয়াত পরিমাণ হয়ে যায় তবে যথেষ্ট হবে।

আর সফরে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য যে কোন সূরা ইচ্ছা হয় পড়বে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) তাঁর সফরে ফজরের সালাতে ফালাক ও নাস সূরাদ্বয় পাঠ করেছিলেন তাছাড়া সালাতের অর্ধেক রহিত করার ক্ষেত্রে সফরের প্রভাব রয়েছে। সুতরাং কিরাত হ্রাস করণের ব্যাপারে তার প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। এ হুকুম তখন, যখন সফরে তাড়াহুড়া থাকে পক্ষান্তরে যদি (মুসাফির) স্থিতি ও শান্তির পরিবেশে থাকে, তাহলে ফজরের সালাতে সূরা বুরূজ ও ইনশাক্কা পরিমাণ সূরা পাঠ করবে। কেননা, এভাবে তাখফীফ সহকারে সুন্নাতের উপরও আমল সম্ভব হয়ে যাবে।

মুকীম অবস্থায় ফজরের উভয় রাকাআতে সূরাতুল ফাতিহা ছাড়া চল্লিশ বা পঞ্চাশ আয়াত পড়বে। চল্লিশ থেকে ষাট এবং ষাট থেকে একশ' আয়াত পাঠ করার কথাও বর্ণিত রয়েছে। আর এ সব সংখ্যার সমর্থনে হাদীছ এসেছে। বর্ণনাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান এভাবে হতে পারে যে, (কিরাত শ্রবণে) আগ্রহীদের ক্ষেত্রে একশ' আয়াত এবং অলসদের ক্ষেত্রে চল্লিশ আয়াত এবং মধ্যমদের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ থেকে ষাট আয়াত পাঠ করবে।

কারো কারো মতে রাত্র ছোট-বড় হওয়া এবং কর্মব্যস্ততা কম-বেশী হওয়ার অবস্থা বিবেচনা করা হবে।

ইমাম কুদূরী বলেন, *যুহরের নামাযেও অনুরূপ পরিমাণ পাঠ করবে।* কেননা সময়ের প্রশস্ততার দিক দিয়ে উভয় সালাত সমান। মবসূত গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ "কিংবা তার চেয়ে কম"। কেননা তা কর্মব্যস্ততার সময়। সুতরাং অনীহা এড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে ফজর থেকে কমানো হবে।

আসর ও 'ঈশা একই রকম। দু'টোতেই আওসাতে মুফাস্সাল পাঠ করবে। আর মাগরিবে তার চেয়ে কম অর্থাৎ তাতে 'কিসারে মুফাস্সাল' পাঠ করবে।[৪৭]

এ বিষয়ে মূল দলীল হলো আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)-এর নামে প্রেরিত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)-এর এই মর্মে লিখিত পত্র যে, ফজরে ও যুহরে 'তিওয়ালে মুফাস্সাল' পড়ো এবং আসরে ও ঈশায় 'আওসাতে মুফাস্সাল পড়ো এবং মাগরিবে 'কিসারে মুফাস্সাল' পড়ো।

তাছাড়া মাগরিবের ভিত্তিই হলো দ্রুততার উপর। সুতরাং হালকা কিরাতই তার জন্য অধিকতর উপযোগী। আর আসর ও 'ঈশায় মুস্তাহাব হলো বিলম্বে পড়া। আর কিরাত দীর্ঘ করলে সালাত দু'টি মুস্তাহাব ওয়াক্ত অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে। সুতরাং এ দুই সালাতে আওসাতে মুফাস্সাল নির্ধারণ করা হয়।

ফজরে প্রথম রাকাআতকে দ্বিতীয় রাকাআতের তুলনায় দীর্ঘ করবে, যাতে লোকদের জামা'আত ধরার ব্যাপারে সহায়ক হয়।

ইমাম কুদূরী বলেন, *যুহরের উভয় রাকাআত সমান।*

তা ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, সব সালাতেই প্রথম রাকাআতকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করা আমার কাছে পসন্দনীয়। কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) সব সালাতেই প্রথম রাকাআতকে অন্য রাকাআতের তুলনায় দীর্ঘ করতেন। প্রথমোক্ত ইমামদ্বয়ের দলীল এই যে, উভয় রাকাআতই কিরাতের সমান হকদার। সুতরাং পরিমাণের ক্ষেত্রেও উভয় রাকাআত সমান হতে হবে। তবে ফজরের সালাত এর

---

৪৭. তিওয়ালে মুফাস্সাল হলো সূরাতুল হুজুরাত হতে والسماء ذات البروج পর্যন্ত আর আওসাতে মুফাস্সাল হলো তা থেকে لم يكن সূরা পর্যন্ত আর কিসারে মুফাসসাল হলো তা থেকে শেষ পর্যন্ত।

বিপরীত। কেননা, তা ঘুম ও গাফলাতের সময়। আর উদ্ধৃত হাদীছটি সানা, আউযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ পড়ার প্রেক্ষিতে দীর্ঘ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত।

আর কম, বেশীর ক্ষেত্রে তিন আয়াতের কম ধর্তব্য নয়। কেননা অনায়াসে এতটুকু কম-বেশী থেকে বেঁচে থাকা সম্ভবপর নয়।

আর কোন সালাতের সহিত এমন কোন সূরা নির্দিষ্ট নেই যে, এটি ছাড়া সালাত জাইয হবে না। কেননা, আমরা পূর্বে যে আয়াত (فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ) পেশ করেছি, তা নিঃশর্ত।

বরং কোন সালাতের জন্য কুরআনের কোন অংশকে নির্ধারণ করে নেওয়া মাকরূহ। কেননা, তাতে অবশিষ্ট কুরআনকে বর্জন করা হয় এবং বিশেষ সূরার ফযীলতের ধারণা জন্মে।

মুক্তাদী ইমামের পিছনে কিরাত পাঠ করবে না। সূরাতুল ফাতিহার ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ভিন্ন-মত রয়েছে। তাঁর দলীল এই যে, কিরাত হলো সালাতের অন্যান্য রুকনের মত একটি রুকন। সুতরাং তা পালনে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে শরীক থাকবেন।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ –যে ব্যক্তির ইমাম রয়েছে, সেক্ষেত্রে ইমামের কিরাত তার কিরাত রূপে গণ্য। এবং এর উপরই সাহাবীদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আর কিরাত হলো উভয়ের মাঝে শরীকানামূলক রুকন। তবে মুক্তাদীর অংশ হলো নীরব থাকা ও মনোযোগসহ শ্রবণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ وَاِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوْا –(ইমাম) যখন কুরআন পাঠ করেন তখন তোমরা খামুশ থাকো।

তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সতর্কতা অবলম্বন হিসাবে পাঠ করাই উত্তম। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে তা মাকরূহ।[৪৮] কেননা এ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি রয়েছে।[৪৯]

আর মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং নীরব থাকবে। যদিও ইমাম আশা ও ভয়ের আয়াত পাঠ করেন। কেননা, নীরবে শ্রবণ ও নীরবতা আয়াত দ্বারা ফরয সাব্যস্ত হয়েছে। আর নিজে পাঠ করা, কিংবা জান্নাত প্রার্থনা করা এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়া এ সকল এতে বাধা সৃষ্টি করে।

খুতবার হুকুমও অনুরূপ। তেমনি হুকুম নবী (সা.)-এর উপর দুরূদ পাঠ করার সময়ও। কেননা, মনোযোগ সহকারে খুতবা শ্রবণ করা ফরয। *তবে যদি খতীব এ আয়াত পড়েন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ الاية তখন শ্রোতা মনে মনে দুরূদ পড়বে।*

অবশ্য মিম্বর থেকে দূরের লোকদের সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে নীরব থাকার মধ্যে ইহতিয়াত রয়েছে, যাতে (কমপক্ষে) খামুশ থাকার ফরয পালিত হয়। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই উত্তম জানেন।

---

৪৮. দৃশ্যতঃ মাকরূহ দ্বারা তাহরীমা বুঝান হয়েছে।

৪৯. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে ইমামের পিছনে কিরাত পড়বে তার মুখে আগুন। (আবূ হাইয়ান বর্ণিত, নিহায়াহ দ্রঃ)

ইমামত

জামা'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ اَلْجَمَاعَةُ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى لَايَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلاَّ مُنَافِقٌ –জামা'আত হিদায়াতের পরিচায়ক সুন্নত, মুনাফিক ছাড়া কেউ তা থেকে পিছিয়ে থাকে না।

ইমামতির জন্য সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি হলেন যিনি সালাতের মাসাইল সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত, যিনি কিরাতে সর্বোত্তম। কেননা সালাতে কিরাত অপরিহার্য। আর ইলমের প্রয়োজন হয় কোন ঘটনা দেখা দিলে।

এর উত্তরে আমরা বলি, একটি রুকন আদায়ে আমরা কিরাতের মুখাপেক্ষী আর সকল রুকন আদায়ে আমরা ইলমের মুখাপেক্ষী।

ইলমের (ক্ষেত্রে উপস্থিত) সকলে সমান হলে যিনি কিরাতে সর্বোত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ ، فَاِنْ كَانُوْا سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ –আল্লাহ্র কিতাব পাঠে সর্বোত্তম ব্যক্তি কাওমের ইমাম হবে। যদি এতে সকলে বরাবর হয় তাহলে সুন্নত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি (ইমাম হবে)।

উল্লেখ্য যে, সে যুগে কিতাবুল্লাহ্ পাঠে উত্তম ব্যক্তিই সর্বাধিক জ্ঞানীও হতেন। কেননা, তাঁরা আহকাম ও মাসায়েলসহ কুরআন শিক্ষা করতেন। তাই হাদীছে কিতাবুল্লাহ্ পাঠে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের যুগে অবস্থা সেরূপ নয়, তাই আমরা (দীনী ইলমে) সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।

এ ক্ষেত্রে সকলে সমান হলে (তিনিই ইমাম হবেন) যিনি অধিক পরহিযগার।[১] কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ مَنْ صَلّٰى خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيٍّ فَكَاَنَّمَا صَلّٰى خَلْفَ نَبِيٍّ –যে ব্যক্তি একজন পরহিযগার আলিমের পিছনে সালাত আদায় করলো, সে যেন একজন নবীর পিছনে সালাত আদায় করলো।

এ ক্ষেত্রে সকলে সমান হলে যিনি অধিকতর বয়োজ্যেষ্ঠ। কেননা নবী (সা.) আবূ মুলায়কার পুত্রদ্বয়কে বলেছিলেন ঃ وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا سِنًّا –তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে-ই যেন ইমামতি করে। তাছাড়া বয়োজ্যেষ্ঠকে আগে বাড়ালে জামা'আতের সমাগম বর্ধিত হবে।

---

১. ইমামতির ক্রম অগ্রাধিকার বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীছ শরীফে অবশ্য অধিক পরহিযগার কথাটা নেই। এদস্থলে আছে হিজরত করার ক্ষেত্রে অধিকতর প্রবীন। বর্তমানে যেহেতু হিজরতের বিষয় নেই সেহেতু আমাদের আলিমগণ এদস্থলে পরহিযগারির বিষয়টি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ গুনাহ্ থেকে হিজরত করাকে তারা দেশ থেকে হিজরতের স্থলবর্তী করেছেন।

দাসকে (ইমামতির জন্য) আগে বাড়ানো মাকরূহ। কেননা শিক্ষালাভের জন্য (সাধারণতঃ) সে অবসর পায় না। *এবং বেদুঈন (ও গ্রাম্য)-কে।* কেননা, মূর্খতাই তাদের মাঝে প্রবল *এবং ফাসিককে।* কেননা, সে দীনী বিষয়ে যত্নবান নয়। *এবং অন্ধকে* কেননা, সে পূর্ণরূপে নাপাকি থেকে বেঁচে থাকতে পারে না।

আর জারজ সন্তানকে। কেননা, তার পিতা (ও অভিভাবক) নেই, যে তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করবে। সুতরাং অজ্ঞতাই তার উপর প্রভাবিত হয়।

তাছাড়া এদের আগে বাড়ানোর কারণে জনগণের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি হয়।[২] সুতরাং তা মাকরূহ। তবে যদি তারা আগে বেড়ে যায় তাহলে সালাত দুরুস্ত হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ –তোমরা সালাত আদায় কর যে কোন নেককার ও বদকারের পিছনে।

ইমাম মুক্তাদীদের নিয়ে সালাত আদায় করতে দীর্ঘ করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

مَنْ اَمَّ قَوْمًا فَلْيُصَلِّ بِهِمْ صَلٰوةَ اَضْعَفِهِمْ فَاِنَّ فِيْهِمِ الْمَرِيْضَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ۔

–যে ব্যক্তি কোন জামা'আতের ইমামতি করে, সে যেন তাদের দুর্বলতম ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী সালাত আদায় করে। কেননা, তাদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ ও প্রয়োজনগ্রস্ত ব্যক্তি থাকতে পারে।

স্ত্রী লোকদের এককভাবে জামা'আত করা মাকরূহ। কেননা, তা একটি নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে মুক্ত নয়। আর সেটা হলো কাতারের মাঝে ইমামের দাঁড়ানো। সুতরাং মাকরূহ হবে, যেমন উলঙ্গদের জামা'আতের হুকুম।

তবে যদি তারা তা করে তাহলে ইমাম তাদের মাঝে দাঁড়াবে। কেননা, 'আইশা (রা.) অনুরূপ করেছেন। আর তাঁর এই জামা'আত অনুষ্ঠান ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত।

তাছাড়া এজন্য যে, আগে বেড়ে দাঁড়ানোতে অতিরিক্ত প্রকাশ ঘটে।

যে ব্যক্তি এক মুকতাদী নিয়ে সালাত আদায় করবে, সে তাকে নিজের ডান পাশে দাঁড় করাবে। কেননা, ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে মুক্তাদী করে সালাত আদায় করেছেন এবং তাঁকে নিজের ডান পাশে দাঁড় করিয়েছেন।

আর সে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মুক্তাদী তার পায়ের আংগুল ইমামের গোড়ালি বরাবর রাখবে। তবে প্রথম মতই যাহিরে রিওয়ায়াতের।

অবশ্য যদি ইমামের পিছনে বা বামে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তাহলে জাইয হবে।

তবে সুন্নাতের বিরোধিতার কারণে সে গুনাহ্গার হবে।

---

২. অর্থাৎ এদের প্রতি অশ্রদ্ধাবশতঃ জামা'আতে মানুষ কম আসবে।

আর যদি দুই ব্যক্তির ইমামতি করেন, তাহলে তিনি তাদের আগে দাঁড়াবেন।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, উভয়ের মধ্যখানে দাঁড়াবে। আর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) এরূপ করেছেন বলে বর্ণিত আছে।

আমাদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আনাস (রা.) ও তাঁর ইয়াতীম ভাইকে নিয়ে সালাত আদায়ের সময় উভয়ের আগে দাঁড়িয়েছিলেন।

সুতরাং এ হাদীছের দ্বারা উত্তম প্রমাণিত হয়, আর সাহাবীর আমল দ্বারা এরূপ দাঁড়ানো মুবাহ্ প্রমাণিত হয়।

পুরুষদের জন্য কোন নারী বা নাবালেগের পিছনে ইকতিদা করা জাইয নয়। স্ত্রী লোকের পিছনে জাইয না হওয়ার কারণ এই যে, নবী (সা.) বলেছেন ঃ أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ –আল্লাহ্ যেমন তাদের পিছনে রেখেছেন, তেমনি তোমরাও তাদের পিছনে রাখ।

সুতরাং তাদের (ইমামতির জন্য) আগে বাড়ানো জাইয নয়। আর নাবালেগের পিছনে জাইয না হওয়ার কারণ এই যে, সে নফল আদায়কারী। সুতরাং তার পিছনে ফরয আদায়কারীর ইকতিদা জাইয হবে না। তবে তারাবীহ ও 'নিয়মিত' সুন্নাত[৩]-এর ক্ষেত্রে বাল্‌খ-এর মাশায়েখগণ জাইয রেখেছেন আর[৪] আমাদের মাশায়েখগণ তা অনুমোদন করেননি।

আবার কারো কারো তাহ্‌কীক অনুযায়ী সাধারণ নফলের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

তবে গ্রহণযোগ্য মত এই যে, কোন সালাতেই তাদের (ইমামতি) জাইয নয়। কেননা, নাবালেগের নফল বালেগের নফলের চেয়ে নিম্নমানের। কেননা, ইজমায়ী মতানুসারে সালাত ভংগ করার কারণে নাবালেগের উপর কাযা ধর্তব্য নয়। আর দুর্বলের উপর প্রবলের ভিত্তি হতে পারে না।

'ধারণা-ভিত্তিক' সালাত[৫] এর ব্যতিক্রম। কেননা, (ভঙ্গ হলে কাযা করতে হবে কিনা) এতে মতভেদ রয়েছে। সুতরাং উদ্ভূত ধারণা (মুকতাদীর বেলায়) অস্তিত্বহীন বলে বিবেচিত। অবশ্য নাবালেগের পিছনে নাবালেগের ইকতিদার হুকুম ভিন্ন (অর্থাৎ জাইয)। কেননা, উভয়ের সালাত সমমানের।

---

৩. অর্থাৎ ফরযের পরবর্তী সুন্নত গুলোতে, অদ্রূপ এক বর্ণনা মতে সালাতুল ঈদের ক্ষেত্রে এবং সাহেবাইনের মতে বিত্‌রের ক্ষেতে এবং সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ও বৃষ্টির নামাযের ক্ষেত্রে।
দৃশ্যত নিয়মিত সুন্নত ও সাধারণ নফল সকল ক্ষেত্রেই তাঁরা জাইয মনে করে থাকেন।

৪. অর্থাৎ নিয়মিত সুন্নতের ক্ষেত্রে যেমন মতপার্থক্য রয়েছে অদ্রূপ সাধারণ নফলের ক্ষেত্রেও মতপার্থক্য রয়েছে।

৫. বলখের মাশায়েখগণ প্রাপ্ত বয়স্কদের অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ইমামতিকে জাইয বলেছিলেন। মূলতঃ ধারণা-নির্ভর নামাযের উপর কিয়াস করে। অর্থাৎ যে ব্যক্তির ফরয নামায প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু সে পূর্ণ হয়নি মনে করলো। এমতাবস্থায় হুকুম এই যে, দাঁড়িয়ে যাবে এবং এক বা দুই রাকাআত পড়ে নিবে। আর এটা হবে নফল নামায। এমতাবস্থায় যদি কোন ফরয আদায়কারী ব্যক্তি তার পিছনে ইকতিদা করে তবে সর্বসম্মতভাবেই এ ইকতিদা সহীহ্ হবে। অথচ এখানে দুর্বলের উপর সচলের ইকতিদা হচ্ছে। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্কের দুর্বল সুন্নাত বা নফলের উপর প্রাপ্ত বয়স্ক সবল নামাযের ইকতিদা হতে পারবে। এর জবাব এই যে, বাচ্চার ইমামতিকে ধারণাগ্রস্ত ব্যক্তির ইমামতির উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা এর মধ্যেও ভিন্নমত রয়েছে। সুতরাং এখানে মুক্তাদির ব্যাপারে উক্ত ধারণাকে অস্তিত্বহীন ধরা হবে। কেননা তা তাৎক্ষণিক উদ্ভূত বিষয়, পূর্ব হতে বিদ্যমান নয়। পক্ষান্তরে অপ্রাপ্ত বয়সের বিষয়টি পূর্ব হতে বিদ্যমান।

প্রথমে পুরুষে কাতার করবে। তারপর নাবালেগ ও তারপর স্ত্রী লোকেরা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى –তোমাদের প্রাপ্ত-বয়স্ক এবং জ্ঞানবানরা যেন আমার কাছাকাছি থাকে। আর যেহেতু নারী-পুরুষ এক সমানে দাঁড়ানো সালাত ভংগকারী; সুতরাং তাদের পশ্চাদবর্তিণী রাখা হবে।

যদি স্ত্রীলোক পুরুষের পার্শে দাঁড়ায় আর উভয়ে একই সালাতে শরীক হয়, তাহলে পুরুষের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে, যদি ইমাম স্ত্রী লোকের ইমামতির নিয়্যত করে থাকেন।[৬]

আর সাধারণ কিয়াসের চাহিদা হল সালাত ফাসিদ না হওয়া। এবং এ-ই হল ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মত। স্ত্রীলোকটির সালাতের উপর কিয়াস অনুযায়ী; যেহেতু তাঁর সালাত ফাসিদ হয় না।

আর সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হলো আমাদের বর্ণিত হাদীছ, যা মশহূর শ্রেণীভুক্ত।

আর সেই হাদীছে পুরুষকেই সম্বোধন করা হয়েছে, স্ত্রীলোককে নয়। সুতরাং পুরুষই হচ্ছে স্থানগত ফরয বর্জনকারী। সুতরাং তার সালাতই ফাসিদ হবে, স্ত্রী লোকটির সালাত নয়। যেমন মুক্তাদী (-এর সালাত ফাসিদ হয়) ইমামের আগে দাঁড়ালে।

আর যদি ইমাম স্ত্রীলোকের ইমামতির নিয়্যত না করে থাকেন, তাহলে পুরুষটির সালাতের ক্ষতি হবে না; স্ত্রীলোকটির সালাত দুরুস্ত হবে না।

কেননা আমাদের মতে ইমামের নিয়্যত ছাড়া সে সালাতে[৭] শামিল হওয়া সাব্যস্ত হবে না। ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, স্থানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ইমামের কর্তব্য। সুতরাং তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের উপর বিষয়টি নির্ভর করবে। যেমন ইকতিদার ক্ষেত্রে (মুকাতাদির জন্য ইমামের নিয়্যত করা জরুরী)।

তবে ইমামের নিয়্যত তখনই শর্ত হবে, যখন সে কোন পুরুষের পার্শ্বে ইকতিদা করে। পক্ষান্তরে যদি তার পাশে কোন পুরুষ না থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে দু'টি মত রয়েছে। উক্ত দু'টি

---

৬. হাদীছটি এই أخروهن من حيث أخرهن الله। আল্লাহ্ যেখানে তাদেরকে পিছনে রেখেছেন সেখানে তোমরাও তাদেরকে পিছনে রাখো।
এখানে নির্দেশটি যেহেতু পুরুষদের প্রতি সেহেতু দায়-দায়িত্বও তাদেরই উপর বর্তাবে। প্রশ্ন হতে পারে যে, এটা তো খাবারুল ওয়াহিদ শ্রেণীভুক্ত হাদীছ, যার দ্বারা ফরয প্রমাণিত হয় না। এর উত্তরে লেখক বলেছেন যে, এটা মশহুর শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং তা দ্বারা ফরয প্রমাণিত হতে পারে।

৭. লেখক এখানে 'ইমামের নিয়্যত ছাড়া উভয়ের নামাযে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হয় না' কথাটার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। অর্থাৎ 'নস' বা হাদীছের বাণী দ্বারা প্রমাণিত যে, সালাতের 'ছফ' বা কাতারের তরতীব রক্ষা করা ইমামের দায়িত্ব। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, যে কারো উপর কোন দায়িত্ব অর্পিত হওয়া তার দায়িত্ব গ্রহণের উপর নির্ভরশীল। বিষয়টি 'ইকতিদা' এর অনুরূপ। অর্থাৎ মুকতাদীর নামায যেহেতু ইমামের দিক থেকে ফাসিদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেহেতু মুকতাদির পক্ষ থেকে দায়বদ্ধতা গ্রহণ করা ছাড়া ইকতিদা সহীহ্ হবে না। আর নিয়্যত দ্বারা দায়বদ্ধতা গ্রহণ সাব্যস্ত হবে।

মতের একটির ক্ষেত্রে পার্থক্যের কারণ এই যে, প্রথম সুরতে তো সালাত ফাসিদ হওয়া অনিবার্য। আর দ্বিতীয় সুরতে সম্ভাবনা যুক্ত।

সালাত নষ্টকারী 'এক সমানে দাড়ানো'-এর জন্য শর্ত হলো (উভয়ের) সালাত অভিন্ন হওয়া[৮] *এবং (রুকূ-সাজদা বিশিষ্ট) সাধারণ সালাত হওয়া।*[৯] *আর স্ত্রীলোকটি কামোত্তেজনাযোগ্য হওয়া এবং উভয়ের মাঝে কোন আড়াল না থাকা।* কেননা, কিয়াস ও যুক্তির বিপরীতে শরীআতের বাণী দ্বারা সালাত ফাসাদকারিণী প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং বাণী সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় উপস্থিত থাকতে হবে।

স্ত্রী লোকদের জামা'আতে হাযির হওয়া মাকরূহ। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা যুবতী (তাদের জন্য এ হুকুম) কেননা তাতে ফিতনার আশংকা রয়েছে।

বৃদ্ধাদের জন্য ফজর, মাগরিব ও 'ঈশার জামা'আতের উদ্দেশ্যে বের হওয়াতে অসুবিধা নেই।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, সকল সালাতেই তারা বের হতে পারে। কেননা, আকর্ষণ না থাকায় ফিতনার আশংকা নেই। তাই মাকরূহ হবে না, যেমন ঈদের জামাআতে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো; প্রবৃত্তির প্রবাল্য (দুষ্কর্মে) উদ্বুদ্ধ করে থাকা। সুতরাং ফিতনা ঘটতে পারে। তবে যুহর, আসর ও জুমুআর সময় ফাসিকদের উপদ্রব থাকে। আর ফজর ও 'ঈশার সময় (সাধারণতঃ) তারা ঘুমিয়ে থাকে এবং মাগরিবে পানাহারে মশগুল থাকে। আর (ঈদের) মাঠ প্রশস্ত হওয়ার কারণে পুরুষদের থেকে পাশ কেটে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব। তাই মাকরূহ হয় না।[১০]

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *পবিত্র ব্যক্তি 'মুস্তাহাযা'-এর শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করবে না। সেরূপ পবিত্র স্ত্রীলোকও মুস্তাহাযা এর পিছনে সালাত আদায় করবে না।* কেননা সুস্থ ব্যক্তির (তাহারাতের) অবস্থা মা'যূর ব্যক্তির চেয়ে উন্নততর। আর কোন কিছু তার চেয়ে উন্নত কিছুর দায়িত্ব বহন করতে পারে না। আর ইমাম হচ্ছেন দায়িত্ব বহনকারী। অর্থাৎ মুক্তাদির সালাত তাঁর সালাতের আওতাভুক্ত।

---

৮. উভয়ের সালাত অভিন্ন হওয়ার অর্থ হলো যে সালাত তারা আদায় করছে তার একজন ইমাম রয়েছেন। চাই তিনি প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান থাকুন কিংবা পরোক্ষভাবে থাকুন; যেমন 'লাহিক' ব্যক্তির ক্ষেত্রে। তাছাড়া অভিন্নতার জন্য উভয়ের ফরয নামায এক হওয়া শর্ত। উভয়ের নামায নফল হলেও অভিন্নতা সাব্যস্ত হবে। তদ্রূপ ফরয আদায়কারীর সাথে নফল আদায়কারিণীর ইকতিদারও একই হুকুম।

৯. অর্থাৎ সালাতুল জানাযার ক্ষেত্রে কোন স্ত্রীলোকের পার্শ্ব অবস্থান দ্বারা নামায ফাসিদ হবে না। কেননা এটা প্রকৃতপক্ষে সালাত নয় বরং মাইয়েতের জন্য দু'আ।

১০. মূল কথা এই যে, ইসলামের শুরুতে স্ত্রী লোকদের জন্য জামা'আতে হাযির হওয়ার অনুমতি ছিলো। কিন্তু পরে যখন তাদের বের হওয়াটা ফিতনার কারণ হয়ে দেখা দিলো তখন তাদেরকে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে।

কুরআন পাঠে সক্ষম ব্যক্তি উম্মী লোকের পিছনে এবং বস্ত্রধারী ব্যক্তি উলংগ ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করবে না। কেননা, তাদের দু'জনের অবস্থা উন্নততর।

আর জাইয রয়েছে তায়াম্মুমকারীর জন্য উযূকারীদের ইমামতী করা। এ হল ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জাইয হবে না। কেননা, তায়াম্মুম জরুরী অবস্থায় তাহারাত। আর পানি হল তাহারাতের মূল উপাদান।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলীল এই যে, এটা (সাময়িক তাহারাত নয় বরং) সাধারণ তাহারাত।[১১] সুতরাং এ কারণেই তা প্রয়োজনের সাথে সীমিত থাকে না।

(মোজায়) মাস্‌হকারী পা ধৌতকারীদের ইমামতী করতে পারে। কেননা, মোজা পায়ের পাতায় 'হাদাছ'-এর অনুপ্রবেশে বাধা দেয়। আর মোজায় যে হাদাছ যুক্ত হয়, সেটাকে মাস্‌হ দূর করে দেয়। মুস্তাহাযার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা বাস্তবে হাদাছ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় শরীআত তা বিদূরিত হয়ে গেছে বলে গণ্য করে।

দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারী বসে সালাত আদায়কারীর পিছনে (ইকতিদা করে) সালাত আদায় করতে পারে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তা জাইয হবে না। কিয়াসের দাবী এ-ই। কেননা, দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অবস্থা উন্নততর।

আমরা হাদীছের কারণে কিয়াস বর্জন করেছি। কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) তাঁর শেষ সালাত আদায় করেছেন আর লোকজন তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ইশারায় সালাত আদায়কারী অনুরূপ ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করতে পারে। কেননা, উভয়ের অবস্থা সমান। তবে যদি মুকতাদী বসে এবং ইমাম শুয়ে ইশারা করে তবে তার পিছনে জাইয হবে না। কেননা, বসা শরীআতে স্বীকৃত।[১২] সুতরাং এর দ্বারা তা উন্নত হওয়া প্রমাণিত হয়।

রুকূ-সাজদাকারী ব্যক্তি ইশারাকারী ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করবে না। কেননা, মুকতাদীর অবস্থা উন্নততর। এ সম্পর্কে ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

ফরয আদায়কারী নফল আদায়কারীর পিছনে সালাত আদায় করবে না। কেননা, ইকতিদা অর্থ ভিত্তি করা, আর এখানে ইমামের ক্ষেত্রে 'ফরয' গুণটি নেই। সুতরাং যে গুণ নেই, তার উপর ভিত্তি স্থাপিত হবে না।

ইমাম কুদূরী বলেন, *এক ফরয আদায়কারী ভিন্ন ফরয আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করবে না।* কেননা, ইকতিদা হলো (একই তাহরীমায়) শামিল হওয়া এবং সামঞ্জস্য রক্ষা করা। সুতরাং (সালাতে) অভিন্নতা অপরিহার্য।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রে ইকতিদা সহীহ্। কেননা, তাঁর মতে ইকতিদা হল সমন্বিত রূপে আদায় করা। আর আমাদের মতে দায়িত্বের অন্তর্ভুক্তির অর্থ বিবেচ্য।

---

১১. অর্থাৎ ওয়াক্তের সাথে সম্পৃক্ত নয়। যেমন মুস্তাহাযার তাহারাত ওয়াক্তের সাথে সীমাবদ্ধ।

১২. তাই তো বসতে সক্ষম অবস্থায় চিত হয়ে ইশারার মাধ্যমে নফল নামায আদায় করা জাইয নয়।

নফল আদায়কারী ফরয আদায়কারীর পিছনে সালাত আদায় করতে পারে। কেননা, নফল আদায়কারীর জন্য শুধু মূল সালাত থাকাই হল প্রয়োজন। আর ইমামের ক্ষেত্রে মূল সালাত বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এর উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

যে ব্যক্তি কোন ইমামের পিছনে ইকতিদা করলো তারপর জানতে পারলো যে, তার ইমাম হাদাছগ্রস্ত; তখন তাকে সালাত দোহরাতে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

مَنْ أَمَّ قَوْمًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا أَوْ جُنُبًا أَعَادَ صَلَاتَهُ وَأَعَادُوْا

–যে ব্যক্তি কোন জামাআতের ইমামতি করলো, তারপর প্রকাশ পেল যে, সে হাদাছগ্রস্ত অথবা জুনুবী, তখন সে নিজেও সালাত দোহরাবে এবং মুকতাদিরাও দোহরাবে।

এ বিষয়ে ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। পূর্ব বর্ণিত যুক্তির ভিত্তিতে। আর আমরা অন্তর্ভুক্তির মর্ম বিবেচনা করি। আর তা জাইয হওয়া ও ফাসিদ হওয়া উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য হবে।

কোন উম্মী ব্যক্তি[১৩] যখন কুরআন পাঠে সক্ষম একদল লোক এবং উম্মী একদল লোকের ইমামতি করে, তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সকলের সালাতই ফাসিদ হয়ে যাবে।[১৪]

ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ইমামের সালাত এবং যারা কুরআন পাঠে সক্ষম নয়, তাদের সালাত পূর্ণাংগ হয়েছে। কেননা, ইমাম নিজে মা'যূর এবং তিনি একদল মা'যূর লোকের ইমামতি করেছেন। সুতরাং এটি ঐ অবস্থার সদৃশ, যখন কোন উলংগ ব্যক্তি একদল উলংগ ও একদল বস্ত্রধারীর ইমামতি করেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, ইমাম কিরাতের উপর সক্ষমতা সত্ত্বেও কিরাতের ফরয তরক করেছে। সুতরাং তার সালাত ফাসিদ হবে। সক্ষমতার কারণ এই যে, সে যদি কারীর পিছনে ইকতিদা করতো তাহলে কারীর কিরাত তার কিরাত হতো। আর ঐ মাসআলাটি এবং এর অনুরূপ মাসআলার হুকুম ভিন্ন। কেননা, ইমামের ক্ষেত্রে যা বিদ্যমান, তা মুকতাদীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান রূপে গণ্য হবে না।

যদি উম্মী ও কারী একা একা সালাত আদায় করে, তাহলে তা জাইয হবে।

এই বিশুদ্ধমত। কেননা, তাদের উভয় থেকে জামা'আতের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পায়নি।

ইমাম যদি প্রথম দুই রাকাআতে কিরাত পাঠ করে, অতঃপর শেষ দুই রাকাআতে

---

১৩. উম্মী অর্থ أُمّ (মা)-এর সাথে সম্পর্ক যার। অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ অবস্থার মতো নিরক্ষর। এখানে উদ্দেশ্যে হলো ঐ ব্যক্তি যে নামাযের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ কিরাত সক্ষম নয়।

১৪. পিছনে কিরাত পাঠে সক্ষম ব্যক্তি রয়েছে একথা ইমামের জানা থাকুক বা না থাকুক। কেননা কিরাত হলো ফরয। সুতরাং জানা বা না জানার কারণে হুকুমের কোন তারতম্য হবে না। যেমন ভুলে কিরাত তরক করার কারণে হুকুমের তারতম্য হয় না। বোবা ব্যক্তি যদি একদল বোবা ও একদল কারীর ইমামতির করে সে ক্ষেত্রেও একই হুকুম এবং একই মতভিন্নতা।

কোন উম্মীকে (নায়িব হিসাবে) আগে বাড়িয়ে দেয়, তাহলে সকলের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, সালাত ফাসিদ হবে না। কেননা, কিরাতের ফরয আদায় হয়ে গেছে।[১৫]

আমাদের দলীল এই যে, প্রতিটি রাকাআতই সালাত। সুতরাং তা কিরাত থেকে খালি হতে পারে না। বাস্তবে হোক কিংবা গণ্য করা হিসাবে হোক।[১৬] আর উম্মীর ক্ষেত্রে যোগ্যতা না থাকার কারণে কিরাতকে বিদ্যমান গণ্য করার অবকাশ নেই। উক্ত দলীলের ভিত্তিতে অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে। তাশাহ্হুদের সময় তাকে আগে বাড়ালেও। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

---

১৫. কেননা প্রথম ইমাম কিরাতের ফরয আদায় করেছেন আর শেষ দুই রাকাআতে তো কিরাত ফরয নয়। সুতরাং উম্মী ও কারীকে স্থলবর্তী করা একই ব্যাপার।

১৬. অর্থাৎ একই মতভিন্নতা দেখা দিবে যদি কিরাত পাঠে সক্ষম ব্যক্তি সাজদা থেকে মাথা তোলার পর হাদাছগ্রস্ত হয় এবং কোন উম্মীকে স্থলবর্তী করে। অর্থাৎ সকলের সালাত ফাসিদ হবে আমাদের মতে। আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে ফাসিদ হবে না। পক্ষান্তরে যদি তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর এ ঘটনা ঘটে তাহলে এখানেও ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইনের মাঝে সেই বিখ্যাত মতভিন্নতাটি দেখা দিবে; অর্থাৎ আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সালাত হয়ে যাবে কিন্তু সাহেবাইনের মতে হবে না।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

সালাতের মধ্যে হাদাছ হওয়া

সালাতের মধ্যে যে ব্যক্তির হাদাছ ঘটে যায়, সে ফিরে যাবে। যদি সে ইমাম হয় তাহলে (পিছনে দাঁড়ানো) একজনকে স্থলবর্তী করবে এবং উযূ করে 'বিনা' করবে।[১]

কিয়াসের দাবী এই যে, নতুনভাবে সালাত শুরু করবে। এটাই হল ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মত। কেননা হাদাছ সালাতের বিপরীত। আর কিবলা থেকে ফিরে যাওয়া এবং হাঁটা-চলা করা সালাতকে ফাসিদ করে দেয়। সুতরাং তা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাছ ঘটানোর সদৃশ।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী ঃ

مَنْ قَاءَ اَوْ رَعَفَ اَوْ اَمْذَى فِيْ صَلاَتِهٖ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وليبن عَلٰى صَلاَتِهٖ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ (ابن ماجة)-

–সালাতে যে ব্যক্তির বমি হয় কিংবা নাক থেকে রক্তক্ষরণ হয় কিংবা মযী (তরলপদার্থ) বের হয়, সে যেন ফিরে যায় এবং উযূ করে আর নিজের (পূর্ব) সালাতের উপর 'বিনা' করে, যতক্ষণ না সে কথা বলে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন ঃ

اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَقَاءَ اَوْ رَعَفَ فَلْيَضَعْ يَدَه عَلٰى فَمِهٖ وَلْيُقَدِّمْ مَنْ لَمْ يَسْبِقْ بِشَيْءٍ-

–তোমাদের কেউ যখন সালাত শুরু করে, তারপর তার বমি হয় কিংবা নাক থেকে রক্তক্ষরণ হয়, তখন সে যেন তার মুখে হাত রাখে[২] এবং এমন কাউকে (ইমামতির জন্য) আগে বাড়িয়ে দেয়, যে কিছু সালাতের মাসবূক হয়নি।[৩]

আর সাধারণ ওযর রূপে তাই গণ্য, যা অনিচ্ছায় ঘটে যায়। যা ইচ্ছাকৃত ঘটে, তা তার মধ্যে গণ্য নয়। সুতরাং একে তার সাথে যুক্ত করা যায় না। ***তবে নতুন করে পড়ে নেয়াই উত্তম।***

যাতে মতপার্থক্যের দ্বিধা থেকে বাঁচা যায়। কারো কারো মতে একাকী নতুন ভাবে পড়বে। আর ইমাম ও মুকতাদী হলে জামা'আতের ফযীলত সংরক্ষণ করার জন্য 'বিনা' করবে।

আর মুনফারিদ ইচ্ছা করলে নিজের (উযূর) স্থানেই সালাত পুরা করে নিবে। আবার

---

১. বিনা করার অর্থ যতটুকু সালাত পড়া হয়েছে উযূ করে তারপর থেকে অবশিষ্ট সালাতটুকু আদায় করে নেওয়া।

২. অর্থাৎ যাতে অন্যরা বিষয়টা বুঝতে পারে যে, তার বমি হচ্ছে বা নাক থেকে রক্ত করছে।

৩. হাদীছে বর্ণিত আগে বাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ শুধু স্থলবর্তী করার বৈধতা প্রমাণ করে কিন্তু উযূ করে বিনা করার বৈধতা প্রমাণ করে না।

ইচ্ছা করলে নিজের সালাতের স্থানে ফিরে আসবে। আর মুকতাদী অবশ্য নিজের স্থানে ফিরে আসবে। তবে যদি তার ইমাম (সালাত থেকে) ফারেগ হয়ে যায় কিংবা যদি উভয়ের মাঝে কোন আড়াল না থাকে (তাহলে ফিরে আসার প্রয়োজন নেই।)

যে ব্যক্তির মনে হলো যে, তার হাদাছ হয়েছে, এবং সে মসজিদ থেকে বের হয়ে পড়ল; পরে বুঝতে পারলো যে, তার হাদাছ হয়নি, সে নতুন ভাবে সালাত আদায় করবে। আর যদি মসজিদ থেকে বের না হয়ে থাকে, তাহলে অবশিষ্ট সালাত পড়ে নিবে।

অবশ্য উভয় অবস্থাতেই কিয়াসের দাবী হলো নতুন করে আদায় করা। এটাই হল ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত। কেননা বিনা ওযরে সালাত থেকে ফিরে যাওয়া হয়েছে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, সে সংশোধনের উদ্দেশ্যে ফিরে গিয়েছে। দেখুন না, যদি তার ধারণা বাস্তব হতো তাহলে তো অবশ্যই সে নিজের সালাতের উপর 'বিনা' করতো। সুতরাং সংশোধনের ইচ্ছাকে বাস্তব সংশোধনের সাথে যুক্ত করা হবে যতক্ষণ না বের হওয়ার কারণে স্থানের ভিন্নতা দেখা দেয়।

আর যদি (ইমাম হওয়ার কারণে) সে কাউকে স্থলবর্তী করে থাকে[৪] *তাহলে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।* কেননা এখানে বিনা ওযরে আমলে কাছীর হয়েছে। আর এটি সে মাসআলার বিপরীত, যদি সে ধারণা করে যে, সে উযূ ছাড়া সালাত শুরু করেছে এবং ফিরে যায় তারপর বুঝতে পারে যে, সে উযূ অবস্থায় আছে, তাহলে (মসজিদ থেকে) বের না হলেও তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, এই ফিরে আসাটা হলো সালাত পরিত্যাগের ভিত্তিতে। দেখুন না; যদি তার ধারণা বাস্তব হতো তাহলে তো অবশ্যই তার নতুন করে সালাত শুরু করতে হতো। এ-ই মূল কথা।

আর খোলামাঠে কাতারগুলোর স্থানটুকু হলো মসজিদের হুকুমভুক্ত। যদি সম্মুখের দিকে যায় তাহলে সুতরাহ (বা লাঠি) হলো সীমানা। আর যদি সুতরাহ্ না থাকে তাহলে (সীমানা হলো) তার পিছনের কাতারসমূহের পরিমাণ। আর মুনফারিদ হলে চারদিকে তার সাজদার জায়গা পরিমাণ।

আর (সালাতের মধ্যে) যদি পাগল হয়ে যায়, কিংবা ঘুম আসার পর ইহ্‌তিলাম হয়ে যায়, কিংবা অজ্ঞান হয়ে যায়, তাহলে নতুন করে সালাত শুরু করবে। কেননা, এরূপ ঘটনা ঘটে যাওয়া বিরল। সুতরাং যে সকল ঘটনা সম্পর্কে 'নস্‌জ' রয়েছে, এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

সেরূপ যদি অট্টহাস্য করে। কেননা এটা 'কথা' বলার পর্যায়ের। আর কথা বলা সালাত ভঙ্গকারী।

যদি ইমাম কিরাতে আটকে যাওয়ার কারণে অন্যকে আগে বাড়িয়ে দেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তাদের সালাত দুরস্ত হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ

৪. অর্থাৎ সালাত থেকে ফিরে আসা যদি সালাতকে সংশোধন করার নিয়্যাতে হয়ে থাকে তাহলে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত তার সালাত ফাসিদ হবে না। আর যদি সালাত ছেড়ে দেয়ার নিয়্যাতে ফিরে আসে তবে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।

ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তাদের সালাত দুরস্ত হবে না। কেননা, এ ধরনের ঘটনা বিরল। সুতরাং তা (সালাতরত অবস্থায়) জানাবাতের সদৃশ হলো।[৫]

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো স্থলবর্তী করা হয় অক্ষমতার কারণে। আর তা এখানে অধিক প্রযোজ্য। আর কিরাতের অক্ষমতা বিরল নয়। সুতরাং জানাবাতের সাথে যুক্ত হবে না।

আর যদি সালাত জাইয হওয়া পরিমাণ কিরাত পড়ে থাকে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে স্থলবর্তী বানান জাইয নয়। কেননা, এক্ষেত্রে স্থলবর্তী করার প্রয়োজন নেই।

যদি তাশাহ্হুদের পরে সে হাদাছগ্রস্ত হয়, তাহলে উযূ করবে এবং সালাম ফিরাবে। কেননা সালাম ফিরানো ওয়াজিব। সুতরাং তা আদায় করার জন্য উযূ করা জরুরী।

আর যদি এ অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে 'হাদাছ' ঘটায় কিংবা কথা বলে কিংবা এমন কোন কাজ করে, যা সালাতের বিপরীত, তাহলে তার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, সালাত ভঙ্গকারী বিদ্যমান হওয়ার কারণে 'বিনা' সম্ভব নয়। কিন্তু সালাত দোহরানো তার উপর জরুরী নয়। কেননা কোন রুকন তার যিম্মায় বাকি নেই।

তায়াম্মুমকারী যদি সালাতের মধ্যে পানি দেখতে পায়, তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আগে এর আলোচনা হয়েছে।

যদি তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পরে পানি দেখতে পায়, কিংবা সে মোজার উপর মাসহকারী থাকে, কিন্তু মাসহ করার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়ে থাকে কিংবা আমলে কালীল (অতিসামান্য কাজ) দ্বারা মোজা জোড়া খুলে ফেলে কিংবা উম্মী ছিলো কিন্তু সূরা শিখে ফেলে কিংবা উলংগ ছিলো, কাপড় পেয়ে যায়, কিংবা ইশারাযোগে সালাত আদায়কারী ছিলো, কিন্তু রুকূ সাজদা করতে সক্ষম হয়ে যায়, কিংবা এই সালাতের পূর্ববর্তী কোন কাযা সালাত তার স্মরণ হয় কিংবা কিরাত পাঠে সক্ষম ইমাম হাদাছগ্রস্ত হয়ে কোন উম্মীকে স্থলবর্তী করেন, কিংবা ফজরে সূর্যোদয় হয়ে যায়, কিংবা জুমুআর সালাতে থাকা অবস্থায় আসরের ওয়াক্ত হয়ে যায় কিংবা সে জখমের পট্টির উপর মাসহকারী ছিলো, জখম ভাল হওয়ার কারণে পট্টি খুলে পড়ে যায় কিংবা সে মা'যূর ছিলো, কিন্তু তার ওযর দূর হয়ে যায়, যেমন মুস্তাহাযা নারী ও তার সমশ্রেণীভুক্ত অন্যান্যরা– এই সকল অবস্থায় সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

এ হল আবূ হানীফা (র.)-এর মত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তার সালাত পূর্ণ হয়ে গেছে। কারো কারো মতে এ বিষয়ে আসল কথা এই যে, আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মুসল্লীর নিজস্ব কোন 'কর্ম' দ্বারা সালাত থেকে বের হয়ে আসা ফরয, কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা ফরয নয়। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এই অবস্থায় (অর্থাৎ তাশাহ্হুদের পরে) এ সকল 'আপদ' দেখা দেওয়া সালাতের মধ্যে দেখা দেওয়ারই সমতুল্য। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সালামের পরে দেখা দেওয়ার সমতুল্য।

---

৫. সালাতের মাঝে যদি রোগবশতঃ কারো বীর্যস্খলন হয় তবে বিরল ব্যাপার হিসাবে এক্ষেত্রে হুকুম হলো সালাত নতুন করে শুরু করা। তদ্রূপ এটিও বিরল ঘটনা হিসাবে একই হুকুমভুক্ত হবে।

উক্ত ইমামদ্বয়ের দলীল হলো ইতোপূর্বে বর্ণিত ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর হাদীছ।[৬]

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, বর্তমান সালাত থেকে বের হওয়া ছাড়া অন্য সালাত আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর যে কাজ ছাড়া কোন ফরয কাজে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়, সে কাজটাও ফরয।

আর (হাদীছে বর্ণিত) تمت শব্দটির অর্থ হলো সম্পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি এসেছে।

আর স্থলবর্তী করা (স্বকীয়ভাবে) সালাত ভংগকারী নয়। এজন্যই কিরাত পাঠে সক্ষম ব্যক্তি (কে স্থলবর্তী করা)-র ক্ষেত্রে জাইয হয়। বরং এখানে ফাসাদ এসেছে একটি শরীআতী হুকুমের অনিবার্য প্রয়োজনে। আর তা হলো (উম্মী ব্যক্তিটির) ইমামতি করার অযোগ্যতা।

যে ব্যক্তি ইমামের এক রাকাআত হওয়ার পর ইকতিদা করলো, তারপর ইমাম হাদাছগ্রস্ত হয়ে তাকে আগে বাড়িয়ে দিলেন, তার পক্ষে (ইমামের স্থলবর্তী হওয়ার) অবকাশ আছে। কেননা, তাহরীমাতে (উভয়ের) অংশীদারিত্ব রয়েছে। তবে ইমামের জন্য উত্তম হলো প্রথম থেকে অংশ গ্রহণকারী কোন ব্যক্তিকে আগে বাড়ানো। কেননা, সে ইমামের সালাতকে সম্পন্ন করার ব্যাপারে (মাসবূকের তুলনায়) অধিকতর সক্ষম। আর মাসবূকের উচিত সালাম ফিরানো ব্যাপারে নিজের অপারাগতার কথা বিবেচনা করে অগ্রসর না হওয়া।

মাসবূক যদি (ইমামের স্থলবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে) অগ্রসর হয়, তাহলে ইমাম যেখানে এসে শেষ করেছেন, সেখান থেকে সে শুরু করবে। কেননা, এখন সে ইমামের স্থলবর্তী।

যখন সে সালাম পর্যন্ত উপনীত হবে তখন ইমামের সাথে প্রথম থেকে অংশগ্রহণকারী কোন ব্যক্তিকে আগে বাড়িয়ে দিবে। সে মুক্তাদীদের নিয়ে সালাম ফিরাবে। কিন্তু এই মাসাবূক যদি ইমামের সালাত সম্পন্ন করার পর অট্টহাস্য করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাছ ঘটায় বা কথা বলে বা মসজিদ থেকে বের হয়ে আসে, তাহলে তার সালাত ফাসিদ হবে আর মুক্তাদীদের সালাত পূর্ণ হবে। কেননা তার ক্ষেত্রে সালাত ফাসাদকারী বিষয়টি সালাতের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু মুক্তাদীদের ক্ষেত্রে সকল রুকন সম্পন্ন হওয়ার পর পাওয়া গিয়েছে।

আর প্রথম ইমাম যদি (অন্যান্যদের সাথে দ্বিতীয় ইমামের পিছনে) সালাত থেকে ফারেগ হয়ে থাকে, তাহলে তার সালাত ফাসিদ হবে না। আর ফারেগ না হয়ে থাকলে ফাসিদ হয়ে যাবে।[৭] এটাই বিশুদ্ধতম মত।

---

৬. اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك (যখন তুমি এটা (অর্থাৎ তাশাহ্হুদ) বললে কিংবা এটা করলে (অর্থাৎ তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসলে তখন তোমার সালাত পূর্ণ হয়ে গেলো।)

৭. কেননা প্রথম ইমাম দ্বিতীয় ইমামের পিছনে ইকতিদা করেছে। সুতরাং দ্বিতীয় ইমামের সালাতের মাঝখানে যেমন কর্তনকারীটি এসেছে তদ্রূপ প্রথম ইমামেরও সালাতের মাঝখানে এসেছে। সুতরাং উভয়ের সালাত ফাসিদ হবে।

আর যদি প্রথম ইমামের[৮] হাদাছ না ঘটে এবং তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসেন তারপর অট্টহাস্য করেন কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাছ ঘটান, তাহলে ঐ লোকের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে, যে সালাতের প্রথম দিক পায়নি।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ফাসিদ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যদি কথা বলেন। কিংবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যান তাহলে সকলের মতেই সালাত ফাসিদ হবে না।[৯]

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলীল এই যে, জাইয হওয়া ও ফাসিদ হওয়া উভয় ক্ষেত্রেই মুক্তাদির সালাতের ভিত্তি হলো ইমামের সালাতের উপর। যেহেতু এখানে (সকলের মতেই) ইমামের সালাত ফাসিদ হয়নি, সেহেতু মুক্তাদীর সালাতও ফাসিদ হবে না। বিষয়টি সালাম বলা ও কথা বলার মতো হলো।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, অট্টহাস্য ইমামের সালাতের ঐ অংশকে ফাসিদ করে দেয় যে অংশ অট্টহাস্যের সাথে যুক্ত। সুতরাং মুক্তাদীর সালাতেরও ততটুকু ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে ইমামের তো আর 'বিনা' করার প্রয়োজন নেই। আর মাসবূকের বিনা করার প্রয়োজন রয়েছে। আর ফাসিদের উপর বিনা করাও ফাসিদ। সালামের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা, সালাম তো সালাত সমাপ্তকারী।[১০] আর কথা সালামের সমমানের।[১১] তবে ইমামের উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে, যেহেতু অট্টহাস্য সালাতে থাকা অবস্থায় হয়েছে।

যে ব্যক্তির রুকূতে কিংবা সাজদায় হাদাছ হয়ে যায়, সে উযূ করে 'বিনা' করবে এবং যে যে রুকনে হাদাছ হয়েছে, তা গ্রহণীয় হবে না। কেননা রুকন পূর্ণ হয় তা থেকে প্রস্থানের মাধ্যমে। আর হাদাছ অবস্থায় প্রস্থান, সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং (উক্ত রুকনটি) দোহরানো জরুরী।

---

৮. 'প্রথম' শব্দটির ব্যবহার যথার্থ নয়। কেননা এখানে স্থলবর্তিতার প্রসংগ নেই। সুতরাং দ্বিতীয় ইমামও নেই। অতএব শুধু ইমাম বলাই যুক্তিযুক্ত।

৯. মাসআলাটি এই যে, ইমাম একদল মুদরিক ও একদল মাসবূকের ইমামতি করেছেন। সালাম ফেরানোর স্থানে এসে তিনি অট্টহাস্য করলেন কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাছগ্রস্ত হলেন। তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মাসবূকদের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে ফাসিদ হবে না। পক্ষান্তরে সালাম ফেরানোর স্থানে এসে যদি কথা বলেন কিংবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যান তবে কারো মতেই সালাত ফাসিদ হযে না। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) সালামের মুহূর্তে এসে অট্টহাস্য করা কিংবা ইচ্ছাকৃত হাদাছ সৃষ্টি করা এবং কথা বলা কিংবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার মাঝে পার্থক্য করেন। পক্ষান্তরে সাহেবাইন উভয় অবস্থার পার্থক্য করেন না।

১০. অর্থাৎ তাহ্রীমারই অনিবার্য পরিণতি। যেমন সালাত থেকে বের হওয়া তাহরীমারই অনিবার্য পরিণতি। কেননা হাদীছে আছে وتحليلها التسليم (সালাত থেকে হালাল হওয়ার উপায় হলো সালাম করা।) অনুরূপ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করিয়াছেন ঃ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ (যখন সালাত আদায় সম্পন্ন হবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়ো।)
পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃত হাদাছ ও অট্টহাস্য তাহরীমার অনিবার্য পরিণতি নয়। বরং তাহরীমার নিষিদ্ধ বিষয়। সুতরাং এদু'টিকে আগের দু'টির উপর কিয়াস করা চলে না।

১১. কেননা সালাম মূলতঃ ডানের ও বামের লোকদের সম্বোধন করে কথা বলা। যেহেতু তাতে সম্বোধন বাচক সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

আর যদি তিনি ইমাম হয়ে থাকেন আর অন্যকে আগে বাড়িয়ে থাকেন, তবে যাকে আগে বাড়ানো হয়েছে, সে রুকূ দীর্ঘায়িত করবে। কেননা, দীর্ঘায়িত করার দ্বারা পূর্ণ করা তার পক্ষে সম্ভব।[১২]

যদি রুকূতে বা সাজদায় মনে পড়ে যে তার যিম্মায় একটি সাজদা রয়ে গেছে। তখন সে রুকূ থেকেই সাজদায় নেমে গেলো কিংবা সাজদা থেকে মাথা তুলে ঐ সাজদাটি করে নিলো তবে রুকূ বা সাজদাকে দোহরাবে।

এটা হলো উত্তম হওয়ার বর্ণনা। যাতে রুকনগুলো যথাসম্ভব তারতীব মুতাবিক হয়।[১৩] আর যদি না দোহরায় তবু চলবে। কেননা সালাতের রুকনগুলো সাথে তারতীব রক্ষা করা শর্ত নয়।

তা ছাড়া তাহারাতের অবস্থায় (অন্য রুকনে) গমন শর্ত। আর তা তো পাওয়া গেছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তার জন্য রুকূ দোহরানো জরুরী। কেননা তাঁর মতে 'কাওমা' হলো ফরয।

যে ব্যক্তি মাত্র একজন মুক্তাদীর ইমামতি করছে, এমতাবস্থায় তার হাদাছ ঘটলো আর সে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো, তখন মুক্তাদী ইমাম হয়ে যাবে, তাকে স্থলবর্তী করার নিয়্যত করুন কিংবা না করুন। কেননা, এতে সালাত রক্ষার উপায় হয়।[১৪]

আর প্রথমজন দ্বিতীয় জনের মুক্তাদী হয়ে সালাত সম্পূর্ণ করবে। প্রকৃতই তাকে স্থলবর্তী করলে যেমন করতো।

যদি তার পিছনে বালক বা স্ত্রীলোক ছাড়া অন্য কেউ না থাকে, তবে কারো কারো মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, যার ইমামতি জাইয নেই, সে স্থলবর্তী হয়েছে।

অন্য মতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে 'স্থলবর্তীকরণ' পাওয়া যায়নি এবং তার ইমামতি করার যোগ্যতা নেই।

---

১২. অর্থাৎ রুকূ প্রলম্বিত করাই নতুন ভাবে রুকূ করার সমতুল্য।

১৩. কেননা নামাযী সাজদা হোক কিংবা তিলাওয়াতি সাজদা তার স্থান ছিলো পূর্ববর্তী রাকাআত। কিন্তু সেখানে সে তা আদায় করেনি। সুতরাং এই সাজদাটি যেন তার স্থলে আদায় করা হলো। এমতাবস্থায় এই সাজদাটি করা এবং না করার মাঝে ইখতিয়ার দেয়া সংগত ছিলো। কিন্তু আংশিক রুকন যখন সম্পন্ন হয়ে গেছে তখন সেটাকে ধর্তব্যে না এনে গত্যন্তর ছিলো না। কেননা সেটা তো পূর্ণতা লাভ করে ফেলেছিলো। অবশ্য যেটা পূর্ণতা লাভ করেনি সেটা বর্জন সম্ভাবনার মুখে আছে, সুতরাং সেটাকে গণ্য না করা সম্ভব।

১৪. অর্থাৎ সালাত অব্যাহত থাকার জন্য ইমাম দরকার। আর সেখানে ইমাম হতে পারে এমন অন্য কেউ তার সাথে নেই। অথচ সে ইমাম হওয়ার যোগ্যতা রাখে এখন তাকে ইমাম গণ্য না করলে সালাত ফাসিদ হয়ে যায়। সুতরাং সালাতকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার স্বার্থে সে নিজস্ব ভাবেই ইমাম রূপে সাব্যস্ত হবে। প্রশ্ন হতে পারে যে, নিযুক্ত করা ছাড়া তো নিযুক্ত হতে পারে না। আর প্রথম ইমাম তো তাকে স্থলবর্তী নিযুক্ত করেন নি। সুতরাং সে নিযুক্ত হলো কি ভাবে। এর উত্তরে লেখক বলছেন। ইমামকে স্থলবর্তী নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো প্রতিযোগিতা এড়ানোর উদ্দেশ্য, এখানে যেহেতু সে ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। তাই প্রতিযোগিতার প্রশ্নই আসে না।

যা সালাতকে ভংগ করে এবং যা সালাতকে মাকরূহ করে

যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে বা ভুলে সালাতের মধ্যে কথা বলে, তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। বিচ্যুতি বা ভুলবশতঃ কথা বলার ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর দলীল হলো সেই প্রসিদ্ধ হাদীছটি।[১]

আমাদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

اِنَّ صَلَاتَنَا هٰذِهٖ لَايَصْلُحُ فِيْهَا شَيْئٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَاِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّهْلِيْلُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ - (مسلم ، البيهقى)

আমাদের এ সালাত কোন মানুষের কথাবার্তার উপযোগী নয়। সালাততো তাসবীহ, তাহলীল ও কুরআন পাঠ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছটি গুনাহ্ রহিত হওয়ার উপর প্রযোজ্য। ভুলে সালাম করার বিষয়টি ব্যতিক্রম।[২] কেননা, এটা 'যিকির' এর মধ্যে গণ্য। সুতরাং ভুলের অবস্থায় একে যিকির ধরা হবে এবং সেচ্ছায় বললে কথা ধরা হবে। কেননা এতে সম্বোধনের ك সর্বনাম রয়েছে।

যদি সালাতের মধ্যে কাতরায় কিংবা উহ্-আহ শব্দ করে বা শব্দ করে কাঁদে, এগুলো যদি জান্নাত-জাহান্নামের স্মরণের কারণে হয়ে থাকে তবে সালাত নষ্ট হবে না। কেননা, এতে অধিক 'খুশুখুযু' প্রমাণিত হয়।

আর যদি ব্যথা বা কোন বিপদের কারণে হয়, তবে সালাত ভংগ হয়ে যাবে। কেননা তাতে অস্থিরতা ও আক্ষেপ প্রকাশ পায়। সুতরাং তা মানুষের কথার[৩] অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আহ্ শব্দটি উভয় অবস্থায় সালাত নষ্ট করবে না। আর 'আওয়াহ' শব্দটি নষ্ট করবে।

---

১. অর্থাৎ নবী (সা.) বলেছেন ঃ رُفِعَ عَنْ اُمَّتِى الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ আমার উম্মত থেকে ভুল ও বিস্মৃতি রহিত করা হয়েছে।

২. ইমাম শাফিঈ (র.) ভুলে কথা বলাকে ভুলে সালাম করার উপর কিয়াস করেন। তিনি বলেন, ভুলে কাওকে সালাম করলে সালাত নষ্ট হয় না। অথচ সেটাও কথা বিশেষ। সুতরাং ভুলে সাধারণ কথা বললেও একই হুকুম হওয়া উচিত। সেই কিয়াসেরই জবাব দিয়েছেন লেখক।

৩. অর্থাৎ কোন বর্ণ উচ্চারণ থেকে কোন অর্থ বোঝা গেলেই সেটাকে কথা বলে। এটাই যুক্তিগ্রাহ্য এবং যে কোন অবস্থার ক্ষেত্রে সহজে প্রযোজ্য।

কেউ কেউ বলেছেন, আবূ ইউসুফ (র.)-এর মূল বক্তব্য এই যে, উচ্চারিত শব্দ যদি দুই হরফ বিশিষ্ট হয় আর উভয় হরফ কিংবা একটি যদি (আরবী ব্যাকরণ মতে) অতিরিক্ত হরফ সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে সালাত ফাসিদ হবে না। আর উভয়টি যদি মূল হরফ সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয় তবে ফাসিদ হয়ে যাবে। আর অতিরিক্ত হরফ সমষ্টিকে ফকীহ্গণ اليوم تنساه বাক্যে একত্র করেছেন। এ বক্তব্য সবল নয়। কেননা, প্রচলিত অর্থে মানুষের কথা বর্ণোচ্চারণ ও অর্থ বুঝানোর অনুগামী।[৪] আর তা এমন ধ্বনির ক্ষেত্রেও সাব্যস্ত হতে পারে, যার সব ক'টি বর্ণ 'অতিরিক্ত' বর্ণসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত।

যদি বিনা ওযরে গলা খাকারি দেয়, অর্থাৎ অনন্যোপায় অবস্থায় হয়নি, আর তার ফলে বর্ণসমূহ সৃষ্টি হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সালাত ফাসিদ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আর যদি ওযরের কারণে হয় তবে তা মা'ফ। যেমন হাঁচি ও ঢেকুর; যখন এতে হরফ প্রকাশিত হয়।[৫]

কেউ হাঁচি দিলো আর অন্যজন সালাতের মধ্যেই তাকে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলে উঠলো তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, এটি ব্যবহৃত হয় মানুষের পরস্পর সম্বোধনের ক্ষেত্রে। সুতরাং কাজের কথার মধ্যে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে হাঁচিদাতা অথবা শ্রোতা যদি الحمد لله বলে তবে সালাত ফাসিদ হবে না বলেই ফকীহদের মত। কেননা, এটা জবাব হিসাবে প্রচলিত নয়।

আর যদি কিরাত পাঠকারী ব্যক্তি আটকা পড়ে লোকমা চায় আর অন্য ব্যক্তি সালাতে থেকেই তাকে লোকমা দিয়ে দেয় তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।

এর অর্থ হল মুসল্লি নিজে ইমাম ছাড়া অন্য কাউকে বলে দেয়। কেননা, এরূপ করা শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত। তা মানুষের কথার মধ্যে গণ্য হবে। তবে মাবসূত' কিতাবে একাধিকবার করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কেননা এটা সালাতের আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই অল্প মা'ফ হবে। কিন্তু 'জামেউস সাগীর' কিতাবে এ শর্ত আরোপ করা হয়নি। কেননা, স্বয়ং মানুষের কথা অল্প হলেও তা সালাত ভঙ্গকারী।

আর যদি নিজের ইমামের কিরাত বলে দেয় তবে তা 'কথা' রূপে গণ্য হবে না, সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে। কেননা মুক্তাদী নিজের সালাত সংশোধন করতে বাধ্য। সুতরাং এরূপ বলে দেয়া প্রকৃতপক্ষে তার সালাতের আমল হিসাবে গণ্য হবে। *অবশ্য ইমামের কিরাত বলে দেওয়ারই নিয়্যত করবে। নিজে পাঠ করার নিয়্যত করবে না।* এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা, তাকে বলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিরাত পাঠের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

আর যদি ইমাম অন্য আয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তবে লোকমাদাতার সালাত

---

৪. এমন কোন হরফ উচ্চারিত হলো যা স্বাভাবিক নয়। যেমন হাইতোলতে গিয়ে হাঁ-হা করলো অর্থাৎ 'হা' শব্দটা দু'বার করলো। এটা নির্বিঘ্ন, তদ্রূপ যদি হরফ সমষ্টি উচ্চারিত না হয় তবে কোন অবস্থাতেই ফাসিদ হবে না। যেমন হাঁচি দিলো এবং ভিতর থেকে শব্দ হলো কিন্তু নাক থেকে কোন শব্দ ছাড়া বের হয়ে আসলো।

৫. সেই অন্য ব্যক্তিটি সালাতে থাকলে তারও সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।

ফাসিদ হয়ে যাবে। এবং ইমামের সালাতও ফাসিদ হয়ে যাবে, যদি সে তার লোকমা গ্রহণ করে। কেননা, এখানে বিনা প্রয়োজনে পাঠদান ও পাঠ গ্রহণ সংঘটিত হলো। আর মুক্তাদীর উচিত নয় বলে দেওয়ার ব্যাপারে জলদি করা। আবার ইমামেরও উচিত নয় মুক্তাদীদের বলে দেওয়ার জন্য বাধ্য করা। বরং তাঁর কর্তব্য রুকূর সময় হয়ে গেলে রুকূতে চলে যাবেন কিংবা অন্য আয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন।

যদি সালাতের মধ্যে কারো উত্তরে[৬] لا اله الا الله বলে, তবে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা সালাত ফাসিদকারী কালাম বলে গণ্য হবে। কিন্তু আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এটা সালাত ফাসিদকারী হবে না।

এই মতভিন্নতা তখনই, যখন এই বাক্য দ্বারা উত্তর দেয়ার নিয়্যত করবে।

ইমাম আবূ ইউসুফের দলীল এই যে, এ বাক্যটি আল্লাহ্র প্রশংসা অর্থেই গঠিত। সুতরাং তার নিয়্যতের কারণে তা পরিবর্তিত হবে না। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলীল এই যে, বাক্যটি উত্তরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়েছে। আর উত্তর হওয়ার উপযোগিতা বাক্যটির মধ্যে রয়েছে। সুতরাং একে উত্তর রূপেই গ্রহণ করা হবে। যেমন, হাঁচির উত্তর (ইয়ারহামুকাল্লাহ)। আর ইন্না লিল্লাহর বিষয়টিও বিশুদ্ধ মতে মতবিরোধপূর্ণ।

যদি সে এ দ্বারা একথা জানানোর ইচ্ছা করে থাকে যে, সে সালাতে রয়েছে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমেই তার সালাত ফাসিদ হবে না।

কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ اِذَا نَابَتْ اَحَدَكُمْ نَائِبَةٌ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيُسَبِّحْ (اخرجه الستة) –তোমাদের কেউ যদি সালাতে কোন ঘটনার সম্মুখীন হয়, তবে সে যেন তাসবীহ পড়ে।

যে ব্যক্তি যুহরের এক রাকাআত আদায় করল, তারপর আসর বা সাধারণ নফল শুরু করে দিলো, তাহলে তার যুহর ভংগ হয়ে গেলো। কেননা অন্য সালাত শুরু করা সহীহ্ হয়েছে। সুতরাং সে (বর্তমান সালাতে) যুহর থেকে বের হয়ে যাবে।

যদি যুহরের এক রাকাআত আদায়ের পর আবার যুহরই শুরু করে, তাহলে সেটা যুহরই হবে এবং ঐ রাকাআতই যথেষ্ট হবে। কেননা, যে সালাতে সে বিদ্যমান আছে, হুবহু সেটাকেই শুরু করার নিয়্যত করেছে। সুতরাং তার নিয়্যত বাতিল হবে এবং নিয়্যতকৃত সালাত বহাল থাকবে।

ইমাম যদি কুরআন শরীফ দেখে পাঠ করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সালাত পূর্ণ হয়ে গেছে। কেননা এখানে এক ইবাদতের সঙ্গে অন্য ইবাদত যুক্ত হয়েছে মাত্র।[৭]

---

৬. যেমন কেউ জিজ্ঞাসা করলো আল্লাহ্র সাথে কি কোন ইলাহ্ আছে? এর উত্তরে সে নামাযের মধ্যেই বলে উঠলো لا اله الا الله

৭. কুরআন শরীফ দেখা একটি ইবাদত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন। ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমরা চোখের প্রাপ্য অংশ দান করো। আরয করা হলো, চোখের প্রাপ্য অংশ কি? তিনি বললেন, কুরআন শরীফ দেখা।

তবে তা মাকরূহ হবে। কেননা এটা কিতাবীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ।[৮]

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, কুরআন শরীফ বহন করা দেখা এবং পাতা উল্টানো, এগুলো আমলে কাছীর (বা বেশী মাত্রার কাজ)।[৯]

তাছাড়া এটা হচ্ছে কুরআন শরীফ থেকে পাঠ গ্রহণ। সুতরাং অন্য কারো কাছ থেকে পাঠ গ্রহণের মতো এটাও সালাত ফাসিদকারী হবে।

দ্বিতীয় দলীলের আলোকে হাতে বহনকৃত ও কোন স্থানে রক্ষিত কুরআনের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু প্রথম দলীলের আলোকে উভয়ের মাঝে পার্থক্য হবে।

যদি কোন লেখার দিকে দৃষ্টি দেয় আর বিষয়বস্তু (মুখে না পড়ে) বুঝে ফেলে, তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে সর্বসম্মতিক্রমেই তার সালাত ফাসিদ হবে না।

পক্ষান্তরে যদি কসম করে থাকে যে, অমুকের চিঠি পড়বে না, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে শুধু বুঝার দ্বারাই কসম ভংগ হয়ে যাবে। কেননা সেখানে (উচ্চারণ পড়াটা নয় বরং) বুঝাই হলো উদ্দেশ্য। আর সালাত ফাসিদ হয় আমলে কাছীর দ্বারা। আর তা এখানে পাওয়া যায়নি।

আর যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে কোন স্ত্রীলোক অতিক্রম করে, তবে সালাত ভংগ হবে না। কেননা হুযূর (সা.) বলেছেন : لايقطع الصلاة مرور شئ –কোন কিছুর অতিক্রম সালাত ভংগ করে না। তবে অতিক্রমকারী গুনাহ্গার হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন:

لَوْ عَلِمَ الْمَارُّ بَيْنَ يَدِي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْوِزْرِ لَوَقَفَ اَرْبَعِيْنَ (البخاري ومسلم)۔

–যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো যে, তার কত গুনাহ্ হবে, তাহলে সে চল্লিশ (দিন বা মাস বা বছর) পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতো।

কথিত মতে যদি সে মুসল্লীর সাজদার স্থান দিয়ে অতিক্রম করে এবং উভয়ের মাঝে কোন আড়াল না থাকে, তদ্রূপ দোকানে (বা অন্য কোন উঁচু স্থানে) যদি সালাত আদায় করে এবং অতিক্রমকারীর অংগসমূহ তার অংগের সোজাসুজি হয় তবে গুনাহ্গার হবে।[১০]

আর যে ব্যক্তি মরুভূমিতে (বা খোলা স্থানে) সালাত আদায় করে তার জন্য উচিত নিজের সামনে একটি সুতরাহ্ গ্রহণ করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فِى الصَّحْرَاءِ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةً তোমাদের কেউ যখন মরুভূমিতে সালাত আদায় করে, তখন সে যেন নিজের সামনে সুতরাহ গ্রহণ করে।

---

৮. অতএব যে সকল ক্ষেত্রে পরিহার করা সম্ভব সে সকল ক্ষেত্রে কিতাবীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করাকে অপছন্দের বিষয় করা হয়েছে।

৯. যদি পাতা উল্টানো এবং বহন করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে তো সালাত ফাসিদ হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু যদি বহন করা ও পাতা উল্টানো ছাড়া শুধু রক্ষিত কুরআন দেখে পড়ে তবে তাতেই দ্বিমত। কেননা এটাতে আমলে কালীল (বা স্বল্পমাত্রার কাজ)

১০. এ শর্ত আরোপ করার কারণ এই যে, যদি দোকানে অর্থাৎ উঁচু স্থানে নামায পড়ে এবং সেটা মানুষের উচ্চতা বরাবর হয় তবে সেটাই 'সুতরাহ' এর কাজ দিবে। সুতরাং অতিক্রমকারী ব্যক্তি গুনাহ্গার হবে না

'সুতরাহ' এর পরিমাপ হলো একগজ বা তার বেশী। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى فِى الصَّحْرَاءِ أَنْ يَكُونَ أَمَامَهُ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ –তোমাদের কেউ যখন মরুভূমিতে সালাত আদায় করে তখন সে কি নিজের সামনে হাউদার পিছনের কাঠের মতো কিছু একটা ধারণ করতে পারে না?

বলা হয়েছে যে, তা আংগুলের মত মোটা হওয়া দরকার। কেননা এর চাইতে সরু হলে দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে না। ফলে উদ্দেশ্যও হাসিল হবে না।

'সুতরাহ' এর কাছাকাছি দাঁড়াবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ مَنْ صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا –যে ব্যক্তি 'সুতরাহ' এর সামনে সালাত আদায় করে, সে যেন 'সুতরাহ'র নিকটবর্তী দাঁড়ায়।

'সুতরাহ' ডান ভ্রূ বা বাম ভ্রূ বরাবর স্থাপন করবে। হাদীছে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।[১১]

যদি অতিক্রমণের আশংকা না থাকে এবং রাস্তা সামনে রেখে না দাঁড়ায়, তবে সুতরাহ্ বাদ দেওয়ায় কোন অসুবিধা নেই।

ইমামের সুতরাহ্ জামা'আতের সুতরাহ বলে গণ্য হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কার 'সমতল ভূমিতে' লাঠি সামনে রেখে সালাত আদায় করেছে; কিন্তু জামা'আতের সামনে কোন সুতরাহ্ ছিল না।

(সুতরাহ) মাটিতে গেড়ে রাখাই গ্রহণীয়, ফেলে রাখা বা মাটিতে দাগ টানা নয়। কেননা তা দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয় না।

যদি সামনে সুতরাহ্ না থাকে অথবা তার ও 'সুতরাহ্'র মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করতে চায়, তবে অতিক্রমকারীকে বাধা দিবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ فادرؤوا ما استطعتم –যতটা পরো বাধা দাও।

আর ইশারার মাধ্যমে বাধা দিবে। উম্মু সালামা (রা.)-এর দুই 'সন্তান' সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এমনই করেছেন।[১২]

---

১১. আবূ দাউদ (র.) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছের দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

হযরত মিকদাম (রা.) বলেন,

مَارَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إِلَى عَمُودٍ وَلَاشَجَرٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ وَالْأَيْسَرِ لَايَصْمُدُ بِهِ صَمْدًا ـ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আমি কখনো কোন খুটি বা গাছ সামনে রেখে নামায পড়তে দেখিনি কিন্তু তিনি সেটা ডান ভ্রূ বা বাম ভ্রূ বরাবর রাখতেন। একেবারে সোজা রাখতেন না।

১২. ইবন মাজাহ্ কিতাবে উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উম্মু সালামার ঘরে নামায পড়ছিলেন, তাঁর সামনে দিয়ে আবদুল্লাহ্ কিংবা উমর ইবন আবূ সালামা অতিক্রম করছিলো. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হাতের ইশারায় তাকে বাধা দিলেন। পরে যায়নাব বিনতে উম্মু সালামা অতিক্রম করছিলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকেও হাতের ইশারায় বাধা দিলেন, কিন্তু সে বাধা ডিংগিয়ে পার হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নামায শেষ করে বললেন, মেয়েরা বড়ই প্রবল।

কিংবা তাসবীহ পড়ে রোধ করবে। প্রথম হলো ঐ হাদীছ, যা ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।[১৩]

(ইশারা ও তসবীহ) উভয়টি একত্র করা মাকরূহ হবে। কেননা (উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য) একটিই যথেষ্ট।

পরিচ্ছেদ ঃ সালাতের মাকরূহ

মুসল্লী নিজের কাপড় নিয়ে বা শরীর (এর কোন অংগ) নিয়ে (সালাতরত অবস্থায়) খেলা করা মাকরূহ। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ انَّ اللّٰهَ تَعَالَى كَرِهَ لَكُمْ ثَلٰثًا –আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস মাকরূহ করেছেন, তন্মধ্যে তিনি সালাতরত অবস্থায় ক্রীড়া করার কথা উল্লেখ করেছেন।

সালাতের বাইরেও ক্রীড়া হারাম। সুতরাং সালাতের ভিতরে (তা হারাম হওয়া সম্পর্কে) তোমার কি ধারণা? আর পাথর কণা-সরাবে না। কেননা, এও এক ধরনের ক্রীড়া; অবশ্য যদি সাজদা দেওয়া সম্ভব না হয় তবে একবার মাত্র সমান করে নিবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ مَرَّةً يَا اَبَا ذَرٍّ ، وَاِلاَّ فَذَرْ –হে আবূ যার! কেবল একবার (পরিষ্কার করতে পারো) অন্যথায় ছেড়ে দাও।

তাছাড়া যেহেতু তাতে তার সালাতের সংশোধন রয়েছে।

আর আংগুল মটকাবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ لاَتُفَرْقِعْ اَصَابِعَكَ وَاَنْتَ تُصَلِّى (ابن ماجة) –সালাতরত অবস্থায় তুমি তোমার আংগুল মটকিয়ো না।

আর কোমরে হাত রাখবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সালাতের মধ্যে কোমরে হাত রাখা নিষেধ করেছেন। এতে সুন্নতসম্মত অবস্থা তরক করা হয়।

আর অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ لَوْ عَلِمَ الْمُصَلِّى مَنْ يُنَاجِى مَا الْتَفَتَ –মুছল্লী যদি জানত যে, কার সংগে কথোপকথন করছে, তাহলে সে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করতো না।

যদি মুসল্লি ঘাড় বাঁকা না করে চোখের কোণ দিয়ে ডানে, বামে তাকায়, তবে তা মাকরূহ হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সালাতে থেকে চোখের কোণ দিয়ে তাঁর সাহাবীদের দিকে তাকাতেন।

আর হাঁটু তুলে বসবে না এবং (সাজদার সময়) ডানা ভূমিতে বিছিয়ে রাখবে না। কেননা আবূ যার (রা.) বলেছেন ঃ

نَهَانِى خَلِيلِى عَنْ ثَلْثٍ اَنْ اَنْقُرَ نَقْرَ الدِيكِ وَاَنْ اُقْعِىَ اِقْعَاءَ الْكَلْبِ وَاَنْ اَفْتَرِشَ اِفْتَرَاشَ الثَّعْلَبِ-

–আমার হাবীব আমাকে তিনটি কাজ নিষেধ করেছেন। মোরগের মত ঠোকর দেওয়া, কুকুরের মত বসা এবং শৃগালের মত ডানা বিছিয়ে দেওয়া।

---

১৩. অর্থাৎ নবী কারীম (সা.) বর্ণিত হাদীছে اِذَا نَابَتْ اَحَدَكُمْ نَائِبَةٌ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ فَلْيُسَبِّحْ এটা তো হল পুরুষদের ক্ষেত্রে আর স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে হল করতালি অর্থাৎ ডান হাতের আংগুলের পিঠ দিয়ে বাম হাতের তালুর উপরে আঘাত করবে।

আবূ যার (রা.) বর্ণিত إقعاء -এর অর্থ উভয় নিতম্ব মাটিতে রেখে উভয় হাঁটু খাড়া করে রাখা। এ-ই বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা।

আর মুখে সালামের জবাব দিবে না। কেননা, তা কথা বলা; এবং হাতেও না : কেননা, এ-ও পরোক্ষভাবে সালাম। এমন কি কেউ যদি সালামের নিয়্যতে মুছাফাহা করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।

কোন ওযর ছাড়া আসন করে বসবে না। কেননা, তাতে বসার সুন্নত তরক হয়।

আর চুল ঝুটি করবে না। ঝুটি করা মানে চুলগুলো মাথার উপরে একত্র করে সূতা দিয়ে কিংবা রাবার দিয়ে বাঁধা, যাতে চুল স্থির থাকে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) চুল ঝুটি করা অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

আর কাপড় গুটাবে না। কেননা, এটা এক ধরনের অহংকার।

আর কাপড় ঝুলিয়ে দেবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কাপড় ঝুলিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন। সাদ্‌ল অর্থ মাথায় ও কাঁধে কাপড় রেখে প্রান্তগুলো দু'দিক দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া।

আর পানাহার করবে না। কেননা এটা সালাতভুক্ত কাজ নয়।

যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলে পানাহার করে তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা এটা আমলে কাছীর (বা অতিমাত্রার কাজ) আর সালাতের অবস্থা হলো স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অবস্থা।[১৪]

ইমামের দাঁড়ানোর স্থান মসজিদে আর সাজদার স্থান মেহরাবে হওয়াতে অসুবিধা নেই। তবে মেহরাবে দাঁড়ানো মাকরূহ। কেননা, এটা ইমামের জন্য আলাদা স্থান নির্ধারণের দিক থেকে আহলে কিতাবের আচরণ সদৃশ। তবে (পদদ্বয় মসজিদে থাকা অবস্থায়) মেহরাবে সাজদা দেওয়ার বিষয়টি আলাদা।[১৫]

ইমামের একা উঁচু স্থানে দাঁড়ানো মাকরূহ। কারণ হলো, যা আমরা বলে এসেছি।

তদ্রূপ জাহিরী বর্ণনা মুতাবিক (বিপরীত অবস্থাটিও) মাকরূহ হবে। কেননা, এতে ইমামের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়।

বসা, আলাপরত কোন মানুষের পিঠ সামনে রেখে সালাত আদায়ে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, ইব্‌ন উমর (রা.) কোন কোন সফরে (আপন আযাদকৃত দাস) 'নাফি'কে সুতরাহ্ বানিয়ে সালাত আদায় করতেন।

সামনে ঝুলন্ত কুরআন শরীফ বা ঝুলন্ত তলোয়ার রেখে সালাত আদায়ে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, এ দু'টো ইবাদতযোগ্য বস্তু নয়। আর সে হিসাবেই মাকরূহ হওয়া সাব্যস্ত হয়।

ছবি সম্বলিত বিছানায় সালাত আদায়ে অসুবিধা নেই। কেননা, এতে ছবিকে তুচ্ছই করা হয়।

---

১৪. সুতরাং সালাত অবস্থায় ভুলে পানাহার রোযা অবস্থায় ভুলে পানাহারের মত হবে না।

১৫. সেটা মাকরূহ হবে না। কেননা সালাতে পায়ের অবস্থানই হলো বিবেচ্য। এ জন্যই তো পায়ের স্থান পাক হওয়ার শর্ত সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। পক্ষান্তরে সাজদার স্থান পাক হওয়ার শর্ত সম্পর্কে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে।

আর ছবিগুলোর উপর সাজদা করবে না। কেননা, এটা ছবি পূজার সদৃশ। মাবসূত কিতাবে (মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি) নিঃশর্ত করা হয়েছে। কেননা, অন্যান্য বিছানার মুকাবিলায় মুছল্লাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়।

মাথার উপরে ছাদে কিংবা সামনে কিংবা বরাবরে ছবি থাকা কিংবা ঝুলন্ত ছবি রাখা মাকরূহ। কেননা (হযরত) জিবরাঈল কথিত হাদীছে রয়েছে: اَنَّا لاَنَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ اَوْ صُوْرَةٌ (رواه البخارى) –যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে, সে ঘরে আমরা প্রবেশ করি না। ছবি যদি এতো ছোট হয় যে, মানুষের চোখে পড়ে না তবে মাকরূহ হবে না। কেননা খুব ছোট ছবি পূজ্য নয়।

আর মূর্তি যদি কর্তিত মস্তক হয়। অর্থাৎ যদি মাথা ফেলে দেওয়া হয় তবে তা মূর্তি নয়। কেননা, মস্তকহীন অবস্থায় মূর্তিপূজা করা হয় না। সুতরাং তা প্রদীপ বা মোমবাতি সামনে রেখে সালাত আদায় করার মত হলো। যেমন, উলামায়ে কিরাম বলেছেন।

যদি মাটিতে পড়ে থাকা বালিশ কিংবা বিছিয়ে রাখা বিছানায় ছবি থাকে তবে তা মাকরূহ হবে না। কেননা এ অবস্থায় তো তা পায়ে মাড়ানো হয়। পক্ষান্তরে বালিশ খাড়া করে রাখা অবস্থায় কিংবা ঝুলন্ত পর্দায় ছবি থাকলে ভিন্ন হুকুম হবে। কেননা, এতে ছবির সম্মান প্রকাশ পায়।

কঠিনতম মাকরূহ হলো ছবি মুসল্লীর সামনে থাকা, অতঃপর মাথার উপরে থাকা এরপর ডান দিকে থাকা, এরপর বাম দিকে থাকা অতঃপর পিছন থাকা। আর যদি ছবিযুক্ত কাপড় পরিধান করে তবে মাকরূহ হবে।

কেননা, সে মূর্তি বহনকারীর সদৃশ হবে। তবে এ অবস্থার সালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, সালাতের যাবতীয় শর্ত পাওয়া গিয়েছে। তবে মাকরূহমুক্ত অবস্থায় তা দোহরাতে হবে। মাকরূহসহ আদায়কৃত সমস্ত সালাতের একই হুকুম।

তবে অপ্রাণীর ছবি মাকরূহ হবে না। কেননা সেগুলোর পূজা করা হয় না।

সালাতের মধ্যে সাপ ও বিচ্ছু হত্যা করায় কোন অসুবিধা নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: اُقْتُلُوْا الاَسْوَدَيْنِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِى الصَّلاَةِ –তোমরা দুই 'কালো' (সাপ ও বিচ্ছু) মেরে ফেলবে, এমন কি তোমরা যদি সালাতের মধ্যেও থাক।

তাছাড়া এদ্বারা সালাতে বিঘ্নকারী দূর করা হয়। সুতরাং তা সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে রোধ করার সমতুল্য।

সবরকম সাপেরই সমান হুকুম। এটাই সহীহ্ মত। কেননা বর্ণিত হাদীছটি নিঃশর্ত।

আর সালাতের মধ্যে যাতে আয়াত ও তসবীহ সংখ্যা তদ্রূপ সূরা গণনা করাও মাকরূহ হবে। কেননা তা সালাতের কার্যভুক্ত নয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কিরাতের সুন্নত পরিমাণ রক্ষা করার জন্য এবং হাদীছে যে সংখ্যা বর্ণিত আছে, তা রক্ষা করার জন্য গণনা করা মাকরূহ্ হবে না।

(উত্তরে) আমরা বলি, সালাত শুরু করার আগেই তো তা গণনা করে নিতে পারে যাতে পরে গণনা করার প্রয়োজন না হয়।[১৬] আল্লাহ্ই উত্তম জানেন।

পরিচ্ছেদ ঃ পায়খানায় কিবলামুখী বসা

পায়খানায় লজ্জাস্থান কিবলামুখী করে বসা মাকরূহ। কেননা, নবী করীম (সা.) তা নিষেধ করেছেন। এক বর্ণনা মতে কিবলার দিকে পিছন দিয়ে বসা মাকরূহ্। কেননা তাতে সম্মান তরক করা হয়। অন্য বর্ণনা মতে তা মাকরূহ্ হয় না। কেননা, যে ব্যক্তি (কিবলার দিকে) পিছন দিয়ে বসেছে, তার লজ্জাস্থান কেবলার দিকে নয়।

আর যে নাজাসাত তার থেকে বের হয়, তা ভূমির দিকে পড়ে। আর যে কিবলামুখী হয়ে বসে, তার লজ্জাস্থান কেবলামুখী হয়ে থাকে। আর তা থেকে যা নির্গত হয়, তা সে মুখী হয়ে মাটিতে পড়ে।

মসজিদের উপরে স্ত্রী সহবাস করা, পেশাব করা এবং নির্জনে মিলিত হওয়া মাকরূহ। কেননা মসজিদের ছাদ মসজিদের হুকমভুক্ত। এইজন্য মসজিদে ছাদ থেকে ছাদের নীচে দাঁড়ানো ইমামের পিছনে ইকতিদা করা বৈধ। এবং ছাদে আরোহণের কারণে ই'তিকাফ বাতিল হয় নি। এবং জানাবাতের অবস্থায় সেখানে অবস্থান করা জাইয নয়।

ঐ ঘরের উপরে পেশাব করায় কোন অসুবিধা নেই, যার নীচে মসজিদ রয়েছে।

মসজিদ দ্বারা বাড়ীর ঐ অংশকে বোঝানো হয়েছে, যা সালাতের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কেননা তা মসজিদের হুকুমের আওতায় পড়েনি। যদিও আমাদেরকে বাড়ীতে সালাতের জন্য নির্ধারিত স্থান রাখার আহবান জাননো হয়েছে।

আর মসজিদের দরজা তালাবদ্ধ রাখা মাকরূহ। কেননা তা সালাত থেকে নিষেধ করার সদৃশ। কোন কোন মতে মসজিদের আসবাবপত্র হারানোর ভয় থাকলে সালাত ছাড়া অন্য সময়ে বন্ধ রাখায় অসুবিধা নেই।

মসজিদের চুনকাম করা, শালকাঠ দ্বারা এবং স্বর্ণের পানি দ্বারা কারুকার্য করাতে কোন অসুবিধা নেই।

'অসুবিধা নেই' দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, একাজে কোন সাওয়াব হবে না। তবে গুনাহ্ও হবে না। কোন কোন মতে অবশ্য এটি সাওয়াবের কাজ। তবে এটি নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ করার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে মুতাওয়াল্লী ওয়াকফের মাল হতে ঐ সমস্ত কাজই শুধু করতে পারেন, যা নির্মাণ সংশ্লিষ্ট; কারুকার্য সংশ্লিষ্ট নয়। যদি কিছু করেন তবে ব্যয়কৃত অর্থের দায় তাকেই বহন করতে হবে। আল্লাহ্ই উত্তম জানেন।

---

১৬. অনুরূপ সালাতুত্-তাসবীহেও হাতে গণনা করার প্রয়োজন নেই। কেননা হাতের আংগুলের মাথা চাপ দিয়ে তা গণনা করা সম্ভব।

সালাতুল বিতর

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সালাতুল বিতর হলো ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এটি সুন্নত।[১] কেননা, তাতে সুন্নতের আলামতসমূহ সুপ্রকাশিত রয়েছে। কারণ, বিতর অস্বীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত করা যায় না। এবং এর জন্য আলাদা আযান দেওয়া হয় না।

আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো হাদীছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى زَادَكُمْ صَلٰوةً اَلَا وَهِىَ الْوِتْرُ ، فَصَلُّوْهَا مَابَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ ـ

–আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের একটি সালাত বৃদ্ধি করেছেন। সেটা হলো বিতর। সুতরাং তা তোমরা ঈশা ও ফজর উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় কর।

এখানে 'আমর' বা আদেশবাচক শব্দ এসেছে। আর তা দ্বারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে। এজন্যই সর্বসম্মতিক্রমে তা কাযা করা ওয়াজিব।

তবে বিতর অস্বীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত না করার কারণ এই যে, তার ওয়াজিব হওয়া হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবূ হানীফা (র.) থেকে বিতর সুন্নাত হওয়ার যে বর্ণনা রয়েছে, তার অর্থ এই যে, তা সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত। আর যেহেতু তা 'ঈশার সময় আদায় করা হয়, সেহেতু 'ঈশার আযান ও ইকামাতকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন। ***বিতর হলো তিন রাকাআত, যার মাঝে সালাম দ্বারা ব্যবধান করা হবে না।*** কেননা, 'আইশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী (সা.) তিন রাকাআতের বিতর আদায় করতেন। তদুপরি হাসান বসরী (র.) বিতরের তিন রাকাআতের ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা বর্ণনা করেছেন।

এতে ইমাম শাফিঈ (র.)ও এক মত। অন্যমতে বিতর দুই সালামে আদায় করার কথা রয়েছে। ইমাম মালিক (র.)-এর এই মত। আমাদের বর্ণিত হাদীছ তাদের বিপক্ষে প্রমাণ।

---

১. মতভিন্নতা সত্ত্বেও এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, বিতরের মর্যাদা ফরযের চেয়ে কম। তাই বিতর অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যায় না। এবং এর জন্য আলাদা আযান ইকামত নেই। আর তৃতীয় রাকাআতে কিরাত ওয়াজিব হয় না। পক্ষান্তরে এর মর্যাদা সুন্নতের উর্ধ্বে। তাই ভুলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিতর তরক করলে তার কাযা ওয়াজিব হয়। পুরনো হয়ে গেলেও তা রহিত হয় না। অদ্রূপ ওযর ছাড়া সওয়ারির উপরে তা পড়া যায় না; এবং বিতরের নিয়্যাত ছাড়া শুধু নফল বা সুন্নতের নিয়্যতে তা আদায় হয় না। অথচ সুন্নত হলে সাধারণ নিয়্যতই যথেষ্ট হবে।

আর তৃতীয় রাকাআতে 'রুকূ এর পূর্বে কুনূত পড়বে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, রুকূর পরে পড়বে। কেননা, বর্ণিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিতরের শেষে কুনূত পড়েছেন। আর তা রুকূর পরেই হবে।

আমাদের দলীল হলো বর্ণিত হাদীছ যে, নবী কারীম (সা.) রুকূর পূর্বে কুনূত পড়েছেন। আর যা অর্ধেকের বেশী, তাকে শেষাংশ বলা যায়।

সারা বছরই কুনূত পড়া হবে। রমাযানের শেষার্ধ ছাড়া অন্য সময়ের ব্যাপারে শাফিঈ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। কেননা, হাসান ইব্ন আলী (রা.)-কে কুনূতের দু'আ শিক্ষা দেয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাধারণতঃ বলেছেন ঃ اِجْعَلْ هذا فِىْ وِتْرِكَ –এটা তোমার বিতর-এর মধ্যে পড়ো।

বিতরের প্রত্যেক রাকাআতে সূরাতুল ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ –কুরআনের যে অংশ তোমাদের জন্য সহজ হয় পড়ো।

আর যখন কুনূত পড়ার ইচ্ছা করবে তখন তাকবীর বলবে। কেননা, অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

আর উভয় হাত উঠাবে এবং কুনূত পড়বে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, কেবল সাতটি ক্ষেত্র ব্যতীত হাত উঠানো হবে না। তন্মধ্যে কুনূতের কথাও তিনি বলেছেন। এছাড়া অন্য কোন সালাতে কুনূত পড়বে না।

ফজরের ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। কেননা ইব্ন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ফজরের সালাতে কুনূত পড়েছেন। পরে তা ছেড়ে দিয়েছেন।

ইমাম যদি ফজরের সালাতে কুনূত পড়েন তবে আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তাঁর মুকতাদীরা নীরব থাকবে। আর আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, মুকাতাদী ইমামের অনুসরণ করবে (অর্থাৎ কুনূত পড়বে)। কেননা, সে তার ইমামের অনুগত। আর ফজরে কুনূত পড়ার বিষয় ইজতিহাদ নির্ভর।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর যুক্তি এই যে, ফজরের কুনূত রহিত হয়ে গেছে। আর যা রহিত হয়ে গেছে, তা অনুসরণযোগ্য নয়।

তবে কথিত আছে যে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে। যেন যে বিষয়ে ইমামের অনুসরণ আবশ্যক, সে বিষয়ে যথাসম্ভব ইমামের অনুসরণ বজায় থাকে।

অন্য মতে মতভিন্নতা সাব্যস্ত করার জন্য বসা অবস্থায় থাকবে। কেননা নীরবতা অবলম্বনকারী আহবানকারীর সাথে শরীক বলেই গণ্য হয়ে থাকে। তবে প্রথম মতটি অধিক যুক্তিযুক্ত।

এই মাসআলাটি শাফিঈ মাযহাব অনুসারীদের পিছনে ইকতিদার বৈধতা এবং বিতরে কুনূত পড়ার ক্ষেত্রে অনুসরণের বৈধতা প্রমাণ করে।

মুকতাদী যদি ইমামের পক্ষ থেকে এমন কিছু দেখতে পায়, যাতে সে ইমামের সালাত ফাসিদ মনে করে; যেমন, রক্ত মোক্ষণ করানো, ইত্যাদি তাহলে তার পিছনে ইকতিদা করা জাইয নয়।

কুনূতের ক্ষেত্রে পসন্দনীয় হলো নীরবে পড়া, কেননা এটা দু'আ।

নফল সালাত

ফজরের পূর্বে দু-রাকাআত, যুহরের পূর্বে চার রাকাআত এবং তারপরে দু'রাকাআত এবং আসরের পূর্বে চার রাকাআত, তবে ইচ্ছা করলে দুই রাকাআত এবং মাগরিবের পরে দুই রাকাআত এবং 'ঈশার পূর্বে চার রাকাআত এবং ঈশার পরে চার রাকাআত, তবে ইচ্ছা করলে দুই রাকাআত সুন্নত।

এ সম্পর্কে মূল সূত্র হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ ঃ

مَنْ ثَابَرَ عَلٰى ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ -

যে ব্যক্তি দিনে ও রাত্রে বার রাকাআত (সুন্নত সালাত) নিষ্ঠার সাথে আদায় করবে আল্লাহ্ পাক তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঐ ভাবেই তাফসীর করেছেন, যেভাবে (মাবসূত) কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে আসরের পূর্ববর্তী চার রাকাআতের কথা হাদীছে নেই। এ কারণেই (মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র.)) আল-আসল কিতাবে এটাকে (সুন্নতের পরিবর্তে) 'উত্তম' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এবং (চার রাকাআত) পড়া না পড়ায় ইখতিয়ার দিয়েছেন। কেননা এ সম্পর্কে হাদীছ বিভিন্ন রকমের রয়েছে। তবে চার রাকাআতই উত্তম। 'ঈশার পূর্ববর্তী চার রাকাআতের কথা উল্লেখ করা হয় নি। এজন্যই নিয়মিতি না থাকার কারণে এটাকে মুসতাহাব ধরা হয়েছে। তদ্রূপ আলোচ্য হাদীছে 'ঈশার পরে দুই রাকাআতের কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্য হাদীছে চার রাকাআতের কথা বলা হয়েছে। এ জন্যই ইমাম কুদূরী 'ইচ্ছা করলে' বলেছেন। তবে চার রাকাআতই উত্তম। বিশেষতঃ আবূ হানীফা (র.)-এর সুপরিচিত মত অনুসারে। (কেননা তাঁর মতে রাত্রে এক সালামে চার রাকাআত আদায় উত্তম।)

আর যুহরের পূর্বের চার রাকাআত আমাদের মতে এক সালামে আদায় উত্তম। যেমন (আবূ দাউদ বর্ণিত হাদীছে) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) (আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.))-কে বলেছেন। এ বিষয়ে শাফিঈ (র.)-এর দ্বিমত রয়েছে।

ইমাম কুদূরী বলেন, *দিনের নফল ইচ্ছা করলে এক সালামে দুই রাকাআত আদায় করবে আর ইচ্ছা করলে চার রাকাআত আদায় করবে। এর বেশী আদায় করা মাকরূহ হবে। আর রাত্রের নফল সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, এক সালামে আট রাকাআত পর্যন্ত আদায় করা জাইয। কিন্তু এর বেশী মাকরূহ। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন ঃ রাত্রে এক সালামে দুই রাকাআতের বেশী আদায় করবে না।*

জামেউস সগীর কিতাবে রাত্রের নফলের ক্ষেত্রে আট রাকাআতের উল্লেখ নেই। ছয় রাকাআতের কথা আছে। মাকরূহ হওয়ার দলীল এই যে, নবী করীম (সা.)-এর বেশী আদায় করেননি। যদি মাকরূহ না হতো তাহলে বৈধতার বিষয়টি শিক্ষাদানের জন্য অবশ্যই তিনি বেশী আদায় করতেন।

আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে রাত্রে দুই রাকাআত করে পড়া আর দিনে চার রাকাআত করে আদায় করা উত্তম। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে উভয় ক্ষেত্রেই দুই রাকাআত করে আদায় করা উত্তম। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উভয় ক্ষেত্রেই চার রাকাআত করে আদায় করা উত্তম।

শাফিঈ (র.)-এর দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ صَلٰوةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى —রাত্র ও দিনের সালাত দুই রাকাআত করে।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) তারাবীহের উপর কিয়াস করেন। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রমাণ এই যে, নবী (সা.) ঈশার পর চার রাকাআত পড়তেন। আইশা (রা.) এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। (আবূ দাঊদ) তাছাড়া চাশতের সময় নিয়মিত চার রাকাআত পড়তেন।

তাছাড়া এতে তাহরীমা দীর্ঘতর হয়। সুতরাং তা অধিক কষ্টকর হবে এবং অধিক ফযীলতপূর্ণ হবে। এ কারণেই কেউ যদি এক সালাতে চার রাকাআত নামায পড়ার মান্নত করে থাকে তবে দুই সালামে নামায পড়া দ্বারা মান্নত থেকে মুক্ত হবে না। পক্ষান্তরে বিপরীত ক্ষেত্রে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে।

(তারাবীহ-এর উপর সাধারণ নফলকে কিয়াস করা ঠিক নয়) কেননা তারাবীহ জামাআতের সাথে আদায় করা হয়। সুতরাং তাতে সহজ হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে।

আর ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছের অর্থ হলো জোড় রাকাআত আদায় করতেন বেজোড় রাকাআত আদায় করতেন না। আল্লাহ্ই উত্তম জানেন।

পরিচ্ছেদ ঃ কিরাত সংক্রান্ত

ফরয সালাতের দুই রাকাআতে কিরাআত ওয়াজিব[১]

ইমাম শাফিঈ (র.) সকল রাকাআতে ওয়াজিব বলেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ لَاصَلٰوةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ —কিরাত ছাড়া সালাত শুদ্ধ নয়। আর প্রতিটি রাকাআতই সালাত।

ইমাম মালিক (র.) তিন রাকাআতে কিরাত ফরয বলেন। সহজ করার নিমিত্ত অধিকাংশকে সমগ্রের তুল্য মনে করেন।

আমাদের দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ فَاقْرَؤُا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ —কুরআনের যতটুকু সহজ হয় পাঠ কর। আর কোন কাজের আগে পুনরাবৃত্তির দাবী রাখে না। তবে দ্বিতীয় রাকাআতে আমরা কিরাত ওয়াজিব করেছি প্রথম রাকাআতের সাথে তুলনা করে। কেননা উভয় রাকাআত সকল দিক থেকে সদৃশ। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দুই রাকাআতের পার্থক্য

১. ওয়াজিব শব্দটি এখানে সুপরিচিত অর্থে নয় বরং ফরয অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

রয়েছে প্রথম দুই রাকাআত থেকে। সফরে বাইর হওয়ার এবং কিরাতের গুণে (উচ্চৈঃস্বরে নীরব পড়ার ব্যাপারে) এবং কিরাতের পরিমাণের ব্যাপারে। দ্বিতীয় দুই রাকাআত প্রথম দুই রাকাআতের সাথে মিলিত হবে না।

আর শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছে সালাত শব্দটি সুস্পষ্ট রূপে উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং তা পূর্ণ সালাতের উপর প্রয়োজ্য হবে। আর তা সাধারণ ব্যবহারে দুই রাকাআতই হয়। যেমন কেউ কোন সালাত আদায় করবেন বলে শপথ করল (এতে দুই রাকাআত পড়লেই শপথ ভঙ্গ হবে।) পক্ষান্তরে যদি শপথ করে যে, সে 'সালাত' আদায় করবে না (এতে এক রাকাআত পড়লেও সে শপথভঙ্গকারী হবে)।

শেষ দুই রাকাআতে সে তার ইচ্ছার উপর ন্যস্ত। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে সে নীরব থাকবে। ইচ্ছা করলে কিরাত পড়বে। আবার ইচ্ছা করলে তাসবীহ্ পাঠ করবে। আবূ হানীফা (র.) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। আলী (রা.) ইব্‌ন মাসঊদ ও 'আইশা (রা.) থেকে এ-ই বর্ণিত হয়েছে। তবে কিরাত পড়াই উত্তম। কেননা নবী করীম (সা.) (প্রায় সর্বদাই এরূপ করেছেন। একারণেই জাহিরি রিওয়ায়াত মতে তা তরক করার কারণে সাজদা সাহ্ ওয়াজিব হয় না।

নফলের সকল রাকাআতে এবং বিতরের সকল রাকাআতে কিরাত ওয়াজিব।

নফলে ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, নফলের প্রতি দুই রাকাআত আলাদা সালাত বিশিষ্ট এবং তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়ানো নতুন তাহরীমা বাঁধার সমতুল্য। একারণেই আমাদের ইমামদের প্রসিদ্ধ মতে প্রথম তাহরীমা দ্বারা দুই রাকাআতই শুধু ওয়াজিব হয়। তাই ফকীহ্গণ বলেছেন যে, তৃতীয় রাকাআতে (প্রথম রাকাআতের ন্যায়) ছানা পড়বে। অর্থাৎ سبحانك اللهم পড়বে। আর বিতরে ওয়াজিব করা হয়েছে সর্তকতার দৃষ্টিকোণে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***যে ব্যক্তি নফল শুরু করে তা ভেঙ্গে ফেলে, তবে তা কাযা করবে।*** আর ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তার উপর কাযা ওয়াজিব নয়। কেননা, সে তা স্বেচ্ছায় আরম্ভ করেছে। আর যে সেচ্ছায় কিছু করে, তার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয় না।

আমাদের দলীল এই যে, আদায়কৃত অংশটুকু ইবাদতে গণ্য হয়েছে। সুতরাং তা পূর্ণ করা অনিবার্য যেহেতু আমলকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা জরুরী।

যদি চার রাকাআত সালাত শুরু করে এবং প্রথম দুই রাকাআতে কিরাত পড়ে ও বৈঠক করে, এরপর শেষ দুই রাকাআত নষ্ট করে ফেলে তবে দুই রাকাআত কাযা করবে। কেননা, প্রথম দু'রাকাআত পূর্ণ হয়ে গেছে। আর তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়ানো নতুনভাবে তাহরীমা করার সমতুল্য। সুতরাং তা সে ওয়াজিব করে নিয়েছে।

এ হুকুম তখনকার জন্য, যখন শেষ দুই রাকাআত শুরু করার পর নষ্ট করে। আর যদি দ্বিতীয় দু'রাকাআত শুরু করার আগেই নষ্ট করে ফেলে তবে শেষ দু'রাকাআত কাযা করবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সালাত শুরু করাকে মান্নতের উপর

কিয়াস করে চার রাকাআত কাযা করবে।[২]

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর দলীল এই যে, আরম্ভ অবশ্য পালনীয় করে ঐ অংশকে, যা আরম্ভ করা হয়েছে এবং যে অংশ ছাড়া ঐ কর্ম শুদ্ধ হয় না। আর প্রথম দুই রাকাআতের শুদ্ধতা দ্বিতীয় অংশের সাথে সম্পৃক্ত নয়। দ্বিতীয় রাকাআতের বিষয়টি এর বিপরীত। যুহরের সুন্নত সম্পর্কেও একই মতভিন্নতা। কেননা, মূলতঃ এটা নফল কোন কোন মতে সতর্কতা হিসাবে চার রাকাআতই কাযা করবে। কেননা তা সম্পূর্ণ একই সালাত হিসাবে গণ্য।

আর যদি কেউ চার রাকাআত (নফল সালাত) আদায় করলেন আর তাতে কোন কিরাত পড়ল না, তবে সে দুই রাকাআতই দোহরাবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে চার রাকাআত কাযা করবে।

এ মাসআলা আট প্রকারের। মাসআলার মূল কথা এই যে, মুহাম্মদ (র.)-এর মতে প্রথম দুই রাকাআতে কিংবা দুই রাকাআতের যে কোন একটিতে কিরাআত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে দেয়। কেননা তাহরীমা বাঁধা হয় কর্ম সম্পাদনের জন্য।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে প্রথম দুই রাকাআতে কিরাতে তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে না, বরং সালাত আদায় হওয়াকে ফাসিদ করে। কেননা কিরাত হলো সালাতের অতিরিক্ত রুকন। দেখুন না কিরাত ছাড়াও সালাতের অস্তিত্ব হয়ে যায়। যেমন (বোবা মানুষের) তবে কিরাতে ছাড়া সালাত আদায় বিশুদ্ধ নয়। আর আদায় ফাসিদ হওয়া রুকন তরক করার চেয়ে গুরুতর নয়। সুতরাং তাহরীমা বাতিল হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে প্রথম দুই রাকাআতে কিরাত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে দেয় কিন্তু দুই রাকআাতের শুধু এক রাকাআতে তরফ করা তাহরীমাকে বাতিল করে না। কেননা প্রতি দুই রাকাআত স্বতন্ত্র নামায। আর এক রাকাআতে কিরাত তরফ করার কারণে নামায নষ্ট হওয়া বিতর্কিত বিষয়। তাই সর্তকতা অবলম্বনে আমরা কাযা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে নামায নষ্ট হওয়ার রায় দিয়েছি। আর দ্বিতীয় রাকাআতদ্বয় আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে তাহরীমা অব্যাহত থাকার রায় দিয়েছি।

এই মূলনীতি সাব্যস্ত হওয়ার পর আমাদের বক্তব্য হলো; কোন রাকাআতেই যদি কিরাত না পড়ে থাকে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দুই রাকাআত কাযা করবে। কেননা প্রথম রাকাআতদ্বয়ে কিরাত তরক করার কারণে তাদের মতে তাহরীমা বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং দ্বিতীয় রাকাআতদ্বয় শুরু করা শুদ্ধ হয়নি। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তাহরীমা অব্যাহত আছে। সুতরাং দ্বিতীয় রাকাআতদ্বয় শুরু করা শুদ্ধ হয়েছে। অতঃপর যেহেতু কিরাত তরফ করার কারণে পুরা নামায ফাসিদ হয়ে গেছে, সেহেতু তাঁর মতে চার রাকাআতই কাযা করতে হবে।

যদি শুধু প্রথম দুই রাকাআতে কিরাত পড়ে থাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে শেষ দুই রাকাআত কাযা করবে। কেননা তাহরীমা বাতিল হয়নি। সুতরাং দ্বিতীয় রাকাআতদ্বয় শুরু করা শুদ্ধ হয়েছে। অতঃপর কিরাত তরক করার কারণে তা ফাসিদ হওয়া প্রথম রাকাআতদ্বয়ের ফাসিদ হওয়াকে সাব্যস্ত করে না।

---

২. কেননা চার রাকাআতের নিয়্যত করা (নামায) ওয়াজিব হওয়ার সব ও কারণ অর্থ উদ্বোধনের সাথে যুক্ত হয়েছে। সুতরাং তার কাযা ওয়াজিব হবে। যেমন নযর? মান্নতের ক্ষেত্রে চার রাকাআতের নিয়্যতটি ওয়াজিব হওয়ার কারণ তথা নযরের সাথে যুক্ত হয়েছে। তাই তা পুরা করা ওয়াজিব হয়ে থাকে।

যদি শুধু শেষ দুই রাকাআতে কিরাত পড়ে থাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম দুই রাকাআত কাযা করা ওয়াজিব হবে। কেননা ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দ্বিতীয় অংশ শুরু করা শুদ্ধ হয়নি।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে শুরু করা যেহেতু শুদ্ধ হয়েছে, তেমনি তা আদায়ও হয়েছে।

যদি প্রথম দুই রাকাআতে এবং দ্বিতীয় রাকাআতদ্বয়ের এক রাকাআতে কিরাত পড়ে থাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে শেষ দুই রাকাআত তাকে কাযা করতে হবে। আর যদি শেষ দুই রাকাআতে এবং প্রথম রাকাআতদ্বয়ের এক রাকাআতে কিরাত পড়ে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম দুই রাকাআত কাযা করতে হবে। আর যদি উভয় অংশের এক রাকাআত করে কিরাত পড়ে থাকে তাহলে আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে চার রাকাআত কাযা করবে। আবূ হানীফা (র.)-এর মতও তাই। কেননা তাহ্‌রীমা অব্যাহত রয়েছে। মুহাম্মদ (র.)-এর মতে প্রথম দুই রাকাআত কাযা করতে হবে। কেননা (প্রথম রাকাআতদ্বয়ের এক রাকাআতে কিরাত তরক করার কারণে) তাঁর মতে তাহ্‌রীমা রহিত হয়ে গেছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে এই বর্ণনার কথা অস্বীকার করেছেন। (ইমাম মুহাম্মদ (র.)-কে সম্বোধন করে) তিনি বলেছেন, আমি তোমাকে আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে এ বর্ণনা শুনিয়েছি যে, তাকে দুই রাকাআত কাযা করতে হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে তার এ বর্ণনা প্রত্যাহার করেন নি।

যদি শুধু প্রথম রাকাআতদ্বয়ের এক রাকাআতে কিরাত পড়ে তাহলে বড় ইমামদ্বয়ের[১] মতে চার রাকাআত কাযা করবে। আর মুহাম্মদ (র)-এর মতে দুই রাকাআত কাযা করবে। আর যদি দ্বিতীয় এক রাকাআতে কিরাত পড়ে তাহলে আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে চার রাকাআত কাযা পড়বে। আর ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দুই রাকাআত কাযা করবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ ঃ لَايُصَلِّى بَعْدَ صَلٰوةٍ مِثْلِهَا কোন সালাতের পর অনুরূপ সালাত পড়বে না।

এর অর্থ হলো, দুই রাকাআত কিরাতসহ পড়া এবং দুই রাকাআত কিরাত ছাড়া পড়া। সুতরাং এ হাদীছ দ্বারা নফলের সকল রাকাআতে কিরাত ফরয হওয়া বয়ান করা উদ্দেশ্যে।

দাঁড়ানোর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বসে নফল পড়তে পারে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ صَلٰوةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلٰوةِ الْقَائِمِ (اخرجه الجماعة الا مسلما)

বসা অবস্থায় নামাযের সাওয়াব দাঁড়ানো অবস্থার নামাযের অর্ধেক।

তাছাড়া নামায হলো শ্রেষ্ঠ ইবাদত, যা সর্বসময়ে আদায়যোগ্য। অথচ মাঝেমধ্যে দাঁড়ানো তার জন্য কষ্টকর হতে পারে। তাই কিয়াম তরক করা তার জন্য জাইয হবে যাতে নামায পড়া থেকে (শুধু এই কারণে) বিরত না হয়।

বসার ধরন সম্পর্কে আলিমগণ মতভিন্নতা পোষণ করেন। তবে পসন্দনীয় (ও ফাতওয়া রূপে গৃহীত) মত এই যে, তাশাহ্‌হুদে যেভাবে বসা হয় সেভাবে বসবে। কেননা এটা নামাযে বসার সুন্নত তরীকা রূপে পরিচিত।

---

১ ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)

যদি দাঁড়ানো অবস্থায় সালাত শুরু করে তারপর ওযর ছাড়া বসে পড়ে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জাইয হবে।

এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াস। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জাইয হবে না। এটা হলো সাধারণ কিয়াস। কেননা আরম্ভ করা মান্নতের সাথে তুলনীয়।[৪]

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর যুক্তি এই যে, অবশিষ্ট নামাযে তো সে কিয়াম গ্রহণ করেনি। আর নামাযের যতটুকু অংশ সে আদায় করেছে কিয়াম ছাড়াই তার বিশুদ্ধতা রয়েছে। নযর বা মান্নতের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সে স্পষ্ট ভাষায় এই বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। এমন কি যদি কিয়ামের বিষয়টি স্পষ্ট না বলে থাকে তবে কোন কোন মাশায়েখের মতে তার জন্য কিয়াস জরুরী হবে না।

যে ব্যক্তি শহরের বাইরে রয়েছে সে তার সাওয়ারির জন্তুর উপর ইশারা করে নফল পড়তে পারে, সওয়ারি যে দিকেই অভিমুখী হোক। কেননা বর্ণিত আছে যে, ইব্ন উমর (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আমি খায়বার অভিমুখী গাধার পিঠে ইশারা করে নামায পড়তে দেখেছি (মুসলিম)।

তাছাড়া নফল বিশেষ কোন ওয়াক্তের সাথে সম্পৃক্ত নয়, এমতাবস্থায় যদি আমরা সওয়ারি হতে নামা এবং কিবলামুখী হওয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক করে দেই তবে হয় সে নফল ছেড়ে দেবে অথবা কাফেলা থেকে পিছনে পড়ে যাবে। পক্ষান্তরে ফরয নামাযগুলো নির্ধারিত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। নিয়মিত সুন্নত নামাযগুলো নফলের অন্তর্ভুক্ত। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত এক রিওয়ায়াত মতে ফজরের সুন্নাতের জন্য সওয়ারি হতে নামতে হবে। কেননা এটা অন্যান্য সুন্নতের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শহরে বাইরে হওয়ার শর্ত দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে নিয়মিত সফর হওয়া শর্ত নহে। অদ্রূপ শহরের ভিতরে এরূপ আদায় করা জাইয হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত এক মতে শহরেও জাইয আছে। জাহিরী রিওয়ায়াতের কারণ এই যে, হাদীছ শহরের বাইরে সম্পর্কেই রয়েছে। আর সওয়ারির প্রয়োজনীয়তা শহরের বাইরেই বেশী।

যদি নফল নামায সওয়ার অবস্থায় শুরু করে এরপর সওয়ারি থেকে নেমে যায় তাহলে 'বিনা' করবে। আর যদি নামা অবস্থায় এক রাকাআত পড়ে তারপর আরোহণ করে তবে নতুন ভাবে শুরু করবে। কেননা নামতে সক্ষম হওয়ার কারণে আরোহীর তাহরীমা সংগঠিত হয়েছে, রুকূ-সাজদার বৈধতা সহকারে। সুতরাং যখন সে নেমে রুকূ-সাজদা করবে তখন তা জাইয হবে। পক্ষান্তরে অবতরণকারীর তাহ্রীমা রুকূ সাজদা ওয়াজিবকারী রূপে সংগঠিত হয়েছে। সুতরাং যা তার উপর বাধ্যতামূলক হয়ে গিয়েছে, তা সে বিনা ওযরে তরক করতে পারে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে একটি বর্ণনা আছে যে, সওয়ারি হতে নামলেও নতুন করে শুরু করবে। অদ্রূপ মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, এক রাকাআত পড়ার পর অবতরণ করলে নতুন করে শুরু করবে। তবে উপরোক্ত জাহিরী রিওয়ায়াতই হলো অধিকতর বিশুদ্ধ।

---

৪. অর্থাৎ শুরু করা কিংবা মান্নত করা দুটোই নামায আদায় করাকে ওয়াজিব করে। আর যে ব্যক্তি মান্নত করে যে, দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে তার জন্য বিনা ওজরে বসে আদায় করা জাইয নয়। সুতরাং দাঁড়িয়ে শুরু করার পরও বিনা ওজরে বসে আদায় করা জাইয হবে না।

পরিচ্ছেদ ঃ কিয়ামে রমাযান

মুসতাহাব এই যে, মানুষ রমাযান মাসে 'ঈশার পরে একত্র হবে এবং ইমাম সাহেব তাদেরকে নিয়ে পাঁচ তারবীহা (অর্থাৎ চার চার রাকাআতী সালাত) পড়বেন। প্রতিটি তারবীহা (চার রাকাআত) দুই সালামে হবে। এবং প্রতিটি তারবীহার পরে এক তারবীহা পরিমাণ সময় বসবে।[৫] *এরপর ইমাম সাহেব তাদেরকে নিয়ে বিতর পড়বেন।*

(ইমাম কুদূরী) মুসতাহাব শব্দটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকতর বিশুদ্ধ মত এই যে, তা সুন্নত। হাসান ইব্‌ন যিয়াদ ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে তাই বর্ণনা করেছেন। কেননা উমর (রা.), উছমান (রা.) ও 'আলী (রা.) এই তিন} খুলাফায়ে রাশিদীন তা নিয়মিত আদায় করেছেন। আর নবী (সা.) নিজে নিয়মিত আদায় বর্জন করার কারণ বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো আমাদের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকা।

তারাবীতে জামা'আত করা সুন্নাত। তবে তা সুন্নতে (মুয়াক্কাদা) কিফায়া। সুতরাং কোন মসজিদের মুসল্লীরা যদি তারাবীর জামাআতি কায়েম করা হতে বিরত থাকে তবে সকলেই গুনাহ্গার হবে। পক্ষান্তরে যদি একাংশ তা কায়েম করে তবে অন্যরা শুধু জামাআতের ফযীলত তরককারী হবে। কেননা কিছু সংখ্যক সাহাবী (রা.) হতে তারাবীর জামাআতে হাযির না হওয়া বর্ণিত আছে।

দুই তারবীহার মধ্যে এক তারবীহা পরিমাণ সময় বসা মুসতাহাব। তদ্রূপ পঞ্চম তারবীহা ও বিতরের মাঝেও (ঐ পরিমাণ বসা মুসতাহাব।) কেননা হারামায়নের অধিবাসীদের মধ্যে এরূপ চলে আসছে। আবার কেউ কেউ পাঁচ সালামের পর বিশ্রাম নেয়া উত্তম বলেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়।

ইমাম কুদূরী (র.)-এর বক্তব্য "এরপর তিনি তাদেরকে নিয়ে বিতর পড়বেন"– এদিকে ইংগিত করে যে, তারাবীর সময় হলো 'ঈশার নামাযের পর বিতরের আগে। সাধারণ মাশায়েখগণ এ মতই পোষণ করেন। অবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, তারাবীর সময় হলো ঈশার পর হতে শেষ রাত পর্যন্ত। এটা বিতরের পূর্বেও হতে পারে, পরেও হতে পারে, কেননা তারাবীহ্ হলো নফল বিশেষ, যা 'ঈশার পরে আদায় করার জন্য সুন্নত হিসাবে প্রবর্তিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) কিরাতের পরিমাণ উল্লেখ করেন নি। তবে অধিকাংশ মাশায়েখের মতে সুন্নত হলো তারাবীর সালাতে একবার কুরআন খতম করা। সুতরাং মুসল্লীদের অলসতার কারণে তা বাদ দেয়া যাবে না। পক্ষান্তরে তাশাহ্হুদের পরে দু'আগুলো বাদ দেয়া যেতে পারে। কেননা এগুলো সুন্নত নয়।

রমাযান মাস ছাড়া অন্য কোন সময় জামা'আতের সাথে বিতর পড়বে না। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ইজমা রয়েছে। আল্লাহ্ই উত্তম জানেন।

---

৪. বসে থাকার অর্থ বিরতি দেয়া। বাকি এ সময়টা বসে থাকতে পারে আবার তাসবীহ, তাহলীল, তিলাওয়াত করতে পারে, তাওয়াফ করতে পারে। আবার নফল নামায পড়তে পারে।

দশম অনুচ্ছেদ

জামা'আত পাওয়া

যে ব্যক্তি যুহরের এক রাকাআত পড়ার পর ইকামাত হলো সে আরেক রাকাআত পড়ে নেবে। আদায়কৃত অংশকে বাতিল হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য।

এরপর লোকদের সাথে (জামাআতে) শামিল হবে। জামাআতের ফযীলত হাসিল করার জন্য।

যদি প্রথম রাকাআতের সাজদা না দিয়ে থাকে তবে সালাত ছেড়ে দিয়ে ইমামের সাথে শুরু করবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা সে ছেড়ে দেয়ার স্থানে রয়েছে।[১] আর আমল ভংগ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ণাংগ রূপে আদায় করা। নফলের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্নরূপ। কেননা তা ভংগ করা পূর্ণাংগ রূপে আদায় করার জন্য নয়।

যদি যুহর বা জুমুআ পূর্ববর্তী সুন্নত নামাযে রত থাকে আর এমন সময় ইকামত বা খুতবা শুরু হয়, তাহলে (জামা'আতের ফযীলত হাছিল করার জন্য) দুই রাকাআতের মাথায় নামায শেষ করে দেবে। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত। কোন কোন মতে চার রাকাআত পূর্ণ করবে।

আর যদি যুহরের তিন রাকাআত পড়ে থাকে তাহলে তা পূর্ণ করবে। কেননা অধিকাংশের প্রতি সকলের হুকুম আরোপিত হয়। সুতরাং তা ভংগ করার অবকাশ রাখে না। পক্ষান্তরে যদি সে তৃতীয় রাকাআতে রত থাকে এবং এখনও এর সাথে সাজদা মিলিত করে নেই, তবে এক্ষেত্রে তা ভংগ করে ফেলবে। কেননা সে ভংগ করার অবস্থানে আছে।

এমতাবস্থায় তার অধিকার রয়েছে। ইচ্ছা করলে সে ফিরে এসে বসবে এবং সালাম ফিরাবে আর ইচ্ছা করলে দাঁড়ানো অবস্থায় ইমামের সালাতে শরীক হওয়ার নিয়্যাতে তাকবীর বলবে। আর যখন যুহরের নামায পূর্ণ করে ফেলবে তখন জামাআতে শামিল হয়ে যাবে।

আর জামাআতের সাথে যা পড়বে তা নফল হবে। কেননা নামাযের ওয়াক্তে ফরযের পুনরাবৃত্তি হয় না।

---

১. অর্থাৎ সাজদা করার পূর্ব পর্যন্ত আমলটি পূর্ণত্বপ লাভ করে না। এবং সেটাকে প্রত্যাহার করার অধিকার শরীআত তাকে দিয়েছে। যেমন কেউ যদি চতুর্থ রাকাআতের পর না বসে পঞ্চম রাকাআতে দাঁড়িয়ে যায় তখন সাজদা করার পূর্ব পর্যন্ত সে পঞ্চম রাকাআত ছেড়ে দিতে পারে।

যদি ফজরের এক রাকাআত পড়ার পর ইকামাত হয় তবে তা ভংগ করে জামাআতে শামিল হয়ে যাবে। কেননা যদি তার সাথে আরেক রাকাআত যুক্ত করে, তবে তার জামাআত ফউত হয়ে যাবে। তেমনি যদি দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় তবে তার সাথে সাজদা মিলানোর পূর্ব পর্যন্ত এই হুকুম হবে। আর (ফজরের) নামায পূর্ণ করার পর ইমামের নামাযে শামিল হবে না। কেননা ফজরের পর নফল পড়া মাকরূহ। জাহিরে রিওয়ায়াত অনুযায়ী মাগরিবের পরও একই হুকুম, কেননা তিন রাকাআত নফল পড়া মাকরূহ। পক্ষান্তরে তাকে চার রাকাআতে রূপান্তরিত করলে ইমামের বিরোধিতা হয়।

'আযান হয়ে গেছে' এমন সময় মসজিদে যে ব্যক্তি প্রবেশ করল, তার জন্য সালাত না পড়ে সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়া মাকরূহ। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

لَايَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ الا مُنَافِق اَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ يُرِيْدُ الرُّجُوْعَ ـ

–আযান হয়ে যাওয়ার পর মসজিদ থেকে ঐ ব্যক্তি ছাড়া কেউ বের হয় না, যে মুনাফিক কিংবা ঐ ব্যক্তি, যে ফিরে আসার ইচ্ছা নিয়ে মসজিদ থেকে বের হল।

ইমাম কুদূরী বলেন, *তবে যদি তার উপর কোন জামা'আতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকে।*[২] কেননা এটা বাহ্যতঃ বর্জন হলেও প্রকৃত পক্ষে তা পূর্ণাংগতা দানের শামিল।

আর যুহর ও 'ঈশার ক্ষেত্রে যদি কেউ নামায পড়ে ফেলে থাকে তবে (আযানের পরও মসজিদ থেকে) বের হওয়াতে দোষ নেই। কেননা আল্লাহ্র আহ্বানকারীর ডাকে সে একবার সাড়া দিয়েছে।

তবে যদি মুআয্যিন ইকামাত শুরু করে দেয় (তাহলে বের হওয়া ঠিক হবে না।) কেননা সে তরকে জামা'আতের দ্বারা অভিযুক্ত হবে। বাহ্যতঃ জামা'আতের বিরোধিতার কারণে।

আর আসর, মাগরিব ও ফজরের সময় মুআয্যিন ইকামাত শুরু করে দিলেও বের হয়ে যাবে। কেননা এ সকল সালাতের পরে নফল মাকরূহ।

যে ব্যক্তি ফজরের নামাযে এমন সময় পৌঁছল যে, ইমাম সালাত শুরু করেছেন, কিন্তু সে ফজরের দু'রাকাআত সুন্নত পড়েনি। এমতাবস্থায় যদি তার আশংকা হয় যে এক রাকাআত ফউত হয়ে যাবে এবং এক রাকাআত পাবে, তাহলে মসজিদের দরজার সামানে ফজরের দু'রাকাআত সুন্নত পড়ে নেবে, তারপর ইমামের সাথে শরীক হবে।[৩] কেননা এভাবে তার জন্য সুন্নত ও জামা'আতের উভয় ফযীলত হাসিল করা সম্ভব।

যদি দ্বিতীয় রাকাআতও ফউত হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে ইমামের সাথে

---

২. যেমন, মুয়াযযিন, ইমাম কিংবা মহল্লার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, যাদের অনুপস্থিতিতে জামা'আতে বিশৃঙ্খলার আশাংকা রয়েছে।

৩. জামা'আতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরও ফজরের সুন্নত পড়ার কারণ এই যে, সেটা হলো শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণতম সুন্নত। হাদীছ শরীফে এসেছে, শত্রুবাহিনী তোমাদেরকে ধাওয়া করলেও তোমরা তা পড়ে নেবে–
صَلُّوهُمَا وَاِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ

শরীক হয়ে যাবে। কেননা জামা'আতের সাওয়াব অতিবেশী এবং জামা'আত তরকের ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।

যুহরের সুন্নতের হুকুম হল ভিন্ন। অর্থাৎ উভয় অবস্থায়ই তা ছেড়ে দিবে। কেননা ওয়াক্তের ভিতরে ফরযের পরে তা আদায় করা সম্ভব। এটাই বিশুদ্ধ মত। অবশ্য আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে মতপার্থক্য শুধু এই যে, উক্ত চার রাকাআত সুন্নতকে দুই রাকাআতের আগে পড়বে, না পরে পড়বে। কিন্তু ফজরের সুন্নতের বেলায় এ সুযোগ নেই। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে তা আলোচনা করা হবে।

মসজিদের দরজার সামনে আদায় করার শর্তারোপ দ্বারা বোঝা যায় যে, ইমাম নামাযরত থাকা অবস্থায় মসজিদের ভিতরে (সুন্নত আদায় করা) মাকরূহ।

সাধারণ সুন্নত ও নফলসমূহ ঘরে আদায় করাই উত্তম। এটাই নবী (সা.) হতে বর্ণিত হয়েছে।

যদি ফজরের দুই রাকাআত ফউত হয়ে যায়, তবে সূর্যোদয়ের পূর্বে তা কাযা করবে না। কেননা তা কেবল নফল হয়ে যায়।[৪] আর ফজরের পর নফল পড়া মাকরূহ।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সূর্য উপরে উঠে যাওয়ার পরেও তা আদায় করবেনা। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)বলেন, আমার কাছে পসন্দনীয় হলো সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত তা কাযা করে নিবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)'শেষ রাত্রে যাত্রা বিরতির' ঘটনায় পরবর্তী সকালে সূর্য উপরে উঠার পরে ফজরের দু'রাকাআত সুন্নত কাযা করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ ইমামদ্বয়ের দলীল এই যে, সুন্নতের ক্ষেত্রে কাযা না করাই হলো আসল হুকুম। কেননা কাযার বিষয়টি ওয়াজিব-এর সাথে সম্পৃক্ত। আর হাদীছের ঘটনায় এ দু'রাকাআত কাযা করার কথা এসেছে ফরযের অনুসরণে। সুতরাং অন্য ক্ষেত্রে হুকুম মূলনীতি হিসাবে বহাল থাকবে। ফরয জামা'আতের সাথে আদায় করা হোক কিংবা একা, সুন্নতকে ফরযের অনুসরণে কাযা করা হবে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত। আর সূর্য ঢলে যাওয়ার পর কাযা করা সম্পর্কে মাশায়েখগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ফজর ছাড়া অন্য সকল সুন্নত ওয়াক্তের পরে এককভাবে করা হবে না। আর ফরযের অনুসরণে কাযা করা হবে কিনা, সে সম্পর্কে মাশায়েখগণের মতভেদ রয়েছে।

যে ব্যক্তি যুহরের সালাতে এক রাকাআত পেল তিন রাকাআত পায়নি, সে যুহরের সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করেনি। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জামা'আতের ফযীলত সে লাভ করবে। কেননা কোন কিছুর শেষাংশ যে পায়, সে যেন ঐ বস্তুটি পেয়ে গেছে। সুতরাং সে জামা'আতের সাওয়াব অর্জনকারী হবে। তবে প্রকৃতপক্ষে সে জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করেনি। একারণেই যদি কেউ কসম খায় যে, সে কখনো

৪. কেননা সুন্নত হলো যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আদায় করেছেন। আর ফজরের সুন্নত তিনি ফজরের পূর্বে ছাড়া আদায় করেন নি।

জামা'আত ধরবে না, তবে শেষ রাকাআতে জামা'আতে শরীক হওয়া দ্বারা সে কসমভংগকারী হবে। কিন্তু যুহরের সালাত জামা'আতের সাথে পড়বে না, এই কসম করলে সে কসমভংগকারী হবে না।

যে ব্যক্তি জামা'আত হয়ে গেছে এমন সময় মসজিদে উপস্থিত হলো, সে ফরয আদায় করার পূর্বে ওয়াক্তের ভিতরে যতক্ষণ ইচ্ছা নফল পড়তে পারে।

ইমাম কুদূরীর এ বক্তব্য হল ঐ ক্ষেত্রে, যখন সময়ের মধ্যে অবকাশ থাকে। পক্ষান্তরে সময় সংকীর্ণ হয়ে পড়লে নফল ও সুন্নত পড়া ছেড়ে দিবে।

আর কেউ কেউ বলেছেন (নফল ছেড়ে দেয়ার) এ হুকুম হলো যুহর ও ফজরের সুন্নত ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে। কেননা এ দু'টি সুন্নতের অতিরিক্ত মর্যাদা রয়েছে। সুন্নত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ (ابو داود) صَلُّوْهَا وَلَوْطَرَدَتْكَ الْخَيْلُ – 'অশ্বদল' তোমাকে তাড়া করলেও তোমরা তা পড়ো। অপর সুন্নতটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ مَنْ تَرَكَ الاَرْبَعَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ تَنَلْهُ شَفَاعَتِي –যুহরের পূর্ববর্তী চার রাকাআত যে ছেড়ে দেবে, সে আমার শাফাআত লাভ করবে না।

আর কেউ কেউ বলেছেন এটা সকল সুন্নতের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জামা'আতের সাথে ফরয আদায় করার সময় নির্ধারিত সুন্নতগুলো নিয়মিত আদায় করেছেন। আর 'নিয়মিতি' ছাড়া সুন্নত হওয়া সাব্যস্ত হয় না। তবে সর্বাবস্থায়ই তা তরক না করাই উত্তম। কেননা সুন্নতগুলো হচ্ছে ফরযসমূহের সম্পূরক। তবে ওয়াক্ত ফউত হওয়ার আশংকা থাকলে ছেড়ে দেবে।

কেউ যদি এসে ইমামকে রুকূতে পায় আর তাকবীর বলে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ইমাম মাথা তুলে ফেললেন, তাহলে সে ঐ রাকাআত পেয়েছে বলে গণ্য হবে না।

এ বিষয়ে ইমাম যুফার (র.)-এর মত ভিন্ন রয়েছে। তিনি বলেন ইমামকে সে এমন অবস্থায় পেয়েছে, যা কিয়ামের হুকুমভুক্ত।

আমাদের দলীল এই যে, নামাযের কার্যসমূহে (ইমামের সাথে) অংশ গ্রহণ করা হলো শর্ত। আর তা এখানে পাওয়া যায়নি, কিয়ামের অবস্থায়ও না এবং রুকূর অবস্থায়ও না।

মুক্তাদী যদি ইমামের আগে রুকূতে চলে যায় আর ইমাম তাকে রুকূতে গিয়ে পান, তবে সালাত জাইয হয়ে যাবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, এটা তার জন্য জাইয হবে না। কেননা ইমামের আগে যা সে করেছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এর উপর যা বিনা করা হয়েছে, তাও শুদ্ধ হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, শর্ত হলো কোন এক অংশে (ইমামের সাথে) শরীক হয়ে যাওয়া। যেমন প্রথমাংশে (শরীক হলে তা গণ্য হয়)।[৫] আল্লাহ্ই উত্তম জানেন।

---

৫. অর্থাৎ ইমামের সাথে রুকূতে যাওয়া এবং ইমামের আগেই রুকূ থেকে মাথা তুলে ফেলা।

একাদশ অনুচ্ছেদ

কাযা সালাত

কারো যদি কোন নামায কাযা হয়ে যায়, তবে যখনই স্মরণ হবে তখন তা পড়ে নেবে এবং ওয়াক্তিয়া নামাযের উপর তাকে অগ্রবর্তী করবে।

এ বিষয়ে মূলনীতি এই যে, ওয়াক্তিয়া ফরয নামায ও কাযা নামাযসমূহের মাঝে তারতীব বা ক্রম রক্ষা করা আমাদের মতে ওয়াজিব। আর ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে তা মুসতাহাব। কেননা প্রতিটি ফরয নামায নিজস্ব ভাবে সাব্যস্ত। সুতরাং অন্য ফরযের জন্য তা শর্ত হতে পারে না।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلَمْ يَذْكُرْهَا اِلاَّ وَهُوَ مَعَ الإمامِ فَلْيُصَلِّ الَّتِىْ هُوَ فِيْهَا ثُمَّ لِيُصَلِّ الَّتِىْ ذَكَرَهَا ثم لِيُعِدِ التى صَلَّي مَعَ الْاِمَامِ (رواه الدار قطنى)۔

–যে ব্যক্তি নামাযের সময় ঘুমিয়ে যায় অথবা নামাযের কথা ভুলে যায় আর তা ইমামের সাথে নামাযে শরীক হওয়ার পরই শুধু মনে পড়ে, সে যেন যে নামায আরম্ভ করেছে তা পড়ে নেয়। এরপর যে নামাযের কথা মনে পড়েছে, তা পড়ে নেবে এরপর ইমামের সাথে যে নামায আদায় করেছে, তা পুনরায় পড়ে নেবে।

যদি ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা হয়, তবে ওয়াক্তিয়া নামায আগে পড়ে নেবে এরপর কাযা নামায আদায় করবে। কেননা সময় সংকীর্ণতার কারণে, তেমনি ভুলে যাওয়ার কারণে এবং কাযা নামায বেশী হওয়ার কারণে তারতীব রহিত হয়ে যায়, যাতে ওয়াক্তিয়া নামায ফউত হয়ে যাওয়ার উপক্রম না হয়ে পড়ে।

যদি কাযা নামাযকে আগে পড়ে নেয় তবে তা দুরুস্ত হবে। কেননা তা আগে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে অন্যের কারণে। (কাযা নামাযের নিজস্ব কোন কারণে নয়) পক্ষান্তরে যদি সময়ের মধ্যে প্রশস্ততা থাকে এবং ওয়াক্তিয়া নামাযকে অগ্রবর্তী করে তবে তা জাইয হবে না। কেননা হাদীছ দ্বারা উক্ত নামাযের জন্য যে ওয়াক্ত সাব্যস্ত হয়েছে, তার পূর্বে সে তা আদায় করেছে।

যদি কয়েক ওয়াক্ত নামায ফউত হয় তবে মূলতঃ নামায যে তারতীবে ওয়াজিব ছিল, কাযা নামাযও সে তারতীবে আদায় করবে। কেননা খন্দকের[1] যুদ্ধে নবী (সা.)-এর

১. তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, (মদীনা অবরোধকারী) মুশরিকগণ পরিখা যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে (একে একে) চার ওয়াক্ত নামায পড়া থেকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল। এমন কি রাত্রের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি হযরত বিলাল (রা.)-কে (আযান দেওয়ার) আদেশ করলেন, তিনি আযান ও ইকামাত দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যুহরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর বিলাল (রা.) ইকামাত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আসরের নামায পড়লেন। এই ভাবে মাগরিব ও 'ঈশার নামায পড়লেন।

চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়েছিলো, তখন তিনি সেগুলো তারতীবের সাথে কাযা করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ –আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখেছো, সেভাবে তোমরাও সালাত পড়ো।

তবে যদি কাযা সালাত ছয় ওয়াক্তের বেশী হয়ে যায়।[২] কেননা কাযা সালাত বেশী পরিমাণে হয়ে গেছে; সুতরাং কাযা সালাতগুলোর মাঝেও তারতীব রহিত হয়ে যাবে, যেমন কাযা সালাত ও ওয়াক্তিয়া সালাতের মাঝে রহিত হয়ে যায়।

আধিক্যের পরিমাণ হলো কাযা নামায ছয় ওয়াক্ত হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ ষষ্ঠ নামাযের ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়া। জামেউস সাগীর কিতাবের নিম্নোক্ত ইবারতের অর্থ এটাই।

যদি একদিন একরাত্রের অধিক নামায কাযা হয়ে যায়, তাহলে যে ওয়াক্তের নামায প্রথমে কাযা করে তা জাইয হবে। কেননা একদিন একরাত্রের অধিক হলে নামাযের সংখ্যা ছয় হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত যে, তিনি ষষ্ঠ ওয়াক্ত দাখিল হওয়ার বিষয় বিবেচনা করেছেন। তবে প্রথমোক্ত মতটিই বিশুদ্ধ। কেননা পুনঃ আরোপিত হওয়ার সীমায় উপনীত হওয়া দ্বারা আধিক্য সাব্যস্ত হয়। আর তা প্রথমোক্ত সুরতে রয়েছে।

যদি পূর্বের[৩] *ও সাম্প্রতিক কাযা সালাত একত্র হয়ে যায়, তবে কোন কোন মতে সাম্প্রতিক কাযা সালাত স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্তিয়া সালাত আদায় করা জাইয হবে। কেননা কাযা সালাত অধিক হয়ে গেছে।*

কোন কোন মতে জাইয হবে না এবং বিগত কাযা নামাযগুলোকে 'যেন তা নেই' ধরে নেয়া হবে[৪] যাতে ভবিষ্যতে সে এ ধরনের অলসতা থেকে সতর্ক হয়।

যদি কিছু কাযা সালাত আদায় করে ফেলে এবং অল্প পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে, তবে কোন কোন ইমামের মতে 'তারতীব' পুনঃ আরোপিত হবে।

এই মতই অধিক প্রবল। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ একদিন ও এক রাত্রের নামায তরক করে আর পরবর্তী দিন প্রতি ওয়াক্তিয়া সালাতের সাথে এক

---

২. মূল কিতাবের বক্তব্যে দৃশ্যতঃ এটাই মনে হয় যে, তারতীব রহিত হওয়ার জন্য কাযা সালাতের সংখ্যা ছয় এর বেশী হওয়া জরুরী। অথচ প্রকৃত বিষয় তা নয়; বরং কাযা সালাতের সংখ্যা ছয়-এ উপনীত হওয়াই যথেষ্ট।

৩. বিগত হওয়ার অর্থ এই যে, এক লোক আল্লাহর নাফরমানীবশত এক মাসের সালাত তরক করলো অতঃপর তওবা করে নিয়মিত সালাত আদায় করতে লাগল। এখন যদি পিছনের কাযা থাকা অবস্থায় আবার এক ওয়াক্ত সালাত তরক করে। এবং এটা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও সামনের ওয়াক্তের সালাত আদায় করে তবে এটা হলো সাম্প্রতিক কাযা।

৪. অর্থাৎ যদি সাম্প্রতিক কাযা আদায় না করে ওয়াক্তিয়া পড়ার অনুমতি দেওয়া হয় তবে নামায আদায় করার ব্যাপারে তার অলসতা আরো বেড়ে যাবে।

ওয়াক্তের কাযা সালাত আদায় করতে থাকে, তবে কাযা সালাতগুলো সর্বাবস্থায় জাইয হবে। পক্ষন্তরে ওয়াক্তিয়া সালাত যদি (কাযা সালাতের) আগে আদায় করে,[৫] তবে তা ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, কাযা নামাযগুলো অল্প এর গণ্ডিতে এসে গেছে। আর যদি ওয়াক্তিয়াকে (কাযা নামাযের) পরে আদায় করে, তবে একই হুকুম হবে। কিন্তু পরবর্তী 'ঈশার নামাযের হুকুম ভিন্ন (অর্থাৎ আদায় হয়ে যাবে)। কেননা তার ধারণা মতে তো 'ঈশার সালাত আদায় করার সময় তার যিম্মায় কোন কাযা সালাত নেই।[৬]

যুহর আদায় করেনি, একথা স্মরণে থাকা অবস্থায় কেউ যদি আসরের সালাত পড়ে, তবে তা ফাসিদ হবে। কিন্তু একেবারে শেষ ওয়াক্তে স্মরণ থাকা অবস্থায় পড়ে থাকলে ফাসিদ হবে না। এটা তারতীব সংক্রান্ত মাসআলা।

অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে (উক্ত আসরের নামাযের) ফরযগুণ নষ্ট হয়ে গেলেও মূল নামায বাতিল হবে না।) (বরং নফল রূপে গণ্য হবে।)

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মূল নামাযও বাতিল হয়ে যাবে। কেননা 'ফরযিয়াতের' জন্যই তাহরীমা বাঁধা হয়েছিল। সুতরাং ফরযিয়াত যখন বাতিল হয়ে গেল, তখন মূল তাহরীমাও বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলীল এই যে, তাহরীমা বাঁধা হয়েছে মূলতঃ সালাতের জন্য ফারযিয়াতের গুণ সহকারে, সুতরাং ফরযিয়াতের গুণ বিনষ্ট হওয়ার কারণে মূল সালাত বিনষ্ট হওয়া জরুরী নয়।

তবে আসর ফাসিদ হবে স্থগিতাবস্থায়, অতএব যদি যুহরের কাযা আদায় না করে ধারাবাহিক ছয় ওয়াক্ত নামায পড়ে ফেলে তবে সব ক'টি ওয়াক্তের নামাযই জাইয রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে চূড়ান্ত ভাবেই তা ফাসিদ হয়ে যাবে। কোন অবস্থাতেই তা পুনঃ বৈধতা পাবে না। এ বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

---

৫. কেননা যখনই সে একটি ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করবে তখন সেটা ষষ্ঠ তরককৃত নামায হয়ে যাবে। কেননা পূর্ববর্তী পাঁচ ওয়াক্তের কাযা আদায় না করে সেটা আদায় করা জাইয হয় নি।) কিন্তু যখন তারপরে তরককৃত এক ওয়াক্ত নামায আদায় করা হবে তখন কাযার সংখ্যা আবার পাঁচে নেমে আসবে। এ অবস্থাই চলতে থাকবে। সুতরাং ওয়াক্তিয়া নামায আর আদায় হবে না।

৬. 'ঈশার সালাত সম্পর্কে এ হুকুম তখনই হবে যখন তার এটা জানা নেই যে, ওয়াক্তিয়াগুলো 'কাযা' এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। কেননা তখন তো তার ধারণা মুতাবিক সে তার যিম্মার সমস্ত নামায আদায় করে ফেলেছে। সুতরাং তার অবস্থা হলো ভুলে যাওয়া ব্যক্তির মত। পক্ষান্তরে যদি বিষয়টি তার জানা থাকে তবে 'ঈশার সালাতও হবে না। কেননা সে যখন 'ঈশার সালাত পড়ছে তখনও তার জানা মুতাবিক তার যিম্মায় চার ওয়াক্তের কাযা রয়ে গেছে।

'বিতর পড়েনি' একথা স্মরণে থাকা অবস্থায় কেউ যদি ফজরের নামায আদায় করে, তবে তা ফাসিদ হয়ে যাবে।

এটা আবূ হানীফা (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

এ মতভিন্নতার ভিত্তি এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিতর হল ওয়াজিব। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের[৭] মতে তা সুন্নত। আর সুন্নত ও ফরয নামাযসমূহের মাঝে তারতীব জরুরী নয়।

বিতরের ব্যাপারে এই মতপার্থক্যের ভিত্তিতেই (এ মাসআলা রয়েছে)। কেউ যদি 'ঈশার নামায পড়ার পর পুনরায় উযূ করে সুন্নত ও বিতর আদায় করেন। অতঃপর প্রকাশ পেল যে, 'ঈশার সালাত সে বিনা উযূতে পড়েছে, তবে আবূ হানীফা (র.)-এর মতে শুধু 'ঈশা ও সুন্নত পুনঃ আদায় করবে, বিতর নয়।[৮] কেননা তার মতে বিতর স্বতন্ত্র ফরয আর সাহেবাইনের মতে বিতরও পুনঃ আদায় করতে হবে। কেননা তা 'ঈশা' এর অনুবর্তী। আল্লাহ্ই উত্তম জানেন।

---

৭. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) দ্বয়কে সাহেবাইন বলে

৮. কেননা আবূ হানীফা (র.)-এর মতে 'ঈশার ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে বিতরের ওয়াক্তও হয়ে যায়। শুধু 'ঈশা ও বিতরের মাঝে তারতীব রক্ষা করা তার জন্য জরুরী ছিল। আর সেটা ভুলে যাওয়ার কারণে রহিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে বিতরের ওয়াক্ত হয় 'ঈশার সালাত বিশুদ্ধভাবে আদায় করার পর। আর এক্ষেত্রে তা হয়নি।

সাজদায়ে সাহ্ও

(নামাযে) কম বা বেশী করার কারণে (শেষ বৈঠকে) সালামের পর দু'টি সাজদায়ে সাহ্ও করবে। অতঃপর তাশাহ্হুদ পাঠ করবে এবং সালাম ফিরাবে।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে সালামের আগে সাজদা করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.)-এর আগেই সাজদা সাহ্ও করেছেন।

আমাদের দলীল এই যে, নবী (সা.) এর এ উক্তিঃ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ –প্রতিটি সাহ্ও (বা ভুল)-এর জন্য সালামের পর দু'টি সিজদা (আবূ দাউদ)।[১]

আরো বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.)-এর পর দু'টি সাজদা সাহ্ও করেছেন (মুসলিম ও অন্যান্য)।

এখানে তাঁর আমল সংক্রান্ত বর্ণনা দু'টি পরস্পর বিপরীত রয়েছে। সুতরাং প্রমাণ রূপে তাঁর বাণী গ্রহণ করা অক্ষুণ্ন থেকে যাবে।

আর একারণেও যে, সাজদায়ে সাহ্ও এক সালাতে বারংবার হয় না। সুতরাং তাকে সালাম থেকে বিলম্বিত করতে হবে, যাতে সালামের ব্যাপারে ভুল হলে সাজদায়ে সাহ্ও দ্বারা তা পূরণ হতে পারে।

(ইমাম শাফিঈ (র.) ও আমাদের মাঝে) এই মতভিন্নতা কেবল কোনটি উত্তম এ ব্যাপারে (বৈধতার প্রশ্নে নয়)।

(সাজদায়ে সাহ্ও এর) উল্লেখিত সালামকে (নামাযের) পরিচালিত সালামের সদৃশ হিসাবে দুই সালাম সহ সাজদা করবে। এটাই বিশুদ্ধ মত।[২]

নবী (সা.)-এর উপর দুরূদ এবং দু'আ 'সাজদায়ে সাহ্ও' পরবর্তী বৈঠকে পড়বে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা নামাযের শেষাংশই হল দু'আর প্রকৃত স্থান।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *সালাতের মধ্যে যদি এমন কোন কাজ অতিরিক্ত করে ফেলে, যা সালাত জাতীয় কিছু সালাতভুক্ত নয়, তবে সে ক্ষেত্রে সাজদায়ে সাহ্ও আবশ্যক হবে।*

---

১. আলোচ্য হাদীছ বাহ্যত এটাই দাবী করে যে, প্রত্যেকটি ভুলের জন্য ভিন্ন সাজদা সাহ্ও করতে হবে। অথচ এটা কারো মত নয়। এর উত্তর এই যে, যদিও প্রত্যেকটি সহ্ওর চাহিদা সাজদার পুনরাবৃত্তি। তবে নিয়ম অনুযায়ী একটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে সব কটি আদায় হয়ে যাবে।

২. ইমাম ফখরুল ইসলাম (র.)-এর মতে চেহারা ডানে বামে কোন দিকে না ফিরিয়ে সোজা রেখেই এক সালাম করবে এবং সাজদায় চলে যাবে। ইমাম কারখী (র.)-এর মতে ডান দিকে এক সালাম করবে। ইমাম নাখঈও এ মত পোষণ করেন। আল্‌মুহীত গ্রন্থকারের মতে এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ মত।

আবশ্যক শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাজদায়ে সাহ্ও ওয়াজিব, এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা সাজদায়ে সাহ্ও ওয়াজিব হয় ইবাদতে সৃষ্ট কোন ত্রুটি পূরণ করার জন্য। সুতরাং সেটা ওয়াজিব হবে। যেমন হজ্জের ক্ষেত্রে দম দেওয়া ওয়াজিব। যখন এটা ওয়াজিব সাব্যস্ত হল, তখন ভুলে কোন ওয়াজিব তরক করা কিংবা বিলম্বিত করা কিংবা কোন রুকন বিলম্বিত করার কারণেই শুধু সাজদায়ে সাহ্ও ওয়াজিব হবে। সাজদায়ে সাহ্ও ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে) এটাই হল মূলনীতি।

অতিরিক্ত কোন কাজ যুক্ত হওয়ার দ্বারাও সাজদায়ে সাহ্ও ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, তা কোন রুকন বিলম্বিত হওয়া বা কোন ওয়াজিব তরক হওয়া থেকে মুক্ত নয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***যদি কোন 'মাসনূন' আমল তরক করে তবে সাজদা সাহ্ও ওয়াজিব হবে।***

সম্ভবতঃ 'মাসনূন' দ্বারা ওয়াজিব আমল বুঝানো হয়েছে। তবে 'মাসনূন' বলার কারণ এই যে, তা ওয়াজিব হওয়া 'সুন্নাহ্' বা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

ইমাম কুদূরী বলেন, ***অথবা যদি সূরাতুল ফাতিহা পড়া তরক করে।*** কেননা তা ওয়াজিব।

অথবা কুনূত, তাশাহ্হুদ বা দুই ঈদের তাকবীরসমূহ যদি তরক করে। কেননা এই গুলো ওয়াজিব। এই জন্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একবারও তরক না করে এগুলো অব্যাহত ভাবে পালন করেছেন। আর এটা ওয়াজিব হওয়ার আলামত।

তাছাড়া এ সমস্ত আমলকে পুরা নামাযের সাথে সম্বন্ধ করা হয়। আর এ সম্বন্ধ প্রমাণ করে যে, এগুলো নামাযের সাথে বিশিষ্ট আর বিশিষ্টতা সাব্যস্ত হয় ওয়াজিব হওয়ার মাধ্যমে।

তাশাহ্হুদ শব্দের উল্লেখ দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠক উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার উভয় বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা এ সবই ওয়াজিব এবং তাতে সাজদায়ে সাহ্ও আবশ্যক। এটাই বিশুদ্ধ মত।

আর চুপেচুপে কিরাতের ক্ষেত্রে ইমাম যদি উচ্চৈঃস্বরে কিরাত পড়েন, অথবা উচ্চৈঃস্বরে কিরাতের ক্ষেত্রে যদি চুপেচুপে পড়েন, তবে এ অবস্থায় সাজদায়ে সাহ্ও ওয়াজিব হবে।

উচ্চৈঃস্বরের কিরাতের স্থানে উচ্চৈঃস্বরে কিরাত পড়া এবং চুপেচুপে কিরাত স্থানে চুপে চুপে পড়া ওয়াজিবসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

পরিমাণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। বিশুদ্ধতম মত এই যে, যে পরিমাণ কিরাত দ্বারা সালাত শুদ্ধ হয়, উভয় ক্ষেত্রে সে পরিমাণই বিবেচ্য। কেননা সামান্য পরিমাণ উচ্চৈঃস্বরে বা চুপেচুপে পাঠ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু অধিক পরিমাণ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। আর যে পরিমাণে সালাত শুদ্ধ হয় সেটাই হল অধিক। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সেটা হল এক আয়াত আর সাহেবাইনের মতে তিন আয়াত। এটা হল ইমামের ক্ষেত্রে। একা নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে নয়। কেননা উচ্চৈঃস্বরে কিরাত পাঠ ও চুপেচুপে কিরাত পাঠ জামাআতে নামাযের বৈশিষ্ট্য.

ইমাম কুদূরী বলেন, ***ইমামের ভুল মুক্তাদীর উপর সাজদা ওয়াজিব করে।***[৩] কেননা যার উপর নামাযের নির্ভর (ইমাম) তার উপর সাজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এ জন্যই মুক্তাদীর উপর মুকীম হওয়ার হুকুম সাব্যস্ত হয়ে যায় ইমামের নিয়্যতের কারণে।

আর ইমাম যদি সাজদা না করে তবে মুক্তাদিও সাজদা করবে না। কেননা এমতবস্থায় সে ইমামের বিরুদ্ধাচারণকারী হয়ে যাবে। অথচ সে ইমামের অনুসারী হিসাবে আদায় করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

আর মুক্তাদী যদি ভুল করে তবে ইমাম ও সেই মুক্তাদীর উপরই সাজদা ওয়াজিব হবে না। কেননা যদি সে একা সাজদা করে তবে ইমামের বিরুদ্ধাচরণকারী হবে।[৪] পক্ষান্তরে ইমাম যদি মুক্তাদীর অনুসরণ করে তবে, যে অনুসরণীয়, সে অনুসরণকারীতে পরিণত হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি প্রথম বৈঠক ভুলে যায়, পরে বসার অধিকতর নিকটবর্তী থাকা অবস্থায় তা স্মরণ হয়, তবে সে ফিরে বসে যাবে এবং তাশাহহুদ পড়বে। কেননা যা কোন নিকটবর্তী, তা ঐ জিনিসেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়।

কারো কারো মতে এমতাবস্থায় বিলম্বজনিত কারণে সাজদায়ে সাহও করবে। কিন্তু বিশুদ্ধতম মত এই যে, সাজদা করবে না, যেমন না দাঁড়ালে সাজদা করতে হয় না।[৫]

পক্ষান্তরে যদি দাঁড়ানো অবস্থার অধিকতর নিকটবর্তী হয়, তবে (বৈঠকের দিকে) ফিরে আসবে না। কেননা প্রকৃতপক্ষে সে দাঁড়ানো ব্যক্তির মতই। ***আর সে সাজদায়ে সাহও করবে।*** কেননা সে ওয়াজিব তরক করেছে।

আর যদি শেষ বৈঠক ভুলে যায়, এমন কি পঞ্চম রাকাআতে দাঁড়িয়ে যায়, তবে সাজদা করার পূর্ব পর্যন্ত বৈঠকে ফিরে আসবে। কেননা এই ফিরে আসার মধ্যে তার নামাযের সংশোধন রয়েছে। আর তার জন্য এটা সম্ভব। কেননা এক রাকাআতের কম যা, তা পরিহারযোগ্য।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***পঞ্চম রাকাআত বাতিল করে দেবে।*** কেননা সে এমন বিষয়ের দিকে ফিরে এসেছে, যার স্থান উক্ত রাকাআতের পূর্বে। সুতরাং তা আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যাবে।

---

৩. মুক্তাদী যদি এমন মাসবূক হয় যে ঐ ভুলের সময় ইমামের সাথে শরীক ছিল না তবুও সাজদা ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম যখন সালাম বলবেন তখন মাসবূক সালাম বলবে না। বরং ইমামের সিজদায় যাওয়ার অপেক্ষা করবে। ইমাম যখন সালাম বলে সাজদায় যাবেন তখন মাসবূক তাঁর সাথে সাজদায় যাবে। অতঃপর (সাজদা পরবর্তী সালামের পর) সালাত পুরা করার জন্য উঠে দাঁড়াবে।

৪. প্রশ্ন হতে পারে যে, সাজদায়ে সাহও তো নামাযের একেবারে শেষ অংশে সালামের পরে করা হয়। সুতরাং ইমামের সালাম করার পর যদি মুক্তাদি সাজদা করে অতঃপর সালাম করে তাহলে অসুবিধা কোথায়? উত্তর এই যে, এটা সম্ভব নয়। কেননা সুন্নত হলো ইমামের সালামের পরপরই মুক্তাদির সালাম করা। তাছাড়া এখন যদি সে সাজদা করে তবে তার সাজদা নামায থেকে বের হওয়ার পর সাব্যস্ত হবে। কেননা ইমামের সালাম তাকে নামায থেকে বের করে দেয়।

৫. কেননা, নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তাকে বসা ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তই গণ্য করা হবে।

আর সাজদা সাহ্ও করবে। কেননা সে ওয়াজিব বিলম্বিত করেছে।

আর যদি পঞ্চম রাকাআতের এক সাজদাও আদায় করে ফেলে তবে আমাদের মতে তার ফরয বাতিল হয়ে যাবে।

শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

আমাদের দলীল এই যে, ফরয নামাযের রুকনসমূহ পূর্ণ করার পূর্বেই সে তার নফল নামাযের আরম্ভ পোক্ত করে ফেলেছে। আর এটার অবশ্যম্ভাবী দাবী হল ফরয থেকে বের হয়ে আসা।

এর কারণ এই যে, এক সাজদাসহ রাকাআত আদায়কে প্রকৃত অর্থেই নামায গণ্য হয়। তাই নামায পড়বে না এমন কসমের বেলায় এক সাজদা এক রাকাআত আদায় করলে কসম ভংগ হয়ে যাবে।

আর তার এই নামায নফলে পরিণত হয়ে যাবে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কাযা নামায অধ্যায়ে এটা আলোচিত হয়েছে।

সুতরাং উক্ত রাকাআতের সাথে ষষ্ঠ রাকাআত যুক্ত করবে। যদি কোন রাকাআত যুক্ত না করে তবে তার উপর (সাজদা সাহ্ও বা কাযা) কিছুই ওয়াজিব হবে না।[১৩] কেননা এটা ধারণা বশীভূত।

আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে মাটিতে কপাল রাখা মাত্র তার ফরয বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এটাই পূর্ণ সাজদা। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মাথা উঠানোর পর তা বাতিল হবে। কেননা কোন কিছু পূর্ণতা লাভ করে তার শেষাংশের মাধ্যমে। আর তা হল মাথা উঠানো। অতএব হাদাছ অবস্থায় মাথা উঠানো বিশুদ্ধ হয় না, মত ভিন্নতার ফলাফল প্রকাশ পাবে, সাজদার মাঝে হাদাছ দেখা দেবে।[১৪] মুহাম্মদ (র.)-এর মতে 'বিনা' করবে আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বিনা করতে পারবে না।

আর যদি চতুর্থ রাকাআতে বৈঠকের পর সালাম না করে দাঁড়িয়ে যায়, তবে পঞ্চম রাকাআতের সাজদা না করা পর্যন্ত বৈঠকে ফিরে আসবে এবং সালাম ফিরাবে।[১৫] কেননা

---

১৩. অর্থাৎ সে তো এটাকে চতুর্থ রাকাআত মনে করেই দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং এটা স্বতন্ত্রভাবে সজ্ঞানে রাকাআত শুরু করার মতো নয়। তখন তো রাকাআত ভংগ করলে কাযা করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে কাযা করতে হবে না।

১৪. অর্থাৎ এই সাজদায় যদি তার 'হাদাছ' দেখা দেয়, অতঃপর সে উযূ করতে যায়, এরপর তার স্মরণ হয় যে, সে চতুর্থ রাকাআতের পর বসে নি তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে উযূ করার পর বৈঠকে ফিরে আসবে। কেননা হাদাছ অবস্থায় মাথা তোলার কারণে তার সাজদা সম্পন্ন হয়নি। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে 'বিনা' করতে পারবে না। কেননা তার মতে কপাল মাটিতে স্থাপিত হওয়ার সাথে সাথে সাজদা হয়ে গেছে এবং নামায ফাসিদ হয়ে গেছে।

১৫. কেননা নবী (সা.) একবার পঞ্চম রাকাআতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তখন পিছনের সাহাবায়ে কিরাম সুবহানাল্লাহ বলে উঠলেন আর নবী (সা.) পুনরায় বসে সালাম ফিরালেন এবং সাজদায়ে সাহ্ও করলেন।

দাঁড়ানো অবস্থায় সালাম করা বিধিসম্মত নয়। আর বৈঠকে ফিরে এসে বিধিসম্মতভাবে সালাম ফেরানো তার পক্ষে সম্ভব। কেননা এক রাকাআতের কম যা তা বর্জনীয়।

আর যদি পঞ্চম রাকাআতে সাজদা করার পর তার স্মরণ হয় (এবং বুঝতে পারে যে, সে পঞ্চম রাকাআত অতিরিক্ত যোগ করেছে, তবে তার সাথে আরেক রাকাআত যোগ করবে। আর তার ফরয পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা শুধু সালাম করা বাকী ছিল, আর তা ওয়াজিব।

অন্য রাকাআত যোগ করার কারণ হল, যাতে দুই রাকাআত মিলে নফল হয়ে যায়। কেননা এক রাকাআত নফল হিসাবে যথেষ্ট নয়। নবী (সা.) বিচ্ছিন্ন এক রাকাআত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। তবে এ দু'রাকাআত যুহর পরবর্তী সুন্নত দু'রাকাআতের স্থলবর্তী হবে না। এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা (নবী (সা.)) থেকে নতুন তাহরীমা দ্বারা এর উপর নিয়মিত আমল রয়েছে।

আর ভুলের জন্য সাজদা করবে।

এটা সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। কেননা সুন্নত তরীকার বিপরীতে (ফরয হতে) বের হওয়ার কারণে ফরযে ত্রুটি এসে গেছে। আর সুন্নত তরীকার বিপরীত (নফল সালাতে) প্রবেশের কারণে নফল সালাতেও ত্রুটি এসেছে। আর যদি এই নফল সালাত ছেড়ে দেয় তবে তার উপর কাযা আবশ্যক হবে না। কেননা এ রাকাআতটা ধারণা বশীভূত।

এ রাকাআতদ্বয়ে কেউ যদি তার সাথে ইক্‌তিদা করে তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে ছয় রাকাআত পড়বে। কারণ এ তাহরীমা দ্বারা ছয় রাকাআত আদায় করা হয়েছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে দু'রাকাআত আদায় করবে। কেননা ফরয হতে তার বের হয়ে আসা পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মুক্তাদী যদি এ সালাত ফাসিদ করে ফেলে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ইমামের উপর কিয়াস করে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে না।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে (মুক্তাদীকে) দু'রাকাআত কাযা করতে হবে। কেননা কাযা রহিত হওয়ার কারণ ইমামের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত।

জামেউস-সগীর কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি দু'রাকাআত নফল পড়ল আর তাতে কোন ভুল করল এবং সাজদায়ে সাহ্‌ও করল, অতঃপর (একই তাহরীমার মাধ্যমে) আরও দু'রাকাআত পড়ার ইচ্ছা করল সে (পূর্ববর্তী রাকাআতদ্বয়ের উপর) 'বিনা' করতে পারবে না। কেননা তখন সালাতের মধ্যবর্তী স্থানে হওয়ার কারণে সাজদায়ে সাহ্‌ও বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মুসাফির যদি সাজদায়ে সাহ্‌ও করার পর মুকীম হওয়ার নিয়্যত করে তবে সে (পূর্ববর্তী রাকাআতদ্বয়ের উপর পরবর্তী রাকাআতের) 'বিনা' করতে পারবে। কেননা মুসাফির যদি 'বিনা' না করে তবে তার সম্পূর্ণ সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

তা সত্ত্বেও যদি সে (পরবর্তী দু'রাকাআত নফল) আদায় করে তবে তাহ্‌রীমা বাকি থাকার কারণে তা সহীহ্ হবে। কিন্তু সাজদায়ে সাহ্‌ও বাতিল হয়ে যাবে। এ-ই বিশুদ্ধ মত। (সুতরাং শেষে পুনঃ সাজদা সাহ্‌ও করে নিবে)।

কেউ (সালাতের শেষে) সালাম ফেরাল, অথচ তার যিম্মায় সাজদায়ে সাহ্‌ও রয়ে গেছে; এমন সময় সালামের পর কোন লোক (ইকতিদার মাধ্যমে) তার সালাতে দাখিল হল, তবে ইমাম যদি সাজদায় যায় তাহলে মুক্তাদী সালাতে শামিল গণ্য হবে। অন্যথায় সালাতে শামিল গণ্য হবে না।

এটা ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ইমাম সাজদা করুন বা না করুন, মুক্তাদী সালাতে দাখিল গণ্য হবে। কেননা তাঁর মতে যার যিম্মায় সাজদায়ে সাহ্‌ও রয়েছে, তার সালাম মূলতঃ তাকে সালাতে থেকে বের করে না। কারণ এ সাজদা ওয়াজিব হয়েছে ক্ষতি পূরণের জন্য। সুতরাং সালাতের ইহরামে থাকা তার জন্য অপরিহার্য।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সালাম তাকে স্থগিতাবস্থায় সালাত থেকে বের করে। কেননা বস্তুতঃ সালাম হল সালাত থেকে বহিষ্কারকারী। কিন্তু সাজদা আদায়ে প্রয়োজনে এখানে তা কার্যকর হচ্ছে না। সুতরাং সাজদা ছাড়া এই 'স্থগিত হওয়া' প্রকাশ পাবে না। আর সাজদায় ফিরে না আসার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনের কার্যকারিতা নেই।

এ মতপার্থক্যের ফলাফল আলোচ্য মাসআলায় যেমন প্রকাশ পাচ্ছে তেমনি প্রকাশ পাবে এ অবস্থায় উচ্চহাস্য দ্বারা উযূ ভংগ হওয়ার ক্ষেত্রে এবং মুকীম হওয়ার নিয়্যত দ্বারা ফরয পরিবর্তন হওয়ার ক্ষেত্রে।

যে ব্যক্তি সালাত শেষ করার নিয়্যতে সালাম করল অথচ তার যিম্মায় সাজদায়ে সাহ্‌ও রয়ে গেছে, তার কর্তব্য হল সাজদায়ে সাহ্‌ও করা। কেননা এ সালাম সালাত সমাপ্তকারী নয়। আর তার নিয়্যতের লক্ষ্য হচ্ছে শরীআত অনুমোদিত বিষয়ের পরিবর্তন। সুতরাং এ নিয়্যত বাতিল।

যে ব্যক্তি সালাত রত অবস্থায় সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে তিন রাকাআত পড়েছে না চার রাকাআত, তা বলতে পারে না, আর এই প্রথম সে এ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে সে পুনরায় সালাত আদায় করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْتَقْبِلِ الصَّلَوةَ –তোমাদের কেউ যদি তার সালাতে সন্দিহান হয়ে পড়ে যে, কত রাকাআত পড়েছে? তাহলে সে যেন পুনরায় সালাত আদায় করে।

আর যদি এ অবস্থা তার বহুবার হয়ে থাকে, তাহলে সে নিজের প্রবল ধারণার উপর নির্ভর করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

مَنْ شَكَّ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ –যে ব্যক্তি তার সালাতে সন্দিহান হয়ে পড়ে, সে যেন চিন্তার মাধ্যমে কোনটি সঠিক তা সাব্যস্ত করে।

আর যদি তার কোন ধারণা না থাকে তবে নিশ্চিত (সংখ্যার) উপর নির্ভর করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

مَنْ شَكَّ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ اَثَلٰثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا بَنٰى عَلَى الاَقَلِّ – যে ব্যক্তি আপন সালাতে সন্দিহান হয়ে পড়ে ফলে সে বলতে পারে না যে, তিন রাকাআত পড়েছে, না চার রাকাআত সে 'কম' এর উপর নির্ভর করবে।

আর সালাম দ্বারা (সন্দেহগ্রস্ত সালাত শেষ করে) নতুন সালাত শুরু করা উত্তম। কেননা সালামই সালাত সমাপ্তকারী রূপে পরিচিত। কথাবার্তা দ্বারা নয়। সালাত কর্তন করার 'নিছক নিয়্যত' বাতিল গণ্য হবে।[১৬] আর কম সংখ্যার উপর নির্ভর করার সুরতে সালাত শেষ রাকাআত হিসাবে ধারণা হয়, এমন প্রত্যেক স্থান বসবে, যেন সে ফরয বৈঠক তরককারী না হয়। আল্লাহ্-ই উত্তম জানেন।

---

১৬. যে সকল বিষয়ের বাস্তবায়ন নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল সে সকল ক্ষেত্রে নিছক নিয়্যত গ্রহণযোগ্য নয়। বরং কর্মের সংযোগ জরুরী। সুতরাং শুধু নামায কর্তনের নিয়্যত যথেষ্ট নয় বরং কর্তনকারী কোন আমলও জরুরী।

অসুস্থ ব্যক্তির সালাত

অসুস্থ ব্যক্তি যখন দাঁড়াতে অক্ষম হয়[১] *তখন সে বসে রুকূ-সাজদা করবে।* কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইমরান ইব্ন হাসীন (রা.)-কে বলেছেন ঃ

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى الْجَنْبِ تُوْمِئُ اِيْمَاءً

(اخرجه الجماعة الا مسلما)

–তুমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর। যদি তা না পার তবে বসে (পড়)। যদি তা না পার তবে পার্শ্বে শয়ন করে ইংগিতের মাধ্যমে।

তাছাড়া যুক্তি এই যে, ইবাদত সামর্থ্য অনুযায়ী হয়ে থাকে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *যদি রুকূ-সাজদা করতে না পারে তাহলে ইশারায় তা আদায় করবে।* অর্থাৎ বসা অবস্থায় (ইশারায় রুকূ-সাজদা করবে) কেননা এতটুকু করার সামর্থ্য তার রয়েছে। তবে সাজদার ইশারাকে রুকূর ইশারার তুলনায় অধিক অবনমিত করবে। কেননা ইশারা হল রুকূ-সাজদার স্থলবর্তী।তা রুকূ-সাজদার হুকুম গ্রহণ করবে।

কপালের কাছে কোন কিছু উঁচু করে তার উপর সাজদা করবে না। সাজদা করার জন্য কিছু তার কপালের সামনে উচু করে ধরা হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْاَرْضِ فَاسْجُدْ وَ اِلاَّ فَأَوْمِ بِرَأْسِكَ –যদি তুমি ভূমিতে সাজদা করতে পার তবে সাজদা কর। অন্যথায় মাথা দিয়ে ইশারা কর।

আর যদি কিছু তুলে ধরা হয় এবং সেই সাথে আপন মাথাও কিঞ্চিত অবনত করে, তবে ইশারা পাওয়া যাওয়ার কারণে তা যথেষ্ট হবে। আর যদি উক্ত উত্তোলিত বস্তুকে কপালের উপর শুধু স্থাপন করে তবে ইশারা না হওয়ার কারণে তা যথেষ্ট হবে না।

আর যদি বসতে না পারে তবে পিঠের উপর চিত হয়ে শোবে[২] *এবং দু'পা কেবলামুখী করবে। এবং ইশারায় রুকূ-সাজদা করবে।* কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ

يُصَلِّي الْمَرِيْضُ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى قَفَاهُ يُوْمِئُ اِيْمَاءً ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاللّٰهُ تَعَالَى اَحَقُّ بِقَبُوْلِ الْعُذْرِ منه-

---

১. এখানে অক্ষমতা দ্বারা আক্ষরিক অর্থের অক্ষমতা উদ্দেশ্য নয়। সাধারণ অক্ষমতা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পংগুত্বের কারণে দাঁড়াতে অক্ষম হলে যেমন কিয়ামের হুকুম রহিত হয়ে যাবে তদ্রূপ যদি এমন অবস্থা হয় যে, দাঁড়াতে তীব্র ব্যথা হয় কিংবা দুর্বলতা বেড়ে যায় তবে তার ক্ষেত্রেও কিয়ামের হুকুম রহিত হয়ে যাবে।

২. অবশ্য মাথার নীচে বালিশ ইত্যাদি কোন জিনিষ রাখবে যাতে রুকূ-সাজদার জন্য ইশারা করতে সক্ষম হয়।

–অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। যদি তা না পারে তাহলে বসে (আদায় করবে)। যদি তা না পারে তাহলে চিত হয়ে ইশারায় আদায় করবে। যদি তাও না পারে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলাই তার ওযর কবূল করার অধিক হকদার।

যদি পার্শ্বে শয়ন করে আর তার চেহারা কেবলামুখী থাকে তবে তা জাইয হবে। প্রমাণ হল ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত (ইমরান ইব্‌ন হাসীনের) হাদীছ। কিন্তু আমাদের মতে প্রথম সুরতটি উত্তম। ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

কেননা চিত হয়ে শয়নকারী ব্যক্তির ইশারা কা'বা শরীফের অভিমুখী হয়। পক্ষান্তরে পার্শ্ব শয়নকারী ব্যক্তির ইশারা তার পদদ্বয় অভিমুখী হয়। অবশ্য তা দ্বারা সালাত আদায় হয়ে যাবে।

যদি মাথা দিয়ে ইশারা করতে সক্ষম না হয় তবে তার সালাত বিলম্বিত হবে। কিন্তু চোখ দ্বারা, অন্তর দ্বারা বা চোখের ভ্রূ দ্বারা ইশারা করা যাবে না।

ইমাম যুফার (এবং আহমদ, শাফিঈ ও মালিক (র.))-এর ভিন্নমত রয়েছে। আমাদের প্রমাণ হলো ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ।[৩] তাছাড়া যুক্তি এই যে, নিজস্ব মত দ্বারা স্থলবর্তী নিধারণ করা সম্ভব নয়। আর মাথা দিয়ে ইশারা এর উপর কিয়াস করা সংগত নয়। কেননা মাথা দ্বারা সালাতের রুকন আদায় করা হয় অথচ চোখ বা অপর দু'টি দ্বারা তা করা হয় না।

যদি সালাত বিলম্বিত করা হবে– ইমাম কুদূরীর এ ব্যক্তব্যে ইংগিত রয়েছে যে, সালাতের ফরয তার থেকে রহিত হবে না। যদিও অক্ষমতা একদিন এক রাত্রের বেশী হয় আর সে সজ্ঞানে থাকে। এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা সে শরীআতের সম্বোধন উপলব্ধি করতে পারে। অজ্ঞান লোকের বিষয়টি এর বিপরীত।

যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয় কিন্তু রুকূ-সাজদা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে কিয়াম করা জরুরী নয়, বরং বসে ইশারায় (রুকূ-সাজদা করে) সালাত আদায় করবে। কেননা, কিয়াম রুকন হয়েছে সাজদায় যাওয়ার মাধ্যম হিসাবে। কারণ, কিয়াম থেকে সাজদায় যাওয়ার মধ্যে চূড়ান্ত তাযীম প্রকাশ পায়, সুতরাং কিয়ামের পরে সাজদা না হলে তা রুকন রূপে গণ্য হবে না। সুতরাং অসুস্থ ব্যক্তিকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। তবে উত্তম হল বসা অবস্থায় ইশারা করা। কেননা তা সাজদার সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আংশিক সালাত আদায় করার পর যদি অসুস্থতা দেখা দেয় তাহলে বসে রুকূ-সাজদা করে সালাত পূর্ণ করবে। আর সক্ষম না হলে ইশারা দ্বারা আদায় করবে। আর (বসতে) সক্ষম না হলে চিত হয়ে শোয়ে আদায় করবে। কেননা, নিম্নস্তরকে উচ্চস্তরের উপর 'বিনা' করেছে। সুতরাং এটা ইকতিদার মত।[৪]

কোন ব্যক্তি অসুস্থতাবশতঃ বসে রুকূ-সাজদা করে সালাত শুরু করল। এরপর

---

৩. নবী (সা.)-এর নিম্নোক্ত বাণীর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে ঃ ان قدرت ان تسجد على الارض فاسجد والافاوم براسك যদি মাটিতে সাজদা করতে পার তাহলে কর। অন্যথায় আপন মস্তক দ্বারা ইংগিত কর।

৪. অর্থাৎ বসে নামায আদায়কারী যেমন দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর পিছনে ইকতিদা করতে পারে এবং ইশারায় নামায আদায়কারী যেমন রুকূ সাজদাকারীর পিছনে ইকতিদা করতে পারে, তদ্রূপ অসুস্থ ব্যক্তিও শেষাংশের নামাযকে প্রথমাংশের উপর বিনা করতে পারবে, কেননা উভয় ক্ষেত্রে দুর্বলকে সবলের সাথে যুক্ত করা হচ্ছে।

(সালাতের মাঝেই) সুস্থ হয়ে গেল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সে তার পূর্ববর্তী সালাতের উপরই বিনা করে দাঁড়িয়ে আদায় করবে। আর মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নতুন করে সালাত শুরু করবে।

এ মতপার্থক্যের ভিত্তি হল তাঁদের ইকতিদা সংক্রান্ত মতপার্থক্য। পূর্বে এর বিবরণ (ইমামাত অনুচ্ছেদ) বর্ণিত হয়েছে।

আর যদি আংশিক সালাত ইশারা দ্বারা আদায় করার পর রুকূ-সাজদা করতে সক্ষম হয়, তাহলে সকলের মতেই নতুন করে সালাত শুরু করতে হবে। কেননা, ইশারা দ্বারা আদায়কারীর পিছনে রুকূ-সাজদাকারীর ইকাতিদা করা জইয নয়। সুতরাং 'বিনা'ও জাইয হবে না।

যে ব্যক্তি দাঁড়ানো অবস্থায় নফল সালাত শুরু করে পরবর্তীতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সে লাঠিতে বা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াতে পরে কিংবা বসেও আদায় করতে পারে। কেননা, এটা ওযর। বিনা ওযরে হেলান দেওয়া অবশ্য মাকরূহ। কারণ তা আদবের খেলাফ। কেউ কেউ বলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট তা মাকরূহ নয়। কেননা তাঁর মতে বিনা ওযরে বসা জাইয আছে। সুতরাং হেলান দেয়া মাকরূহ হতে পারে না। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যেহেতু (বিনা ওযরে) বসা জাইয নেই, সেহেতু হেলান দেয়াও মাকরূহ হবে।

যদি (দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করার পর) বিনা ওযরে বসে পড়ে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমেই তা মাকরূহ হবে। তবে আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সালাত দুরস্ত হবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে দুরুস্ত হবে না। নফল অনুচ্ছেদ এ আলোচনা বিগত হয়েছে।

কোন ব্যক্তি 'জলযানে' 'বিনা ওযরে' বসে সালাত পড়লে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা জাইয হবে। তবে দাঁড়িয়ে আদায় করা উত্তম। আর সাহেবাইন বলেন যে, ওযর ছাড়া তা জাইয হবে না। কেননা কিয়ামের সামর্থ্য তার আছে। সুতরাং তা পরিত্যাগ করা যাবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর যুক্তি এই যে, সেখানে মাথা ঘুরানোর সম্ভাবনাই প্রবল সুতরাং সেটা বাস্তবতুল্য। তবে দাঁড়িয়ে পড়া হল উত্তম। কেননা তা মতপার্থক্যের সংশয় মুক্ত। আর যতটা সম্ভব মতপার্থক্য থেকে দূরে থাকাই উত্তম। কেননা তা অন্তরের জন্য অধিক প্রশান্তিকর। এ মতপার্থক্য নোংগরহীন নৌকার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে বাঁধা নৌকা নদীর তীরের (ভূমির) মতই।[৫] এটাই বিশুদ্ধ মত।

যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কিংবা তার কম সময় বেঁহুশ ছিল, সে কাযা আদায় করবে। আর যদি পাঁচ ওয়াক্তের বেশী বেহুশ থাকে, তাহলে কাযা আদায় করবে না।

এটা সূক্ষ্ম কিয়াসের সিদ্ধান্ত, সাধারণ কিয়াস অনুযায়ী অজ্ঞানতা যদি একপূর্ণ সালাতের

---

৫. বাঁধা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নদীর তীরের সাথে বাঁধা। যদি নদীর মাঝে নোংগর করা থাকে তবে অবস্থা দেখতে হবে। যদি প্রবলভাবে দোলায়মান হয় তবে তা চলন্ত জলযানের অনুরূপ গণ্য হবে। আর দোলার পরিমাণ সামান্য হলে তীরে বাঁধা স্থির জলযানের অনুরূপ গণ্য হবে।

ওয়াক্ত স্থায়ী হয়, তাহলে কাযা ওয়াজিব হবে না। কেননা অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তা পাগল হওয়ার সমতুল্য।

সূক্ষ্ম কিয়াসের ব্যাখ্যা এই যে, সময় দীর্ঘ হলে কাযা সালাতের সংখ্যা বেড়ে যায় ফলে আদায় করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে সময় সংক্ষিপ্ত হলে কাযা সালাতের সংখ্যা কম হয়; ফলে তাতে কোন কষ্ট হবে না। আর বেশীর পরিমাণ হল কাযা সালাত একদিন ও একরাত্র দাঁড়িয়ে যাওয়া। কেননা তখন তা পুনরাবৃত্তির গণ্ডিতে প্রবেশ করে যায়। আর পাগল হওয়ার হুকুম অজ্ঞান হওয়ার মত। আবূ সুলায়মান (র.) এরূপই উল্লেখ করেছেন।

ঘুমের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ঘুম এত দীর্ঘ হওয়া বিরল। সুতরাং সেটা সংক্ষিপ্ত ঘুমের পর্যায়ভুক্ত বলেই গণ্য হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বেশীর পরিমাণ হিসাব করা হবে সালাতের ওয়াক্ত হিসাবে। কেননা সেটা দ্বারাই পুনরাবৃত্তি সাব্যস্ত হয়। আর ইমাম আবূ মালিক ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সময় হিসাবে। 'আলী (রা.) ও ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে এটাই বর্ণিত হয়েছে। নির্ভুল সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই উত্তম জানেন।

তিলাওয়াতের সাজদা

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *কুরআন শরীফে মোট চৌদ্দটি সাজদায়ে তিলাওয়াত রয়েছে। (১) সূরাতুল 'আরাফের শেষে, (২) সূরাতুর রা'দ, (৩) সূরাতুন-নাহল, (৪) সূরা বনী ইসরাঈল, (৫) সূরা মারয়াম, (৬) সূরাতুল হাজ্জ-এর প্রথমটি, (৭) সূরাতুল ফুরকান, (৮) সূরা আন্-নামল, (৯) আলিফ-লাম-মীম তানযীল, (১০) সূরা সা'দ, (১১) সূরা হামীম সাজদা, (১২) সূরাতুন-নাজম, (১৩) সূরা ইযাস-সামাউন শাক্কাত ও (১৪) সূরা ইকরা।* মাসহাবে উছমানে এভাবেই লিখিত হয়েছে এবং এ-ই নির্ভরযোগ্য। সূরাতুল হাজ্জ-এর সাজদার দ্বিতীয় আয়াতটি আমাদের মতে সালাতের সাজদা সংক্রান্ত। আর হামীম আস-সাজদা -এর সাজদাস্থল হল لايسأمون আয়াতটি। এটা উমর (রা.)-এর মত। এবং সতর্কতা অবলম্বনে এই গ্রহণীয়।

এ সকল স্থানে পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ের উপর সাজদা ওয়াজিব। কুরআন শ্রবণের ইচ্ছা থাকুক কিংবা ইচ্ছা না থাকুক। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا وَعَلَى مَنْ تَلَاهَا –সাজদার আয়াত যে শ্রবণ করেছে এবং যে তিলাওয়াত করেছে উভয়ের উপর সাজদা ওয়াজিব।[১]

على অব্যয়টি ওয়াজিব নির্দেশক। আর তা ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

ইমাম যখন সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করেন তখন তিনি সাজদা করবেন এবং মুক্তাদীও তার সঙ্গে সাজদা করবে। কেননা সে ইমামের অনুসরণ নিজ কর্তব্যরূপে গ্রহণ করেছে।

মুক্তাদী তিলাওয়াত করলে ইমাম ও মুক্তাদি কেউ সাজদা করবে না। সালাতের মধ্যেও না, সালাতের পরেও না। এটা আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত। মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, সালাত শেষ করার পর সকলেই সাজদা করবে। কেননা সাজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ সাব্যস্ত হয়েছে এবং কোন প্রতিবন্ধকতাও নেই। সালাতের অবস্থা অবশ্য এর বিপরীত। কেননা সালাতের ভিতরে সাজদা করা ইমামতির অথবা তিলাওয়াতের অবস্থার বৈপরীত্যের দিকে নিয়ে যায়। শায়খাইনের যুক্তি এই যে, মুক্তাদীর উপর ইমামের কর্মকাণ্ড আরোপিত হওয়ার কারণে সে কিরাত পড়া থেকে বাধাপ্রাপ্ত। বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্মের উপর কোন হুকুম আরোপিত হয় না।

---

১. প্রশ্ন হলো পুরো আয়াত পড়ার পর সাজদা ওয়াজিব হবে না কি অর্ধেকের বেশী পড়লেই ওয়াজিব হয়ে যাবে। বিশুদ্ধতম মত এই যে, সাজদার শব্দটি যেখানে এসেছে এর পর্বে বা পরের শব্দসহ পড়লেই সাজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে (রাদ্দুল মুহতার)।

জুনুবী ও হায়যগ্রস্ত নারীর অবস্থা এর বিপরীত। কেননা তাদের কিরাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তবে হায়যগ্রস্ত নারীর উপর তিলাওয়াতের কারণে সাজদা ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ শ্রবণের কারণেও ওয়াজিব হবে না। কেননা তার সালাত আদায়ের যোগ্যতাই নাই। জুনুবী ব্যক্তির বিষয়টি এর বিপরীত।

যদি উক্ত সালাত বহির্ভূত কোন ব্যক্তি উক্ত আয়াত শ্রবণ করে তবে সে সাজদা করবে। এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা (শরীআত কর্তৃক) প্রতিবন্ধকতা মুক্তাদীর ক্ষেত্রে সাব্যস্ত ছিল। সুতরাং তাদের অতিক্রম করে অন্যদের উপর তা আরোপিত হবে না।

যদি সালাতের ভিতরে থেকে তারা এমন লোকের তিলাওয়াত শ্রবণ করে, যে সালাতে তাদের সাথে (শরীক) নেই, তাহলে তারা সালাতে ঐ তিলাওয়াতের সাজদা করবে না। কেননা, এটি সালাতভুক্ত সাজদায়ে তিলাওয়াত নয়। কারণ তাদের এই সাজদার আয়াত শ্রবণ সালাতের কোন আমল নয়। তবে সালাতের পরে এর জন্য তারা সাজদা করবে। কেননা, সাজদার কারণ পাওয়া গেছে।

যদি তারা সালাতের মাঝেই সাজদা করে, তবে তা যথেষ্ট হবে না। কেননা, নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে তা নিম্নমানের সাজদা। সুতরাং তা দ্বারা পূর্ণমানের সাজদা আদায় হতে পারে না।

গ্রন্থকার বলেন, *পুনরায় তারা এ সাজদা করবে। কেননা সাজদার কারণ পাওয়া গেছে। তবে সালাত দোহরাতে হবে না।* কেননা, কেবলমাত্র সাজদা সালাতের তাহরীমার পরিপন্থী নয়।

'নাওয়াদির'-এর বর্ণনা মতে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা সালাতে তারা এমন 'কাজ' বৃদ্ধি করেছে যা সালাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা মুহাম্মদ (র.)-এর মত।[২]

ইমাম যদি সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করেন আর তা এমন কোন ব্যক্তি শুনতে পায়, যে সালাতে ইমামের সাথে শরীক নয়। এরপর ইমাম সাজদা করার পর সে ইমামের সাথে সালাতে শরীক হল, তাহলে ঐ সাজদা করা তার জন্য জরুরী নয়। কেননা ঐ রাকাআতে শরীক হওয়ার দ্বারা ঐ সাজদাতেও সে শরীক বলে গণ্য হয়েছে।[৩]

আর যদি ঐ সাজদা করার আগেই সে ইমামের সঙ্গে শরীক হয়ে যায়, তাহলে ইমামের সঙ্গে সেও ঐ সাজদা করবে। কেননা, ঐ আয়াতটি যদি সে শ্রবণ নাও করতো, তবু ইমামের সঙ্গে তাকে সাজদা করতে হত। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সাজদা করা অধিকতর সংগত হবে।

---

২. অর্থাৎ এটা শুধু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত শায়খাইনের মত নয়। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একটি অতিরিক্ত সাজদা সালাত ফাসিদ করে দেয়। পক্ষান্তরে শায়খাইনের মতে এক রাকাআতের কম অতিরিক্ত হলে তা সালাতকে ফাসিদ করে না।

৩. এ হুকুম ঐ সময় যখন ইমামকে সে ঐ রাকাআতের শেষদিকে পায়। আর যদি ইমামকে অন্য রাকাআতে গিয়ে পায় তবে সালাত থেকে ফারিগ হওয়ার পর সাজদা করবে। কেননা সে তো সাজদার কিরাত বা কিরাত সংশ্লিষ্ট রাকাআতের কোন অংশেই পায়নি।

আর যদি ইমামের সঙ্গে সালাতে মোটেই শরীক না হয়, তাহলে সে সাজদা করে নেবে। কেননা, সাজদার কারণ পাওয়া গেছে।

যে সাজদা সালাতের মধ্যে ওয়াজিব হল কিন্তু সে সালাতের মধ্যে আদায় করল না, তবে সালাতের বাইরে আর কাযা করবে না। কেননা, এ হল সালাতের মধ্যকার সাজদা। তার সালাতভক্তির অতিরিক্তি মর্যাদা রয়েছে। সুতরাং নিম্নমানের সাজদা দ্বারা তা আদায় হবে না।

যে ব্যক্তি সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করল, এরপর সাজদা না করেই সালাত শুরু করে উক্ত আয়াত পুনঃপাঠ করল এবং সাজদা করল, তার দুই বারের তিলাওয়াতের জন্য এ সাজদাই যথেষ্ট হবে। কেননা, দ্বিতীয় সাজদাটি সালাতভুক্ত হওয়ার কারণে অধিকতর শক্তিশালী। সুতরাং তা প্রথম সাজদাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিবে।

তবে 'নাওয়াদির' এর বর্ণনা মতে সালাত থেকে ফারিগ হওয়ার পর আর এক সাজদা করে নিবে। কেননা, প্রথম সাজদাটি অগ্রগামিতার প্রাধান্য রাখে। সুতরাং উভয়টি সমমানের হয়ে গেল।

আমাদের বক্তব্য এই যে, উদ্দেশ্যের সাথে (আদায় নিজে সংযুক্ত হওয়ার কারণে) এর অতিরিক্ত মর্যাদা রয়েছে, সুতরাং এদিক থেকে তা অগ্রগণ্য হবে।

আর যদি সাজদার আয়াত তিলাওয়াতের পর সাজদা করে, এরপর সালাতে দাখিল হয়ে পুনরায় উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে এর জন্য আবার সাজদা করবে। কেননা দ্বিতীয় বার আয়াতে সাজদা তার পশ্চাতে এসেছে। অতএব এটিকে প্রথমটির সাথে যুক্ত করার কোন যুক্তি নেই। কেননা, এমতাবস্থায় 'কারণ'-এর উপর 'কার্য' অগ্রবর্তী হয়ে পড়বে।

যদি কোন ব্যক্তি একই মজলিসে একটিমাত্র সাজদার আয়াত পুনরাবৃত্তি করল তাহলে একই সাজদা তার জন্য যথেষ্ট হবে। কিন্তু যদি নিজ স্থানে আয়াত তিলাওয়াত পূর্বক সাজদা করে এরপর অন্যত্র গিয়ে (পূর্ববর্তী স্থানে ফিরে এসে) উক্ত আয়াত আবার তিলাওয়াত করল, তবে দ্বিতীয়বার সাজদা করতে হবে। আর প্রথম তিলাওয়াতের জন্য সাজদা না করে থাকলে তার উপর দু'টি সাজদাই ওয়াজিব হবে।

মূল নিয়ম এই যে, কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াতি সাজদার ভিত্তি হল একত্রীকরণের উপর আর এ একত্রীকরণ ও সাধিত হবে (সাজদার) কারণ (অর্থাৎ তিলাওয়াত)-এর ক্ষেত্রে, হুকুম বা বিধানের ক্ষেত্রে নয়। ইবাদতে ব্যাপারে এটাই মুনাসিব।[৪] পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি শাস্তি বিষয়ক ক্ষেত্রে অধিক যুক্তিযুক্ত।

আর একত্রীকরণ তখনই সম্ভব, যখন মজলিস অভিন্ন হবে। কেননা মজলিসই হল বিক্ষিপ্তগুলোকে একত্রকারী। সুতরাং মজলিস যখন বিভিন্ন হবে তখন হুকুম বা বিধান মূল

৪. কেননা যদি সবব বা কারণের বিভিন্নতা বিবেচনায় আনা হয় তবে ইবাদতের ক্ষেত্রে সর্তকতা রক্ষা হয় না। কেননা তখন 'সবব' সাব্যস্ত হওয়ার পরও হুকুম রহিত করা অনিবার্য হয়ে যাবে। সুতরাং তা জাইয হবে না। কেননা ইবাদত সাব্যস্ত করার মধ্যে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, রহিত করার মধ্যে নয়।

অবস্থায় ফিরে যাবে। শুধু দাঁড়ানো দ্বারা মজলিস ভিন্ন হয় না। তালাকের ইখতিয়ারপ্রাপ্ত নারীর বিষয়টি এ থেকে ভিন্ন। কেননা এক্ষেত্রে দাঁড়ানো গ্রহণ না করার ইঙ্গিত বহন করে। আর তা ইখতিয়ারকে বাতিল করে দেয়।

কাপড়ের সূতা তানা করার সময় আসা-যাওয়াতে ওয়াজিব পুনরাবৃত্ত হতে থাকবে। বিশুদ্ধতম মত অনুসারে গাছের এক ডাল থেকে আরেক ডালে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও এই বিধান। তেমনি শস্য মাড়াইয়ের ক্ষেত্রেও সতর্কতার খাতিরে একই বিধান হবে।

যদি পাঠকারীর মজলিস অভিন্ন থেকে শ্রোতার মজলিস ভিন্ন হয় তাহলে শ্রোতার উপর ওয়াজিব সাজদা পুনরাবৃত্ত হবে। কেননা তার ক্ষেত্রে শ্রবণই হল সাজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ।

তদ্রূপ যদি শ্রোতার মজলিস অপরিবর্তিত থাকে আর পাঠকারীর মজলিস পরিবর্তিত হয়। এরূপই বলা হয়েছে। তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, শ্রোতার উপর ওয়াজিব সাজদার হুকুম পুনরায় বর্তিবে না। কারণ আমরা (আগে) বলেছি।

যে ব্যক্তি সাজদা করার ইচ্ছা করবে, সে উভয় হাত না তুলে তাকবীর বলবে এবং সাজদায় যাবে। এরপর তাকবীর বলে মাথা উঠাবে।

সালাতের সাজদার অনুসরণে ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) থেকে এমনই বর্ণিত হয়েছে। আর তার উপর তাশাহ্হুদ বা সালাম ওয়াজিব নয়। কেননা তাতো করা হয় হালাল হওয়ার জন্য আর তার চাহিদা হল পূর্ববর্তী তাহরীমার উপস্থিতি, যা এখানে নেই।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, সালাতের মধ্যে বা সালাতের বাইরে সাজদার আয়াত বাদ দিয়ে সূরা তিলাওয়াত করা মাকরূহ। কেননা তা সাজদার আয়াতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের সদৃশ।

তবে অন্যান্য অংশ বাদ দিয়ে সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করাতে কোন দোষ নেই। কেননা এত সাজদার আয়াতের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পায়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আমার কাছে পসন্দনীয় সাজদার আয়াতের পূর্বে এক বা দু'আয়াত পড়ে নেওয়া। যাতে এ ভুল ধারণা না হয় যে, আয়াতে সাজদার ফযীলত অধিক রয়েছে।

শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে ফকীহ্গণ সাজদার আয়াত চুপি চুপি পড়া উত্তম মনে করেছেন।

মুসাফিরের সালাত

যে সফর দ্বারা শরীআতের আহকাম পরিবর্তিত হয়, তা হল তিন দিন তিন রাত্রি পরিমাণ দূরত্বে যাওয়ার ইচ্ছা করা উটের গতি বা হেঁটে[১] চলার গতি হিসাবে।[২] কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : يَمْسَحُ الْمُقِيْمُ كَمَالَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالْمُسَافِرُ ثَلْثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا - মুকীম পূর্ণ একদিন একরাত্র মাস্‌হ করবে, আর মুসাফির করবে তিন দিন তিন রাত্র।

মাস্‌হ্‌র অবকাশ মুসাফির সম্প্রদায়কে সামগ্রিকভাবে শামিল করেছে।[৩] আর তার অনিবার্য প্রয়োজন হবে (সফরের) সময়সীমা সম্প্রসারণ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) তা নির্ধারণ করেছেন দুই দিন এবং তৃতীয় দিনের অধিকাংশ সময় পরিমাণ দ্বারা। আর ইমাম শাফিঈ (র.) নির্ধারণ করেছেন একদিন একরাত পরিমাণ দ্বারা। আর উভয়ের বিপরীতে প্রমাণ হিসাবে আলোচ্য হাদীছই যথেষ্ট।

আর উল্লেখিত পথচলা দ্বারা মধ্যমগতির পথ চলা উদ্দেশ্য।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মনজীল দ্বারা দূরত্ব নির্ধারণ করেছেন। আর এ মত হল প্রথমোক্ত দূরত্ব পরিমাণের নিকটবর্তী।[৪] ফরসখ মাইল দ্বারা দূরত্ব নির্ধারণ গ্রহণযোগ্য নয়। এ-ই বিশুদ্ধ মত।[৫]

---

১. অবশ্য দিনরাতের সবটুকু সময় চলা উদ্দেশ্য নয়। বরং দিবাভাগের চলাই উদ্দেশ্য কেননা রাত্র তো হলো বিশ্রামের জন্য। তদ্রূপ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলাও উদ্দেশ্য নয়। কেননা মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয় আবার সওয়ারি জানোয়ারের পক্ষেও তা সম্ভব নয়। বরং স্বাভাবিক বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে পথ চলা উদ্দেশ্য।

২. ইচ্ছা বা নিয়্যাতের শর্ত আরোপ করার উদ্দেশ্য এই যে, বিনা নিয়্যাতে যদি সমগ্র পৃথিবীও কেউ ভ্রমণ করে তবে সেটা শরীআতের নিকট সফর গণ্য হবে না। মোটকথা শুধু সফরের নিয়্যাত দ্বারা মুসাফির হবে না। অবার নিয়্যত ছাড়া শুধু পথ অতিক্রম দ্বারাও মুসাফির হবে না।

৩. অর্থাৎ হাদীছ শরীফে المسافر কে তিনদিন তিনরাত্র মোজার উপর মাস্‌হ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেহেতু হাদীছে নির্দিষ্ট কোন মুসাফিরের হুকুম বয়ান করা উদ্দেশ্য নয় বরং প্রত্যেক মুসাফিরের হুকুম বয়ান করাই উদ্দেশ্য। সুতরাং আলোচ্য হাদীছের দাবী হলো প্রত্যেক মুসাফিরের তিন দিন তিন রাত্র মোজার উপর মাস্‌হ করতে সক্ষম হওয়া, আর তা সফরের সময় সীমা তিনদিন তিন রাত্র পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা ছাড়া সম্ভব নয়।

৪. অর্থাৎ তিন দিন তিনরাত্র দ্বারা দূরত্ব নির্ণয়ের অনুরূপ। কেননা সাধারণ ভাবে প্রতিদিন এক মনজীল পরিমাণ পথই অতিক্রম করা হয়ে থাকে।

৫. কিন্তু অধিকাংশ মাশায়েখ মানুষের 'হিসাবে' এর সুবিধার্থে মাইল দ্বারা দূরত্ব নিধারণ করে দিয়েছেন এবং বলেছেন, যে ধরনের পথ চলার কথা বলা হয়েছে তাতে একজন মানুষ দিনে সাধারণতঃ ষোল মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে। সুতরাং সফরের শরীআত নির্ধারিত দূরত্ব হলো আটচল্লিশ মাইল।

আর নৌপথের চলার গতিকে পরিমাপ হিসাবে গ্রহণ করা হবে না। অর্থাৎ স্থল পথের জন্য নৌপথের যাত্রাকে পরিমাপ হিসাবে গণ্য করা হবে না।[৬] আর সমুদ্রে তার উপযোগী যাত্রা পরিমাপ বিবেচ্য, যেমন পার্বত্য পথের হুকুম।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *চার রাকাআত বিশিষ্ট সালাতে মুসাফিরের জন্য ফরয হল দুই রাকাআত। এর অধিক আদায় করবে না।*

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, মুসাফিরের (মূল) ফরয চার রাকাআত। তবে কসর করা হল রুখছত, সাওমের উপর কিয়াস করে।

আমাদের দলীল এই যে, দ্বিতীয়ার্থ দুই রাকাআত কাযা করতে হয় না এবং তা তরক করার কারণে গুনাহ্ হয় না। আর এ হল নফল হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে সাওমের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা কাযা করতে হয়।

আর যদি চার রাকাআত পড়ে নেয় এবং দ্বিতীয় রাকাআতে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বৈঠক করে, তাহলে প্রথম দুই রাকাআত ফরয হিসাবে আদায় হয়ে যাবে এবং শেষ দুই রাকাআত নফল হবে।

ফজরের সালাতের উপর কিয়াস করে। অবশ্য সালাম বিলম্ব করার কারণে গুনাহ্গার হবে।

আর যদি দ্বিতীয় রাকাআতে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বৈঠক না করে তাহলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, ফরযের রুকনসমূহ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই নফল তার সাথে মিলে গেছে।

মুসাফির যখন বস্তির আবাদী ত্যাগ করবে তখন থেকেই দু'রাকাআত আদায় করবে। কেননা, বস্তিতে প্রবেশের সাথে মুকীম হওয়া সম্পৃক্ত। সুতরাং সফরের সম্পর্ক হবে বস্তি থেকে বের হওয়ার সাথে। এ সম্পর্কে আলী (রা.) থেকে নিম্নোক্ত বাণী বর্ণিত আছে ঃ لَوْ جَاوَزْنَا هٰذَا الْخُصَّ لَقَصَرْنَا -যদি আমরা বস্তির গৃহসমূহ অতিক্রম করি তখনই অবশ্য সালাত কসর করব।

সফরের হুকুম অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না কোন শহরে বা বস্তিতে পনের দিন বা তার বেশী থাকার নিয়্যত করে। যদি এর কম সময় থাকার নিয়্যত করে তাহলে কসর করবে। কারণ সফরের একটি মিয়াদ নির্ধারণ করা জরুরী। কেননা সফরে স্বভাবতঃ বিরতি ঘটে থাকে। তাই আমরা সফরের মিয়াদ নির্ধারণ করেছি (দুই হায়যের মধ্যবর্তী) তুহরের মিয়াদ দ্বারা। কেননা উভয় মিয়াদই কিছু আহকাম আরোপ করে।[৭]

---

৬. অর্থাৎ সাধারণতঃ সফরের 'প্রাকৃতিক পথ' তিনটি, সমতল স্থলপথ, পাহাড়ী পথ ও নৌপথ। এখন এই তিন পথের কোন পথে অন্য পথের পথ চলা। গ্রহণযোগ্য হবে না। উদাহরণ স্বরূপ যদি এমন কোন স্থানের উদ্দেশ্যে সফরে বের হয় যেখানে যাওয়ার বিন্দুটি পথ রয়েছে। স্থলপথে তিনদিন তিন রাত্রের দূরত্ব। কিন্তু নৌপথে তার চেয়ে কম। এখন যদি স্থল পথে সফর করে তাহলে সে মুসাফির হবে কিন্তু পানি পথে গমন করলে মুসাফির হবে না।

৭. কেননা হায়যের কারণে স্থগিত রোযা ও নামাযকে যে তুহ্র পুনরায় বলবৎ করে তার স্বল্পতম মিয়াদ হয় পনের দিন। তদ্রূপ সফরের কারণে যা স্থগিত হয়ে যায় পনের দিনের মুকীম হওয়ার নিয়্যত তা পুনরায় বলবৎ হয়ে যাবে।

আর এটি ইব্ন 'আব্বাস ও ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর এ ধরনের ক্ষেত্রে সাহাবীর বাণী হাদীছের মত।[৮]

শহর বা বস্তির শর্ত এ দিকে ইংগিত করে যে, মাঠে-প্রান্তরে ইকামতের নিয়্যত করা সহীহ্ নয়। এ-ই জাহির রিওয়ায়াত।

যদি এমন সুদৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে কোন শহরে প্রবেশ করে যে, আগামীকাল অথবা পরশু এখান থেকে বের হয়ে যাবে এবং সে মুকীম হওয়ার নির্ধারিত মেয়াদের নিয়্যত করল না; এমন কি এভাবে সে কয়েক বছর অবস্থান করল, তাহলে সে কসর করতে থাকবে। কেননা, ইব্ন 'উমর (রা.) আজারবাইজান শহরে ছয়মাস অবস্থান করেছেন এবং তিনি এ সময় কসর করতে থাকেন। আরও বহু সাহাবায়ে কিরাম থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

সৈন্যবাহিনী যখন শত্রু এলাকায় প্রবেশ করে এবং ইকামতের নিয়্যত করে তখন তারা কসরই পড়বে। তদ্রূপ যদি শত্রু দেশের কোন শহর বা দুর্গ অবরোধ করে। কেননা শত্রুভূমিতে প্রবেশকারীর অবস্থা দোদুল্যমান; হয়ত পরাজিত হয়ে স্থান ত্যাগ করবে, নয়ত (শত্রুবাহিনীকে) পরাস্ত করে তথায় স্থায়ী হবে। সুতরাং তা ইকামাতের স্থান হতে পারে না।

অনুরূপভাবে (কসর আদায় করবে) যদি (মুসলিম) বাহিনী দারুল ইসলামের বিদ্রোহীদের শহর বহির্ভূত কোন এলাকায়[৯] অবরোধ করে কিংবা সমুদ্রে তাদের অবরোধ করে। কেননা[১০] তাদের অবস্থা তাদের নিয়্যতের দৃঢ়তা বাতিল করে।

যুফার (র.)-এর মতে উভয় অবস্থায় (ইকামতের নিয়্যত) গ্রহণযোগ্য হবে, যদি মুসলিম বাহিনীর শক্তিতে প্রাধান্য থাকে। কেননা, সে অবস্থায় বাহ্যতঃ তারা অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে যদি তারা বস্তি এলাকায় থাকে তবে (নিয়্যত) গ্রহণযোগ্য হবে; কেননা বস্তি এলাকা ইকামত করার স্থান।

আর তাঁবুবাসীদের সম্পর্কে ইকামতের নিয়্যত কারো কারো মতে দুরস্ত নয়। তবে বিশুদ্ধ মত এই যে, তারা মুকীম বিবেচিত হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। কেননা ইকামত হলো (মানুষের জীবনের) আসল অবস্থা। সুতরাং এক চারণভূমিতে যাওয়ার কারণে তা বাতিল হবে না।

আর মুসাফির যদি ওয়াক্তিয়া সালাতের ক্ষেত্রে মুকীমের পিছনে ইক্‌তিদা করে তাহলে চার রাকাআত পুরা করবে। কেননা তখন অনুসরণের বাধ্যবাধকতায় তার ফরয চার রাকাআতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। যেমন তার নিজের ইকামতের নিয়্যত দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। কারণ, পরিবর্তনকারী বিষয় (অর্থাৎ ইকতিদা) 'সবব'-এর সাথে (অর্থাৎ ওয়াকতের সাথে) যুক্ত হয়েছে।

---

৮. যেহেতু এসকল ক্ষেত্রে কিয়াসের কোন অবকাশ নেই সেহেতু এটাই স্বাভাবিক যে, সাহাবী তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকেই বর্ণনা করেছেন।

৯. বিদ্রোহী অর্থ যারা বৈধ খলীফা বা প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে।

১০. কেননা তারা একটি উদ্দেশ্যে এখানে অবস্থান করছে। যখন তাদের উদেশ্য হাছিল হয়ে যাবে তখন তারা ফিরে চলে যাবে। আবার উদ্দেশ্য হাছিল হওয়ার সময় সীমাও তাদের জানা নেই। সুতরাং তাদের নিয়্যত স্থিতিপূর্ণ নয়।

যদি মকীম ইমামের সঙ্গে কাযা সালাতে শামিল হয়, তবে তা জাইয হবে না। কেননা, ফরয পরিবর্তিত হয় না ওয়াকতের পর সবব বিলুপ্ত হওয়ার কারণে; যেমন ইকামতের নিয়্যত দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। এমতাবস্থায় এটা বৈঠক ও কিরাতের ক্ষেত্রে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইকতিদার মত হয়ে যাবে, যা দুরস্ত নয়।

মুসাফির যদি দুই রাকাআতে মুকীমদের ইমামতি করে তবে সে (দুই রাকাআত শেষে) সালাম ফিরাবে আর মুকীমগণ তাদের সালাত পূর্ণ করে নিবে। কেননা, মুকতাদীরা দুই রাকাআতের ক্ষেত্রে (মুসাফির ইমামের) অনুসরণের বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। সুতরাং অবশিষ্ট সালাতের ক্ষেত্রে তারা মাসবূকের মত একাকী হয়ে পড়বে। তবে বিশুদ্ধ মতে সে কিরাত পড়বে না। কেননা তারা তাহরীমার বেলায় মুকতাদী, অন্যান্য কাজের বেলায় নয়। আর ফরয (কিরাত) আদায় হয়ে গেছে। সুতরাং সতর্কতা হিসাবে কিরাত তরক করবে। মাসবূকের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, সে নফল কিরাত পেয়েছে। সুতরাং (কিরাতের) ফরয বিরতি আদায় হয়নি। সুতরাং (তার ক্ষেত্রে) কিরাত পড়াই উত্তম।

সালাম ফিরানোর পর (মুসাফির) ইমামের পক্ষে একথা বলে দেওয়া মুসতাহাব যে, তোমরা তোমাদের সালাত পূর্ণ করে নাও। আমরা মুসাফির কাফেলা। কেননা, মুসাফির অবস্থায় মক্কাবাসীদের ইমামতি করার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরূপ বলেছিলেন।

মুসাফির যখন আপন শহরে প্রবেশ করবে তখন সালাত পূর্ণ করবে। যদিও সেখানে সে ইকামতের নিয়্যত না করে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম সফর করতেন। অতঃপর ইকামাতের নতুন নিয়্যত ব্যতীত ওয়াতানের দিকে ফিরে এসে মুকীম হিসাবে অবস্থান করতেন।

যদি কারও নিজস্ব আবাসভূমি থাকে অতঃপর সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে অন্য স্থানকে আবাসভূমি রূপে গ্রহণ করে, তবে অতঃপর সফর করে প্রথম আবাসভূমিতে প্রবেশ করে, তবে সে কসর পড়বে। কেননা প্রথমটি তার আবাসভূমি থাকে না। একথা স্পষ্ট প্রমাণিত যে, হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজেকে মক্কায় মুসাফির গণ্য করেছিলেন।

এর কারণ এই যে, নীতি হল, স্থায়ী আবাসভূমি অনুরূপ আবাসভূমি দ্বারা বাতিল হয়ে যায়, সফর দ্বারা হয় না। পক্ষান্তরে অস্থায়ী অবস্থান স্থল অনুরূপ স্থল দ্বারা, সফর দ্বারা এবং স্থায়ী আবাসভূমি দ্বারা বাতিল হয়ে যায়।

মুসাফির যদি মক্কায় ও মীনায় পনের দিন থাকার নিয়্যত করে তবে সে কসর পড়বে। কেননা দুই স্থানে ইকামতের নিয়্যতকে যদি এ'তেবার করা হয়, তাহলে বিভিন্ন জায়গার ইকামতের নিয়্যতকেও মিলিতভাবে গ্রহণ করতে হবে। আর তা নিষিদ্ধ। কেননা, সফর তো বিভিন্ন স্থানে অবস্থান থেকে মুক্ত নয়। তবে যদি উভয়ের মধ্যে একটিতে রাত্রিযাপন করার নিয়্যত করে থাক তবে সে সে স্থানে প্রবেশ করার সাথে সাথে মুকীম হয়ে যাবে। কেননা, লোকের ইকামতের বিষয়টি তার রাত্রি যাপনের স্থানের সাথে সম্পৃক্ত।

সফরে যার সালাত ফউত হয়ে যায়, সে মুকীম হওয়ার পরও দুই রাকাআতই কাযা করবে। তদ্রূপ যার ইকামাত অবস্থায় (চার রাকাআত ওয়ালা সালাত) কাযা হয়ে যায় সফরে তা চার রাকাআতই আদায় করবে। কেননা আদায় অনুরূপ কাযা করতে হয়। অনুরূপ কাযার বেলায় ওয়াক্তের শেষ সময় ধর্তব্য। কেননা, শেষ ওয়াকতই সব হিসাবে গণ্য, যখন ওয়াকতের মধ্যে সালাত আদায় না করা হয়।

অবৈধ উদ্দেশ্যে ও বৈধ উদ্দেশ্যে সফরকারী সফরে রুখসত লাভের ক্ষেত্রে উভয়ই সমান।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, গুনাহের সফরে রুখসত লাভ হবে না। কেননা, তা কষ্ট লাঘবের জন্য কার্যকরী। সুতরাং যা কঠোরতা দাবী করে, তার সাথে তা সম্পৃক্ত হবে না।

আমাদের দলীল শরীআতের বিধানের নিঃশর্ততা। তাছাড়া মূলতঃ সফর কোন অপরাধ নয়। অপরাধ তো এর পাশাপাশি বা পরে সংযুক্ত হয়। সুতরাং রুখসত সম্পৃক্ত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

সালাতুল জুমুআ

জুমুআর সালাত শুদ্ধ হয় না কেবল জামে' শহর কিংবা শহরের ঈদগাহ ব্যতীত। গ্রামাঞ্চলে জুমুআ জাইয নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, لاجُمُعَةَ وَلاَتَشْرِيْقَ وَلاَفِطْرَ وَلاَ اَضْحَى اِلاَّ فِىْ مِصْرٍجَامِعٍ -শহর ছাড়া অন্য কোথাও জুমুআ (তাকবীর) তাশরীক, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা নেই।[১]

'জামে' শহর' অর্থ এমন লোকালয়, যেখানে শাসক ও বিচারক রয়েছেন, যিনি শরীআতের বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করতে এবং 'হদ'সমূহ কার্যকর করতে পারেন। এ হলো ইমাম আবূ ইউসুফ থেকে বর্ণিত মত। তাঁর থেকে আরেকটি মত বর্ণিত আছে যে, যদি তারা তাদের সবচেয়ে বড় মসজিদে সমবেত হয় তাহলে সেখানে তাদের স্থান সংকুলান হয় না। প্রথমটি ইমাম কারখী (র.) সমর্থিত মত। এবং এ-ই প্রকাশ্য মাযহাব। আর দ্বিতীয় মত হলো ইমাম সালজী (র.) গ্রহীত।

তবে জুমুআর বৈধতা শুধু ঈদগাহের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং শহরের সমগ্র উপকণ্ঠেই জাইয হবে। কেননা শহরবাসীদের প্রয়োজনের লক্ষ্যে তা শহরেরই স্থলবর্তী।

মীনাতে জুমুআ জাইয হবে যদি হিজাযের আমীর উপস্থিত থাকেন, কিংবা যদি মুসাফির[২] অবস্থায় খলীফা উপস্থিত থাকেন। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মীনাতে জুমুআ দুরুস্ত নেই। কেননা এটি গ্রামে গণ্য। এজন্যই সেখানে ঈদের সালাত পড়া হয় না। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফের দলীল এই যে, হজ্জের মওসুমে মীনা শহরে পরিণত হয়ে যায়। ঈদের অনুষ্ঠান হয় না হাজীদের দায়িত্বভার লাঘবের জন্য।[৩]

আরাফাতে সকলের মতেই জুমুআ জাইয নয়। কেননা, তা খোলা প্রান্তর। পক্ষান্তরে মীনাতে ঘরবাড়ী রয়েছে।

---

১. হিদায়া গ্রন্থকার এটাকে মারফু হাদীছরূপে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে ইব্‌ন আবী শায়বা এটাকে আলী (রা.)-এর উপর মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। এ-ই বিশুদ্ধ মত।

২. মুসাফির হওয়ার কথা বলা হয়েছে দু'টি কারণে , প্রথমতঃ এ বিষয়ে ইংগিত করার জন্য যে. মুসাফির অবস্থায় যখন তিনি তা পারেন তবে মুকীম অবস্থায় তো অবশ্যই তা পারবেন। দ্বিতীয়তঃ এই ভুল ধারণা দূর করার জন্য যে, খলীফা মুসাফির অবস্থায় জুমুআ কায়েম করতে পারেন না। যেমন হজ্জ মৌসুমের আমীর মুসাফির অবস্থায় পারেন না। এতে এই ইংগিতও রয়েছে যে, খলীফা বা শাসক দেশের যে কোন শহরে যাবেন সেখানে তার উপর জুমুআ ওয়াজিব হবে।

৩. অর্থাৎ মীনায় ঈদের নামায না হওয়া শহরের গুণ না থাকার কারণে নয়। বরং সহজতা আনয়নের জন্য। কেননা মানুষ হজ্জ অনুষ্ঠানের যাবতীয় আহকাম পালনে ব্যস্ত থাকবে। আর দশ তারিখে ঈদ অতি অবশ্যই আসবে সুতরাং ঈদের নামায তার উপর চপিয়ে দিলে মানুষের ভীষণ অসুবিধা হবে। পক্ষান্তরে জুমুআর নামায প্রত্যেক হজ্জ মৌসুমে হওয়া নিশ্চিত নয়। মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে সুতরাং তাতে বিশেষ অসুবিধা নেই।

খলীফা কিংবা হিজাযের আমীরের সাথে বিষয়টিকে শর্তযুক্ত করার কারণ এই যে, ক্ষমতা তাদেরই রয়েছে। হজ্জ মওসুমের আমীর তো শুধু হজ্জ সংশ্লিষ্ট বিষয়ই তদারক করে থাকেন।

শাসক কিংবা শাসক নির্ধারিত লোক ছাড়া অন্য কারো জন্য জুমুআ জামা'আত কায়েম করা জাইয নয়। কেননা জুমুআ বিশাল সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। আর সেখানে ইমাম হওয়া কিংবা অন্যকে ইমাম করা এছাড়া অন্যান্য কারণে কোন কোন সময় ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। সুতরাং জুমুআর সালাত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য তা জরুরী।

জুমুআর আরেকটি শর্ত হল সময়। সুতরাং তা যুহরের সময় সহীহ্ হবে, তার পরে দুরস্ত নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ اِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ -যখন সূর্য হেলে পড়ে তখন তুমি লোকদের নিয়ে জুমুআর সালাত আদায় কর।

যদি জুমুআর সালাতে থাকা অবস্থায় ওয়াক্ত চলে যায় তবে পুনরায় যুহর শুরু করবে।

জুমুআর উপর যুহরের বিনা করবে না। কেননা উভয়টি ভিন্ন সালাত।

জুমুআর সালাতের জন্য আরেকটি শর্ত হল খুতবা। কেননা নবী (সা.) জীবনে কখনো খুতবা ছাড়া জুমুআর সালাত আদায় করেননি।

আর এই খুতবা হবে সূর্য হেলে যাওয়ার পরে সালাতের পূর্বে। হাদীছে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম দু'টি খুতবা দিবেন এবং উভয় খুতবার মাঝে একটি বৈঠকে ব্যবধান করবেন। এর উপরই আমল চলে এসেছে।

তাহারাত অবস্থায় দাঁড়িয়ে খুতবা দিবেন। কেননা, দাঁড়িয়ে খুতবা একটি সর্বকালীন আমল। অতঃপর যেহেতু খুতবা হলো সালাতের শর্ত। এত তাহারাত মুসতাহাব, যেমন আযানের ধ্বনি।

যদি বসে কিংবা তাহারাত ছাড়া খুতবা পাঠ করে তবে তা জাইয হবে। কেননা খুতবার উদ্দেশ্য তার দ্বারা হাসিল হয়ে যায়।

তবে তা মাকরূহ হবে।

সর্বকালীন আমলের বিরুদ্ধাচরণ এবং সালাত ও খুতবার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টির কারণে।

যদি শুধু আল্লাহ্র যিকিরের উপর শেষ করে দেয়, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা জাইয[৪] *আর সাহেবাইনের মতে এই পরিমাণ দীর্ঘ যিকির আবশ্যক, যাকে খুতবা বলা যায়।* কেননা, খুতবা হল ওয়াজিব। শুধু তাসবীহ এবং শুধু হাম্‌দকে খুতবা বলা হয় না।

ইমাম শাফিঈ (র.) প্রচলিত রীতির উপর ভিত্তি করে বলেন, দু'টি খুতবা পাঠ ছাড়া জাইয হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ -তোমরা আল্লাহ্র যিকিরের দিকে ধাবিত হও। এতে কোন বিশ্লেষণ করা হয়নি। উছমান (রা.)

---

৪. অর্থাৎ যদি খুতবার উদ্দেশ্যে যিকির করে। যেমন الحمد لله বলল। কিংবা سبحان الله বলল। কিংবা لا اله الا الله বলল। কিন্তু হাঁচির জবাবে বা এমনিতে বললে শেষে খুতবা হবে না।

সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি শুধু الحمد لله বলার পর তাঁর কথা থেমে গেলে তখন তিনি (মিম্বর থেকে) নেমে গেলেন এবং সালাত আদায় করলেন।

জুমুআর আরেকটি শর্ত হল জামা'আত কেননা جمعة শব্দটি جماعة শব্দ হতে গঠিত

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জামা'আতে সর্ব নিম্ন সংখ্যা হল ইমাম ছাড়া তিনজন। সাহেবাইনের মতে ইমাম ছাড়া দুইজন হতে হবে।

গ্রন্থকার বলেন, বিশুদ্ধতম কথা এই যে, এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর একক মত তাঁর দলীল এই যে, দুইয়ের মাঝে اجتماع বা সমাবেশের অর্থ রয়েছে। আর جمعة শব্দ সমাবেশের প্রতিই ইংগিত করে।

তরফাইনের দলীল এই যে, প্রকৃতপক্ষে جمع বা বহুবচন হল তিন। কেননা, এটিই নাম ও অর্থ উভয় দিক থেকেই جمع আর জামা'আত আলাদা শর্ত। তদ্রূপ ইমামও শর্ত। সুতরাং ইমাম জামা'আতের মধ্যে গণ্য হবে না।

ইমাম রুকূ ও সাজদা করার পূর্বেই যদি লোকেরা চলে যায়, শুধু নারী ও শিশুরা থেকে যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইমাম পুনরায় যুহর শুরু করবেন। সাহেবাইন বলেন, ইমাম সালাত শুরু করার পর তারা যদি তাকে ছেড়ে চলে যায় তবু তিনি জুমুআর সালাতই আদায় করবেন। আর যদি রুকূ ও একটি সাজদা করার পর তারা চলে যায় তবে (সকলের মতে) তিনি জুমুআই অব্যাহত রাখবেন।

এতে ইমাম যুফার (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। তিনি বলেন, যেহেতু এটা শর্ত সেহেতু এর স্থায়িত্ব আবশ্যক। যেমন ওয়াক্তের বিষয়টি।

সাহেবাইনের দলীল এই যে, জামা'আত হল জুমুআ অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত। সুতরাং তার স্থায়িত্ব শর্ত হবে না। যেমন খুতবার বিষয়টি।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, জুমুআ অনুষ্ঠিত হওয়া সাব্যস্ত হবে সালাত শুরু হওয়ার মাধ্যমে। আর এক রাকাআত পূর্ণ হওয়া ছাড়া সালাতের শুরু পূর্ণতা লাভ করে না। কেননা, এক রাকাআতের কম পরিমাণ সালাত নয়। সুতরাং এক রাকাআত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত জামা'আতের স্থায়িত্ব জরুরী। খুতবার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা সালাতের সাথে সামঞ্জস্যহীন। সুতরাং তার স্থায়িত্ব শর্ত হতে পারে না। নারী তেমনি ছেলেদের থেকে যাওয়া ধর্তব্য নয়। কেননা তাদের দ্বারা জুমুআ অনুষ্ঠিত হয় না। সুতরাং তাদের দ্বারা জাম'আতের পূর্ণতা সাধিত হবে না।

মুসাফির, নারী, রোগী, দাস ও অন্ধের উপর জুমুআ ওয়াজিব নয়। কেননা, জুমুআর উপস্থিতিতে মুসাফিরের অসুবিধা হবে। রোগী ও অন্ধ ব্যক্তি সম্পর্কেও একই কথা। তদ্রূপ দাস তার মনিবের খিদমতে এবং স্ত্রী তার স্বামীর খিদমতে ব্যস্ত থাকে। তাই ক্ষতি ও অসুবিধার জন্য তাদের 'মাযূর' গণ্য করা হয়েছে।

তবে যদি তারা উপস্থিত হয়ে লোকদের সাথে জুমুআর সালাত আদায় করে তাহলে ওয়াক্তিয়া করবের পরিবর্তে তা যথেষ্ট হবে। কেননা, তারা নিজেই তা বরদাশত করেছে। সুতরাং তারা ঐ মুসাফিরের মত হয়ে যাবে, যে সফরে সিয়াম পালন করল।

মুসাফির, দাস ও অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে জুমুআর ইমামতি করা জাইয আছে।

যুফার (র.) বলেন, তা জাইয নেই। কেননা তাদের উপর (জুমুআর) ফরযিয়াত নেই। সুতরাং তারা বালক ও স্ত্রী লোকের সদৃশ হলো।

আমাদের দলীল এই যে, এ হল তাদের জন্য অবকাশ (প্রদত্ত সুবিধা)। সুতরাং যখন তারা উপস্থিত হয়ে থাকে তখন ফরয হিসাবেই আদায় হবে। যেমন, (ইতোপূর্বে) আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

পক্ষান্তরে বালকের তো যোগ্যতাই নেই। আর স্ত্রী লোক, পুরুষদের ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়

মুসাফির, দাস ও অসুস্থদের দ্বারা জুমুআ অনুষ্ঠিত হবে। কেননা তারা যখন জুমুআর ইমামতিরই যোগ্য, তখন তাদের মধ্যে মুকতাদি হওয়ার যোগ্যতা আরও অধিক রয়েছে।

জুমুআর দিন যে ব্যক্তি ইমামের জুমুআ আদায়ের আগে আপন গৃহে যুহরের সালাত আদায় করে ফেলল, অথচ তার কোন ওযর নেই, তার জন্য তা মাকরূহ হবে। তবে তার সালাত আদায় হয়ে যাবে।

যুফার (র.) বলেন, তার এই সালাত আদায়ই হবে না। কেননা, তাঁর মতে জুমুআ মূল ফরয আর যুহর হল তার বিকল্প। আর মূলের উপর সামর্থ্য থাকা অবস্থায় বিকল্পের অভিমুখী হওয়ার অবকাশ নেই।

আমাদের দলীল এই যে, সকলের ক্ষেত্রেই মূল ফরয হল যুহর এই যাহিরে মাযহাবে অভিমত। তবে জুমুআ আদায়ের মাধ্যমে ঐ ফরয নিরসন করার জন্য সে আদিষ্ট।

এ মত এ কারণে যে, সে নিজেই যুহর আদায় করতে সক্ষম রয়েছে, জুমুআ আদায় করতে সক্ষম নয়। কেননা, তা এমন কতিপয় শর্তের উপর নির্ভরশীল, যা তার একার মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। আর নিজ সামর্থ্যের উপরই শরীআতের দায়িত্ব নির্ভরশীল।

এরপর যদি তার জুমুআর জামা'আতে হাযির হওয়ার ইচ্ছা হয় এবং জুমুআর জামা'আত অভিমুখী হয় আর ইমাম জুমুআর সালাতরত থাকেন তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গমনের দ্বারাই তার যুহর বাতিল হয়ে যাবে।

আর সাহেবাইনের মতে ইমামের সাথে সালাতে দাখিল হওয়া পর্যন্ত যুহর বাতিল হবে না। কেননা সাঈ যুহরের চেয়ে নিম্নমানের। সুতরাং যুহর সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর সাঈ তা বাতিল করবে না। আর জুমুআ হল যুহরের চেয়ে উঁচু পর্যায়ের। সুতরাং তা যুহরকে বাতিল করে দেবে।

আর এটা জুমুআ থেকে ইমামের ফারেগ হওয়ার পর জুমুআ অভিমুখী হওয়ার মত হল।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, জুমুআ অভিমুখে সাঈ করা জুমুআর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সতর্কতার খাতিরে যুহর বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে এটাকে জুমুআর স্থলবর্তী করা হবে। জুমুআ থেকে (ইমামের) ফারেগ হয়ে যাওয়ার পরবর্তী বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, প্রকৃতপক্ষে সেটা জুমুআ অভিমুখে সাঈ নয়।

জুমুআর দিন শহরে জামা'আতের সাথে যুহর আদায় করা মা'যূর লোকদের জন্য মাকরূহ। জেলখানায় কয়েদীরও এ হুকুম। কেননা, তাতে জুমুআর ব্যাপারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়। কারণ জুমুআ হল সমস্ত জামা'আতকে একত্রকারী। আর মা'যূরদের সাথে কোন কোন সময় অন্যেরাও ইকতিদা করে ফেলে। গ্রামবাসীদের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাদের উপর তো জুমুআ নেই।

তবে একদল লোক যদি যুহর জামা'আতে পড়েই ফেলে তাহলে তাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে। কেননা, যুহর জাইয হওয়ার যাবতীয় শর্ত পাওয়া গেছে।

যে ব্যক্তি জুমুআর দিন ইমামকে সালাতের মধ্যে পাবে সে ইমামের সাথে ঐ পরিমাণ সালাত পড়বে, যা সে পেয়েছে, অতঃপর তার উপর জুমুআ 'বিনা' করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ مَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوْا -যে পরিমাণ সালাত তোমরা পেয়েছ, তা পড়ে নাও, আর যে পরিমাণ ফউত হয়েছে, তা কাযা করে নাও।

যদি ইমামকে তাশাহ্হুদের মাঝে কিংবা সাজদায়ে সাহ্ও-এর মাঝে পায়। তবে শায়খাইনের মতে সে এর উপর জুমুআর বিনা করবে।

মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকা'আতের অধিকাংশ পায়, তবে তার উপর জুমুআর বিনা করবে। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় রাকাআতের কম অংশ পায়[১] তবে তার উপর যুহর এর বিনা করবে। কেননা, একদিক থেকে তা জুমুআ আবার অন্যদিকে তার থেকে কতিপয় শর্ত ফউত হওয়ার কারণে তা যুহর। সুতরাং যুহর বিবেচনায় সে চার রাকাআত পড়বে। এবং জুমু'আ বিবেচনায় দুই রাকাআতের মাথায় অবশ্যই বসবে। আবার নফল হওয়ার সম্ভাবনার কারণে শেষ দুই রাকাআতে কিরাতও পড়বে।

শায়খাইনের দলীল এই যে, এই অবস্থাতেও সে জুমুআর সালাত তো পেয়েছে। এ কারণেই জুমুআর নিয়্যত করা শর্ত। আর জুমু'আ তো দুই রাকাআত। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষ থেকে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার কোন কারণ নেই। কেননা উভয় সালাত ভিন্ন। সুতরাং একটির তাহরীমার উপর অন্যটির বিনা করা যাবে না।

জুমুআর দিন ইমাম যখন (খুতবা দানের উদ্দেশ্যে) বের হন তখন লোকেরা খুতবা থেকে তাঁর ফারেগ হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় ও কথা বলা বন্ধ রাখবে।

গ্রন্থকার বলেন, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, ইমামের বাহির হওয়ার পর খুতবা শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত এবং মিম্বর থেকে নামার পর তাকবীর বলার পূর্ব পর্যন্ত কথা বলাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, মাকরূহ হওয়ার কারণ হল মনোযোগের সাথে শ্রবণের ফরযে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়া। অথচ এই সময়ে শ্রবণের কিছু নেই। সালাতের বিষয়টি বিপরীত। কেননা সালাত তো দীর্ঘায়িত হয়।

---

১. অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকাআতের রুকূ থেকে ইমামের মস্তক উত্তোলনের পরে সে ইমামের সাথে শরীক হল।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ اَذَا خَرَجَ الاِمَامُ فَلاَ صَلاَةَ وَلاَ كَلاَمَ -ইমাম যখন বের হন (খুতাবার উদ্দেশ্যে) তখন সালাত নেই, কথাও নেই। এতে কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাছাড়া কথাবার্তা স্বভাবতঃ কখনো দীর্ঘায়িত হয়। তাই তা সালাতের সদৃশ।

মুআয্যিনগণ যখন প্রথম আযান দিবেন, তখন লোকদের কর্তব্য হল বেচা-কেনা ছেড়ে দেওয়া এবং জুমুআ অভিমুখী হওয়া। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ -তোমরা আল্লাহ্র যিকির অভিমুখে ধাবিত হও এবং বেচা-কেনা ছেড়ে দাও।

ইমাম যখন মিম্বরে আরোহণ করেন, তখন তিনি বসবেন এবং মুআয্যিনগণ মিম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দিবেন। এর উপর যুগ পরম্পরায় আমল চলে এসেছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যামানায় এই আযানই শুধু প্রচলিত ছিল। একারণেই কেউ কেউ বলেন, সাঈ ওয়াজিব হওয়া এবং বেচা-কেনা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে এই আযানই ধর্তব্য। তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, প্রথম আযান ধর্তব্য, যদি সূর্য ঢলে পড়ার পরে হয়। কেননা, তা দ্বারাই জুমুআর অবহিতি অর্জিত হয়।[৬]

---

৬. ইমাম মুসলিম ছাড়া অন্যান্যরা বর্ণনা করেন যে, হযরত সাঈদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা.) বলেন, নবী (সা.) এবং আবূ বকর ও উমর (রা.)-এর যামানা পর্যন্ত প্রথম আযান ছিল যখন ইমাম মিম্বরে আরোহণ করতেন। কিন্তু উছমান (রা.)-এর যামানায় যখন লোক সংখ্যা বেড়ে গেল তখন তৃতীয় আযানের ব্যবস্থা করা হল।

এটাকে তৃতীয় বলার কারণ এই যে, ইকামতও এক অর্থে আযান।

সাঈ ওয়াজিব হওয়া এবং বেচা-কেনা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম আযান বিবেচ্য হওয়াই বিশুদ্ধতম মত। কেননা দ্বিতীয় আযান বিবেচিত হলে সুন্নত সালাত ও খুতবা ফউত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

দুই ঈদের বিধান

যাদের উপর জুমুআর সালাত ওয়াজিব, তাদের সকলের উপর ঈদের সালাত ওয়াজিব।

আল-জামেউস সাগীর কিতাবে বলা হয়েছে, একই দিনে দু'টি ঈদ একত্র হয়েছে। প্রথমটি হল সুন্নত আর দ্বিতীয়টি হল ফরয। তবে দু'টির কোন একটিকেও তরক করা যাবে না।

গ্রন্থকার বলেন, এতে স্পষ্টভাবে সুন্নত বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে প্রথমটি ওয়াজিব হওয়ার সুস্পষ্ট উক্তি। আর তা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত।

প্রথমোক্ত বর্ণনার দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিয়মিত ভাবে তা পালন করেছেন।

দ্বিতীয় বর্ণনার দলীল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উক্তি, যা এক গ্রাম্য সাহাবীর এ প্রশ্ন-আমার উপর এ ছাড়া আরও কোন সালাত ওয়াজিব আছে কি-এর উত্তরে বলেন ঃ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ না নেই, তবে যদি নফল আদায় কর (তবে তোমার ইচ্ছা)। প্রথমোক্ত বর্ণনাটি অধিক বিশুদ্ধ। আর তাকে সুন্নত বলার কারণ এই যে, তা সুন্নাহ্ বা হাদীছ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে।

আর মুসতাহাব হল ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগায় যাওয়ার পূর্বে কিছু (মিষ্টি) খাবার গ্রহণ করা, গোসল করা, মিসওয়াক করা এবং খুশবু ব্যবহার করা। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগায় যাওয়ার পূর্বে আহার করতেন এবং দুই ঈদেই গোসল করতেন।

কেননা এ হল সমাবেশের দিন। সুতরাং তাতে গোসল করা ও খুশবু ব্যবহার করা সুন্নত হবে। যেমন জুমুআর জন্য।

আর নিজের সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করবে। কেননা, নবী (সা.)-এর একটি পুস্তিনের বা পশমের জুব্বা ছিল, যা তিনি ঈদে পরিধান করতেন।

আর সাদাকাতুল ফিতর আদায় করবে। যাতে দরিদ্র ব্যক্তি সচ্ছলতা লাভ করতে পারে এবং তার অন্তর সালাতের জন্য একাগ্র হতে পারে।

অতঃপর ঈদগাহ অভিমুখে গমন করবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ঈদগায় যাওয়ার পথে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলবে না। আর সাহেবাইনের মতে তাকবীর বলবে।[১] তাঁরা ঈদুল আযহার উপর কিয়াস করেন।

---

১. মতভিন্নতা হল সশব্দে তাকবীর বলা সম্পর্কে। মূল তাকবীর সম্পর্কে কোন মতভিন্নতা নেই। সাহেবাইন ঈদুল আযহার ন্যায় ঈদুল ফিতরেও সশব্দে তাকবীর উচ্চারণের কথা বলেন, আর আবূ হানীফা (র.) বলেন যে, মনে মনে তাকবীর বলবে ঈদুল আযহার মত সশব্দে বলবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, সানা ও যিকির এর ব্যাপারে আসল হল গোপনীয়তা। কিন্তু ঈদুল আযহার ক্ষেত্রে শরীআত প্রকাশ্য যিকিরের আদেশ দিয়েছে। কেননা, তা তাকবীর দিবস। কিন্তু ঈদুল ফিতর সেরূপ নয়।

ঈদের সালাতের পূর্বে ঈদগায় নফল পড়বে না। কেননা সালাতের প্রতি প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও নবী (সা.) তা করেননি। এরপর কেউ কেউ বলেন, এই মাকরূহ হওয়া ঈদগাহের জন্য নির্দিষ্ট।

আবার কেউ কেউ বলেন, সাধারণভাবে ঈদগাহ ও সব স্থানের জন্য ব্যাপক। কেননা নবী (সা.) তা করেননি।

যখন সূর্য উপরে উঠে আসার মাধ্যমে সালাত আদায় করা জাইয হয়ে যায়, তখন থেকে যাওয়াল পর্যন্ত ঈদের সালাতের সময় থাকে। যখন সূর্য ঢলে পড়ে তখন ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। কেননা নবী (সা.) সূর্য এক বা দুই বর্শা পরিমাণ উপরে উঠতে ঈদের সালাত আদায় করতেন। আর (একবার) যখন সাহাবায়ে কিরাম যাওয়ালের পর চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলেন, তখন তিনি পরবর্তী দিন ঈদগায় যাওয়ার আদেশ করলেন।

ইমাম লোকদের নিয়ে দুই রাকাআত সালাত আদায় করবেন। প্রথম রাকাআতে এক তাকবীর বলবেন তাহরীমার জন্য। তারপর তিনবার তাকবীর বলবেন। এরপর ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন এবং তাকবীর বলে রুকূতে যাবেন। এরপর দ্বিতীয় রাকাআতে কিরাত দিয়ে শুরু করবেন। তারপরে তিনবার তাকবীর বলবেন এবং চতুর্থ তাকবীর বলে রুকূতে যাবেন।

এ হল ইব্ন মাস'ঊদ (রা.)-এর মত এবং তা আমাদের মাযহাব। ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন, প্রথম রাকাআতে তাহরীমা তাকবীর বলে তার পর পাঁচটি তাকবীর বলবেন এবং দ্বিতীয় রাকাআতেও পাঁচবার তাকবীর বলার পর কিরাত পড়বে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, (দ্বিতীয় রাকাআতে) চারবার তাকবীর বলবেন। বর্তমানে ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর বংশধর খলীফাদের শাসনের যুগ হওয়ার কারণে সাধারণ লোকের আমল তার মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে মাযহাব হল প্রথমোক্ত মত। কেননা, (অতিরিক্ত) তাকবীর এবং হাত উঠানো সালাতের নির্ধারিত প্রকৃতির বিপরীত। সুতরাং নিম্নতর সংখ্যাই গ্রহণ করা শ্রেয়।

আর (ঈদের) তাকবীরসমূহ হল দীনের প্রতীক। এ জন্য তা উচ্চৈঃস্বরে আদায় করা হয়। সুতরাং এর প্রকৃত চাহিদা হলো মিলিতভাবে পাঠ করা। প্রথম রাকআতে এই তাকবীরগুলোকে তাকবীরে তাহরীমার সাথে যুক্ত করা ওয়াজিব। যেহেতু এ তাকবীর ফরয এবং প্রথমে হওয়ার প্রেক্ষিতে এটার শক্তি বেশী। আর দ্বিতীয় রাকাআতে রুকূর তাকবীর ছাড়া অন্য কোন তাকবীর নেই। সুতরাং (ঈদের তাকবীরগুলো) তার সাথে যুক্ত করাই ওয়াজিব।

ইমাম শাফিঈ (র.) ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর মতামত গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি বর্ণিত সব ক'টি তাকবীরকে অতিরিক্ত তাকবীর হিসাব গ্রহণ করেছেন। ফলে (তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর দুই তাকবীরসহ) মোট তাকবীর তাঁর মতে পনেরটি কিংবা ষোলটি হবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দুই ঈদের তাকবীরগুলোতে উভয় হাত উপরে উঠাবে

এটা দ্বারা ইমাম কুদূরী (র.) রুকূর তাকবীর ছাড়া অন্যান্য তাকবীর বুঝিয়েছেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ لا ترفع الايدى الا فى سبع مواطن - সাতটি স্থান ছাড়া অন্য কোথাও হাত তোলা হবে না। তন্মধ্যে ঈদের তাকবীরসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, হাত তোলা হবে না। আমাদের বর্ণিত এ হাদীছ এর বিপরীতে দলীল।

সালাতের পর (ইমাম) দু'টি খুতবা দিবেন। এ সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে.

তাতে লোকদের সাদাকাতুল ফিত্‌র এর আহকাম শিক্ষা দিবেন। কেননা এ খুতবা এ উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে।

যে ব্যক্তির ইমামের সাথে সালাতুল ঈদ ফউত হয়ে গেছে, সে তা কাযা পড়বে না। কেননা এই প্রকৃতির সালাত এমন কিছু শর্তসাপেক্ষেই ইবাদত রূপে স্বীকৃত হয়েছে, যা মুনফারিদ দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে না।

যদি চাঁদ মেঘাবৃত হয়ে যায় আর লোকেরা শাওয়ালের পর শাসক (বা তার নিযুক্ত ব্যক্তির) নিকট চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়, তাহলে ইমাম আগামী দিন ঈদের সালাত আদায় করবেন। কেননা এ বিলম্ব ওযরের কারণে। এ অনুযায়ী হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

যদি কোন ওযরবশতঃ আগামী দিনও সালাত আদায় সম্ভব না হয়, তাহলে এর পরে আর তা পড়বে না। কেননা জুমুআর ন্যায় এ ক্ষেত্রেও মূলনীতি হল কাযা না করা. তবে আমরা বর্ণিত হাদীছের কারণে তা বর্জন করেছি। আর হাদীছে ওযরবশতঃ দ্বিতীয় দিন পর্যন্তই বিলম্বিত করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

ঈদুল আযহার দিনও গোসল করা এবং খুশবু ব্যবহার করা মুসতাহাব। এর দলীল আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর সালাত থেকে ফারেগ না হওয়া পর্যন্ত আহার বিলম্বিত করবে। কেননা হাদীছে আছে যে, নবী (সা.) কুরবানীর দিন (ঈদগাহ থেকে) ফিরে আসার আগে কিছু খেতেন না। এরপর আপন কুরবানীর গোশত থেকে খেতেন।

আর তাকবীর বলতে বলতে ঈদগাহে যাবে। কেননা নবী করীম (সা.) পথে তাকবীর বলতেন।

আর ঈদুল ফিতরের মত দুই রাকাআত সালাত আদায় করবে। (সাহাবায়ে কিরাম থেকে) এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর ইমাম দু'টি খুতবা দিবেন। কেননা নবী করীম (সা.) এরূপ করেছেন।

তাতে লোকদের কুরবানী (আহকাম) এবং তাকবীরে তাশরীক শিক্ষা দিবেন। কেননা এ হল সেই সময়ের আহকাম, আর তা শিক্ষা দানের জন্যই খুতবার বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।

যদি কোন ওযরবশতঃ ঈদুল আযহার দিন সালাত আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে পরের দিন এবং (সেদিন সম্ভব না হলে) তার পরের দিন সালাত আদায় করবে। এরপরে তা আদায় করবে না। কেননা, এ সালাত কুরবানীর সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং কুরবানীর দিনগুলোর সাথে সীমিত থাকবে। তবে বিনা ওযরে বিলম্ব করলে বর্ণিত আমলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে গুনাহ্‌গার হবে।

আর আরাফা পালন নামে মানুষ যা পালন করে থাকে, তার কোন (শরীআতী) ভিত্তি নেই।

'আরাফা পালন' অর্থ আরফা মাঠে অবস্থানকারীদের সাথে সাদৃশ্যের উদ্দেশ্যে আরাফা দিবসে (যিলহাজ্জের নয় তারিখে) কোন স্থানে মানুষের সমবেত হওয়া। কেননা একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করাই ইবাদত রূপে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং ঐ স্থান ছাড়া অন্যত্র তা ইবাদত (বলে গণ্য) হবে না। যেমন হজ্জের অন্যান্য আমল।

পরিচ্ছেদ ঃ তাকবীরে তাশরীক

আরাফা দিবসের ফজরের সালাতের পর থেকে তাকবীরে তাশরীক শুরু করবে এবং কুরবানী দিবসের আসরের সালাতের পর তা শেষ করবে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন আসরের সালাতের পর তা শেষ করবে।

বিষয়টি সম্পর্কে সাহাবয়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাই সাহেবাইন আলী (রা.)-এর মত গ্রহণ করেছেন, দিবসের সংখ্যাধিক্যের উপর প্রেক্ষিতে। কেননা, ইবাদতের ব্যাপারে এতেই সতর্কতা রয়েছে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিম্নতর সংখ্যার উপর আমল করার উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.)-এর মত গ্রহণ করেছেন। কেননা উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলার মধ্যে নতুনত্ব রয়েছে (তাই নিশ্চিতের উপর আমল করা শ্রেয়ঃ)।

আর তাকবীর হল একবার বলবে ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

কেননা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ আলায়হিস সালাম থেকে এরূপই বর্ণিত রয়েছে।

আর এইটি ফরয সালাতসমূহের পর ওয়াজিব। ইমাম আবূ হানীফার মতে শহরে মুস্তাহাব জামা'আতে সালাত আদায়কারী মুকীমদের উপর। সুতরাং স্ত্রী লোকদের জামা'আতের ক্ষেত্রে যেখানে কোন পুরুষ নেই, এবং মুসাফিরদের জামা'আতের বেলায় যাদের সঙ্গে কোন মুকীম নেই, সেখানে তা ওয়াজিব হবে না।

সাহেবাইন বলেন, তা ওয়াজিব ফরয সালাত আদায়কারী প্রত্যেকের উপর। কেননা এ তাকবীর ফরয সালাতের অনুগামী।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল হল ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ।

তাশরীক অর্থ উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা। খলীল ইব্‌ন আহমদ থেকে এটি বর্ণিত। তাছাড়া উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা সুন্নতের খিলাফ। আর শরীআতে এর প্রমাণ পাওয়া যায় উপরোক্ত শর্তসমূহ একত্র হওয়ার বেলায়। অবশ্য স্ত্রী লোকেরা পুরুষের পিছনে ইকতিদা করলে এবং মুসাফিরগণ মুকীমের পিছনে ইকতিদা করলে অনুগামী হিসাবে তাদের উপরও (তাকবীরে তাশরীক) ওয়াজিব হবে।

ইমাম (আবূ ইউসুফ) ইয়া'কূব (র.) বলেন, আরাফা দিবসে মাগরিবের সালাতে আমি ইমামতি করলাম এবং তাকবীর বলতে ভুলে গেলাম। তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাকবীর বললেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম তাকবীর তরক করলেও মুক্তাদী তা তরক করবে না। কেননা এটা সালাতের তাহরীমার মধ্যে আদায় করা হয় না। সুতরাং তাতে ইমাম অপরিহার্য নন। বরং ইমামের অনুসরণ মুস্তাহাব মাত্র।

সালাতুল কুসূফ

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *যখন সূর্যগ্রহণ হবে তখন ইমাম নফলের অনুরূপ দু'রাকাআত সালাত আদায় করবেন।*[১] *প্রতি রাকাআতে একটি রুকূই হবে।*

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, (প্রতি রাকাআতে) দু'টি রুকূ হবে। তাঁর দলীল হল 'আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছ।

আমাদের দলীল হল ইব্‌ন উমর (রা.) বর্ণিত হাদীছ। আর যেহেতু (ইমামের সঙ্গে) নৈকট্যের কারণে বিষয়টি পুরুষদের কাছেই অধিকতর প্রকাশিত সেহেতু ইব্‌ন উমর (রা.) বর্ণিত রিওয়ায়াতই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

উভয় রাকাআতে (ইমাম) কিরাত দীর্ঘ করবেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে (ইমাম) নীরবে কিরাত পড়বেন। আর সাহেবাইনের মতে উচ্চৈঃস্বরে পড়বেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুরূপ মতও বর্ণিত হয়েছে।

কিরাত দীর্ঘ করার বক্তব্যটি উত্তম হিসাবে গণ্য। সুতরাং ইচ্ছা করলে ইমাম কিরাত সংক্ষিপ্ত করতে পারেন। কেননা, সুন্নাত হল গ্রহণের সময়টিকে সালাত ও দু'আ দ্বারা পরিপূর্ণ করা। সুতরাং একটিকে সংক্ষিপ্ত করলে অন্যটিকে দীর্ঘ করবে। নীরবে এবং উচ্চৈঃস্বরে কিরাত পড়ার ব্যাপারে সাহেবাইনের দলীল হল 'আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছ যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাতে উচ্চৈঃস্বরে কিরাত পড়েছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল হল ইব্‌ন 'আব্বাস ও সমুরাহ ইব্‌ন জুন্দুব (রা.)-এর রিওয়ায়াত। আর অগ্রাধিকার প্রদানের কারণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর কেন হবে না? এটা তো দিনের সালাত, আর দিনের সালাত হল নিঃশব্দ।

সালাতের পর সূর্য গ্রহণ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত দু'আ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ اِذَا رَاَيْتُمْ مِنْ هٰذِهِ الْاَفْزَاعِ شَيْئًا فَارْغَبُوا اِلَى اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ -যখন তোমরা এ ধরনের ভয়াবহ কোন অবস্থা দেখতে পাবে, তখন তোমরা দু'আর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অভিমুখী হবে।

---

১. ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, সালাতুল কুসূফ জামে মসজিদে কিংবা ঈদগায় পড়া হবে এবং মাকরূহ ওয়াক্তে পড়া হবে না।
নফলের অনুরূপ বলার কারণ এই যে, তাতে আযান, ইকামত ও খুতবা কিছুই হবে না।

আর দু'আসমূহের ক্ষেত্রে নিয়ম হল তা সালাতের পরে হওয়া।

যে ইমাম জুমুআর সালাত পড়ান, তিনিই সালাতুল কুসূফ পড়াবেন। তিনি উপস্থিত না হলে লোকেরা একা একা সালাত আদায় করবে।

(ইমামতির জন্য কে অগ্রবর্তী হবে, এই) ফিতনা হতে বাঁচার জন্য।

চন্দ্র গ্রহণের ক্ষেত্রে জামা'আত নেই। কেননা রাত্রিকালে সমবেত হওয়া কষ্টকর। কিংবা সংকট সৃষ্টির আশংকা রয়েছে। আর প্রত্যেকে একা একা সালাত আদায় করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ الْأَهْوَالِ فَافْزَعُوْا إِلَى الصَّلٰوةِ -যখন তোমরা এই ধরনের ভয়ংকর কিছু দেখতে পাবে, তখন তোমরা সালাতের আশ্রয় গ্রহণ করবে।[২]

সূর্য গ্রহণের সালাত (জুমু'আর মত) কোন খুতবা নেই। কেননা তা হাদীছে বর্ণিত হয়নি।

---

২. অর্থাৎ এখানে শুধু সালাতের কথা বলা হয়েছে, জামা'আতের কথা বলা হয়নি। আর নফলের ক্ষেত্রে জামা'আত না হওয়াই আসল।

ইসতিসকার সালাত

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, ইসতিসকা-এর জন্য জামা'আতসহ সালাত আদায় করা সুন্নত নয়। তবে লোকেরা যদি একা একা সালাত পড়ে নেয় তবে তা জাইয। আসলে ইসতিসকা হল দু'আ ও ইসতিগফার।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন[১]ঃ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا -তখন আমি বললাম, তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা চাও। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইসতিসকা করেছেন, কিন্তু তাঁর থেকে সালাত আদায় করা বর্ণিত হয়নি।

সাহেবাইন বলেন, ইমাম দু' রাকাআত সালাত আদায় করবেন। কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) দুই রাকাআত ইসতিসকার সালাত আদায় করেছেন, ঈদের সালাতের মত। ইব্ন 'আব্বাস (রা.) একথা বর্ণনা করেছেন।

আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি সালাত আদায় করেছেন, আবার কখনো পড়েননি। সুতরাং এটি সুন্নত নয়।

মাবসূত কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতামত এককভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

উভয় রাকাআতে কিরাত উচ্চৈঃস্বরে পড়বে। ঈদের সালাতের উপর কিয়াস করে।

অতঃপর (ইমাম) খুতবা দিবেন। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) খুতবা দিয়েছেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা হবে ঈদের খুতবার মত (দুই খুতবা বিশিষ্ট)। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে খুতবা একটিই।[২]

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে (ইসতিসকার জন্য) কোন খুতবা নেই। কেননা, খুতবা হল জামা'আতের অনুগামী। আর তাঁর মতে (ইসতিসকার সালাতে) জামা'আত নেই।

দু'আর সময় কিবলামুখী হবে। কেননা, হাদীছে রয়েছে যে, নবী করীম (সা.) কিবলামুখী হয়েছেন এবং আপন চাদর উলটিয়েছেন।[৩]

---

১. এখানে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার বিষয়টিকে ইসতিগফারের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। সালাতের সংগে যুক্ত করা হয়নি।

২. কেননা এর উদ্দেশ্য তো হল দু'আ। সুতরাং মাঝখানে বিরতির কোন প্রয়োজন নেই।

৩. চাদর বা রুমাল উল্টানোর সুরত এই যে, চতুষ্কোণ চাদর হলে চাদরের উপরের অংশ নীচের দিকে এবং নীচের অংশ উপরের দিকে নিয়ে আসবে। আর যদি জুব্বা জাতীয় গোল কিছু হয় তবে ডান দিক বাম দিকে এবং বাম দিক ডান দিকে নিয়ে আসবে।

আর ইমাম সাহেব আপন চাদর উলটাবেন।

এর দলীল আমাদের বর্ণিত হাদীছ।

গ্রন্থকার বলেন, এ হল ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে চাদর উলটাবে না। কেননা এ তো দু'আ। সুতরাং অন্যান্য দু'আর সাথেই একে বিবেচনা করতে হবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তা ছিল সুলক্ষণ গ্রহণ হিসাবে।

তবে মুকতাদীরা তাদের চাদর উল্টাবে না। কেননা এমন বর্ণিত হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে তা করার আদেশ করেছেন।

যিম্মী অধিবাসিগণ ইসতিসকার সালাতে হাযির হবে না। কেননা ইসতিসকা হল রহমত নাযিলের প্রার্থনা করার জন্য, অথচ তাদের উপর তো গযব নাযিল হওয়ার কথা।

বিংশ অনুচ্ছেদ

ভয়কালীন সালাত[১]

যখন (শত্রুর) ভয় তীব্র হয়, তখন ইমাম লোকদের দুই দলে ভাগ করবেন। একদলকে শত্রুর মুখোমুখি রাখবেন আর দ্বিতীয় দলকে নিজের পিছনে দাঁড় করাবেন।

এরপর এই দলকে নিয়ে এক রাকাআত ও দুই সাজদা আদায় করবেন। যখন তিনি দ্বিতীয় সাজদা থেকে মাথা তুলবেন, তখন এই দলটি শত্রুর সামনে অবস্থান নিতে চলে যাবে। এবং (শত্রু মুখোমুখী অবস্থানকারী) ঐ দলটি চলে আসবে। আর ইমাম তাদের নিয়ে এক রাকাআত ও দুই সাজদা আদায় করবেন এবং তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরাবেন। কিন্তু পিছনে ইকতিদাকারী দলটি সালাম ফেরাবে না বরং শত্রুর সামনে (অবস্থান গ্রহণ করতে) চলে যাবে। এবং প্রথম দলটি এসে একা একা ও কিরাত ছাড়া এক রাকাআত ও দুই সাজদা আদায় করবে।

(কিরাত না পড়ার) কারণ এই যে, তারা হল 'লাহিক' আর তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরিয়ে শত্রুর মুখোমুখি চলে যাবে। আর অপর দলটি ফিরে এসে কিরাত সহ এক রাকাআত ও দুই সাজদা আদায় করবে। কেননা তারা হল মাসবূক (আর মাসবূকের উপর কিরাত পড়া ওয়াজিব।)

এবং তারা তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফেরাবে। এ বিষয়ে মূল হল ইবন মাসউদ (র.) বর্ণিত হাদীছ যে, নবী করীম (সা.) উপরে বর্ণিত নিয়মে সালাতুল খাওফ বা ভয়কালীন সালাত আদায় করেছেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) যদিও আমাদের যামানায় এর শরীআত সম্মত হওয়া অস্বীকার করেছেন, কিন্তু তার বিপরীতে দলীল রয়েছে আমাদের বর্ণিত হাদীছ।

ইমাম যদি মুকীম হন তবে প্রথম দলটির সংগে দুই রাকাআত এবং দ্বিতীয় দলটির সংগে দুই রাকাআত পড়বেন। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) যুহরের সালাত উভয় দলের সংগে দুই দুই রাকাআত করে পড়েছেন।

মাগরিবের সালাতে ইমাম প্রথম দলের সংগে দুই রাকাআত এবং দ্বিতীয় দলের সংগে এক রাকাআত পড়বেন। কেননা, এক রাকাআতকে ভাগ করা সম্ভব নয়। তাই অগ্রবর্তিতার ভিত্তিতে প্রথম দলের সাথে সেটা আদায় করাই উত্তম।

---

১. ভয়কালীন নামায পড়ার প্রশ্ন তখনই আসে যখন লোকেরা একই ইমামের পিছনে সালাত আদায় করতে চায় পক্ষান্তরে যদি লোকেরা দুই ইমামের পিছনে সালাত আদায় করতে রাযী হয় তবে বর্ণিত নিয়মে সালাতুল খাওফ আদায়ের কোন প্রয়োজন নেই।

সালাতের অবস্থায় তারা লড়াই করবে না। যদি করে তবে তাদের সালাত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা খন্দক যুদ্ধের দিন নবী করীম (সা.) ব্যস্ততার কারণে চার ওয়াক্ত সালাত আদায় করেননি। যদি লড়াই করা অবস্থায়ও আদায় করা জাইয হতো, তবে কিছুতেই তিনি তা তরক করতেন না।

যদি ভয়ভীতি আরো তীব্র হয় তবে লোকেরা সওয়ার অবস্থায় একা একা সালাত আদায় করবে আর যদি কিবলামুখী হওয়া সম্ভব না হয় তবে যেদিকে সম্ভব সেদিকে অভিমুখী হয়ে ইশারার মাধ্যমে রুকূ-সাজদা আদায় করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا -যদি তোমরা ভীত হয়ে পড় তবে হাঁটা অবস্থায় কিংবা সওয়ার অবস্থায় (সালাত আদায় করবে।)

তখন কিবলামুখী হওয়ার হুকুম প্রয়োজনের কারণে রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, (সেই অবস্থায়ও) তারা জামা'আতের সাথে সালাত পড়বে। কিন্তু এটা বিশুদ্ধ মত নয়। কেননা (জামা'আতের জন্য) অভিন্ন স্থান বিদ্যমান নেই

সালাতুল জানাযা

যখন কোন লোকের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তাকে ডান পার্শ্বের উপর কিবলামুখী করে শোয়াবে।

(এটা করা হবে) তার কবরের অবস্থানের অবস্থা সামঞ্জস্য রেখে। কেননা সে তো কবরের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে। আমাদের দেশে চিত করে শোয়ানোই প্রচলিত। কেননা, এ হল রূহ বের হওয়ার জন্য অধিকতর সহজ। তবে প্রথম সূরত হল সুন্নত।[১] এবং তাকে উভয় শাহাদাতের তালকীন করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ-তোমরা তোমাদের মৃতদের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এই কালিমার সাক্ষ্য দানের তালকীন কর। মৃত দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যার মৃত্যু আসন্ন।

যখন সে মারা যায় তখন তার চোয়াল বেঁধে দিবে এবং চোখ দুটো বন্ধ করে দিবে।

যুগ যুগ ধরে এরূপই চলে আসছে। তাছাড়া এতে তার 'সুরত' সুন্দর করা হয়। সুতরাং এরূপ করাই উত্তম।

পরিচ্ছেদ ঃ গোসল

যখন তাকে গোসল দেয়ার ইচ্ছা করবে, তখন তাকে একটি খাটে শোয়াবে।

যাতে পানি তার থেকে নীচের দিকে সরে যায়। ***আর তার সতরের স্থানে এক খণ্ড বস্ত্র রেখে দেবে।***

এরূপ করা হবে সতরের ওয়াজিব রক্ষা করার জন্য। তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী গোসলের কাজ সহজ করার জন্য মূল লজ্জাস্থান ঢাকাই যথেষ্ট।

আর (গোসলদানকারীরা) তার সমস্ত কাপড় খুলে ফেলবে, যাতে তাদের পক্ষে তাকে পরিষ্কার করা সহজসাধ্য হয়। ***এবং তারা তাকে কুলি ও নাকে পানি দেয়া ছাড়া উযূ করাবে।*** কেননা উযূ হল গোসলের সুন্নত। তবে যেহেতু তার (মুখ ও নাক) থেকে পানি বের করা কঠিন, সেহেতু কুলি ও নাকে পানি দেয়া তরক করবে।

তারপর সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করবে। জীবদ্দশার গোসলের কথা অনুসরণে। অতঃপর তার খাটিয়ায় ধুনী দেওয়া হবে বে-জোড় সংখ্যায়। কেননা এতে মৃত ব্যক্তির

---

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনায় আগমন করার পর বারা ইব্‌ন মারূর (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তাকে বলা হল যে, তিনি ইন্‌তিকাল করেছেন। (মৃত্যুর সময়) তিনি তাকে কিবলামুখী করার ওসীয়ত করেছিলেন। তখন তিনি বললেন, সে 'ফিতরাত' অনুযায়ী ওসীয়ত করেছে।

ফিত্‌রাত অর্থ সেই স্বভাবগুণ যার উপর আল্লাহ্ মানব সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন।

প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়। বে-জোড় করার কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, إِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ -আল্লাহ্ বে-জোড়, তাই তিনি বে-জোড় সংখ্যা পসন্দ করেন। ***আর পানি বড়ই পাতা কিংবা 'উশনান' দ্বারা পানি সিদ্ধ করবে অধিকতর পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে।***

যদি তা না পাওয়া যায়, তবে শুধু পানিই যথেষ্ট। কেননা তা দ্বারা মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

আর তার মাথা ও দাড়ি খিতমী (এক প্রকার তৃণ) দ্বারা ধৌত করবে। যাতে অধিক পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়।

এরপর তাকে বামপার্শ্বে শয়ন করাবে এবং বড়ই পাতা সিদ্ধ পানি দ্বারা তাকে গোসল দেবে যতক্ষণ না দেখা যায় যে, পানি তার নীচ পর্যন্ত পৌছে গেছে। অতঃপর তাকে ডান পার্শ্বে শয়ন করাবে এবং ধুইবে যতক্ষণ না দেখা যায় যে, পানি তার নীচ পর্যন্ত পৌছে গেছে। কেননা ডান দিক থেকে শুরু করাই সুন্নত।

এরপর তাকে বসাবে এবং নিজের দিকে তাকে হেলান দিয়ে তার পেট হালকাভাবে মুছবে। যাতে পরে কাফন নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়। ***যদি তার পেট থেকে কিছু বের হয় তবে তা ধুয়ে ফেলবে। গোসল বা উযূ দোহরাবে না।*** কেননা, গোসলের দেওয়া আমরা জেনেছি শরীআতের নির্দেশে। আর তা একবার পালিত হয়ে গেছে।

এরপর একটি কাপড় দ্বারা তার শরীর চুষে ফেলবে। যাতে তার কাফন ভিজে না যায়।

এরপর মাইয়েতকে তার কাফনে রাখবে। এরপর তার মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধি মাখবে এবং সাজদার অংগগুলোতে কর্পুর মাখবে। কেননা, সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নত, আর সাজদার অংগগুলো অধিক সম্মানযোগ্য।[২]

মাইয়েতের চুল বা দাড়ী আঁচড়াবে না এবং তার লম্বা চুল কাটবে না। কেননা 'আইশা (রা.) বলেছেন ঃ عَلَامَ تَنْصُوْنَ مَيِّتَكُمْ -কেন তোমরা তোমাদের মুর্দারের মাথার চুল পরিপাটি করছ? কেননা, এই সব কাজ হল সৌন্দর্যের জন্য। আর মাইয়েতের জন্য এগুলোর প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে জীবিত ব্যক্তির জন্য এগুলো হল পরিচ্ছন্নতার বিষয়। যেহেতু এগুলোর নীচে ময়লা জমে থাকে। সুতরাং তা খাতনার মত হয়ে গেল।

পরিচ্ছেদ ঃ কাফন পরান

সুন্নত এই যে, পুরুষকে ইযার, কামীছ ও চাদর এই তিন কাপড়ে কাফন দিবে। কেননা বর্ণিত রয়েছে যে, নবী (সা.)-কে 'সাহূলিয়া'র তৈরী তিনটি সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল।

---

২. সিজদার অংগ বলতে কপাল, নাক, দুই হাত, দুই হাঁটুও দুই পা বুঝানো হয়েছে। পুরুষের জন্য জাফরান ও কুসুম ছাড়া যে কোন খুশবু ব্যবহার করা যেতে পারে। আর স্ত্রীলোকের জন্য সবধরণের খুশবু ব্যবহার করা যেতে পারে।

তাছাড়া এই হল স্বভাবতঃ তার জীবদ্দশায় সাধারণ পরিধেয় পোশাক। সুতরাং তার মৃত্যুর পরেও একই রকম হবে।

অবশ্য যদি দুই কাপড়ে সীমিত রাখা হয় তবুও তা জাইয আছে। আর এ দুই কাপড় হল ইযার ও চাদর। হল ন্যূনতম কাফন। কেননা আবূ বকর (রা.) বলেছেন, আমার এ কাপড় দু'টি ধুয়ে দিও এবং তাতেই আমাকে কাফন দিও।

তাছাড়া এটা হল জীবিতদের ন্যূনতম পোশাক। ইযারের পরিমাণ হল মাথা থেকে পা পর্যন্ত। চাদরও অনুরূপ। আর কামীছ হল গলা থেকে পা পর্যন্ত।

যখন কাফন পেঁচানোর ইচ্ছা করবে তখন মাইয়েতের বাম দিক থেকে শুরু করবে। এবং সেদিক থেকে তার উপর লেপটিয়ে দিবে। অতঃপর ডান দিক। যেমন জীবিত অবস্থায় করা হয়। কাফন বিছানোর সুরত এই যে, প্রথমে চাদর বিছাবে, তারপর তার উপর ইযার বিছাবে, তারপর মাইয়েতকে কুর্তা পরানো হবে। তারপর তাকে ইযারের উপর রাখা হবে। অতঃপর প্রথমে বাম থেকে এরপর ডান থেকে ইযার পেঁচানো হবে। অতঃপর একই ভাবে চাদর পেঁচানো হবে।

যদি কাফন সরে যাওয়ার আশংকা হয় তবে একটি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তা বেঁধে দিবে, যাতে অনাবৃত হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

স্ত্রীলোককে পাঁচটি কাপড়ে কাফন দিবে। যথা, কোর্তা, ইযার, ওড়না, চাদর ও পট্টি-যা দ্বারা তার সিনা বেঁধে রাখা হবে। কেননা উম্মু আতিয়্যাহ্ (রা.) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, নবী (সা.) তাঁর কন্যাকে গোসলদানকারিণী স্ত্রী লোকদেরকে পাঁচটি কাপড় দিয়েছিলেন। এবং এ কারণে যে, জীবদ্দশায় সাধারণতঃ এই পাঁচ কাপড়ে সে বের হয়ে থাকে। সুতরাং মৃত্যুর পরেও অনুরূপ হবে।

আর এটা হল সুন্নত কাফনের বয়ান। যদি তিনটি কাপড়ের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখে যথা ইযার চাদর ও ওড়না, তবে জাইয হবে। এটা হল (মেয়েদের জন্য) নূন্যতম কাফন।

এর চেয়ে কম করা মাকরূহ হবে। আর পুরুষের ক্ষেত্রে এক কাপড়ের উপর সীমিত করা মাকরূহ হবে– জরুরী অবস্থা ছাড়া। কেননা মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা.) যখন শহীদ হলেন, তখন তাকে এক বস্ত্রে কাফন দেওয়া হয়েছিল। এ হল জরুরী অবস্থার কাফন।

স্ত্রীলোককে প্রথমে কুর্তা পরানো হবে। তারপর তার চুলগুলো দুই ভাগ করে তার বুকে কোর্তার উপরে রাখতে হবে। তারপর তার উপরে উড়না পরানো হবে। তারপর ইযার দেয়া হবে– চাদরের নীচে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***কাফনের কাপড়ের মাঝে মাইয়েতকে স্থাপনের পূর্বে বেজোড় সংখ্যায় ধুনী দেওয়া হবে।*** কেননা নবী করীম (সা.) তাঁর কন্যার কাফনকে বেজোড় সংখ্যায় ধুপ দিতে আদেশ করেছিলেন। আর ধুনী দেওয়া হল সুরভিত করা।

কাফন থেকে ফারেগ হয়ে মাইয়েতের উপর জানযার সালাত পড়বে। কেননা এ হল ফরয।

পরিচ্ছেদ ঃ মাইয়েতের উপর সালাত আদায়

সুলতান যদি উপস্থিত থাকেন তবে মাইয়েতের উপর সালাত আদায়ের ব্যাপারে তিনিই সব চেয়ে বেশী হকদার। কেননা, তার উপর অন্যকে অগ্রগামী করাতে তাঁর অবমাননা রয়েছে।

যদি তিনি উপস্থিত না থাকেন তবে কাযী (অধিক হকদার)। কেননা তিনিও কর্তৃত্বের অধিকারী।

আর যদি তিনি উপস্থিত না থাকেন তবে মহল্লার ইমামকে অগ্রাধিকার দান করা মুস্তাহাব। কেননা, মাইয়েত তার জীবদ্দশায় তার ইমামতিতে সন্তুষ্ট ছিল।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন ঃ *তারপর মাইয়েতের অভিভাবক অধিক হকদার। আর ওয়ালী বা অভিভাবকদের ক্রম সেই অনুসারেই হবে, যা নিকাহ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যদি ওয়ালী ও সুলতান ছাড়া অন্য কেউ জানাযা পড়িয়ে থাকে তবে ওয়ালী তা পুনরায় পড়তে পারেন,* যদি ইচ্ছা করেন। কেননা আমরা বলে এসেছি যে, অধিকার বা হক হল ওয়ালীদের।

যদি ওয়ালী জানাযা পড়ে থাকেন তাহলে তার পরে অন্য কারো জানাযার সালাত আদায় করা জাইয নয়। কেননা ফরয তো প্রথমবার পড়া দ্বারাই আদায় হয়ে গেছে। আর নফল হিসাবে জানাযা পড়া শরীআত স্বীকৃত নয়। এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, সকল স্তরের লোকেরা নবী করীম (সা.)-এর রওযা শরীফে জানাযা পড়া থেকে বিরত রয়েছেন। অথচ যেভাবে কবরে রাখা হয়েছে, সেভাবেই তাঁর পবিত্র দেহ এখন পর্যন্ত বিদ্যমান আছে।

যদি জানাযা না পড়েই মাইয়েতকে দাফন করা হয়ে থাকে তবে তার কবরেই জানাযা পড়বে। কেননা নবী করীম (সা.) জনৈক আনসারী স্ত্রীলোকের কবরে জানাযা পড়েছিলেন।

তবে লাশ গলিত হওয়ার পূর্বেই তার জানাযা পড়বে। আর তা বোঝার ব্যাপার প্রবল মতের উপর নির্ভরশীল। এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা, অবস্থা, সময় ও স্থান বিভিন্ন রকম রয়েছে।

জানাযার সালাত এই যে, প্রথমে এক তাকবীর বলবে। অতঃপর 'সানা' পড়বে। অতঃপর আরেক তাকবীর বলে নবী করীম (সা.)-এর উপর দরূদ পড়বে। অতঃপর আরেক তাকবীর বলে নিজের জন্য, মাইয়েতের জন্য এবং মুসলমানদের জন্য দু'আ করবে। অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফেরাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শেষ যে জানাযা পড়েছেন, তাতে চার তাকবীর বলেছিলেন। সুতরাং তা পূর্ববর্তী আমল রহিত করে দিয়েছে। ইমাম যদি পঞ্চম তাকবীর বলেন, তবে মুক্তাদী তাকে অনুসরণ করবে না। ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

আমাদের দলীল এই যে, পঞ্চম তাকবীরের হাদীছটি আমাদের পূর্ব বর্ণনার প্রেক্ষিতে রহিত হয়ে গেছে। তবে এক বর্ণনা মতে মুক্তাদী ইমামের সালাম ফেরানোর অপেক্ষা করবে। এ মতই গ্রহণীয়।

আর দু'আসমূহ পাঠ করার উদ্দেশ্য হল মাইয়েতের জন্য ইস্‌তিগফার করা। আর প্রথমে সানা এরপর দরূদ পাঠ হল দু'আর সুন্নত। বাচ্চার জন্য ইসতিগফার করবে না, বরং একপা বলবে ঃ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا -হে আল্লাহ্! তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী করুন এবং আমাদের জন্য তাকে দাওয়াত লাভের মাধ্যম এবং আখেরাতের সঞ্চয় বানিয়ে দিন এবং তাকে আমাদের জন্য সপারিশকারী ও সুপারিশ গ্রহণকৃত বানিয়ে দিন।

ইমাম যদি এক তাকবীর বা দুই তাকবীর দিয়ে সেরে থাকেন, তবে (পরে) আগত ব্যক্তি তার উপস্থিতির পর ইমামের আরেক তাকবীর বলার পূর্বে তাকবীর বলবে না।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে উপস্থিতির সময়েই তাকবীর বলবে। কেননা প্রথম তাকবীর হল সালাত শুরু করার তাকবীর। আর মাসবূককে এ তাকবীর বলতে হয়।

উভয় ইমামের দলীল হল (জানাযার) প্রতিটি তাকবীর একেক রাকাআতের স্থলবর্তী। আর মাস্‌বূক, সালাতের যে অংশ ফউত হয়ে যায়, তা দিয়ে সালাত শুরু করে না। কেননা এরূপ করা রহিত হয়ে গেছে।[৩]

পক্ষান্তরে যদি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ইমামের সংগে তাকবীর না বলে থাকে, তবে সকলেরই মতে সে দ্বিতীয় তাকবীরের জন্য অপেক্ষা করবে না। কেননা সে মুদরিকের সমপর্যায়ভুক্ত।

যে (ইমাম) পুরুষ বা স্ত্রীলোকের উপর সালাত পড়বে সে বুক বরাবর দাঁড়াবে। কেননা, তা কলবের স্থান এবং তাতেই ঈমানের নূর বিদ্যমান থাকে। সুতরাং সেই বরাবর দাঁড়ানোর অর্থ এই দিকে ইংগিত করা যে, তার ঈমানের কারণে শাফাআত দু'আয়ে মাগফিরাত করা হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে আরো বর্ণনায় রয়েছে যে, ইমাম পুরুষের মাথা বরাবর এবং স্ত্রীলোকের মাঝামাঝি দাঁড়াবে। কেননা, আনাস (রা.) এরূপ করেছেন এবং বলেছেন যে, এটাই সুন্নত।

আনাস (রা.) সম্পর্কিত হাদীছের ব্যাখ্যায় আমরা বলি যে, উক্ত মহিলার জানাযার উপর অতিরিক্ত আবরণ ছিল না। কাজেই তিনি স্ত্রীলোকটির জানাযা এবং লোকদের সাথে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

যদি লোকেরা সওয়ার অবস্থায় জানাযা পড়ে তবে তা জাইয হবে- সাধারণ কিয়াস মুতাবিক। কেননা, ইহা মূলতঃ দু'আ। কিন্তু সূক্ষ্ম কিয়াস মুতাবিক জাইয হবে না। কেননা তাহরীমা বিদ্যমান থাকার কারণে এক দিক থেকে তা সালাত। সুতরাং সর্তকতার খাতিরে বিনা ওযরে কিয়াম তরক করা জাইয হবে না।

---

৩. মাসবূকের ক্ষেত্রে ইসলামের শুরুতে নিয়ম ছিল এই যে, ইমামের সংগে শরীক হওয়ার পূর্বে ছুটে যাওয়া নামায আদায় করে নিতো কিন্তু পরে তা রহিত করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ইমামের সংগে শরীক হয়ে নামায শেষ করে তারপর আগের ছুটে যাওয়া অংশ আদায় করবে।

জানাযার সালাতের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান অবৈধ নয়। কেননা অগ্রবর্তিতা হল ওয়ালীর হক। সুতরাং অন্যকে অগ্রবর্তী করে নিজের হক বাতিল করার তিনি অধিকার রাখেন। কোন কোন নুসখা বা অনুলিপিতে إذن (অনুমতি) এর পরিবর্তে إذان শব্দটি রয়েছে। এর অর্থ হলো লোকদের জানিয়ে দেওয়া অর্থাৎ একে অন্যকে অবহিত করবে, যাতে তারা মাইয়েতের হক আদায় করতে পারে।

জামা'আত হয় এমন মসজিদের ভিতরে জানাযা পড়বে না। কেননা নবী (সা.) বলেছেন : مَنْ صَلَّى عَلَىٰ جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا أَجْرَ لَهُ -যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযার সালাত পড়বে তার কোন সাওয়াব নেই।

তাছাড়া, এই জন্যও যে, মসজিদ তো তৈরী হয়েছে ফরয সালাত আদায় করার জন্য। তদুপরি মসজিদ নষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।[8] আর মাইয়েত যদি মসজিদের বাইরে রক্ষিত হয় সে ক্ষেত্রে মাশায়েখগণের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যে শিশু কেঁদে ওঠে, তার নাম রাখা ও তাকে গোসল দেওয়া হবে এবং তার জানাযা পড়া হবে। কেননা নবী (সা.) বলেছেন : إذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ (رواه النسائى) -নবজাতক যদি কেঁদে ওঠে তবে তার জানাযা পড়া হবে। আর যদি না কাঁদে তবে তার উপর জানাযা পড়া হবে না। যেহেতু কেঁদে ওঠা হল প্রাণের অস্তিত্বের প্রমাণ ; সুতরাং না কাঁদলে তার ক্ষেত্রে মৃতদের নিয়ম-কানুন কার্যকর হবে।

যে শিশু কান্না করেনি তাকে কাপড়ে জড়িয়ে (কবরস্থ করে) দেয়া হবে। এটা করা হবে আদম সন্তানের মর্যাদা রক্ষার্থে। *তবে তার জানাযা পড়া হবে না।* এর কারণ ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ। গায়রে যাহির রিওয়ায়াত মতে তাকে গোসলও দেয়া হবে। কেননা এক হিসাবে সেও প্রাণী। এ-ই পসন্দনীয় মত।

কোন শিশু যদি তার (অমুসলিম) মা-বাবার কোন একজনের সংগে বন্দী হয় এবং মৃত্যুবরণ করে তবে তার জানাযা পড়া হবে না। কেননা (ধর্মের দিক থেকে) সে পিতা-মাতার অনুবর্তী।

তবে যদি সে ইসলাম স্বীকার করে নেয় এবং তার বোধশক্তি থেকে থাকে কেননা সূক্ষ্ম কিয়াস মতে তার ইসলাম গ্রহণ শুদ্ধ। *কিংবা যদি পিতা-মাতার কোন একজন ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।* কেননা, ধর্ম হিসাবে সে পিতা-মাতার উত্তম জনের অনুগামী হবে।

যদি পিতা-মাতার একজনও তার সংগে বন্দী না হয় তবে জানাযা পড়া হবে। কেননা তখন তার ক্ষেত্রে দারুল ইসলামের অনুবর্তিতা প্রকাশ পাবে। ফলে তাকে মুসলমান বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে, যেমন কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর ক্ষেত্রে।

---

৪. জানাযা যদি মসজিদের ভিতরে রাখা হয় তবে হানাফী মাযহাবের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল মাকরূহ। পক্ষান্তরে জানাযা, ইমাম ও মুসল্লিদের আংশিক যদি মসজিদের বাহিরে হয় আর কিছু অংশ মসজিদের ভিতরে হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমেই তা মাকরূহ নয়। যদি শুধু জানাযা মসজিদের বাইরে হয় এবং ইমাম ও মুসল্লিগণ মসজিদের ভিতরে হয় তবে কোন কোন মতে তা মাকরূহ। অন্যদের মতে মাকরূহ নয়।

যদি কোন কাফির মৃত্যুবরণ করে আর তার কোন মুসলমান অভিভাবক থাকে তবে সে তার গোসল দিবে, কাফন পরাবে এবং তাকে দাফন করবে।

হযরত আলী (রা.)-কে তাঁর পিতা আবূ তালিব সম্পর্কে এ নির্দেশই দেয়া হয়েছিল। তবে তাকে গোসল দিবে নাপাক কাপড় ধোয়ার মত। আর বস্ত্রখণ্ডে পেঁচানো হবে এবং একটি গর্ত খোঁড়া হবে। কাফন ও কবরের বেলায় সুন্নত তরীকা অনুসরণ করা হবে না এবং যত্নের সাথে কবরে নামানো হবে না। বরং তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

পরিচ্ছেদ ঃ জানাযা বহন

মাইয়েতকে খাটিয়ায় রাখার পর লোকেরা চার পায়া ধরে উঠাবে।

হাদীছে এমনই বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এতে হবে জানাযার সহযাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অধিকতর সম্মান ও হিফাজত।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, সুন্নত এই যে, জানাযা দু'জন লোক বহন করবে। সামনের জন (খাটিয়ার হাতল) কাঁধে স্থাপন করবে। দ্বিতীয় জন বুক বরাবর ধারণ করবে। কেননা হযরত সা'আদ ইব্ন মু'আয (রা.)-এর জানাযা এভাবে বহন করা হয়েছিল। এর জবাবে আমাদের বক্তব্য এই যে, তা করা হয়েছিল সা'আদ (রা.)-এর জানাযার উপর ফেরেশতাগণের ভিড়ের কারণে।

আর জানাযা নিয়ে দ্রুত গতিতে চলবে। তবে দৌড়ে নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে যখন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন ঃ ما دون الخبب -দৌড়ের চেয়ে কম গতিতে। যখন মাইয়েতের কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন মাইয়েতকে কাঁধ থেকে নামানোর পূর্বে উপস্থিত লোকদের বসে পড়া মাকরূহ। কেননা কখনো সহযোগিতার প্রয়োজন হতে পারে। আর দাঁড়ানো অবস্থায় তা অধিক সম্ভবপর।

আর জানাযা বহনের নিয়ম এই যে, প্রথমে জানাযার সামনের অংশ তোমার ডান কাঁধে রাখবে। অতঃপর জানাযার পিছনের অংশ তোমার ডান কাঁধে রাখবে। অতঃপর জানাযার সামনের অংশ তোমার বাম কাঁধে রাখবে এরপর পিছনের অংশ তোমার বাম কাঁধে রাখবে। এটা করা হবে ডান দিককে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য। এ নিয়ম হল পালাক্রমে বহনের ক্ষেত্রে।

পরিচ্ছেদ ঃ দাফন

কবরকে লাহদ রূপে খনন করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, লাহদ হল আমাদের জন্য। আর খাড়া কবর হল অন্য জাতির জন্য।[৫] মাইয়েতকে কেবলার দিক থেকে (গ্রহণ করে) দাখিল করা হবে।

---

৫. আমাদের নিকট কবর 'লাহদ' আকারে খনন করাই হল সুন্নত। তবে মাটি নরম হওয়ার কারণে বা অন্য কোন কারণে যদি 'লাহদ' করা সম্ভব না হয় তবে খাড়াভাবেই খনন করতে পারে।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে মাইয়েতকে পায়ের দিক থেকে নিয়ে দাখিল করা হবে।[৬] কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.)-কে পায়ের দিক থেকে নিয়ে দাখিল করা হয়েছিল।

আমাদের দলীল এই যে, কেবলার দিক হল সম্মানিত। সুতরাং সেদিক থেকে প্রবেশ করানোই মুস্তাহাব হবে। আর নবী করীম (সা.)-কে কবরে প্রবেশ করানো সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো পরস্পর বিরোধী।

মাইয়েতকে যখন কবরে রাখা হবে তখন অবতরণকারী بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ। [আল্লাহ্‌র নামে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মিল্লাতের উপর রাখছি।] বলবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আবূ দুজানা (রা.)-কে কবরে নামানোর সময় এ দু'আ বলেছিলেন।[৭]

আর তাকে কেবলামুখী করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরূপই আদেশ করেছেন।

আর কাফনের গিঠ খুলে দিবে। কেননা এখন আর সরে যাওয়ার ভয় নেই।

আর 'লাহদ'-এর মুখে কাঁচা ইট সমান করে বসিয়ে দিবে। কেননা নবী করীম (সা.)-এর কবর শরীফে কাঁচা ইট বসানো হয়েছিল।

লাহদের মুখে ইট বসানো পর্যন্ত স্ত্রীলোকের কবর কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখবে। তবে পুরুষের কবর কাপড় দ্বারা ঢাকতে হবে না। কেননা, স্ত্রীলোকের অবস্থার ভিত্তি হল পর্দার উপর আর পুরুষের অবস্থার ভিত্তি হল উন্মুক্ত থাকার উপর।

পোড়া ইট বা কাঠ ব্যবহার করা মাকরূহ। কেননা এগুলো হল ঘর মজবুত করার জন্য। অথচ কবর হল জীর্ণ হয়ে নিঃশেষ হওয়ার স্থান। তাছাড়া পোড়া ইটে আগুনের আছর রয়েছে। সুতরাং কুলক্ষণ গ্রহণ হিসাবে তা মাকরূহ হবে।

আর বাঁশ ব্যবহারে অসুবিধা নেই। الجامع الصغير -এর ভাষ্য মতে কাঁচা ইট ও বাঁশ ব্যবহার করা মুস্তাহাব। কেননা নবী (সা.)-এর কবর শরীফে এক আঁটি বাঁশ ব্যবহার করা হয়েছিল।

অতঃপর কবরে মাটি ঢেলে দেওয়া হবে। আর কবরকে কুঁজের মত করা হবে। সমতলও করা হবে না এবং চতুষ্কোণও করা হবে না। কেননা নবী করীম (সা.) কবর চতুষ্কোণ করতে নিষেধ করেছেন। আর যারা নবী করীম (সা.)-এর কবর শরীফ দেখেছেন, তাঁরা বর্ণনা করেছেন যে, তা কুঁজ সদৃশ।

---

৬. অর্থাৎ জানাযার খাটিয়া কবরের পিছনের দিকে রাখবে। এমন ভাবে যে মাইয়েতের মাথা ঐ স্থানে থাকবে যেখানে কবরে মাইয়েতের পা থাকে। অতঃপর মাইয়েতকে লম্বালম্বিভাবে কবরে নেয়া হবে।

৭. কোন বর্ণনায় আছে যে, হযরত, আবূ দুজানাহ আনসারী (রা.) তো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরে মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইয়ামামা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। সুতরাং সম্ভবত তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ্ যাল বুজাদীন। লিপি বিভ্রাটের কারণে এ পরিবর্তন হয়ে গেছে।

শহীদ

শহীদ ঐ ব্যক্তি, যাকে মুশরিকরা হত্যা করেছে[১] কিংবা যুদ্ধের মাঠে (মৃত) পাওয়া গেছে আর তার দেহে চিহ্ন রয়েছে। কিংবা মুসলমানরা তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এবং তাকে হত্যা করার কারণে দিয়াতে ওয়াজিব হয়নি। এমন ব্যক্তিকে কাফন দেওয়া হবে এবং তার উপর জানাযা পড়া হবে কিন্তু গোসল দেওয়া হবে না। কেননা সে উহুদের শহীদদের শ্রেণীভুক্ত। আর তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ زَمِّلُوْهُمْ بِكُلُوْمِهِمْ وَدِمَائِهِمْ وَلَاتَغْسِلُوْهُمْ -তাদেরকে তাদের জখম ও রক্তসহ আবৃত কর। গোসল দিও না।

সুতরাং যে কেউ লৌহাস্ত্র দ্বারা অন্যায়ভাবে নিহত হয় আর সে পবিত্র ও প্রাপ্তবয়স্ক এবং তার হত্যার বিনিময়ে কোন আর্থিক ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না, সে উহুদের শহীদদের শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং তাকে তাদের সংগে যুক্ত করা হবে।

'চিহ্ন' দ্বারা যখম উদ্দেশ্য। কেননা যখম নিহত হওয়ার পরিচায়ক। তেমনি অস্বাভাবিক স্থান থেকে রক্ত বের হওয়া। যেমন, চোখ বা এরূপ কোন স্থান থেকে।

শাফিঈ (র.) জানাযার সালাতের ক্ষেত্রে আমাদের সাথে মতভেদ করেছেন। তিনি বলেন, তরবারির আঘাত গুনাহ মুছে ফেলে। সুতরাং (জানাযার নামাযের মাধ্যমে) দু'আ-ইসতিগফারের প্রয়োজন নেই।

আমরা এর জবাবে বলি, মাইয়েতের জানাযা পড়া হয় তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য। আর শহীদ তো সম্মানের যোগ্য। তাছাড়া পাপ থেকে পবিত্র ব্যক্তিও দু'আর প্রয়োজন থেকে মুক্ত নয়; যেমন নবী ও শিশু।

হারবী, যুদ্ধাবস্থায় কাফির কিংবা বিদ্রোহী কিংবা ডাকাত যাকে হত্যা করবে তাকে যে জিনিস দ্বারাই হত্যা করুক, গোসল দেওয়া হবে না। কেননা উহুদের শহীদানদের সকলেই তরবারি বা লৌহাস্ত্র দ্বারা নিহত ছিলেন না।

জানাবত অবস্থায় কেউ যদি শহীদ হয়, তাহলে আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তাঁকে গোসল দেওয়া হবে।

---

১. মুশরিকরা যে কোন অস্ত্র দিয়েই হত্যা করুক নিহত ব্যক্তি শহীদ হবে। বিদ্রোহী ও ডাকাতদের হাতে নিহত ব্যক্তি সম্পদর্কও একই কথা। কেননা ইমামের আনুগত্য বর্জনের কারণে তারা মুশরিকদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়েছে।

সাহেবাইন বলেন যে, তাকে গোসল দেওয়া হবে না। কেননা, জানাবাত দ্বারা যে গোসল ওয়াজিব হয়েছিল, তা মৃত্যু দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে। আর মৃত্যুর দরুন দ্বিতীয় গোসলটি শাহাদাতের কারণে ওয়াজিব হয়নি।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, শাহাদাত গোসল রোধকারী হিসাবে স্বীকৃত, লোপকারী নয়। সুতরাং তা জানাবাতকে লোপ করবে না। আর বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত আছে যে, হানযালা (রা.) যখন জানাবাতগ্রস্ত অবস্থায় শহীদ হলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাকে গোসল দান করেছিলেন।

হায়িয ও নিফাসগ্রস্ত স্ত্রীলোক যখন পবিত্র হয়ে (শাহাদাত বরণ করে) তখন তার সম্পর্কে একই মতভিন্নতা রয়েছে। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে হায়িয বা নিফাস শেষ হওয়ার আগে শাহাদাত বরণ করলেও তার সম্পর্কে একই মতভিন্নতা রয়েছে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু সম্পর্কেও অনুরূপ মতভেদ।

সাহেবাইনের দলীল এই যে, শিশু তো এই মর্যাদা লাভের অধিকতর উপযুক্ত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জবাব এই যে, পবিত্র অবস্থায় থাকা হিসাবে উহুদের শহীদানের ক্ষেত্রে তরবারির আঘাত গোসলের ব্যাপারে যথেষ্ট হয়েছে। পক্ষান্তরে শিশুর তো গুনাহ্ নেই। সুতরাং সে উহুদের শহীদানের শ্রেণীভুক্ত হবে না।

শহীদের রক্ত ধোয়া হবে না এবং তার কাপড়-চোপড় খোলা হবে না। এর দলীল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ। তবে চর্মের বা তুলাভর্তি পরিধেয় অস্ত্র-শস্ত্র ও মোজা খুলে নেওয়া হবে। কেননা এগুলো কাফন জাতীয় নয়।

আর কাফনের কাপড় পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে (প্রয়োজন অনুযায়ী) ইচ্ছামত বাড়াবে কিংবা কমাবে। যে আহত ব্যক্তি জীবনের কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভের পর মারা যায়, তাকে গোসল দেওয়া হবে।

অর্থাৎ ***যে ব্যক্তি জীবনের আরাম ও সুবিধা গ্রহণের কারণে*** শাহাদাতের হুকুম লাভের ক্ষেত্রে (কিছুটা সময় ক্ষেপণ করে) পুরনো হয়ে গেছে। কেননা এ কারণে জুলুমের চিহ্ন কিছুটা লঘু হয়ে গেছে। ফলে সে উহুদের শহীদানের শ্রেণীভুক্ত হল না।

'সুযোগ-সুবিধা' গ্রহণের অর্থ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা, নিদ্রা যাওয়া, ঔষধ (ও চিকিৎসা) গ্রহণ করা কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে (নিরাপদ স্থানে) স্থানান্তরিত হওয়া। কেননা এভাবে সে জীবনের কিছু সুবিধা ভোগ করল। আর উহুদের শহীদগণ পানির পেয়ালা তাদের সামনে তুলে ধরা সত্ত্বেও পিপাসার্ত অবস্থায় মারা গেছেন। কিন্তু শাহাদাতের মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকায় তারা (পানিটুকু) গ্রহণ করেননি।

কিন্তু যদি কোন আহত ব্যক্তি এ কারণে আহত হওয়ার স্থান থেকে তুলে আনা হয়, যাতে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট না হয় (তবে তা সুযোগ গ্রহণ বলে গণ্য হবে না)। কেননা সে কোন প্রকার আরাম লাভ করেনি। আর যদি কোন শিবিরে বা তাঁবুতে এনে রাখা হয় তবে পূর্ব বর্ণিত কারণে সে সুবিধা গ্রহণকারী গণ্য হবে।

আর যদি এক ওয়াক্ত সালাত অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত সজ্ঞানে সে বেঁচে থাকে তবে সে সুবিধা গ্রহণকারী হল। কেননা উক্ত সালাত তার যিম্মায় ঋণ হয়ে গেল। আর তা জীবিতদের সাথে সম্পর্কিত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত।

যদি আখিরাত সংক্রান্ত কোন বিষয়ে ওসীয়ত করে তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সেও সুবিধাগ্রহণকারী বলে গণ্য হবে।

কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে সুবিধা গ্রহণকারী হবে না। কেননা ওসীয়ত করা তো মাইয়েতের আহকামভুক্ত বিষয়।

যাকে নগরে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, তাকে গোসল দেওয়া হবে। কেননা তার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হল কাসামাহ ও দিয়্যত। সুতরাং এতে করে তার জুলুমের প্রতিক্রিয়া হালকা হয়ে যায়।

তবে যদি জানা যায় যে, তাকে লৌহাস্ত্র দ্বারা অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। (এমতাবস্থায় গোসল দেয়া হবে না) কেননা তার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হল কিসাস, যা একটি শাস্তি। আর হত্যাকারী বাহ্যতঃ কোনক্রমেই শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে না, দুনিয়াতে কিংবা আখিরাতে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যে অস্ত্রে প্রাণ সংহার বিলম্বিত হয় না, তা তলোয়ারের হুকুমভুক্ত। ইনশাআল্লাহ্ جنايات (অপরাধসমূহ) অধ্যায়ে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

যাকে হদ বা কিসাস হিসাবে কতল করা হয়েছে, তাকে গোসল দেওয়া হবে এবং তার উপর জানাযা পড়া হবে। কেননা সে তার উপর সাব্যস্ত হক আদায় করার জন্য আপন প্রাণ ব্যয় করেছে। অথচ উহুদের শহীদগণ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের জান উৎসর্গ করেছেন। সুতরাং তাকে তাদের সংগে যুক্ত করা যাবে না।

সে সকল বিদ্রোহী কিংবা ডাকাত নিহত হয়, তাদের উপর জানাযা পড়া হবে না। কেননা আলী (রা.) বিদ্রোহীদের উপর জানাযা পড়েননি।

ত্রয়োবিংশ অনুচ্ছেদ

কা'বার অভ্যন্তরে সালাত

কা'বার অভ্যন্তরে ফরয ও নফল সালাত আদায় জাইয। উভয় বিষয়ে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ভিন্ন মত রয়েছে। আর শুধু ফরযের ব্যাপারে মালিক (র.)-এর ভিন্ন-মত রয়েছে।

আমাদের দলীল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে সালাত আদায় করেছেন।

আর এ কারণে যে, অভ্যন্তরীণ সালাতের যাবতীয় শর্ত সম্পন্ন হয়েছে। এতে কেবলামুখী হওয়াও পালিত হয়েছে। কেননা সমগ্র কা'বা সম্মুখে রাখা শর্ত নয়।

ইমাম যদি কা'বার ভিতরে জামা'আতের ইমামতি করেন, আর তখন মুক্তাদীদের কেউ ইমামের পিঠের দিকে নিজের পিঠ দিয়ে দাঁড়ায় তবুও জাইয হবে। কেননা সে কেবলামুখী রয়েছে এবং আপন ইমামকে ভুলের উপর রয়েছে বলেও সে মনে করে না। চিন্তা করে কিবলা নির্ধারণের বিষয়টি এর বিপরীত।[১]

আর তাদের মাঝে যে ইমামের চেহারার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াবে, তার নামায জাইয হবে না। কেননা যে তার ইমামের চেহারার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াবে, তার নামায জাইয হবে না। কেননা সে তার ইমামের অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। ইমাম যদি মাসজিদুল হারামে সালাত পড়ান আর লোকেরা কা'বার চারপাশে হালকা করে দাঁড়ায় এবং ইমামের সালাতে ইকতিদা করে সালাত পড়ে তা হলে তাদের মধ্যে যে কা'বার দিকে ইমামের চেয়ে অধিক নিকটবর্তী হয়, তারও সালাত জাইয হবে, যদি সে পাশে না দাঁড়িয়ে থাকে, যে পাশে ইমাম আছেন। কেননা একই পার্শ্বে হওয়ার বেলায়ই অগ্রবর্তিতা ও পশ্চাদবর্তিতা প্রকাশ পাবে।

যে ব্যক্তি কা'বার ছাদে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে, তার নামায জাইয।

এ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কারণ, আমাদের মতে কা'বা হল আসমান পর্যন্ত খোলা স্থল ও শূন্য স্থান, ভবন নয়। আর ভবন তো স্থানান্তরিতও হতে পারে। এ জন্যই তো কেউ জাবালে আবূ কুবায়স এর চূড়ায় উঠে সালাত আদায় করলে তার সালাত জাইয হবে; অথচ ভবন তো তার সম্মুখে বিদ্যমান নেই। অবশ্য কা'বার পাশে আদায় মাকরূহ। কেননা এতে কা'বার প্রতি অসম্মান করা হয় এবং এ সম্পর্কে নবী (সা.) থেকে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে।

---

১. অর্থাৎ অন্ধকার রাত্রে যদি জামা'আত পড়া হয় এবং কিবলা জানা না থাকার কারণে চিন্তা করে কিবলা নির্ধারণ করা হয়; এমতাবস্থায় কেউ যদি ইমামের পিঠের দিকে নিজের পিঠ দিয়ে দাড়ায় আর ইমামের অবস্থা তার জানা থাকে তবে তার নামায সহীহ্ হবে না। কেননা তার ধারণা মতে তো ইমাম ভুলের উপর আছে।

كِتَابُ الزَّكٰوةُ
অধ্যায় ঃ যাকাত

অধ্যায় ঃ যাকাত

স্বাধীন জ্ঞানসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম ব্যক্তি যখন 'নিসাব' পরিমাণ সম্পদের পূর্ণ মালিক[১] হল এবং তার উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়, তখন ঐ ব্যক্তির (সম্পদের) উপর যাকাত ওয়াজিব (অর্থাৎ ফরয) হয়।

ওয়াজিব হওয়ার দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ আর তোমরা যাকাত প্রদান কর।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ اَدُّوا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ -তোমরা তোমাদের মালের যাকাত প্রদান কর। তদুপরি এ সিদ্ধান্তের উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত। ওয়াজিব শব্দে ফরয বুঝান হয়েছে। কেননা (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার যে দলীল) তাতে 'সন্দেহের' কোন অবকাশ নেই।

স্বাধীন হওয়ার শর্ত এই জন্য যে, তা দ্বারা মালিকানার পূর্ণতা অর্জিত হয়। আর 'জ্ঞান সম্পন্ন' ও প্রাপ্ত বয়স্কতার শর্ত আরোপ করার কারণ একটু পরেই উল্লেখ করছি।

মুসলমান হওয়ার শর্ত আরোপ করার কারণ এই যে, যাকাত হল একটি ইবাদত। আর কাফিরের পক্ষ থেকে ইবাদত সাব্যস্ত হতে পারে না।

নিসাব পরিমাণ মালের মালিকানা জরুরী, কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ পরিমাণকে (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার) কারণরূপে নির্ধারণ করেছেন।

এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া জরুরী। কেননা এমন একটা সময়কাল অপরিহার্য যাতে (মালের) বৃদ্ধি সম্পন্ন হতে পারে। আর শরীআত তার সীমা নির্ধারণ করেছে 'এক বছর' দ্বারা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ لَازَكٰوةَ فِىْ مَالٍ حَتّٰى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ -এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত কোন মালে যাকাত নেই। তাছাড়া এ সময়ের অবকাশে মাল বর্ধিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ এতে বিভিন্ন মৌসুমসমূহ শামিল রয়েছে। আর সাধারণতঃ তাতে মূল্যের তারতম্য হয়ে থাকে। সুতরাং হুকুম ও সিদ্ধান্তটি তারই উপর আবর্তিত করা হয়েছে।

আর কোন কোন মতে যাকাত হলো তাৎক্ষণিক ওয়াজিব। কেননা এ-ই 'নিঃশর্ত' আদেশের চাহিদা।

আর কারো কারো মতে এটি বিলম্বিত ওয়াজিব। কেননা সমগ্র জীবনই হল এটি আদায় করার সময়। এ কারণেই আদায়ে ত্রুটির পর নিসাব বিনিষ্ট হয়ে গেলে তার উপর আদায়ের যিম্মাদারী থাকে না।

---

১. এ শর্ত আরোপের মাধ্যমে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সম্পদকে পরিহার করা হয়েছে। কেননা এ সম্পদের হকদার হল ঋণদাতা। সুতরাং উক্ত সম্পদের উপর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মালিকানা ক্ষুন্ন হয়ে গেল। অদ্রূপ স্ত্রীর মাহ্র যতক্ষণ তার করজা ও নিয়ন্ত্রণে না আসবে তখন তার উপর তার মালিকানা পূর্ণতা লাভ করে না।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ও বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, যাকাত হল আর্থিক দায়-দায়িত্ব। সুতরাং এটা অন্যান্য আর্থিক দায়-দায়িত্বের সমতুল্য। যেমন স্ত্রীদের ভরণপোষণ। আর এটি উশর ও খিরাজের অনুরূপ হয়ে যায় (যা বাচ্চা ও পাগলের মাল থেকেও নেয়া হয়)।

আমাদের যুক্তি এই যে, যাকাত হল ইবাদত। সুতরাং স্ব-ইচ্ছা ছাড়া তা আদায় হবে না, যাতে 'পরীক্ষা'-এর দিকটি সাব্যস্ত হতে পারে। আর 'আকল' না থাকার কারণে এ দু'জনের 'স্ব-ইচ্ছা' বলতে কিছু নেই।[২]

'খারাজ'-এর বিপরীত। কেননা খারাজ হল 'ভূমি কর।' জমির আর্থিক 'দায়' তদ্রূপ উশরের ক্ষেত্রে 'আর্থিক দায়'-এর দিকটিই প্রধান। পক্ষান্তরে 'ইবাদত' এর দিকটি আনুসঙ্গিক।

পাগল যদি বছরের কোন অংশে সুস্থত্য লাভ করে তবে সেটা রোযার ক্ষেত্রে মাসের কোন অংশে সুস্থতা লাভ করার সমতুল্য হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বছরের অধিকাংশ সময় ধর্তব্য। আর পাগলের বেলায় স্থায়ী কোন পার্থক্য নেই।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবালক যদি পাগল অবস্থায় বালেগ হয় তবে সুস্থতা লাভের সময় থেকে বছর পূর্ণ হওয়া বিবেচনা করা হবে। যেমন নাবালকের জন্য সাবালক হওয়ার সময় থেকে।

'মুকাতাব' এর উপর যাকাত নেই। কেননা সে পূর্ণভাবে মালের মালিক নয়। কারণ তার মধ্যে মালিকানার পরিপন্থী দাসত্ব বিদ্যমান। এ কারণেই সে আপন গোলামকে আযাদ করার অধিকারী নয়।

যার উপর তার সম্পদকে বেষ্টনকারী ঋণ রয়েছে, তার উপর যাকাত নেই।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যাকাত ওয়াজিব হবে। যেহেতু যাকাতের সবব বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হল পূর্ণ নিসাবের মালিক হওয়া।

আমাদের দলীল এই যে, তার মাল তার মৌলিক প্রয়োজনে দায়বদ্ধ। সুতরাং সেটাকে অস্তিত্বহীন গণ্য করা হবে। যেমন পিপাসা নিবৃতির জন্য রক্ষিত পানি এবং ব্যবহারিক ও কর্তব্য-সম্পাদনের কাপড়।

---

২. অর্থাৎ নিসাবের মালিক হওয়ার পর যদি বছরের শুরুতে বা শেষে যে কোন অংশে সুস্থ থাকে তাহলে সময়ের পরিমাণ অল্প হউক বা বেশী তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যেমন রমাযান মাসের দিনের বা রাত্রের কোন এক অংশে সামান্য পরিমাণ সময়ও যদি সুস্থ থাকে তবে পুরা মাসের রোযা ফরয হয়ে যায়। কেননা রোযার ক্ষেত্রে মাসের যে ভূমিকা যাকাতের ক্ষেত্রে বছরেরও সেই ভূমিকা।

যদি তার সম্পদ ঋণ থেকে অধিক হয় তবে উদ্বৃত্ত অংশ নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত দিবে। কেননা তা প্রয়োজন মুক্ত। আর ঋণ দ্বারা উদ্দেশ্য এমন ঋণ, মানুষের পক্ষ থেকে যার তাগাদাকারী রয়েছে। সুতরাং মান্নত ও কাফ্ফারার ঋণ যাকাতকে বাধা দিবে না। আর যাকাতের ঋণ নিসাব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যাকাতকে বাধা দেয়।[৩] কেননা ঐ ঋণের কারণে নিসাব কমে যাবে। তদ্রূপ মাল নষ্ট করার পরও একই হুকুম।

উভয় ক্ষেত্রে যুফার (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। আর কথিত বর্ণনা মতে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। কেননা আমাদের দলীল হল (মানুষের পক্ষ হতে) এই মালের তাগাদাকারী রয়েছে। গবাদি পশুর ক্ষেত্রে তাগাদাকারী হলেন শাসনকর্তা। পক্ষান্তরে ব্যবসা দ্রব্যের ক্ষেত্রে তাগাদাকারী হলেন শাসনকর্তার নায়েব। কেননা মালিকগণ তার পক্ষে নায়েব বিবেচিত হয়ে থাকেন।

বসবাসের ঘরে, ব্যবহারের কাপড় চোপড়ে, ঘরের আসবাবপত্রে, সওয়ারির পশুর ক্ষেত্রে, খিদমতের গোলামদের ক্ষেত্রে এবং ব্যবহারের অস্ত্রাদির ক্ষেত্রে যাকাত নেই। কেননা তা মৌলিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত। তাছাড়া তা 'বর্ধন-গুণ' সম্পন্ন নয়। জ্ঞানসেবীদের[৪] জ্ঞানচর্চায় ব্যবহৃত কিতাবাদি এবং পেশাদার লোকদের উপকরণাদি[৫] সম্পর্কেও একই হুকুম। এই কারণে যা আমরা (এইমাত্র) বলেছি।

যার অন্য কারো উপর কোন ঋণ রয়েছে, কিন্তু সে কয়েক বছর ধরে তা অস্বীকার করে এসেছে, অতঃপর ঋণসংক্রান্ত প্রমাণ তার হাতে এল, তখন সে উক্ত মালের বিগত বছরগুলোর যাকাত প্রদান করবে না।

---

৩. মাসআলাটির সুরত এই যে, কারো নিকট শুধু নিসাব পরিমাণ মাল রয়েছে। আর ঐ মালের উপর দুই বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু প্রথম বছরের যাকাত সে আদায় করে নি। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বছরের যাকাত তার উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা দ্বিতীয় বছরে প্রথম বছরের যাকাতের ঋণের কারণে। নিসাবের অংশবিশেষ আবদ্ধ রয়েছে। ফলে নিসাব পরিপূর্ণ ছিল না।

৪. 'জ্ঞান সেবী' শর্তটি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থবহ নয়। কেননা কোন মূর্খ লোকের নিকটও যদি নিসাব পরিমাণ অর্থ মূল্যের কিতাব থাকে আর সেগুলো ব্যবসায়ের জন্য না হয় তবে তার উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে না। পরিমাণে তা যতই অধিক হোক। কেননা এগুলো বর্ধনশীল নয়। তবে যাকাতের গ্রহণের ক্ষেত্র হওয়ার ব্যাপারে এ শর্তটি অর্থবহ, কেননা জ্ঞানসেবীর নিকট যদি নিসাব পরিমাণ অর্থমূল্যের কিতাব থাকে আর সেগুলো তার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের প্রয়োজনে লাগে তবে সে যাকাত গ্রহণের ক্ষেত্র হতে পারে। পক্ষান্তরে যদি প্রয়োজনে না লাগে তবে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে না।

৫. উপকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল উপকরণ যা ব্যবহারের কারণে নিঃশেষিত হয় না। যেমন হাতুড়ি-করাত, কিংবা ঐ সকল উপকরণ যা ব্যবহারে নিঃশেষিত হয় কিন্তু তার চিহ্ন কৃতবস্তুতে বিদ্যমান থাকে না। যেমন সাবান।

সুতরাং ধোপা যদি সাবান খরিদ করে এবং তার মূল্য নিসাব পরিমাণ হয় এবং বছর অতিক্রান্ত হয় তবে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক হয় কর্মের বিনিময়ে, উপকরণের বিনিময়ে নয়।

এর অর্থ এই যে, ঋণগ্রহীতা মানুষের নিকট স্বীকারোক্তি করার কারণে তার পক্ষে প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে গেছে, এটা 'মালে যিমার'[৬] এর মাসআলার অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে ইমাম যুফার ও ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে।

হারিয়ে যাওয়া মাল, পলাতক বা পথহারা গোলাম, ছিনিয়ে নেওয়া মাল, যার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই, সমুদ্রে (অর্থাৎ অথৈ পানিতে) পড়ে যাওয়া মাল, খোলা মাঠে পুঁতে রাখা মাল, যার স্থান এখন মনে নেই এবং শাসক যে মাল বাজেয়াফ্ত কারেছেন- এ সবই 'মালে যিমারের' অন্তর্ভুক্ত।

পলাতক, পাথহারা ও ছিনিয়ে নেওয়া গোলামের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ের ব্যাপারেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে।

ইমাম যুফার ও শাফিঈ (র.)-এর দলীল এই যে, (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার) কারণ বিদ্যমান। আর হস্তচ্যুত হওয়া (যাকাত) ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। যেমন, মুসাফিরের (বাড়ীতে রক্ষিত) মাল।

আমাদের দলীল হল আলী (রা.)-এর বাণী ঃ لَا زَكٰوةَ فِىْ مَالِ الضِّمَارِ -মালে যিমারের উপর যাকাত নেই। তাছাড়া (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ) হল বর্ধন-গুণ সম্পন্ন মাল। আর হস্তক্ষেপ ও পরিচালনার সক্ষমতা ছাড়া বর্ধন সম্ভব নয়। আর উপস্থিত ক্ষেত্রে তার সক্ষমতা নেই। পক্ষান্তরে মুসাফির তার স্থলবর্তীর মাধ্যমে পরিচালনা করতে সক্ষম। (সুতরাং এর উপর সেগুলোকে কিয়াস করা ঠিক নয়।)

ঘরে পুঁতে রাখা মাল নিসাবের মধ্যে গণ্য হবে। কেননা তা হস্তগত করা সহজ।

আর জমিতে বা বাগানে পুঁতে রাখা মাল সম্পর্কে (যদি স্থান ভুলে যায়) তবে মাশায়েখদের মতভেদ রয়েছে।[৭]

ঋণের কথা স্বীকার করে এমন কোন লোকের নিকট যদি ঋণ থাকে, তবে সে সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল, ঐ মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা (সচ্ছলের ক্ষেত্রে) সরাসরি কিংবা (অসচ্ছলের ক্ষেত্রে উর্পাজনের পর) উক্ত ঋণ উদ্ধার করা সম্ভব।

তদ্রূপ (যাকাত ওয়াজিব হবে) যদি ঋণ এমন অস্বীকারকারী ব্যক্তির নিকট থাকে যার অনুকূলে প্রমাণ রয়েছে কিংবা কাযী সে বিষয়ে অবগত থাকেন। কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

---

৬. মালে যিমার বলে ঐ হাতছাড়া সম্পদকে যা ফিরে পাওয়ার আশা নেই। যদি ফিরে পাওয়ার আশা থাকে তবে সেটা মালে যিমার নয়।

৭. এক্ষেত্রে মূল বিষয় সহজে হস্তগত হওয়া। সুতরাং যারা বলেন যাকাত ওয়াজিব হবে তাদের বক্তব্য এই যে, সম্পূর্ণ ভূমি খুড়ে ফেলা অসম্ভব নয়। সুতরাং মাল হস্তগত হওয়াও অসম্ভব নয়। সুতরাং এটা বাড়ীতে পুতে রাখা মালের মত হল। খোলা মাঠের মত হল না। পক্ষান্তরে যারা যাকাত ওয়াজিব হবে না বলেন, তাদের মতে এটা অসম্ভব না হলেও কষ্টকর। আর শরীআত কষ্টের বিষয়টি বিবেচনা করে তা মওকুফ করে থাকে। সুতরাং এখানেও তা মওকুফ হবে এবং এটি খোলা মাঠে পুতে রাখা সম্পদের মত হবে।

ঋণ যদি এমন ব্যক্তির নিকট থাকে, যাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়েছে আর সে ঋণের কথা স্বীকার করে, তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত মাল নিসাব রূপে গণ্য হবে কেননা, তাঁর মতে কাযীর পক্ষ থেকে দেউলিয়া ঘোষণা করা শুদ্ধ নয়।

পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা দেউলিয়া ঘোষণা করা দ্বারা তাঁর মতে দেউলিয়াত্ব সাব্যস্ত হয়ে যায়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) দেউলিয়াত্ব সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে মুহাম্মদ (র.)-এর সঙ্গে একমত। পক্ষান্তরে গরীব লোকদের প্রতি সুবিবেচনার লক্ষ্যে যাকাতের হুকুম সাব্যস্ত করার ব্যাপারে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে একমত।

কেউ ব্যবসার উদ্দেশ্যে দাসী খরিদ করল, তারপর তাকে খিদমতে নিয়োজিত করার নিয়্যত করল, তাহলে ঐ দাসী থেকে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। কেননা, নিয়্যত কর্মের সংগে যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ ব্যবসা বর্জন করা।

আর যদি পুনরায় ব্যবসার নিয়্যত করে তবে তাকে বিক্রি করার পূর্ব পর্যন্ত তা ব্যবসায়ের জন্য বলে বিবেচিত হবে না। সুতরাং (বিক্রির পরে) তার মূল্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা, এখানে নিয়্যত কর্মের সংগে যুক্ত হয়নি। কারণ সে তো (এখনও) ব্যবসা করেনি সুতরাং নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে না। এ কারণেই তো মুসাফির শুধু নিয়্যতের দ্বারাই মুকীম হয়ে যায়। কিন্তু মুকীম সফর ছাড়া শুধু নিয়্যত দ্বারা মুসাফির হয় না।

যদি কোন জিনিস খরিদ করে আর ব্যবসার নিয়্যত করে তবে সেটা ব্যবসার জন্যই গণ্য হবে। কেননা, নিয়্যত কর্মের সংগে যুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় এবং ব্যবসার নিয়্যত করে, তা হলে ব্যবসার জন্য গণ্য হবে না। কেননা তার পক্ষ থেকে কোন কর্ম পাওয়া যায় নি।

আর যদি দানের মাধ্যমে, ওসীয়াতের মাধ্যমে, বিবাহের মাধ্যমে, 'খোলা' এর মাধ্যমে, অথবা কিসাসের উপর সন্ধির মাধ্যমে বস্তুটির মালিক হয় এবং সেটাকে ব্যবসার জন্য নিয়্যত করে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা ব্যবসার জন্য হয়ে যাবে। কেননা নিয়্যতটি কর্মের সংগে যুক্ত হয়েছে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা ব্যবসার মধ্য গণ্য হবে না। কেননা নিয়্যতটি 'ব্যবসা-কর্মের' সংগে যুক্ত হয়নি। কারো কারো মতে মতভেদটি এর বিপরীত।

যাকাত আদায় করার সংগে যুক্ত নিয়্যত কিংবা যাকাত পরিমাণ অর্থ আলাদা করার সংগে নিয়্যত ছাড়া যাকাত আদায় করা সহীহ্ হবে না। কেননা যাকাত একটি ইবাদত। সুতরাং তার জন্য নিয়্যত শর্ত হবে। আর নিয়্যতের ক্ষেত্রে আসল হল কর্মের সংগে যুক্ত হওয়া। তবে যেহেতু 'যাকাত প্রদান' (সাধারণতঃ) বিভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে। তাই সহজতার লক্ষ্যে যাকাতের অর্থ আলাদা করার সময় নিয়্যতের উপস্থিতিই যথেষ্ট। যেমন সিয়ামের ক্ষেত্রে নিয়্যতকে অগ্রবর্তী করার বিষয়টি।

যে ব্যক্তি যাকাতের নিয়্যত ব্যতীত সমস্ত মাল দান করে ফেলে, তার যাকাতের ফরয আদায় হয়ে যাবে।

এটা হল সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। কেননা তার উপর ওয়াজিব ছিল মালের একটা অংশ দান করা। সুতরাং সমগ্র মালের মাঝেই তা নির্ধারিত আছে। অতএব নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই।

যদি আংশিক নিসাব দান করে থাকে তবে দানকৃত অংশের যাকাত রহিত হয়ে যাবে।

এটি মুহাম্মদ (র.)-এর মত। কেননা ওয়াজিব অংশটি সমগ্র মালের মাঝে বিস্তৃত রয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা রহিত হবে না। কেননা অবশিষ্ট মাল ওয়াজিব যাকাতের ক্ষেত্র হতে পারার কারণে দানকৃত অংশ নির্ধারিত হয়নি। প্রথম সুরতটি এর বিপরীত। নির্ভুল বিষয় আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

গবাদি পশুর যাকাত

পরিচ্ছেদ ঃ উটের যাকাত

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *পাঁচটি উটের কমে যাকাত ওয়াজিব নয়। যখন মুক্ত মাঠে*[১] *বিচরণকারী উটের সংখ্যা পাঁচটি হয়, এবং তার উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয় তখন পর্যন্ত উটের ক্ষেত্রে একটি বকরী ওয়াজিব হবে। যখন উটের সংখ্যা দশ হবে তখন চৌদ্দ পর্যন্ত তাতে দু'টি বকরী ওয়াজিব হবে। যখন উটের সংখ্যা পনেরটি হবে তখন উনিশ পর্যন্ত তাতে তিনটি বকরী ওয়াজিব হবে। যখন উটের সংখ্যা বিশটি হবে তখন চব্বিশটি পর্যন্ত তাতে চারটি বকরী ওয়াজিব হবে। যখন উটের সংখ্যা পঁচিশে উপনীত হবে তখন পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত তাতে একটি 'বিনতে মাখায'* অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণকারী উটনী *ওয়াজিব হবে। যখন উটের সংখ্যা ছয়ত্রিশ হবে তখন পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত তাতে একটি 'বিনতে লাবূন'* অর্থাৎ তৃতীয় বর্ষে পদার্পণকারী উটনী *ওয়াজিব হবে। যখন উটের সংখ্যা ছয়চল্লিশ হবে তখন ষাট পর্যন্ত তাতে একটি হিক্কা* অর্থাৎ চতুর্থ বর্ষে পদার্পণকারী উটনী *ওয়াজিব হবে। যখন উটের সংখ্যা একষট্টিতে উপনীত হবে তখন পঁচাত্তর পর্যন্ত তাতে একটি জাযা'আ* অর্থাৎ পঞ্চমবর্ষে পদার্পণকারী উটনী *ওয়াজিব হবে। যখন উটের সংখ্যা ছিয়াত্তরটি হবে তখন নব্বই পর্যন্ত তাতে দু'টি 'বিনতে লাবূন' ওয়াজিব হবে। যখন উটের সংখ্যা একানব্বইয়ে উপনীত হবে তখন একশ' বিশ পর্যন্ত তাতে দু'টি 'হিক্কা' ওয়াজিব হবে।* রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে যাকাত সংক্রান্ত ফরমানসমূহ এভাবেই খ্যাতি লাভ করেছে।

অতঃপর যখন উটের সংখ্যা একশ বিশের অধিক হবে তখন (নিসাবের) 'বিধান' নতুন করে শুরু হবে। অর্থাৎ পাঁচটি উটে দুই হিক্কা সহ একটি বকরী ওয়াজিব হবে। এবং দশটিতে দু'টি বকরী এবং পনেরটিতে তিনটি বকরী এবং বিশটিতে চারটি বকরী ওয়াজিব হবে। এবং পঁচিশ থেকে একশ পঞ্চাশ পর্যন্ত একটি 'বিনতে মাখায' ওয়াজিব হবে। একশ' পঞ্চাশে গিয়ে তিনটি হিক্কা ওয়াজিব হবে। অতঃপর নিসাবের বিধানের পুনরাবৃত্তি হবে। অর্থাৎ পাঁচটিতে একটি বকরী এবং দশটিতে দুইটি বকরী এবং পনেরটিতে তিনটি বকরী এবং বিশটিতে চারটি বকরী আর পঁচিশটিতে একটি বিনতে মাখায এবং ছত্রিশটিতে একটি 'বিনতে লাবূন' এবং যখন উট একশ'

১. سائمة বা মুক্ত মাঠে বিচরণকারী অর্থ— ঐ সকল পশু যা বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে চরে ফিরেই নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে। মালিককে খাদ্য সংগ্রহ করে দিতে হয় না।

ছিয়ানব্বইটিতে উপনীত হবে তখন দু'শ পর্যন্ত তাতে চারটি হিক্কা ওয়াজিব হবে। অতঃপর একশ' পঞ্চাশের পরবর্তী পঞ্চাশে যেভাবে পুনরাবৃত্তি হয়েছে, অনুরূপ বিধানের পুনরাবৃত্তি হবে।

এ হল আমাদের মাযহাব। আর ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, একশ' বিশের উপর যখন একটি অতিরিক্ত হবে তখন তাতে তিনটি বিনতে লাবূন ওয়াজিব হবে। যখন উট একশ' ত্রিশটি হবে তখন তাতে একটি হিক্কা ও দুইটি বিনতে লাবূন ওয়াজিব হবে। অতঃপর চল্লিশ ও পঞ্চাশের মাঝে হিসাব আবর্তিত হতে থাকবে। অর্থাৎ প্রতি চল্লিশে একটি বিনতে লাবূন এবং প্রতি পঞ্চাশে একটি হিক্কা ওয়াজিব হতে থাকবে।

কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) এ মর্মে ফরমান জারি করেছিলেন যে, উটের সংখ্যা যখন একশ' বিশের অধিক হবে তখন প্রতি পঞ্চাশে একটি হিক্কা এবং প্রতি চল্লিশে একটি বিনতে লাবূন ওয়াজিব হবে।

উক্ত ফরমানে বিনতে লাবূনের নিম্নবর্তী বিধান পুনঃ আরোপ করার শর্ত উল্লেখ করা হয়নি।

আমাদের দলীল এই যে, আমর ইব্ন হায্মের পত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উপরোক্ত বক্তব্যের শেষে একথাও লিখেছেন ঃ فَمَا كَانَ اَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ فَفِيْ كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ -এর চেয়ে কম যা হবে, তাতে প্রতি পাঁচটিতে একটি বকরী ওয়াজিব হবে। সুতরাং এই অতিরিক্ত অংশ টুকুর উপরও আমল করতে হবে।

(যাকাতের ক্ষেত্রে) অনারব ও আরব উট একই রকম। কেননা সাধারণ (ابل বা উট) শব্দে উভয় প্রকারই অন্তর্ভুক্ত। বিশুদ্ধ বিষয় আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

পরিচ্ছেদ ঃ গরুর যাকাত

গরুর ক্ষেত্রে ত্রিশের নীচে কোন যাকাত নেই। সুতরাং গরুর সংখ্যা যখন মুক্ত মাঠে বিচরণকারী গরু ত্রিশ হবে এবং সেগুলোর উপর এক বছর অতিক্রান্ত হবে, তখন তাতে একটি তাবী বা তাবী'আ[২] অর্থাৎ দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী নর বা মাদী বাছুর *ওয়াজিব হবে। এবং চল্লিশটিতে একটি 'মুসিন' বা 'মুসিন্না'* অর্থাৎ তৃতীয় বছরে পর্দাপণকারী নর বা মাদী বাছুর ওয়াজিব হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মু'আয (রা.)-কে এরূপই আদেশ করেছিলেন।

যখন গরুর সংখ্যা চল্লিশের অধিক হবে তখন ষাট পর্যন্ত অতিরিক্ত সংখ্যাগুলোতে সেই পরিমাণ ওয়াজিব হবে।

এটি আবূ হানীফা (রা.)-এর মত। সুতরাং অতিরিক্ত একটিতে একটি মুসিন্না এর চল্লিশ ভাগের একভাগ এবং দু'টিতে চল্লিশ ভাগের দুইভাগ এবং তিনটিতে একটি মুসিন্না এর চল্লিশ ভাগের তিন ভাগ ওয়াজিব হবে। এটা হল الأصل (মবসূত কিতাবের) বর্ণনা।

---

২. গরুর ক্ষেত্রে শরীআতে 'স্ত্রীত্ব'কে আলাদা গুণ রূপে বিবেচনা করে নি। সুতরাং নর বা মাদা যে কোনটিই আদায় করা যেতে পারে।

কেননা (মধ্যবর্তী সংখ্যার ক্ষেত্রে) যাকাত মা'ফ হওয়া কিয়াসের বিপরীতে নস (শরীআতের বাণী) দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর এক্ষেত্রে কোন 'নাস' নেই। আর হাসান ইবন যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, পঞ্চাশে পৌঁছা পর্যন্ত অতিরিক্ত সংখ্যায় কিছুই ওয়াজিব হবে না। অতঃপর তাতে একটি 'মুসিন্না' এবং এক মুসিন্না' -এর চতুর্থাংশ কিংবা এক 'তাবী' -এর তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে।

কেননা এই (গরুর যাকাতের) নিসাবের ভিত্তি হল এই যে, প্রতি দু'টি দশকের মাঝে 'ছাড়' রয়েছে। এবং প্রতিটি দশকে ওয়াজিব আরোপিত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ষাটে উপনীত হওয়া পর্যন্ত অতিরিক্ত সংখ্যায় কোন কিছু ওয়াজিব নেই। এটিও ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত একটি রিওয়ায়াত।

কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মু'আয (রা.)-কে বলেছেন ঃ لَا تَأْخُذْ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا -গরুর 'মধ্যবর্তী' সংখ্যাগুলো থেকে কিছু গ্রহণ করো না। আলিমগণ 'মধ্যবর্তী' সংখ্যার ব্যাখ্যা করেছেন চল্লিশ ও ষাটের মধ্যবর্তী দ্বারা।

আমাদের বক্তব্য এই যে, এমনও বলা হয়েছে যে, اوقاص (অতিরিক্ত) সংখ্যা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গরুর বাছুর সমূহ।

অতঃপর ষাটটি গরুর ক্ষেত্রে দুইটি তাবী কিংবা তাবী'আ এবং সত্তরের ক্ষেত্রে একটি মুসিন্না ও একটি তাবী, এবং আশিটির ক্ষেত্রে দুটি মুসিন্না এবং নব্বইটির ক্ষেত্রে তিনটি তাবী এবং একশটির ক্ষেত্রে দু'টি তাবী ও একটি মুসিন্না ওয়াজিব হবে।

অনুরূপভাবে প্রতি দশে বিধান তাবী থেকে মুসিন্না-তে এবং মুসিন্না থেকে তাবী -তে রূপান্তরিত হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ أَوْ مُسِنَّةٌ" -প্রতি ত্রিশটি গরুতে একটি তাবী কিংবা তাবী'আ এবং প্রতি চল্লিশটি গরুতে একটি মুসিন কিংবা মুসিন্না ওয়াজিব হবে।

মহিষ ও গরু (যাকাতের হুকুমের ক্ষেত্রে) সমান। কেননা بقر শব্দটি উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ তা بقر - এরই শ্রেণী বিশেষ। তবে আমাদের দেশে সংখ্যাল্পতার কারণে মানুষের চিন্তা بقر শব্দ দ্বারা সেদিকে ধাবিত হয় না। এ কারণেই কেউ যদি কসম করে যে, গরুর গোশত খাবে না তবে মহিষের গোশত খেলে কসম ভংগ হবে না। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

পরিচ্ছেদ ঃ বকরীর যাকাত

মুক্ত মাঠে চরে খাদ্য সংগ্রহকারী বকরী চল্লিশের নীচে হলে তার যাকাত নেই। যখন মাঠে বিচরণকারী সংখ্যা চল্লিশ হয় এবং সেগুলোর উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়, তখন তাতে একশ' বিশ পর্যন্ত একটি বকরী ওয়াজিব। যখন সংখ্যা একটি বাড়বে তখন দু'শ পর্যন্ত দু'টি বকরী ওয়াজিব। অতঃপর যখন সংখ্যা একটি বাড়বে তখন তিনশ' পর্যন্ত তাতে তিনটি বকরী ওয়াজিব। যখন সংখ্যা চারশ' হবে তখন তাতে চারটি বকরী ওয়াজিব। অতঃপর প্রতি একশতে একটি বকরী ওয়াজিব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ফরমানে অতঃপর আবূ বকর (রা.)-এর ফরমানে এরূপ বিবরণই এসেছে। আর এর উপর উম্মাতের ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ***ভেড়া ও ছাগল (নিসাবের ক্ষেত্রে) সমান।*** কেননা, غنم শব্দটি সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর 'নাস' বা শরীআতের বাণীতে غنم শব্দটি এসেছে।

বকরীর যাকাতে 'ছানী' (পূর্ণ এক বছরের) গ্রহণ করা হবে। ভেড়ার ক্ষেত্রে 'জাযা' গ্রহণ করা হবে না। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে হাসান ইব্‌ন যিয়াদ বর্ণিত রিওয়ায়াত মতে গ্রহণ করা হবে। বকীর মধ্যে 'ছানী' বলা হয়, যার এক বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। আর 'জাযা' বলা হয় যার বয়স ছ'মাসের উপরে হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে এবং সাহেবাইনেরও এ মত যে, 'জাযা' গ্রহণ করা হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ اِنَّمَا حَقُّنَا الْجَذَعَةُ وَالثَّنِيُّ –আমাদের হক হল 'জাযা' ও 'ছানী'। তা ছাড়া জাযার দ্বারা কুরবানী আদায় হয়ে যায়। সুতরাং যাকাতও আদায় হবে।[৩]

জাহেরী বর্ণনার প্রমাণ হল আলী (রা.) থেকে মাওকূফ ও মারফূ রূপে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ ঃ لَايُؤْخَذُ فِي الزَّكٰوةِ اِلاَّ الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا –যাকাতের ক্ষেত্রে এক বছরের এবং তদূর্ধ্বেরই শুধু গ্রহণ করা হবে।

তাছাড়া যাকাতের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হল মাঝারি, 'জাযা' তো ছোটর মধ্যেই গণ্য। এ কারণেই তো 'জাযা' ছাগলের মধ্য থেকে জাইয হয় না। তবে 'জাযা' দ্বারা কুরবানী জাইয হওয়ার বিষয়টি 'নাস' দ্বারা জানা গেছে।

আর উপরে বর্ণিত হাদীছে جذعه -এর যে কথা বলা হয়েছে, সেটা দ্বারা উদ্দেশ্য হল উটের 'জাযা'।

বকরীর যাকাতের ক্ষেত্রে নর ও মাদী উভয় প্রকারই গ্রহণ করা হবে। কেননা شاة শব্দটি উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ فِىْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ –চল্লিশটি ছাগলে একটি ছাগল। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

---

৩. কেননা কুরবানীর বিষয়টি অপেক্ষাকৃত কঠোর। এ জন্যই তো কুরবানীতে 'তাবী' জাইয হয় না, অথচ যাকাতের ক্ষেত্রে 'তাবী' প্রদান করা জাইয হয়। সুতরাং প্রায় এক বছরী বাচ্চা দ্বারা কুরবানী জাইয হলে তা দ্বারা যাকাত অবশ্য নিঃসন্দেহে জাইয হবে।

পরিচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার যাকাত

ঘোড়া যদি মুক্ত মাঠে বিচরণকারী হয় এবং নর ও মাদী উভয় প্রকার মিশ্রিত থাকে তবে ঘোড়ার মালিকের ইখতিয়ার। তিনি ইচ্ছা করলে ঘোড়া প্রতি এক দীনার প্রদান করবেন কিংবা ঘোড়াগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে প্রতি দু'শ দিরহাম থেকে পাঁচ দিরহাম প্রদান করবেন।

ইহা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। যুফার (র.) ও এ মত পোষণ করেন

সাহেবাইন বলেন, ঘোড়ার কোন যাকাত নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِىْ عَبْدِه وَلَا فِىْ فَرَسِهٖ صَدَقَةٌ (رواه السنة) –নিজ গোলামের ক্ষেত্রে এবং নিজ অশ্বের ক্ষেত্রে মুসলমানদের উপর কোন যাকাত নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল হল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ فِىْ كُلِّ فَرَسٍ سَائِمَةٍ دِيْنَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ (رواه الدارقطنى) –মুক্তভাবে বিচরণকারী প্রতিটি ঘোড়ায় এক দীনার কিংবা দশ দিরহাম ওয়াজিব হবে।

সাহেবাইন যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তার উদ্দেশ্য হল মুজাহিদের ব্যবহৃত ঘোড়া।

যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.) থেকে এ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। এক দীনার প্রদান কিংবা মূল্য নির্ধারণ করার মাঝে ইচ্ছা প্রদানের বিষয়টি উমর (রা.) থেকে বর্ণিত।

আলাদা পুরুষ অশ্বের ক্ষেত্রে যাকাত নেই। কেননা তার বংশ বৃদ্ধি হয় না।

(সেরূপ আলাদা স্ত্রী অশ্বের ক্ষেত্রেও যাকাত নেই) এটা এক বর্ণনা মুতাবিক। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অন্য বর্ণনা মতে তাতে যাকাত ওয়াজিব। কেননা, ধার করা পুরুষ অশ্ব দ্বারা তার বংশবৃদ্ধি হতে পারে। কিন্তু পুরুষ অশ্বের বিষয়টি এর বিপরীত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে অন্য বর্ণনা অনুযায়ী আলাদা পুরুষ অশ্বের ক্ষেত্রেও যাকাত ওয়াজিব।

খচ্চর ও গর্দভের ক্ষেত্রে কোন যাকাত নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ لَمْ يَنْزِلْ عَلَىَّ فِيْهِمَا شَىْءٌ –এ দু'টি সম্পর্কে আমার উপর কোন বিধান নাযিল হয়নি।

আর যাকাতের 'পরিমাণ'সমূহ সাব্যস্ত হয় [শারে'আ.)-এর নিকট থেকে] শ্রবণের মাধ্যমে। তবে যদি সেগুলো ব্যবসার জন্য হয় (তখন যাকাত ওয়াজিব হবে।) কেননা, তখন যাকাত সম্পর্কিত হবে মূল্যের দিক থেকে, যেমন অন্যান্য ব্যবসায়ী সম্পদের ক্ষেত্রে।

পরিচ্ছেদ ঃ যে সব পশুর ক্ষেত্রে যাকাত নেই।

উট-শাবক, গো-শাবক ও মেষ-শাবকের ক্ষেত্রে যাকাতে নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে। তবে যদি সেগুলোর সংগে বয়স্কও থাকে (তখন সেগুলো অনুবর্তী হিসাবে শাবকগুলোর উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে।) এ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সর্বশেষ মত। এবং এ-ই ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত।

প্রথমে তিনি বলতেন যে, বয়স্কদের উপর যা ওয়াজিব হয়, ছোটগুলোর উপরও তাই ওয়াজিব হবে। এ-ই হলো ইমাম যুফার ও ইমাম মালিকের মাযহাব। এরপর এ মত প্রত্যাহার করে তিনি বলেছেন যে, শাবকগুলোর মধ্য থেকে তাদেরই একটি ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সর্বশেষ মত।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম শাফিঈ (র.)-এরও এ মত।

তাঁর প্রথম মতামতের দলীল এই যে, (শরীআতের) নির্দেশে উল্লেখিত নাম ছোট ও বড় উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

দ্বিতীয় মতের দলীল হল উভয় পক্ষের প্রতি সুবিবেচনা নিশ্চিত করা। যেমন শুধু শীর্ণ পশুর ক্ষেত্রে তা থেকে একটি ওয়াজিব হয়।

শেষ মতের দলীল এই যে, পরিমাণসমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিয়াস ব্যবহার হতে পারে না। সুতরাং শরীআত প্রবর্তিত পরিমাণ ওয়াজিব করা যখন সম্ভব নয়, তখন সম্পূর্ণ রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু ছোটগুলোর সংগে একটিও যদি বয়স্ক থাকে তবে নিসাব পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে সবগুলোকে বয়স্কটির অনুবর্তী ধরা হবে। কিন্তু যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে অনুবর্তী ধরা হবে না (বরং বয়স্কই আদায় করতে হবে)।[৪]

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে মেষ-শাবকের ক্ষেত্রে চল্লিশটির নীচে এবং গো-শাবকের ক্ষেত্রে ত্রিশটির নীচে যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর উট-শাবকের ক্ষেত্রে পঁচিশটির জন্য একটি ওয়াজিব হবে। অতঃপর আর কিছু ওয়াজিব হবে না যতক্ষণ না ঐ সংখ্যায় উপনীত হয়, যেখানে বয়স্ক উটের ক্ষেত্রে ওয়াজিব দুইটি হয়। অতঃপর আর কিছু ওয়াজিব হবে না যতক্ষণ না ঐ সংখ্যায় উপনীত হয় যেখানে বয়স্ক উটের ক্ষেত্রে ওয়াজিব তিনটি হয়।

এক বর্ণনা মুতাবিক পঁচিশের নীচে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে অন্য একটি বর্ণনা মতে পাঁচিশটিতে একটি শাবকের পঞ্চমাংশ এবং দশটিতে দুই-পঞ্চমাংশ এবং পরবর্তী প্রতি পাঁচে এই হিসাবে ওয়াজিব হবে।

তাঁর পক্ষ থেকে আরেকটি বর্ণনা এই যে, পাঁচটি শাবকের ক্ষেত্রে এক শাবকের মূল্যের পঞ্চমাংশ এবং একটি মধ্যম বকরীর মূল্য বিচার করা হবে। এবং উভয়ের মধ্যে নিম্নতর মূল্যটি ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ দশটির ক্ষেত্রে দু'টি বকরীর মূল্য এবং একটি উট শাবকের দুই-পঞ্চমাংশের মূল্য বিচার করা হবে। পরবর্তী ক্ষেত্রে এই হিসাবে চলবে।

ইমাম কুদূরী বলেন: ***যার উপর বিশেষ বয়সের কোন উট ওয়াজিব হয়েছে, কিন্তু তা পাওয়া গেল না, তখন যাকাত উত্তলকারী তা থেকে বেশী বয়সেরটি গ্রহণ করবে এবং অতিরিক্ত মূল্য ফেরত দিবে। কিংবা তার চেয়ে কম বয়সেরটি গ্রহণ করবে এবং অতিরিক্ত মূল্যও উত্তল করে নিবে।***

এ মাসআ ভিত্তি এই যে, আমাদের নিকট যাকাতের ক্ষেত্রে মূল্য গ্রহণ জাইয রয়েছে। বিষয়টি সামনে ইনশা'আল্লাহ্ আলোচনা করবো। তবে প্রথম সূরতে যাকাত সংগ্রহকারীর

---

৪. অর্থাৎ যদি ছাগল ছানার সংগে বড় ছাগলও থাকে তবে সেগুলোকে বড়গুলোর অনুবর্তী ধরে নিসাব পূর্ণ করা হবে। কিন্তু যাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে ছোটগুলো দ্বারা আদায় করা যাবে না, বরং বড় থেকে দিতে হবে, যদি যে পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব হয়েছে সেই পরিমাণ বড় ছাগল থাকে। অন্যথায় আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে শুধু একটি বড় ছাগল ওয়াজিব হবে।

অধিকার রয়েছে উচ্চতর পশু গ্রহণ না করে যে পশু ওয়াজিব হয়েছে, হুবহু সেটা কিংবা তার মূল্য দাবী করার। কেননা এটা মূলতঃ ক্রয়।

আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যাকাত সংগ্রহকারীকে (নিম্নতর পশু গ্রহণে) বাধ্য করা হবে। কেননা, এখানে (ক্রয় ও) বিক্রয় নেই বরং এটা হল মূল্য দ্বারা যাকাত প্রদান।

আমাদের মতে যাকাতের ক্ষেত্রে মূল্য প্রদান করা জাইয। কাফ্ফারাসমূহ এবং সাদাকাতুল ফিতর, উশর ও নযরের ক্ষেত্রে একই হুকুম।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, 'নাস'-এর অনুসরণ কল্পে মূল্য প্রদান জাইয নয়। যেমন হজ্জের হাদীছ ও কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে।

আমাদের দলীল এই যে, যাকাত দরিদ্রকে প্রদানের আদেশ দানের উদ্দেশ্য হল তার নিকট প্রতিশ্রুত রিযিক পৌঁছানো। সুতরাং এ বিষয়টি (নাস-এ বর্ণিত) বকরীর শর্তকে বাতিল করে দেয়। তাই এটা 'জিযয়া'-এর মত।

হাদী (ও কুরবানীর) বিষয়টি-এর বিপরীত। কেননা, সেখানে রক্ত প্রবাহিত করাই হল ইবাদত। আর তা যুক্তিনির্ভর নয়। (সুতরাং এ ক্ষেত্রে 'নাস'-এর গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকা অপরিহার্য) পক্ষান্তরে বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রে ইবাদতের দিক হল অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির প্রয়োজন মিটানো। আর এটা হল যুক্তিসঙ্গত।

কাজে নিয়োজিত ভারবহনে নিযুক্ত এবং সংগৃহীত খাদ্যে প্রতিপালিত পশুর উপর যাকাত নেই।

(এ বিষয়ে) ইমাম মালিক (র.)-এর ভিন্ন মত রয়েছে। তাঁর দলীল হল প্রকাশ্য 'নাস'সমূহ।

আমাদের দলীল হল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ لَيْسَ فِى الْحَوَامِلِ وَالْعَوَامِلِ وَلَا فِى الْبَقَرَةِ الْمُثِيْرَةِ صَدَقَةٌ –ভার বহনে এবং কাজে নিযুক্ত পশুর ক্ষেত্রে এবং চাষাবাদে নিযুক্ত গরুর ক্ষেত্রে যাকাত নেই।

তা ছাড়া যাকাত ওয়াজিব হওয়ার سبب বা কারণ হল 'বর্ধনশীল' সম্পদ। আর বর্ধনশীলতার প্রমাণ হল মুক্ত মাঠে চরিয়ে পালিত কিংবা ব্যবসায় খাটানো। এখানে এর কোনটিই পাওয়া যায়নি।

তাছাড়া সংগৃহীত খাদ্যে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে ব্যয় বর্ধিত হয়। ফলে প্রকৃতপক্ষে সম্পদের 'বর্ধনশীলতা' লোপ পায়। سائمة (চরণ শীল) অর্থ ঐ সকল পশু, যারা বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে চরে খায়। সুতরাং যদি মালিক অর্ধেক বছর কিংবা তার বেশী সময় পশুপালকে সংগৃহীত খাদ্য খাওয়ায় তা হলে সেটা علوفة (সংগৃহীত খাদ্যে প্রতিপালিত) বলে গণ্য হবে। কেননা অল্প অধিকের অনুবর্তী বলে গণ্য হয়।

যাকাত সংগ্রহকারী উৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ করবে না আর নিকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ করবে না, বরং মধ্যম মানের গ্রহণ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ لَا تَأْخُذُوْا مِنْ حَزَرَاتِ أَمْوَالِ النَّاسِ وَخُذُوْا مِنْ حَوَاشِىْ أَمْوَالِهِمْ –লোকদের উৎকৃষ্ট মাল থেকে গ্রহণ করো না; বরং তাঁদের মধ্যম মাল থেকে গ্রহণ কর। আর এ জন্য যে, তাতে উভয় পক্ষের প্রতি সুবিবেচনা রয়েছে।

ইমাম কুদূরী বলেন, *যে ব্যক্তি নিসাবের অধিকারী হয় এবং বছরের মাঝে একই জাতীয় মাল লাভ করে, সে উক্ত মাল পূর্ববর্তী নিসাবের সংগে যুক্ত করবে এবং উহার সাথে তারও যাকাত আদায় করবে।*

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যুক্ত করা হবে না। কেননা, মালিকানা স্বত্ত্বের দিক দিক থেকে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুতরাং তৎসম্পৃক্ত বিধানের ক্ষেত্রেও তা স্বতন্ত্র হবে। অর্জিত মুনাফা এবং ভূমিষ্ঠ বাচ্চার বিষয়টি এর বিপরীত, কেননা তা মালিকানার ক্ষেত্রে (পূর্ববর্তী সম্পদের) অনুবর্তী। তাই মূল সম্পদের মালিকানায়ই এর মালিকানা সাব্যস্ত হয়।

আমাদের দলীল এই যে, বাচ্চা ও মুনাফা যুক্ত করার কারণ কম সমজাতি হওয়া। কেননা, এ অবস্থায় পৃথকভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। সুতরাং প্রতিটি অর্জিত সম্পদের জন্য আলাদা বর্ষ গণনা করা কষ্টকর হবে। অথচ সহজ করার জন্যই বর্ষপূর্তির শর্ত আরোপ করা হয়েছিল।

গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে যাকাত আরোপিত হয় নিসাবের উপর, (স্তরের পর) বাড়তি অংশের উপর নয়।

আর ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (র.) বলেন, নিসাব ও বাড়তি উভয় অংশের উপর যাকাত আরোপিত হয়। সুতরাং যদি স্তরের পর বাড়তি অংশ নষ্ট হয়ে যায় আর নিসাব অক্ষত থেকে যায় তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম ইউসুফ (র.)-এর মতে ওয়াজিব পুরোপুরি থেকে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে যে পরিমাণ মাল হালাক হয়েছে, ওয়াজিবও সেই অনুপাতে রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (র.)-এর দলীল এই যে, যাকাত ওয়াজিব হয়েছে সম্পদ রূপ নিয়ামতের শোকর হিসাবে। সমগ্র সম্পদই নিয়ামত।

আর শায়খাইন (র.)-এর দলীল হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ فِيْ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ، وَلَيْسَ فِي الزِّيَادَةِ شَيْئٌ حَتّٰى تَبْلُغَ عَشْرًا –পাঁচটি 'সায়মা' উটের ক্ষেত্রে একটি বকরী ওয়াজিব হবে। বাড়তির উপর কিছুই ওয়াজিব নয় সংখ্যা দশে উপনীত হওয়া পর্যন্ত। প্রতিটি নিসাবের ক্ষেত্রেই তিনি অনুরূপ বলেছেন। তিনি বাড়তির উপর ওয়াজিব হবে না বলেছেন।

তাছাড়া বাড়তি অংশটি হল নিসাবের অনুবর্তী। সুতরাং নষ্ট হওয়ার বিষয়টি প্রথমে বাড়তির উপর প্রযোজ্য হবে। যেমন মুযারাবার মালের মুনাফার উপর প্রযোজ্য হয়।

এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, সম্পদের বাড়তি অংশের পর হালাক হওয়ার বিষয়টি শেষ নিসাবের দিকে ফেরানো হবে। এরপর তৎসংলগ্ন নিসাবের প্রতি; এভাবে শেষ পর্যন্ত চলবে। কেননা প্রথম নিসাবই হল মূল। তারপরে যা কিছু বাড়বে, তা উক্ত নিসাবের অনুবর্তী হবে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে প্রথমে বাড়তি অংশের দিকে ফেরানো হবে। অতঃপর সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ নিসাবের দিকে ফেরানো হবে।

বিদ্রোহীরা যদি খারাজ ও গবাদিপশুর যাকাত উশুল করে নিয়ে থাকে তবে তাদের উপর দ্বিতীয়বার যাকাত ধার্য করা হবে না। কেননা শাসক তাদের রক্ষা করেননি। আর রাজস্ব উশুলের অধিকার হয় রক্ষা করার বিনিময়ে।

তবে তাদের এই ফাতওয়া দেওয়া হবে যেন তারা যাকাত নিজেই পুনঃ আদায় করে, খারাজ নয়।

তবে এটা শুধু তাদের ও আল্লাহ্‌র মাঝের বিষয়। কেননা, বিদ্রোহীরা যোদ্ধা হিসাবে বিদ্রোহীদের উপর খারাজ ব্যয় হতে পারে। আর যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র হল দরিদ্ররা। আর বিদ্রোহিগণ দরিদ্রদের মধ্যে যাকাত প্রদান করবে না।

তবে কারো কারো মতে যদি তাদের প্রদানের সময় তাদের উপরই সাদকা করার নিয়্যত করে নেয় তাহলে তার উপর থেকে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। তদ্রূপ যে কোন যালিম হাকিমকে প্রদত্ত মালের একই হুকুম। কেননা তাদের উপর (মানুষের যত (আর্থিক) হক ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে, সেগুলোর প্রেক্ষিতে তারা প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র। তবে প্রথম হুকুম (অর্থাৎ পুনঃ আদায়) অধিক সতর্কতাপূর্ণ।

বনী তাগলিব গোত্রের শিশুদের 'সায়মার' উপর কিছুই ওয়াজিব নয়। তবে তাদের স্ত্রীলোকদের উপর পুরুষদের সমপরিমাণ ওয়াজিব হবে।[৫] কেননা (তাদের ব্যাপারে) এই সমঝোতা হয়েছে যে, মুসলমানদের থেকে যা গ্রহণ করা হয়, তাদের নিকট থেকে তার দ্বিগুণ গ্রহণ করা হবে। আর মুসলমানদের স্ত্রীলোকদের থেকে তো যাকাত গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তাদের শিশুদের থেকে গ্রহণ করা হয় না।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর যদি মাল নষ্ট হয়ে যায় তবে যাকাত রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, আদায়ে ক্ষমতার পর যদি হালাক হয়ে যায় তাহলে তার যিম্মায় যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। কেননা যাকাত যিম্মার উপর ওয়াজিব। সুতরাং এটা সাদাকাতুল ফিতরের মত হল।

তাছাড়া তলব করার পরও সে আদায় করেনি। সুতরাং তা এমন হয়ে গেল, যেন নিজেই মাল ধ্বংস করেছে।

আমাদের দলীল এই যে, ওয়াজিব হল নিসাবের-ই একটি অংশ, সহজসাধ্য হওয়ার প্রতি বিবেচনা করে। সুতরাং ওয়াজিবের ক্ষেত্র হওয়ার কারণে ওয়াজিবও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যেমন অপরাধকারী গোলাম মারা গেলে অপরাধের কারণে তাকে সমর্পণ করার দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়।

---

৫. এরা হল রোম সীমান্তে বসবাসকারী তাগলিব গোত্রের নাসারা সম্প্রদায়। এরা আরব বংশীয়। উমর (রা.) যখন তাদের উপর জিযিয়া নির্ধারণের ইচ্ছা করলেন তখন তারা বলল, আমরা আরব গোত্রের লোক, জিযিয়া প্রদানকে আমরা কলঙ্ক মনে করি। যদি আমাদের উপর জিযিয়া আরোপ করা হয় তবে আমরা রোমকদের সংগেই থাকা পসন্দ করবো। আর যদি আমাদের থেকে মুসলমানদের যাকাতের দ্বিগুণ পরিমাণ নিতে চান তাহলে আমরা তা দিতে প্রস্তুত আছি। তখন উমর (রা.) সাহাবায়ে কিরামের সংগে পরামর্শ করে এই বলে তাদের প্রস্তাব মেনে নিলেন যে, যে নামই তোমরা দাও, আসলে এটা জিযিয়াই।

আর যাকাতের হকদার হল সেই দরিদ্র, যাকে নিসাবের মালিক নিজে নির্বাচন করবে। সুতরাং এখানে তো নির্বাচিত দরিদ্র থেকে তলব পাওয়া যায়নি।

যাকাত উশুলকারীর তলব করার পরে হালাক হলে কোন কোন মতে যিম্মায় ওয়াজিব হবে। আর কোন মতে যিম্মায় ওয়াজিব থাকবে না। কেননা, সে নিজে হালাক করেনি।

আর স্বেচ্ছায় হালাক করার ক্ষেত্রে তার থেকে সীমালংঘন পাওয়া গেছে। (সুতরাং শাস্তি স্বরূপ ওয়াজিবের ক্ষেত্র বিদ্যমান রয়েছে বলে গণ্য করা হবে।)

আংশিক মাল হালাক হলে সেই অনুপাতে যাকাত রহিত হবে। আংশিক-কে সময়ের উপর কিয়াস করে।

যদি নিসাবের মালিক হওয়া অবস্থায় বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করে তাহলে তা জাইয হবে। কেননা, ওয়াজিব হওয়ার কারণ তথা নিসাব বিদ্যমান হওয়ার পরে সে যাকাত আদায় করেছে। সুতরাং তা জাইয হবে। যেমন; (ভুলবশতঃ) জখম করার পরই কাফ্ফারা দিয়ে দিলে (আদায় হয়ে যায়)।

এ বিষয়ে ইমাম মালিক (র.)-এর ভিন্ন মত রয়েছে।

একাধিক বছরের যাকাত অগ্রিম প্রদান করা জাইয আছে। কেননা (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার) কারণ (তথা নিসাব) বিদ্যমান রয়েছে।

যদি তার মালিকানায় একটি নিসাব বিদ্যমান থাকে তবে কয়েকটি নিসাবের যাকাতও প্রদান করতে পারে।

ইমাম যুফার (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। আমাদের দলীল এই যে, সবব বা কারণ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম নিসাবই হল আসল। এর উপর অতিরিক্ত হল তার অনুবর্তী। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

সম্পদের যাকাত

পরিচ্ছেদ ঃ রূপার যাকাত

দু'শ দিরহামের নীচে কোন যাকাত নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَالْاَوْقِيَةُ اَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا – পাঁচ আওকিয়ার নীচে কোন যাকাত নেই। আর এক আওকিয়ার পরিমাণ হলো চল্লিশ দিরহাম (বুখারী)।

দিরহাম যখন দু'শ হবে এবং তার উপর বর্ষপূর্তি হবে তখন তাতে পাঁচ দিরহাম ওয়াজিব হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মু'আয (রা.)-এর নামে এই মর্মে পত্র প্রেরণ করেছিলেন যে, প্রতি দু'শ দিরহাম হতে পাঁচ দিরহাম গ্রহণ করো এবং প্রতি বিশ মিছকাল স্বর্ণ হতে অর্ধ মিছকাল[১] গ্রহণ কর।(দারা-কুতনী)।

গ্রন্থকার বলেন, *নিসাবের অতিরিক্তের ক্ষেত্রে চল্লিশ দিরহাম না হওয়া পর্যন্ত কিছু ওয়াজিব হবে না। চল্লিশে গিয়ে এক দিরহাম ওয়াজিব হবে। এরপর প্রতি চল্লিশে এক দিরহাম।* এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত।

সাহেবাইন বলেন, দু'শর বেশী যা হবে, তার যাকাতেও সেই হিসাবে হবে।

এটি ইমাম শাফিঈ (র.)-এরও মত। কেননা আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে ঃ وَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابِهِ –দু'শর উপরে যা অতিরিক্ত হবে, তার যাকাত সেই হিসাবে হবে।

তাছাড়া যাকাত তো ওয়াজিব হয়েছে নিআমতে মালের শোকর হিসাবে।[২] তবে প্রারম্ভে নিসাব পরিমাণ হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, অভাব মুক্ত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য। আর গবাদি পশুর ক্ষেত্রে (প্রারম্ভিক) নিসাবের পরেও বিশেষ স্তরে পৌছার শর্ত আরোপ করা হয়েছে খণ্ড খণ্ড করার অসুবিধা পরিহার করার জন্য।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো হাদীছে মু'আয (রা.)-এ বর্ণিত নিম্নোক্ত বাক্যটি ঃ لَا تَاْخُذْ مِنَ الْكُسُوْرِ شَيْئًا –নিছাবের ভগ্নাংশ থেকে কিছু গ্রহণ করো না (দারা-কতনী)। তদ্রূপ

১. দু'শ দিরহামে প্রায় ৫৯৫ গ্রাম হয়। এবং পাঁচ দিরহামে হয় প্রায় ১৫ গ্রাম। বিশ মিছকালে হয় প্রায় ৮৫ গ্রাম।

২. আর সমস্ত মালই হলো নিআমত। সুতরাং নিসাবের অতিরিক্ত যে-কোন পরিমাণেই যাকাত ওয়াজিব হবে।

আমর ইব্ন হাযম (রা.) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে ঃ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ الْاَرْبَعِيْنَ صَدَقَةٌ –চল্লিশ দিরহামের নীচে কোন যাকাত নেই। তাছাড়া অসুবিধার অবস্থা শরীআতে পরিহার্য। আর ভগ্নাংশের যাকাত ওয়াজিব করার মধ্যে অসুবিধা রয়েছে। কেননা, ভগ্নাংশের হিসাব কঠিন।

দিরহামের ক্ষেত্রে ওজনে সাবআ গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ প্রতি দশ দিরহামের ওজন হবে সাত মিছ্‌কাল।[৩] উমর (রা.)-এর অর্থ দফতরের হিসাবে এই পরিমাণই প্রচলিত ছিলো এবং পরবর্তীতে এটিই স্থায়ী রূপ লাভ করে।

কোন রৌপ্য বস্তুতে রূপার পরিমাণ যদি বেশী হয় তবে সবটুকুই রূপা হিসাবেই গণ্য হবে। আর খাদ যদি বেশী হয় তবে তা পণ্যদ্রব্য রূপে গণ্য হবে। তার মূল্য নিসাব পরিমাণ হওয়ার বিষয়টি বিবেচিত।

কারণ দিরহামে সামান্য খাদ থাকেই। কেননা তা খাদ ছাড়া জমাট বাঁধে না। তবে অধিক পরিমাণ খাদ থেকে (সাধারণতঃ) মুক্ত থাকে। তাই পরিমাণের অধিক্যকে আমরা পার্থক্য রূপে গণ্য করেছি। আর আধিক্যের অর্থ হলো অর্ধেক থেকে বেশী হওয়া। বাস্তবের প্রতি দৃষ্টি রেখে ছারফ অধ্যায়ে এ প্রসংগ ইনশাআল্লাহ্ আমরা আলোচনা করবো। তবে খাদ অধিক হওয়ার ক্ষেত্রে (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে) ব্যবসায়ের নিয়্যত থাকা অপরিহার্য, যেমন অন্যান্য বাণিজ্য-পণ্যের ক্ষেত্রে। তবে যদি তা থেকে রূপা পৃথক করে নেয়া হয় আর তা নিসাব পরিমাণ হয় (তবে ব্যবসায়ের নিয়্যত করা জরুরী নয়।)

কেননা, শুধু রূপার ক্ষেত্রে মূল্য কিংবা ব্যবসায়ের নিয়্যত ধর্তব্য নয়। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

পরিচ্ছেদ ঃ স্বর্ণের যাকাত

বিশ মিছকাল স্বর্ণের নীচে যাকাত ওয়াজিব নয়। যখন বিশ মিছকাল হবে তখন তাতে অর্ধ মিসকাল ওয়াজিব।

প্রমাণ হলো ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ। মিসকালের (দীনারের) পরিমাণ হল এর সাতটির ওজন দশ দিরহামের সমান হবে। এ-ই প্রচলিত।

এরপর প্রতি চার মিছকালে দুই কীরাত ওয়াজিব হবে। কেননা দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ (বা চল্লিশভাগের একভাগ) হলো যাকাতের ওয়াজিব পরিমাণ। আর তাহল আমরা যা বলেছি (অর্থাৎ ২ কীরাত)। কারণ, প্রতি মিছকালের ওজন বিশ কীরাত।

---

৩. উমর (রা.)-এর জামানায় দিরহামের ওজন বিভিন্ন ছিলো। ফাতওয়া ছোগরার মতে তিন প্রকার দিরহাম তখন প্রচলিত ছিলো, প্রথম প্রকার হলো প্রতি দশ দীনারে দশ মিছকাল এবং প্রতি দিরহামে বিশ কীরাত। দ্বিতীয় প্রকার হলো প্রতি দশ দিরহামে ছয় মিছকাল এবং প্রতি দিরহামে বার কীরাত অর্থাৎ এক মিছকালের পাঁচভাগের তিনভাগ। তৃতীয় প্রকার হলো প্রতি দশ দিরহামে পাঁচ মিছকাল এবং প্রতি দিরহামে অর্ধ মিছকাল বা দশ কীরাত। তবে মিছকালের পরিমাণ ছিলো অভিন্ন। অর্থাৎ বিশ কীরাত।

বর্ধিত অংশ চার মিছকালের কম হলে যাকাত নেই।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইনের মতে সেই অনুপাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। এটা মূলতঃ ভগ্নাংশের মাসআলা।

আর শরীআতের দৃষ্টিতে প্রতি দীনার দশ দিরহামের সমমান। সুতরাং এ ক্ষেত্রে চার মিছকাল চল্লিশ দিরহামের সমমান হবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *স্বর্ণ ও রৌপ্যের খণ্ড, অলংকার ও বর্তন এসবে যাকাত ওয়াজিব।*

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, স্ত্রীলোকের অলংকার এবং পুরুষের রূপার আংটিতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা তা মুবাহ হিসাবে ব্যবহৃত। সুতরাং তা ব্যবহার্য কাপড়ের সদৃশ।

আমাদের দলীল এই যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সবাব (উপাদান) হলো বর্ধন সম্পন্ন সম্পদ। এখানে বর্ধনের প্রমাণ বিদ্যমান আর তা হলো সৃষ্টিগত ভাবেই এগুলো ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুতকৃত। আর এ ক্ষেত্রে প্রমাণের বিদ্যমানতাই বিবেচ্য। ব্যবহার্য বস্ত্রের বিষয়টি এর বিপরীত।

পরিচ্ছেদ ঃ পণ্যদ্রব্যের যাকাত

যে কোন ধরনের ব্যবসায়িক পণ্যদ্রব্য হোক তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে যদি তার মূল্য রূপার কিংবা স্বর্ণের নিসাব পরিমাণে পৌঁছে। কেননা পণ্যদ্রব্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ يُقَوِّمُهَا فَيُؤَدِّيْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ –পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা হবে। এবং প্রতি দু'শ দিরহাম হতে পাঁচ দিরহাম আদায় করা হবে। কারণ এগুলো বান্দার পক্ষ থেকে বর্ধনের জন্য প্রস্তুতকৃত। সুতরাং তা শরীআতের পক্ষ থেকে প্রস্তুতকৃতের সদৃশ।

ব্যবসায়ের নিয়্যতের শর্ত আরোপ করা হয়েছে যাতে বান্দার পক্ষ থেকে প্রস্তুতকরণ সাব্যস্ত হয়।

অতঃপর ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *দরিদ্রদের জন্য অধিকতর লাভজনক যা তা দ্বারাই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।* এর উদ্দেশ্য হলো দরিদ্রদের হক-এর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত একটি রিওয়ায়াত। কিন্তু মাবসূতের বর্ণনা মতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) মালিকের ইখতিয়ারের উপর ন্যস্ত করেছেন। কেননা বস্তুসমূহের মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে উভয় (স্বর্ণ ও রৌপ্য) মুদ্রাই সমান।

অধিকতর লাভজনক হওয়ার ব্যাখ্যা এই যে, ঐ মুদ্রার দ্বারা মূল্য নিরূপণ করতে হবে, যা দ্বারা নিসাব অর্জিত হয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পণ্যদ্রব্য যদি মুদ্রা দ্বারা খরিদ করা হয়ে থাকে তাহলে যে ধরনের মুদ্রা দ্বারা খরিদ করা হয়েছে, তা দ্বারাই মূল্য নিরূপণ করা হবে। কেননা, মূল্যমান পরিচয়ের ক্ষেত্রে এটাই স্পষ্টতর।

পক্ষান্তরে যদি মুদ্রা ছাড়া অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা খরিদ করে থাকে তবে দেশে প্রচলিত প্রধান মুদ্রা দ্বারা মূল্য নিরূপণ করা হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সর্বাবস্থায় প্রচলিত প্রধান মুদ্রা দ্বারাই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে, যেমন গসবকৃত ও ধ্বংসকৃত মালের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

বছরের উভয় প্রান্তে যদি নিসাব পূর্ণ থাকে, তবে মধ্যবর্তী সময়ে নিসাবে হ্রাস যাকাতকে রহিত করবে না। কেননা মধ্যবর্তী সময়ের পূর্ণতার সমীক্ষণ কঠিন। তবে শুরুতে নিসাবের পূর্ণতা আবশ্যকীয় হয়েছে, যাতে যাকাত সংঘটিত হয় এবং অভাবমুক্ততা সাব্যস্ত হয়। তদ্রূপ বছরের শেষ প্রান্তেও (নিসাবের পূর্ণতা জরুরী) হলো যাকাত ওয়াজিব হওয়ার হুকুমের জন্য। মধ্যবর্তী সময়টি অনুরূপ নয়। কেননা, সেটা হচ্ছে নিছক বিদ্যমান থাকার অবস্থা।

পক্ষান্তরে সমস্ত মাল হালাক হয়ে গেলে যাকাতের বছর পূর্তির হুকুমটি বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ সার্বিক ভাবে নিসাব বিলুপ্ত হওয়ার কারণে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কিন্তু প্রথম মাসআলাটি এরূপ নয়। কেননা নিসাবের কিছু অংশ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং যাকাতের উপাদানের সংঘটন অব্যাহত থাকবে।

ইমাম কুদূরী বলেন, *নিসাব পূর্ণ হওয়ার জন্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের সংগে যুক্ত করা হবে।* কেননা পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ-রৌপ্য সকলের ক্ষেত্রেই বাণিজ্য সম্ভার হিসাবেই যাকাত ওয়াজিব হয়ে থাকে। যদিও ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুত করণের দিকটি ভিন্ন।[৪]

স্বর্ণকে রৌপ্যের সংগে যুক্ত করা হবে। কেননা মুদ্রা হওয়ার দিক থেকে উভয়ের মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে। আর মূল্য হওয়ার দিক থেকেই তা যাকাতের সবব (পণ্য রূপে) গণ্য হয়েছে।

তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ সংযুক্তি থেকে মূল্যের মাধ্যমে, আর সাহেবাইনের মতে অংশ হিসাবে। এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও এরূপ এক মত বর্ণিত আছে।

সুতরাং কারো নিকট যদি একশ' দিরহাম এবং পাঁচ মিছকাল স্বর্ণ থাকে, যার মূল্য একশ' দিরহাম পরিমাণ হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। সাহেবাইনের মতে ওয়াজিব হবে না।

তাঁদের বক্তব্য এই যে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে পরিমাণই বিবেচ্য, মূল্য বিবেচ্য নয়। তাইতো যে স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্রের ওজন দু'শ দিরহামের কম অথচ তার মূল্য দু'শ' দিরহামের বেশী, তাতে (সর্ব সম্মতিক্রমে) যাকাত ওয়াজিব হয় না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর যুক্তি এই যে, সাদৃশ্যের কারণেই একটাকে অন্যটার সংগে যুক্ত করা হয়। আর তা মূল্যের বিবেচনায়ই বাস্তবায়িত হয়, বস্তু আকৃতির দিক থেকে নয়। সুতরাং মূল্যের দ্বারাই মিলান হবে। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

---

৪. অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যকে বান্দার পক্ষ থেকে ব্যবসার জন্য নিয়োজিত করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে স্বর্ণ ও রৌপ্যকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যবসার মাধ্যম রূপে নির্বাচিত।

উশর[১] উসূলকারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী

কোন ব্যবসায়ী যখন পণ্যদ্রব্যসহ উশর উসূলকারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে আর বলে যে, মাত্র কয়েক মাস হলো এ সম্পদ আমি লাভ করেছি, কিংবা আমার উপর ঋণের দায় রয়েছে, আর একথা সে শপথ করে বলে, তাহলে তার কথা বিশ্বাস করা হবে।

উশর উসূলকারী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, শাসক যাকে ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে যাকাত উসূল করার জন্য রাস্তার উপর নিযুক্ত করেন। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা বর্ষপূর্তির কথা কিংবা ঋণ হতে মুক্ত থাকার কথা অস্বীকার করে, সে মূলতঃ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করল। আর কসমসহ অস্বীকারকারীর কথাই গ্রহণীয়।

তদ্রূপ যদি সে বলে যে, আমি অন্য উসূলকারীর নিকট উশর আদায় করেছি। এটি এ ক্ষেত্রে, যদি ঐ বছর অন্য কোন উশর উসূলকারী থেকে থাকে। কেননা সে আমানত যথাস্থানে আদায় করার দাবী করছে। পক্ষান্তরে যদি এ বছর অন্য কোন উশর উসূলকারী নিযুক্ত হয়ে না থাকে (তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না)। কেননা, সুনিশ্চিত ভাবেই তার মিথ্যাবাদতা প্রকাশ পেয়ে গেছে।

তদ্রূপ যদি সে বলে যে, আমি নিজেই আদায় করে দিয়েছি। অর্থাৎ আমি শহরের দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছি। কেননা শহরে থাকা অবস্থায় যাকাত আদায় করার বিষয়টি তার উপরই ন্যস্ত ছিলো। আর যাকাত উসূলের কর্তৃত্ব পথ অতিক্রমের কারণে। কেননা সে তখন তার হিফাযতে প্রবেশ করেছে।

গবাদি পশুর যাকাত সম্পর্কেও প্রথমোক্ত তিন ক্ষেত্রে একই হুকুম। কিন্তু চতুর্থ ক্ষেত্রে অর্থাৎ যদি সে বলে যে, আমি নিজেই শহরের দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করেছি, তবে কসম করে বললেও তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, বিশ্বাস করা হবে। কেননা সে হকদারের নিকট হক পৌঁছে দিয়েছে।

আমাদের দলীল এই যে, গবাদি পশুর যাকাত গ্রহণ করার অধিকার হলো রাষ্ট্র পরিচালকের। সুতরাং তা বাতিল করার অধিকার তার নেই। অপ্রকাশ্য সম্পদের হুকুম ভিন্ন।

---

১. 'উশর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ব্যাপক অর্থে, যা মুসলমানের নিকট থেকে যাকাত হিসাবে এবং অমুসলমানদের নিকট থেকে শুল্ক হিসাবে উসূল করা হয়।

আবার কেউ কেউ বলছেন যে, প্রথমটিই যাকাতে গণ্য। পক্ষান্তরে (عاشر কর্তৃক) দ্বিতীয় বার উসূল করা হচ্ছে শাসন ভিত্তিক।

আর কারো কারো মতে দ্বিতীয়টিই হলো যাকাত। এবং প্রথমটি নফলে রূপান্তরিত হবে। এ-ই বিশুদ্ধ মত।

গবাদি পশু ও বাণিজ্য-পণ্যের যে সকল ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণ করা হবে, সে ক্ষেত্রে জামেউস-সগীর-এর বর্ণনার লিখিত সনদ বের করে দেখানোর শর্ত আরোপ করেননি। কিন্তু মাবসূত-এর বর্ণনায় এ শর্ত আরোপ করেছেন। আর তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে হাসান ইব্‌ন যিয়াদ বর্ণনা করেছেন। কেননা সে একটি দাবী করেছে আর তার দাবীর সত্যতার সপক্ষে একটি প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং তা প্রদর্শন করা আবশ্যক হবে।

প্রথম মতের পক্ষে দলীল এই যে, হস্তাক্ষরের সংগে অন্য হস্তাক্ষরের সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং তা প্রমাণ রূপে গ্রহণযোগ হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে ক্ষেত্রে মুসলমানের কথা সত্য বলে গ্রহণ করা হবে, সে ক্ষেত্রে যিম্মির কথাও সত্য বলে গ্রহণ করা হবে। কেননা মুসলমানের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়, তার কাছ থেকে নেওয়া হয় তার দ্বিগুণ। সুতরাং দ্বিগুণত্বকে বাস্তবায়িত করার প্রেক্ষিতে (এ ক্ষেত্রেও) উপরোক্ত শর্তাবলী বিবেচনা করা হবে।

হারবী (ব্যবসায়ীর)-এর দাবী সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না, কিন্তু যদি দাসীদের ব্যাপারে বলে যে, এরা আমার উম্মু ওয়ালাদ। কিংবা যদি সংগের বালকদের সম্পর্কে বলে যে, এরা আমার সন্তান। কেননা, হিফাযতের লক্ষ্যেই তার কাছ থেকে শুল্ক গ্রহণ করা হয়। আর তার মালিকানাধীন সম্পদই শুধু হিফাজতের মুখাপেক্ষী। তবে তার অধীনস্থ বালকের নসবের স্বীকৃতি দান তার জন্য বৈধ। সুতরাং উম্মু ওয়ালাদের (মাতৃত্বের) স্বীকৃতি দানও বৈধ হবে। কেননা মাতৃত্ব নসবের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে সম্পদগুণ লুপ্ত হয়ে গেলো। আর শুল্ক গ্রহণ একমাত্র মালের উপরই ওয়াজিব।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***গ্রহণ করবে মুসলমানের নিকট থেকে দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ, যিম্মীর নিকট থেকে দশমাংশের অর্ধেক এবং হারবীর নিকট থেকে পূর্ণ দশমাংশ। হযরত উমর (রা.) তাঁর শুল্ক আদায়কারীদের প্রতি এরূপ নির্দেশই জারী করেছিলেন।***

হারবী যদি পঞ্চাশ দিরহাম সংগে নিয়ে পথ অতিক্রম করে তাহলে তার নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু যদি তারা এই পরিমাণের ক্ষেত্রে আমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করে থাকে। (তখন আমরাও গ্রহণ করবো।) কেননা তাদের নিকট থেকে নেওয়া হয় মূলতঃ পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে। মুসলিম ও যিম্মীর বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা (মুসলমানের ক্ষেত্রে) উশুলকৃত অর্থ হলো যাকাত কিংবা (যিম্মীর ক্ষেত্রে) যাকাতের দ্বিগুণ। সুতরাং নিসাব পূর্ণ হওয়া জরুরী। এটা জামেউস-সাগীর এর মাসআলা। পক্ষান্তরে (মাবসূত-এর) কিতাবুয যাকাত অধ্যায়ে রয়েছে যে, অল্প পরিমাণের ক্ষেত্রে তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না, যদিও তারা অনুরূপ পরিমাণ আমাদের নিকট হতে গ্রহণ করে থাকে। কেননা অল্প পরিমাণ সর্বদাই ছাড়যোগ্য। তাছাড়া তা নিরাপত্তার মুখাপেক্ষী নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কোন হারবী যদি দু'শ' দিরহাম সংগে নিয়ে পথ অতিক্রম করে আর তারা আমাদের নিকট হতে কি পরিমাণ গ্রহণ করে তা জানা না থাকে তবে তার নিকট থেকে দশমাংশ গ্রহণ করা হবে। কেননা উমর (রা.) বলেছেন, যদি তোমরা জানতে অক্ষম হও তবে দশমাংশ গ্রহণ কর।

আর যদি জানা যায় যে, তারা আমাদের নিকট থেকে উশরের এক-চতুর্থাংশ কিংবা উশরের অর্ধেক গ্রহণ করে, তাহলে তাঁর নিকট হতে সেই পরিমাণই গ্রহণ করা হবে। কিন্তু যদি তারা সবটুকু নিয়ে নেয় তবে সবটুকু নেয়া হবে না, কেননা তা গাদ্দারী (আর গাদ্দারী মুসলিমের জন্য শোভনীয় নয়)। আর যদি তারা কিছুই না নেয় তবে (আমাদের উশর উসূলকারীও) কিছু নেবে না।

যাতে আমাদের ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে শুল্ক নেয়া থেকে তারা বিরত থাকে।

তাছাড়া উত্তম চরিত্র প্রদর্শনের ব্যাপারে আমরাই অধিক হকদার।

ইমাম কুদুরী বলেন, হারবী যদি উসূলকারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে এবং সে তার কাছ থেকে উশর আদায় করে থাকে, অতঃপর যদি সে দ্বিতীয় বার অতিক্রম করে তবে বর্ষপূর্তির পূর্বে তার নিকট থেকে পুনঃ উশর গ্রহণ করা হবে না। কেননা প্রতিবার অতিক্রমের সময় শুল্ক গ্রহণের পরিণাম হলো তার সম্পদ বিনাশ করা। অথচ শুল্ক গ্রহণের অধিকার হল তার সম্পদের হিফাজতের কারণে।

তাছাড়া প্রথম নিরাপত্তা দানের কার্যকারিতা এখনও অব্যহত রয়েছে। বর্ষপূর্তির পর নিরাপত্তার নবায়ন হবে। কেননা তাকে এক বছরের অধিক অবস্থানের অবকাশ দেওয়া হয় না। আর বর্ষপূর্তির পর পুনরায় শুল্ক গ্রহণ দ্বারা তার সম্পদ নিঃশেষিত হবে না।

উশর আদায় করার পর যদি সে দারুল হরবে ফিরে গিয়ে একই দিনে ফিরে আসে তাহলে পুনরায় তার নিকট হতে উশর গ্রহণ করা হবে। কেননা সে নতুন নিরাপত্তা নিয়ে ফিরে এসেছে। আর দারুল হরবে গিয়ে ফিরে আসায় শুল্ক গ্রহণ সম্পদ নিঃশেষে পরিণত হয় না।

কোন যিম্মী যদি শরাব কিংবা শূকর নিয়ে পথ অতিক্রম করে তবে শরাবের উশর গ্রহণ করা হবে কিন্তু শূকরের উশর গ্রহণ করা হবে না।

শরাবের উশর গ্রহণের অর্থ হলো তার মূল্যের উশর গ্রহণ করা।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, উভয়টির উশর গ্রহণ করা হবে না। কেননা (মুসলমানের কাছে) এ দু'টির কোন মূল্য নেই।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, উভয়টিরই উশর গ্রহণ করা হবে। কেননা সম্পদ হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের নিকট উভয়টিই সমান।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, যদি উভয়টি এক সংগে নিয়ে অতিক্রম করে তাহলে উভয়টির উশর গ্রহণ করা হবে। সম্ভবতঃ তিনি শূকরকে শরাবের অনুগামী ধরেছেন। কিন্তু যদি উভয়টিকে আলাদা ভাবে নিয়ে যায় তবে শরাবের উশর নেয়া হবে কিন্তু শূকরের উশর নেয়া হবে না।

যাহিরী রিওয়ায়াত মুতাবিক এই পার্থক্যের কারণ এই যে, মূল্য নির্ভর বস্তু মূল বস্তুর হুকুম রাখে। আর শূকর এই শ্রেণীভুক্ত।

পক্ষান্তরে সমতূল্য বস্তুর ক্ষেত্রে মূল্য মূল বস্তুর হুকুম রাখে না। আর শরাব এই শ্রেণীভুক্ত।

তাছাড়া শুল্ক গ্রহণের অধিকার বর্তে হেফাজতের জন্য। আর মুসলমান সিরকায় রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে তার নিজস্ব শরাব সংরক্ষণ করতে পারে। সুতরাং অন্যের শরাবও সে সংরক্ষণ করেতে পারবে। পক্ষান্তরে নিজস্ব মালিকানায় শূকর সে সংরক্ষণ করতে পারে না। বরং ইসলাম গ্রহণের সংগে সংগে তা ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব। সুতরাং অন্যের শূকরও সে সংরক্ষণ করতে পারবে না।

তাগলাবী গোত্রের কোন শিশু বা স্ত্রীলোক যদি সম্পদ নিয়ে অতিক্রম করে, তবে শিশুর (সম্পদের) উপর কোন শুল্ক আরোপ করা হবে না। পক্ষান্তরে স্ত্রী লোকের (সম্পদের) উপর ঐ পরিমাণ শুল্ক আরোপ করা হবে, যা তাদের পুরুষ লোকের উপর আরোপ করা হয়। এর কারণ আমরা গবাদি পশুর ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি।

যে ব্যক্তি উশর উশুলকারীর সম্মুখ দিয়ে একশ' দিরহাম নিয়ে অতিক্রম করলো এবং একথা জানালো যে, তার ঘরে আরও একশ' দিরহাম রয়েছে এবং সেটার বর্ষপূর্তি হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় যে একশ' দিরহাম নিয়ে সে যাচ্ছে, তার যাকাত উসূল করা হবে না। কেননা তা নিসাব পরিমাণের কম। আর তার ঘরে যা আছে, সেটা উশর আদায়কারীর নিরাপত্তাধীনে আসেনি।

যদি সে অন্যের প্রদত্ত[৩] *পুঁজি রূপে দু'শ' দিরহাম নিয়ে যায়, তবে তার নিকট থেকে উশর উসূল করা হবে না।* কেননা সে যাকাত আদায় করার অনুমতিপ্রাপ্ত নয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *মুদারাবা-এর ক্ষেত্রেও একই হুকুম।* অর্থাৎ মুদারাবা[৪] ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তি যদি উশর উশুলকারীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করে (তবে উক্ত মাল থেকে উশর উসূল করা হবে না।)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রথমে বলতেন যে, উশর উসূলকারী মুদারাবার মাল থেকে উশর উসূল করবে। কেননা (পুঁজির উপর) মুদারিব-এর হক অধিক দৃঢ়। এ জন্যই পুঁজিদাতা ব্যবসার কোন ক্ষেত্রে তাকে বাধা দিতে পারে না। যখন পুঁজির অর্থ ব্যবসায়ের পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সুতরাং সে মালিকের স্থলবর্তী হয়ে যাবে।

পরবর্তীতে তিনি কুদূরীতে উল্লেখিত মতামতের দিকে রুজু করেছেন, আর এ-ই সাহেবাইনেরও মত।

---

৩. যদি মালিক কাউকে ব্যবসা করার জন্য এই শর্তে পুঁজি দান করে যে, মুনাফা সবটুকু মালিকের হবে। নিযুক্ত ব্যক্তি মুনাফার কোন অংশ পাবে না। এই ধরনের পুঁজিকে 'ফিকাহর' পরিভাষায় بضاعة (বা প্রদত্ত পুঁজি) বলে।

৪. মুদারাবা অর্থ লভ্যাংশ ভিত্তিক চুক্তি, যাতে পুঁজি একজনের এবং শ্রম অন্যজনের হয় আর নিযুক্ত ব্যক্তি তথা মুযারিব মুনাফার নির্ধারিত অংশ লাভ করবে।

কেননা প্রকৃত পক্ষে সে উক্ত পুঁজির মালিক নয়। এবং যাকাত আদায়ের ব্যাপারে মালিকের নায়েব বা স্থলবর্তীও নয়। কিন্তু যদি পুঁজির সংগে এই পরিমাণ মুনাফা থেকে থাকে, যাতে তার অংশ নিসাব পরিমাণ পৌছে, তবে তার নিকট হতে যাকাত গ্রহণ করা হবে। কেননা সে তো তার মালিক।

ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত কোন দাস যদি দু'শ' দিরহাম নিয়ে অতিক্রম করে এবং তার উপর ঋণের কোন দায় না থাকে, তবে তার নিকট থেকে উশর গ্রহণ করা হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আমি জানি না ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ সিদ্ধান্ত থেকে রুজূ করেছেন কিনা। তবে মুদারাবা-এর ক্ষেত্রে তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্যের কিয়াস তো এই যে, তার নিকট থেকে উশর গ্রহণ করা হবে না। আর এ-ই সাহেবাইনের মত। কেননা, তার অধীনে যে সম্পদ রয়েছে, তার মালিক তার মনিব। তার শুধু ব্যবসা পরিচালনার অধিকার রয়েছে। সুতরাং সে মুদারিবের মত হয়ে গেল।

আর উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের কারণ হিসাবে বলা হয় যে, দাস নিজের জন্যই যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ কারণেই কোন দায়-দায়িত্ব মনিবের দিকে রুজূ হয় না সুতরাং সে নিজেই নিরাপত্তা লাভের মুখাপেক্ষী। পক্ষান্তরে মুদারিব নায়েব বা স্থলবর্তী রূপে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাই দায়-দায়িত্ব পুঁজিদাতার দিকে রুজূ হয়। তাই পুঁজি দাতাই হচ্ছে নিরাপত্তার মুখাপেক্ষী। সুতরাং মুদারবের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পূর্ব সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের অর্থ অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

তবে অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের সংগে তার মনিবও যদি উপস্থিত থাকে তাহলে মনিবের নিকট হতে উশর গ্রহণ করা হবে। কেননা (আসলে) মালিকানা তো তারই। কিন্তু দাসের উপর যদি তার সম্পদ বেষ্টনকারী ঋণের দায় থাকে, তাহলে উশর নেয়া হবে না। কেননা তার মালিকানা নেই কিংবা তার সম্পদ দায়বদ্ধ।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার কেউ যদি তাদের নিয়োগকৃত عاشر এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করে আর সে তার কাছ থেকে উশর গ্রহণ করে থাকে, তবে বৈধ সরকারের আশের (عاشر) তার কাছ থেকে দ্বিতীয় বার যাকাত উসূল করবে।

অর্থাৎ যখন সে বৈধ শাসকের নিয়োগকৃত عاشر এর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করবে। কেননা, ত্রুটি তার পক্ষ থেকেই হয়েছে, যেহেতু সে খারিজী عاشر এর সম্মুখ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করেছে।

খনিজ-সম্পদ ও প্রোথিত-সম্পদ

খারাজী কিংবা উশরী ভূমিতে প্রাপ্ত স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহ, সীসা, কিংবা তামা জাতীয় খনিজ দ্রব্য পাওয়া গেলে তাতে খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) ওয়াজিব।

এ আমাদের মাযহাব। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এ সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রাপকের উপর কোন কিছু ওয়াজিব নয়।

কেননা, তা মালিকানা মুক্ত সম্পদ, সে সর্বাগ্রে তার অধিকার লাভ করেছে, যেমন শিকারের হুকুম। তবে খনিজদ্রব্য যদি স্বর্ণ বা রৌপ্য হয় তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু এক মত অনুযায়ী তিনি এ ক্ষেত্রে বর্ষপূর্তির শর্ত আরোপ করেননি। কেননা এতো সম্পূর্ণ বর্ধিত সম্পদ। আর বর্ষপূর্তির শর্তারোপ করা হয় সম্পদ বর্ধিত হওয়ার জন্য।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ –ভূ-গর্ভস্থ সম্পদের উপর এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

হাদীছে ব্যবহৃত رِكَازٌ[১] শব্দটি رکز ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ স্থাপিত সম্পদ। সুতরাং খনিজদ্রব্যের উপরও শব্দটি প্রযুক্ত হবে।

তাছাড়া এই কারণেও যে, খনি-অঞ্চলটি কাফিরদের দখলে ছিলো, তা বিজিত রূপে আমাদের হাতে এসেছে। সুতরাং সেটা গনীমতে গণ্য হবে। আর গনীমতের মধ্যে পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

শিকারের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা কখনো কারো দখলে ছিলো না।

অবশ্য তাতে মুজাহিদদের কবজা হলো নীতিগত।[২] কেননা, তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভূ-পৃষ্ঠের উপর। আর প্রকৃত পক্ষে কবজা হাসিল হয়েছে খনিজ উত্তোলনকারীর। তাই পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আমরা নীতিগত অবস্থার বিষয়টি বিবেচনা করেছি আর অবশিষ্ট চারভাগের ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করেছি। অতএব এতে উত্তোলনকারী-এর মালিক হবে।

---

১. ভূ-গর্ভ হতে উদ্ধারকৃত সম্পদের জন্য তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা كنز - معدن ও ركاز - ١ كنز মানুষ কর্তৃক প্রোথিত সম্পদ, معدن ভূ-গর্ভে আল্লাহ্ যে সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। আর ركاز শব্দটি উভয়টির জন্যই ব্যবহৃত হয়।

২. এটা মূলতঃ এক প্রচ্ছন্ন প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন এই যে, যদি প্রাপ্ত খনিজদ্রব্য গনীমত শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে এবং এ কারণেই তাতে বায়তুলমালের অনুকূলে পঞ্চমাংশ হক সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তাহলে তো অবশিষ্ট চারভাগে যোদ্ধাদের হক সাব্যস্ত হওয়া দরকার। কেননা এটাই গনীমতের নিয়ম।

যদি নিজের বাড়ীর সীমানার ভিতরে কোন খনিজ-সম্পদ পায় তাহলে তাতে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, তাতে পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। কেননা আমরা যে হাদীছ বর্ণনা করেছি, তা ব্যাপক।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, এটা ভূমির সংগে যুক্ত ভূমির অংশ বিশেষ। আর ভূমির অন্যান্য অংশের উপর কোন কিছু ধার্য নেই। সুতরাং এটার উপরও কিছু ধার্য হবে না। কেননা (হুকুম ও বিধানের ক্ষেত্রে) এক অংশ সমষ্টির বিপরীত হয় না।

মাটিতে পুঁতে রাখা সম্পদের হুকুম এর বিপরীত। কেননা তা ভূমির সংগে যুক্ত ও মিশ্রিত নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি নিজের জমিতে পেয়ে থাকে তাহলে সে সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে দু'টি বর্ণনা রয়েছে।[৩]

একটি বর্ণনা হিসাবে অর্থাৎ জামেউস্-সাগীরের বর্ণনা হিসাবে (বাড়ী ও সাধারণ জমির মাঝে) পার্থক্যের কারণ এই যে, বাড়ীর মালিকানা আর্থিক দায়মুক্ত। কিন্তু জমির মালিকানা তদ্রূপ নয়। এ কারণেই জমির উপর উশর বা খারাজ ওয়াজিব হয় কিন্তু বাড়ীর উপর হয় না।

যদি জমিতে অবস্থিত অর্থাৎ প্রোথিত কোন সম্পদ লাভ করে তবে সকলের মতেই তাতে খুমুস ওয়াজিব হবে।

আমাদের ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদীছটি হলো এর দলীল। কেননা হাদীছে উল্লেখিত ركاز শব্দটি প্রোথিত সম্পদের উপরও প্রযোজ্য হয়। কেননা তাতে ركز বা স্থায়িত্বের অর্থ বিদ্যমান রয়েছে।

তবে যদি তাতে ইসলামী আমলের ছাপ থাকে, যেমন কালিমা শাহাদাত উৎকীর্ণ থাকলো, তাহলে তা লুকতাহ (হারানো জিনিসের) পর্যায়ভুক্ত হবে। আর তার বিধান যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি তাতে জাহিলী যুগের ছাপ থাকে, যেমন তাতে মূর্তি ইত্যাদি উৎকীর্ণ থাকলো, তবে পূর্ব বর্ণিত কারণে সর্বাবস্থায়[৪] তাতে খুমুস ওয়াজিব হবে।

যদি জাহিলী যুগের প্রোথিত সম্পদ মালিকানামুক্ত (পতিত) ভূমিতে পেয়ে থাকে তাহলে এক-পঞ্চমাংশের অবশিষ্ট চার ভাগ প্রাপকের হবে। কারণ, তারপক্ষ থেকে সংরক্ষণ পূর্ণ হয়েছে। কেননা, যোদ্ধাদের তো এর উপস্থিতি সম্পর্কে জানা ছিলো না। সুতরাং সে-ই এটার নিরংকুশ মালিকানা লাভ করবে। অর্থাৎ নিজের জমিতে হোক কিংবা অন্যের জমিতে।

---

৩. 'মাবসূত' এর বর্ণনা মতে জমিতে প্রাপ্ত খনিজ দ্রব্যের উপরও খুমুস ওয়াজিব হবে না, যেমন বাড়িতে প্রাপ্ত খনিজ দ্রব্যের উপর হয় না। কিন্তু জামে 'সগীরের বর্ণনা মতেও ওয়াজিব হবে। সুতরাং আলোচ্য আর্থিক দায়ও অনুরূপ হবে।

৪. অর্থাৎ নিজের জমিতে হোক কিংবা অন্যের জমিতে।

আর যদি মালিকানাধীন ভূমিতে পেয়ে থাকে, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে একই হুকুম হবে। কেননা অধিকার লাভ হয় পূর্ণ সংরক্ষণের মাধ্যমে। আর তা তার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে শাসকের পক্ষ হতে জমিটি প্রথমে যার নামে দেশ জয়ের শুরুতে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে, সে-ই এর মালিক হবে। কেননা প্রথমে তারই কবজা এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর তা হলো নির্দিষ্ট কবজা। সুতরাং এই কবজার কারণে সে ভূ-গর্ভস্থ সম্পদের মালিক হবে। যদিও তার কবজা ভূ-পৃষ্ঠের উপরে সম্পন্ন হয়েছে। যেমন কেউ একটি মাছ শিকার করল আর তার পেটে একটি মুক্তা পাওয়া গেলো।

অতঃপর ঐ জমি অন্যের কাছে বিক্রি করার কারণে প্রোথিত সম্পদ তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে না। কেননা তা মাটির নীচে রক্ষিত আমানত। খনিজ দ্রব্যের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা যমীনের অংশ বিশেষ। সুতরাং তা ক্রেতার মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়ে যাবে।

প্রথমে যার নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যদি তার পরিচয় না পাওয়া যায়, তাহলে ইসলামী আমলের যে দূরতম মালিকের সন্ধান পাওয়া যায়, তার হাতেই এর মালিকানা সোর্পদ করা হবে। ফকীহগণ এ মত-ই ব্যক্ত করেছেন।

যদি ছাপ অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে যাহেরী মাযহাব অনুসারে সেটাকে জাহিলী যুগের বলে ধরা হবে। কেননা তা-ই মূল অবস্থা।

আর কেউ কেউ বলেছেন আমাদের এ যুগে সেটি ইসলামী আমলেরই ধরা হবে। কেননা ইসলামী যুগও প্রবীণ হয়ে গিয়েছে। (সুতরাং দৃশতঃ তা ইসলামী যুগেরই প্রোথিত)

যে ব্যক্তি দারুল হারবে নিরাপত্তা নিয়ে বৈধভাবে প্রবেশ করলো এবং তাদের কারো বাড়ীতে ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ লাভ করলো, সে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে।

এটা করবে 'বিশ্বাস ঘাতকতা' থেকে বেঁচে থাকার জন্য। কেননা, বাড়ীতে যা কিছু আছে তা বাড়ীর মালিকের জন্যই নির্ধারিত।

আর যদি মালিকানামুক্ত মাঠে পেয়ে থাকে তবে সেটা তারই। কেননা, তা কারো ব্যক্তি মালিকানাধীন নয়। সুতরাং তা হস্তগত করা বিশ্বাস ভংগ বলে গণ্য হবে না। আর তাতে কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা সে গোপনে হস্তগতকারীর ন্যায়, মুজাহিদের মত হস্তগতকারীর ন্যায় নয়।

ফিরোযা পাথর যা পাহাড়ে পাওয়া যায়, তাতে খুমুস ওয়াজিব নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : لَاخُمُسَ فِى الْحَجَرِ –পাথরের উপর খুমুস নেই।

পারদের ক্ষেত্রে খুমুস ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পরবর্তী মত। এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এরও এই মত। এতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে।

মুক্তা ও আম্বরের উপর খুমুস নেই।

এটা ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এ দু'টিতে এবং সমুদ্র থেকে আহরিত সকল ভূষণের উপর খুমুস ওয়াজিব। কেননা উমর (রা.) আম্বর হতে খুমুস গ্রহণ করেছেন। সাহেবাইনের বক্তব্য এই যে, সমুদ্রের তলদেশে বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং তা থেকে লব্ধ বস্তু স্বর্ণ-রৌপ্য হলেও গনীমত রূপে গণ্য হবে না।

আর উমর (রা.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতের ক্ষেত্র হলো সমুদ্র-নিক্ষিপ্ত বস্তু। আর সে ক্ষেত্রে আমাদেরও এ মত।

মাটিতে পুঁতে রাখা সামানপত্র[৫] *পাওয়া গেলে তা ঐ ব্যক্তিরই হবে, যে পেয়েছে। আর তাতে খুমুস ধার্য হবে।* অর্থাৎ মালিকানামুক্ত পতিত ভূমিতে পাওয়া গেছে। কেননা স্বর্ণ-রৌপ্যের মত এটাও মালে গনীমতগ্রস্ত। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

---

৫. অর্থাৎ স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যতীত অস্ত্র-শস্ত্র এবং গৃহের তৈজষপত্র ইত্যাদি।

ফসল ও ফলের যাকাত

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, অল্প হোক কিংবা বেশী, ভূমি থেকে উৎপাদনের উপর উশর ওয়াজিব হবে –প্রবাহিত পানি দ্বারা সিঞ্চিত হোক, কিংবা বৃষ্টির পানি দ্বারা। কিন্তু বাঁশ, জ্বালানী কাষ্ঠ ও ঘাসের উপর উশর নেই।[১]

সাহেবাইন বলেন, যে সকল ফল দীর্ঘদিন সংরক্ষিত থাকে সেগুলো পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হলে তাতে শুধু উশর ওয়াজিব হবে।

এক ওয়াসাক হলো নবী করীম (সা.)-এর যুগে প্রচলিত সা'আ-এর পরিমাণে ষাট সা'আ। মোটকথা দু' ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছেঃ প্রথমতঃ নিসাবের শর্ত আরোপে, দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘস্থায়িত্বের শর্তারোপে।

প্রথম বিষয়ে সাহাবেইনের দলীল হল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ ঃ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ –পাঁচ ওয়াসাকের কমের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব নয়। তাছাড়া যেহেতু এ-ও যাকাত, সুতরাং সচ্ছলতা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এ ক্ষেত্রেও 'নিসাব' -এর শর্ত আরোপ করা হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَفِيْهِ الْعُشْرُ –ভূমি যা উৎপন্ন করে, তাতে উশর ওয়াজিব হবে। এতে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

সাহেবাইনের বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা এই যে, তাতে বাণিজ্য দ্রব্যের যাকাতের কথা বলা হয়েছে। কেননা, তারা ওয়াসাকের মাপে বেচা-কেনা করতো, আর এক ওয়াসাকের মূল্য সাধারণতঃ চল্লিশ দিরহাম হতো।

আর উশরের ক্ষেত্রে তো ভূমির মালিক হওয়ারই শর্ত নেই।[২] সুতরাং মালিকের অবস্থা তথা সচ্ছলতার শর্ত আরোপের তো প্রশ্নই আসে না।

এ কারণেই বর্ষপূর্তির শর্ত আরোপ করা হয় না। কেননা এ শর্তের উদ্দেশ্য হলো বৃদ্ধির সুযোগ। অথচ এটা তো সম্পূর্ণই বর্ধিত সম্পদ।

---

১. অর্থাৎ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াই যা এক বছরের মত থাকে, যেমন চাল, গম, কুমড়া ইত্যাদি; অতএব পচনশীল জিনিসে উশর ওয়াজিব হবে না।

২. এ কারণেই ওয়াকফী জমিতে ও মুকাতাবের যমীনে উশর ওয়াজিব হয়।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সাহেবাইনের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ ঃ لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ –সবজী জাতীয় দ্রব্যের উপরে সাদাকা নেই। এখানে সর্বসম্মতিক্রমেই সাদাকা দ্বারা যাকাত নিষেধ করা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং উশরই উদ্দেশ্য হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ।

সাহেবাইনের বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা হলো ঐ সাদাকা, যা শুল্ক আদায়কারী গ্রহণ করে থাকে। সেক্ষেত্রে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও এ হাদীছের উপর আমল করে থাকেন।

তাছাড়া যৌক্তিক প্রমাণ এই যে, ভূমি এমন ফসলও উৎপন্ন করে, যা দীর্ঘসময় সংরক্ষিত থাকে না। আর উশর ওয়াজিব হওয়ার কারণ ভূমির ফলনশীলতা। এ কারণেই তো এ ধরনের ভূমিতে খারাজ ওয়াজিব হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে বাঁশ, জ্বালানী কাষ্ঠ ও ঘাস সাধারণতঃ বাগানে উৎপন্ন করা হয় না, বরং এগুলো থেকে বাগানকে পরিষ্কার রাখা হয়। এমন কি যদি কেউ বাঁশঝাড় কিংবা জ্বালানী বৃক্ষ কিংবা ঘাসের ক্ষেত লাগায়, তাহলে তাতে উশর ওয়াজিব হবে।

উল্লেখিত বাঁশ দ্বারা সাধারণ বাঁশ উদ্দেশ্য; তবে ইক্ষু কিংবা জোয়ারের উশর ওয়াজিব হবে। কেননা এগুলোর জন্য ভূমিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করা হয়।

খেজুর শাখা ও খড়ের হুকুম এর বিপরীত। কেননা এ গুলোর ক্ষেত্রে শস্য ও ফলই হলো উদ্দেশ্যে, বৃক্ষ বা খড় উদ্দেশ্য নয়।

ইমাম কুদুরী বলেন, ***বালতি দ্বারা (কুয়া থেকে) এবং পানি তোলার চর্কি দ্বারা কিংবা উটনীর পিঠে বয়ে আনা পানি দ্বারা যে ক্ষেতে সেচ দেয়া হয়েছে, তাতে উভয় মত অনুসারে অর্ধেক উশর ওয়াজিব হবে।*** কেননা এ ক্ষেত্রে ব্যয় অধিক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বৃষ্টির পানি কিংবা নালের পানি দ্বারা সেচ দেয়া জমিতে ব্যয় কম হয়ে থাকে।

যদি খালের পানি ও চর্কির পানি উভয় পানি দ্বারা সেচ দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে বছরের অধিকাংশ সময়ের বিবেচনা করা হবে। যেমন 'সায়িমা' পশুর ক্ষেত্রে।

যে সকল জিনিস ওয়াসাক দ্বারা মাপা হয় না, যেমন জাফরান ও তুলা, এগুলো সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, যখন এ গুলোর মূল্য ওয়াসাক দ্বারা পরিমাপকৃত সর্বনিম্ন মূল্যের জিনিসের পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হয়ে যাবে, তখন তাতে উশর ওয়াজিব হবে। যেমন আমাদের যুগে জোয়ার রয়েছে।[৩]

কেননা শরীআত নির্ধারিত পরিমাপ এখানে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, সুতরাং তার মূল্য বিবেচনা করা হবে; যেমন ব্যবসা সামগ্রীর ক্ষেত্রে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উৎপন্ন দ্রব্য যখন ঐ জাতীয় বস্তু পরিমাপ করার সর্বোচ্চ পরিমাণের পাঁচগুণ হয়ে যাবে, তখন তাতে উশর ওয়াজিব হবে। সুতরাং তুলার ক্ষেত্রে পরিমাণ

৩. জোয়ার হচ্ছে ওয়াসাক (বা পাত্র) দ্বারা পরিমাপকৃত সর্ব নিম্ন মূল্যের জিনিস সুতরাং জাফরানের মূল্য যখন পাঁচ ওয়াসাক জোয়ারের সমপরিমাণ হয়ে যাবে, তখন তাতে উশর ওয়াজিব হবে।

ধরা হবে পাঁচ গাঁট, প্রতি গাঁট হবে তিনশত مَنّ তদ্রূপ জাফরানের ক্ষেত্রে হবে পাঁচ مَنّ [৪] (প্রায় পাঁচ সের) কেননা ওয়াসাক দ্বারা পরিমাপ নির্ধারণের কারণ এই ছিলো যে, তা ছিল ঐ জাতীয় দ্রব্য মাপের সর্বোচ্চ প্ররিমাণ।

মধু যদি উশরী যমীন থেকে আহরণ করা হয়, তাহলে তাতে উশর ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, উশর ওয়াজিব হবে না। কেননা তা প্রাণী থেকে উৎপন্ন। সুতরাং তা হল রেশমের সমতুল্য।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ ঃ فِى الْعَسَلِ الْعُشْرُ –মধুতে উশর ওয়াজিব। তাছাড়া এ কারণে যে, মৌমাছি বিভিন্ন ফল ও ফুল থেকে আহরণ করে, আর সেগুলোতে যেহেতু উশর আছে, সেহেতু তা থেকে উৎপন্ন পদার্থের উশর হবে। রেশম কীটের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সে পাতা তক্ষণ করে আর তাতে উশর নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মধু অল্প হোক বা বেশী, তাতে উশর ওয়াজিব হবে। কেননা, তিনি এতে কোন নিসাব ধার্য করেন না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মধুর ক্ষেত্রে তাঁর নীতি অনুযায়ী তিনি পাঁচ ওয়াসাকের মূল্য গণ্য করেন।

তাঁর পক্ষ থেকে এমন মতও বর্ণিত হয়েছে যে, মোশক পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাতে কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা বনূ শাবাবা গোত্র সম্পর্কিত হাদীছে বর্ণিত আছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এই অনুপাতেই উশর আদায় করতো।

তাঁর পক্ষ থেকে পাঁচ مَنّ এর কথাও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে পাঁচ 'ফারাক'-এর রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। প্রতি ফারাক হলো ৩৬ রতল। [৫] কেননা এটা হলো মধু মাপার সর্বোচ্চ পরিমাণ।

তদ্রূপ ইক্ষু সম্পর্কেও (ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে)।

পাহাড়ে যে সকল মধু বা ফলফলাদি পাওয়া যায়, তাতেও উশর ওয়াজিব।

আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত একটি মতে তাতে উশর ওয়াজিব হবে না। কেননা, তাতে উশর ওয়াজিব হওয়ার কারণ বিদ্যমান নেই। আর তা হলো ফলনশীল ভূমি।

জাহিরী রিওয়ায়াতের দলীল এই যে, ফলনশীল ভূমির যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ ফললাভ করা, তাতো অর্জিত হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ভূমির উৎপন্ন যে সকল ফসলে উশর ওয়াজিব হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক এবং হাল-বলদের খরচ হিসাব করা হবে না। কেননা নবী (সা.) ব্যয় ভারের তারতম্যের কারণে ওয়াজিব পরিমাণে তারতম্যের হুকুম দিয়েছেন। সুতরাং ব্যয়ভার বাদ দেয়ার কোন অর্থ নেই।

---

৪. مَن একটি পুরোনো হিসাব, যার পরিমাণ দুই রতল বা পনের ছটাক।

৫. প্রতি রতল ইংলিশ এক পাউণ্ড বা সাড়ে সাত ছটাক।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন ঃ *কোন তাগলাবী যিম্মীর উশরী জমীন থাকলে তার উপর দ্বিগুণ উশর ধার্য করা হবে।*

সাহাবায়ে কিরামের ইজমার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাগলাবী যিম্মী মুসলমানের নিকট হতে কোন জমি খরিদ করলে তাতে এক উশরই ওয়াজিব হবে। কেননা তার মতে মালিকের পরিবর্তনের কারণে জমির আর্থিক দায় পরিমাণে পরিবর্তিত হয় না।

অতঃপর কোন যিম্মী যদি তাগলাবীর নিকট থেকে উক্ত জমি খরিদ করে, তবে সকলের মতেই জমির আর্থিক দায় একই অবস্থায় থাকবে। কেননা কোন অবস্থায় যিম্মির উপর দ্বিগুণ ধার্য করা যায়। যেমন, উশর উত্তলকারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার সময় মুসলমানের নিকট থেকে যা নেয়া হয়, তার নিকট থেকে তার দ্বিগুণ নেয়া হয়।

তদ্রূপ একই হুকুম বহাল থাকবে যদি ঐ জমি কোন মুসলমান তার নিকট থেকে খরিদ করে কিংবা তাগলাবী নিজেই যদি ইসলাম গ্রহণ করে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত, চাই হুকুমের এই দ্বিগুণতা পূর্ব থেকে চলে আসুক,[৬] কিংবা নতুনভাবে আরোপিত হোক।[৭] কেননা দ্বিগুণতাই উক্ত জমির আর্থিক দায় রূপে সাব্যস্ত হয়ে গেছে, সুতরাং উক্ত জমি তার নিজস্ব আর্থিক দায় সহই মুসলমানের মালিকানা স্থানান্তরিত হবে, যেমন খারাজের ক্ষেত্রে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, পুনরায় এক উশরের দিকে ফিরে আসবে। কেননা দ্বিগুণ করণের কারণ দূরীভূত হয়ে গেছে।

মাবসূত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এটাই মুহম্মদ (র.)-এর অভিমত।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত বর্ণনার ক্ষেত্রে অনুলিপির বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, দ্বিগুণ তা বহাল রাখার ক্ষেত্রে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সংগে একমত। তবে পূর্ব থেকে চলে আসার দ্বিগুণতার ক্ষেত্রেই শুধু তাঁর মত প্রযুক্ত হতে পারে। কেননা তাঁর মাযহাব অনুযায়ী নতুন ভাবে আরোপিত দ্বিগুণতা সাব্যস্ত হতে পারে না। কারণ, এতে আর্থিক দায় পরিবর্তিত হয় না।

কোন মুসলমান যদি তার (উশরী) যমীন কোন খৃষ্টানের নিকট বিক্রি করে,

অর্থাৎ তাগলিবী ছাড়া অন্য কোন যিম্মীর নিকট, *আর উক্ত খৃষ্টান বিক্রিত জমির দখল গ্রহণ করে, তাহলে তার উপর খারাজ ওয়াজিব হবে।*

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। কেননা, খারাজই কাফিরের অবস্থার উপযুক্ত।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তার উপর দ্বিগুণ উশর ওয়াজিব হবে। তবে খারাজের ব্যয় ক্ষেত্রে তা ব্যয় করা হবে। এ সিদ্ধান্ত তিনি দিয়েছেন তাগলিবীর উপর কিয়াস করে। কেননা, আমূল পরিবর্তনের চেয়ে এটিই হল সহজ ব্যবস্থা।

---

৬. যেমন উক্ত জমি উত্তরাধিকার সূত্রে তাগলাবীর মালিক হয়েছে।

৭. যেমন তাগলাবী উক্ত জমি কোন মুসলমানের নিকট হতে ক্রয় করেছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এটি পূর্ব অবস্থার উপর উশরী থাকবে। কেননা, এটি জমির দায় রূপে সাব্যস্ত হয়ে গেছে, সুতরাং তা পরিবর্তিত হবে না, যেমন খারাজ পরিবর্তিত হয় না।

অবশ্য এক বর্ণনা মতে গৃহীত অর্থ যাকাত-সাদাকা খাতে ব্যয় হবে। আর অন্য বর্ণনা মতে খারাজের খাতে ব্যয় হবে। উক্ত নাসরানীর নিকট হতে কোন মুসলমান যদি শোফ'আ বলে সে জমি লাভ করে কিংবা বিক্রি ফাসিদ হওয়ার কারণে তা বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া হয়, তবে তা পূর্বের মতো উশরী হয়ে যাবে।

প্রথম সুরতে কারণ এই যে, বিক্রয়ের ব্যাপারটি শুফার দাবীদারের দিকে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং সে যেন মুসলমানের নিকট থেকেই ক্রয় করেছে।

দ্বিতীয় সুরতে কারণ এই যে, ত্রুটির কারণে বিক্রয় প্রত্যাহার করা এবং বিক্রিত বস্তু ফেরত দানের মাধ্যমে ধরে নেয়া হবে যেন 'বিক্রয়' সংঘটিতই হয়নি।

তাছাড়া আরেকটি কারণ এই যে, যেহেতু (ত্রুটিপূর্ণ বিক্রয়ের কারণে) বিক্রিত বস্তুটি ফেরত দান করা কর্তব্য, সেহেতু এই ক্রয়ের কারণে মুসলিম বিক্রেতার হক তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোন মুসলমানের শাসক কর্তৃক বরাদ্দকৃত বাড়ী থাকে আর সে সেটিকে বাগানে পরিণত করে ফেলে, তাহলে তার উপর উশর ওয়াজিব হবে।

অর্থাৎ যদি উশরী পানি দ্বারা বাগান সেচ দিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি খারাজী পানি দ্বারা বাগানে সেচ দিয়ে থাকে তাহলে তার উপর খারাজ ধার্য হবে। কেননা এ ধরনের ক্ষেত্রে পানি সেচের সাথে আর্থিক দায় সম্পৃক্ত।

নিজস্ব বাস ভবনের জন্য মাজুসীর (অগ্নিপূজকের) উপর কোন কর নেই।[৮] কেননা উমর (রা.) বাসভবন সমূহকে করমুক্ত রেখেছেন।

যদি সে তার বাড়ী বাগানে পরিণত করে, তবে তাতে খারাজ ধার্য হবে।

এমন কি উশরী পানি দ্বারা সেচ দান করলেও। কেননা উশরের মাঝে ইবাদতের দিক বিদ্যমান থাকার কারণে তার উপর উশর ওয়াজিব করা সম্ভব নয়। তাই খারাজই নির্ধারিত হবে। আর খারাজ এক প্রকার শাস্তি, যা তার অবস্থার উপযোগী।

সাহেবাইনের নীতির উপর কিয়াসের চাহিদা হল উশরী পানির সেচের ক্ষেত্রে উশরই ওয়াজিব হবে।

তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একটি উশর ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে দু'টি উশর ওয়াজিব হবে। পূর্বে[৯] এর কারণ বর্ণিত হয়েছে।

---

৮. সকল অমুসলিমের ক্ষেত্রে একই হুকুম। বিশেষ করে মজুসীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু তারা ইসলাম থেকে সর্বাধিক দূরে।

৯. অর্থাৎ মুসলমানের নিকট হতে যিম্মীর উশরী জমি খরিদ করা সংক্রান্ত মাসআলায়।

উশরী পানি অর্থ বৃষ্টির পানি, কুয়া, ঝনার ও ঐ সকল নদনদীর পানি, যা কারো নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। আর খারাজী পানি অর্থ যে সকল খাল আজমীরা খনন করেছে জায়হুন, সাযহুন, দজলা ও ফুরাতের পানি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উশরী। কেননা এগুলো কারো রক্ষাণাবেক্ষণে নেই। যেমন, সমুদ্রের পানি।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এগুলো খারাজী পানি। কেননা এর উপর নৌকা ইত্যাদি দ্বারা পুল তৈরী করা হয়, যা তার উপর নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ।

তাগলিবী পুরুষের জমিতে যা ধার্য হয়, তাগলিবী শিশু ও স্ত্রীলোকের জমিতেও তা ধার্য হবে। অর্থাৎ উশরী জমিতে দ্বিগুণ উশর এবং খারাজী জমিতে একটি খারাজ। কেননা তাদের সংগে (এই মর্মে) সমঝোতা হয়েছিল যে, সাদাকা দ্বিগুণ করা হবে। নিছক আর্থিক দায় দ্বিগুণ করা হবে না।

সুতরাং যেহেতু মুসলিম শিশু ও নারীর উপর উশর ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাই তাগলিবী শিশু ও নারীর উপরও তা দ্বিগুণ রূপে ধার্য হবে।

উশরী জমিতে প্রাপ্ত আলকাতরা বা তেলের কূপে কিছু ধার্য করা হবে না। কেননা তা ভূমি থেকে উৎপন্ন জিনিসের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং পানির ঝরনার মতো উৎসারিত ঝরনা বিশেষ।

যদি তা খারাজী জমি থেকে উৎপন্ন হয়, তবে তার উপর খারাজ ধার্য হবে। এটা তখনই হবে, যখন আলকাতরা ও তৈল কূপের চারপার্শ্ব চাষোপযোগী হয়। কেননা, খারাজের সম্পর্ক জমির চাষোপযোগিতার সংগে।

যাকাত-সাদাকা কাকে দেয়া জাইয বা জাইয নয়

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ সম্পর্কে মূল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

সাদাকা হলো দরিদ্রদের জন্য, নিঃস্বদের জন্য সাদাকা উশুলের কাজে নিয়োজিতদের জন্য, ঐ লোকদের জন্য যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয়।[১] দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিয়োজিতদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ফরযকৃত। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাবান (৯ ঃ ৬০)।

এই হল আট প্রকার। তার মধ্য থেকে 'যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয়' সে শ্রেণীটি বাদ পড়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন। এর উপর ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ফকীর ঐ ব্যক্তি, যার সামান্য পরিমাণ জিনিস রয়েছে। আর মিসকীন ঐ ব্যক্তি, যার কিছুই নেই। এ ব্যাখ্যা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত। কেউ কেউ এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন।

উভয়টির যুক্তি রয়েছে। আবার এরা স্বতন্ত্র দুই শ্রেণী কিংবা একই শ্রেণী। ওসীয়ত অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ্ এ বিষয়ে আলোচনা করবো।

যাকাত উসূলের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিকে শাসক তার কাজের পরিমাণ অনুসারে পরিশ্রমিক প্রদান করবেন। এবং এই পরিমাণ দান করবেন, যা তার ও তার অধীনস্তদের (জীবিকার) জন্য যথেষ্ট হয়। তা অষ্টমাংশে সীমাবদ্ধ নয়। ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।[২]

কারণ সে যাকাতের হকদার হয়েছে দায়িত্ব পালনের সূত্রে। এ জন্যই নিয়োজিত ব্যক্তি ধনী হলেও তা গ্রহণ করতে পারে। তবে যেহেতু তাতে যাকাতের কিঞ্চিৎ ছাপ রয়েছে, সেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খান্দানকে ময়লার সন্দেহ থেকেও পবিত্র রাখার জন্য হাশেমী পরিবারের কোন নিয়োজিত ব্যক্তি যাকাতের অর্থ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবে না।

---

১. ইসলাম গ্রহণের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কিছু সংখ্যক অমুসলমানকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা হতো।

২. তাঁর মতে প্রদত্ত অর্থ অষ্টমাংশের বেশী হতে পারবে না। কেননা তিনি বলেন, যাকাতের মাল ভাগ করে কুরআনে বর্ণিত আট শ্রেণীকে দান করতে হবে।

পক্ষান্তরে মর্যাদার যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তি হাশেমীর সমতুল্য নয়। সুতরাং তার ক্ষেত্রে সামান্য সন্দেহ বিবেচ্য নয়।

দাসমুক্তির অর্থ এই যে, মুকাতাবকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভের জন্য সাহায্য করা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে।

ঋণগ্রস্ত হলো ঐ ব্যক্তি, যার উপর ঋণ রয়েছে এবং সে ঋণের পরিমাণ থেকে বেশী নিসাবের মালিক নয়।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে غارم হলো ঐ ব্যক্তি, যে দু'জনের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কিংবা দুই গোত্রের মাঝে শত্রুতা বিদূরিত করতে গিয়ে আর্থিক দায় বহন করছে।

আল্লাহ্র রাস্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি ইমাম আবূ ইউসুফের মতে ঐ মুজাহিদ, যে সম্পদহীন হয়ে পড়ে। কেননা নিঃশর্তভাবে (فى سبيل الله) ব্যবাহার করলে সাধারণতঃ মুজাহিদকেই বুঝায়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, এর অর্থ হজ্জের সফরে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি। কেননা, বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তার উট আল্লাহ্র রাস্তায় দান করার নিয়ত করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর তাকে কোন হজ্জ যাত্রীকে আরোহণ করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ধনী মুজাহিদকে দান করা যাবে না। কেননা দরিদ্ররাই হলো যাকাতের হকদার।

ابن السبيل (মুসাফির) অর্থ ঐ ব্যক্তি, নিজের আবাসস্থলে যার অর্থ রয়েছে; কিন্তু সে অন্য স্থানে রয়েছে, যেখানে তার হাতে কিছুই নেই।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***এই (আটটি) শ্রেণীগুলো যাকাতের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্র। সুতরাং মালিকের ইখতিয়ার আছে যাকাতের অর্থ প্রতিটি শ্রেণীকে প্রদান করার কিংবা যে কোন একটি শ্রেণীর মধ্যে দান করার।***

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, প্রত্যেক শ্রেণীর (অন্ততঃ) তিনজনকে প্রদান না করলে যাকাত আদায় হবে না। কেননা, لام অব্যয়ের দ্বারা সম্বন্ধের মাধ্যমে অধিকার সাব্যস্ত হয়।

আমাদের দলীল এই যে, এই সম্বন্ধ নিছক এ কথা বর্ণনা করার জন্য যে, এরা হলো যাকাত প্রদানের ক্ষেত্র; অধিকার সাব্যস্ত করণের জন্য নয়। কেননা এতো জানা বিষয় যে, যাকাত হলো আল্লাহ্ তা'আলার হক। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে উপরোক্ত শ্রেণীগুলো যাকাতের ক্ষেত্র হয়েছে। সুতরাং ক্ষেত্রের বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। আর আমরা যে মত গ্রহণ করেছি, তা উমর ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত।

কোন যিম্মীকে যাকাত প্রদান করা জাইয নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মু'আয (রা.)-কে বলেছেন ঃ خُذها مِن أغنيائِهِم وَرُدَّها الى فُقَرائِهِم –যাকাত মুসলমানদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করো এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে ফিরিয়ে দাও।

যাকাত ছাড়া অন্যান্য সাদাকা তাকে দেয়া যাবে।[৩]

যাকাতের উপর কিয়াস করে ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, (অন্যান্য সাদাকাও যিম্মীকে) দেয়া যাবে না। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে প্রাপ্ত একটি বর্ণনা।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ ঃ تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا –সকল ধর্মের লোককে সাদাকা প্রদান করো।

মু'আয (রা.)-এর হাদীছ না হলে যাকাত প্রদানও আমরা জাইয বলতাম।

যাকাতের অর্থ দ্বারা মসজিদ তৈরী করা যাবে না এবং তা দ্বারা মাইয়েতের কাফন দেওয়া যাবে না। কেননা এখানে মালিক বানানো অনুপস্থিত। অথচ এটাই যাকাত আদায়ের রুকন।

যাকাতের অর্থ দ্বারা কোন মাইয়েতের ঋণ আদায় করা যাবে না। কেননা অন্যের ঋণ আদায় করা ঋণী ব্যক্তিকে মালিক বানানো প্রমাণ করে না, বিশেষতঃ ঋণী মাইয়েতের ক্ষেত্রে।

যাকাতের অর্থ দ্বারা আযাদ করার জন্য কোন দাস ক্রয় করা যাবে না।

ইমাম মালিক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি আল্লাহ্র বাণী ঃ وَفِي الرِّقَابِ (গোলাম আযাদ করানো)-এর এ ব্যাখ্যা করেছেন।

আমাদের দলীল এই যে, এরূপ আযাদ করার দ্বারা (গোলাম থেকে) মালিকানা রহিত হয় (গোলামকে) মালিক বানানো হয় না। (অথচ মালিক বানানো যাকাতের রুকন)।

ধনীকে যাকাত দেয়া যাবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ –কোন ধনীর জন্য সাদাকা হালাল নয়।

এ নির্দেশ ব্যাপক হওয়ার কারণে এ হাদীছ মালদার মুজাহিদের ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপক্ষে আমাদের দলীল। তদ্রূপ আমাদের বর্ণিত মু'আয (রা.)-এর হাদীছও (তাঁর বিপক্ষে দলীল।)

ইমাম কুদূরী বলেন, *যাকাত আদায়কারী তার পিতা ও পিতামহকে যত উর্ধ্বতনই হোক, তদ্রূপ আপন পুত্র এবং পুত্রের পুত্রকে যত অধঃস্তনই হোক, যাকাত দিতে পারবে না।* কেননা, মালিকানার লাভালাভ তাদের মাঝে ওতপ্রোতভাবে জড়িত পূর্ণরূপে। সুতরাং মালিক বানানো সাব্যস্ত হবে না।

আপন স্ত্রীকেও দিতে পারবে না। কেননা সাধারণতঃ উপকার গ্রহণে (তাদের মাঝে) অংশীদারিত্ব রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না, উল্লেখিত কারণে।

আর সাহেবাইন বলেন, তাকে দিতে পারবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, لَكِ أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الصِّلَةِ –তোমার জন্য রয়েছে দু'টি প্রতিদান ঃ সাদাকার প্রতিদান এবং স্বজনের সহানুভূতির প্রতিদান।

---

৩. যেমন সাদকাতুল ফিতর, মান্নত ও কাফফারা ইত্যাদি।

ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর স্ত্রী ইব্ন মাস'উদ (রা.)-কে সাদাকা প্রদান সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি একথা বলেছিলেন।

আমরা এর উত্তরে বলি, আলোচ্য হাদীছ নফল সাদাকার উপর প্রযোজ্য।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***আপন মুদাব্বার, মুকাতাব এবং উম্মু ওয়ালাদকে[৪] যাকাত দিতে পারবে না।*** কেননা, এ সকল ক্ষেত্রে তামলীক (বা মালিক বানানো) অনুপস্থিত। যেহেতু দাসদাসীর যাবতীয় উপার্জন তার মনিবের। মুকাতাবের উপার্জনেও মনিবের অধিকার রয়েছে। সুতরাং পূর্ণ রূপে তাতে মালিক বানানো হয় না।

আর এমন গোলামকেও দিতে পারবে না, যার একাংশ আযাদ করা হয়েছে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। কেননা, তাঁর বিবেচনায় উক্ত গোলাম মুকাতাবের পর্যায়ভুক্ত।

আর সাহেবাইন বলেন, তাকে দেওয়া যাবে। কেননা, তাঁদের মতে স্বাধীন ঋণগ্রস্ত।

কোন ধনীর দাসকে যাকাত দিবে না। কেননা, মালিকানা তার মনিবের জন্যই সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

আর কোন ধনীর নাবালেগ সন্তানকে দিবে না। কেননা, তাকে তার পিতার সম্পদের কারণে ধনী গণ্য করা হয়। তবে সাবালক দরিদ্র সন্তানকে দেওয়া যাবে। কেননা, পিতার সচ্ছলতার কারণে তাকে মালদার গণ্য করা হয় না। যদিও (বিশেষ কোন কারণে) তার ভরণ-পোষণ তার পিতার যিম্মায় থাকে। আর ধনী লোকের স্ত্রীর হুকুম এর বিপরীত। কেননা সে নিজে দরিদ্র হলে স্বামীর সচ্ছলতার কারণে তাকে ধনী বিবেচনা করা হয় না। আর ভরণ পোষণের পরিমাণ দ্বারা সে মালদার গণ্য হবে না।

আর হাশিমী বংশের কাউকে যাকাত দিবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

يَا بَنِيْ هَاشِمٍ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ غُسَالَةَ النَّاسِ وَ اَوسَاخَهُمْ وَعَوَّضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ۔

–হে হাশিমীগণ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য মানুষের এটো পানি এবং তাদের ময়লা হারাম করেছেন এবং তার বিনিময়ে তোমাদেরকে পঞ্চম ভাগের পঞ্চমাংশ দান করেছেন।

তবে নফল দান তাদের দেয়া যাবে। কেননা এ ক্ষেত্রে সম্পদ হলো পানির মতো। ফরয আদায় করার কারণে তা ময়লা হয়ে যায়। আর নফল দান হলো শীতলতা লাভ করার জন্য পানি ব্যবহার করার মতো।

ইমাম কুদরী (র.) বলেন, ***হাশিমীগণ হলেন আলী (রা.) 'আব্বাস (রা.) জা'ফর (রা.) আকীল (রা.) ও হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা.)-এর পরিবারগণ এবং তাঁদের আযাদকৃত গোলামগণ।*** কেননা এরা সকলে হাশিম ইব্ন আবদে মুনাফ এর সংগে

---

৪. মুদাব্বার এমন গোলাম, যাকে মনিব একথা বলেছে যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ হয়ে যাবে। মুকাতাব ঐ গোলাম, যে মালিকের সাথে তার মূল্য পরিশোধের শর্তে মুক্তি পাওয়ার চুক্তি করেছে। উম্মু ওয়ালাদ এমন দাসী, যার গর্ভে মনিবের সন্তান জন্ম গ্রহণ করার কারণে মুক্তি পাওয়ার অধিকার লাভ করেছে।

সম্পৃক্ত। আর হাশিম গোত্রের পরিচয়ও তার সাথেই সম্পৃক্ত। তাদের আযাদকৃত গোলামদের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আযাদকৃত গোলাম (আবূ রাফে') একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার জন্য কি সাদাকা হালাল হবে? তিনি বললেন, না, তুমি তো আমাদের মাওলা (আযাদকৃত)।

পক্ষান্তরে কোন কুরায়শী যদি কোন নাসরানী গোলামকে আযাদ করে তবে তার নিকট হতে জিয্য়া গ্রহণ করা হবে। এবং এ ক্ষেত্রে আযাদকৃত ব্যক্তির অবস্থাই বিবেচনা করা হবে। কেননা এটাই কিয়াস ও যুক্তির দাবী। পক্ষান্তরে মনিবের সংগে যুক্ত করার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে হাদীছ দ্বারা আর হাদীছে বিশেষভাবে সাদাকাকেই উল্লেখ করা হয়েছে।[৫]

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোন ব্যক্তিকে দরিদ্র মনে করে যাকাত দিয়ে থাকে এবং পরে প্রকাশ পায় যে, সে সচ্ছল ব্যক্তি বা হাশিমী পরিবারের লোক বা কাফির, কিংবা অন্ধকারে যাকাত প্রদান করেছে, কিন্তু পরে প্রকাশ পেল যে, লোকটি তার পিতা কিংবা ভাই, তাহলে তার জন্য পুনঃ যাকাত প্রদান জরুরী নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তার জন্য পুনঃ যাকাত প্রদান জরুরী। কেননা, সুনিশ্চিত ভাবে তার ভুল প্রকাশ পেয়েছে। অথচ এ বিষয়গুলো জেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিলো। বিষয়টি পাত্র ও বস্ত্রের হুকুমের অনুরূপ হয়ে গেল।[৬]

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর দলীল হলো মা'আন ইবন ইয়াযীদ এর হাদীছ। কেননা, নবী করীম (সা.) এ প্রসংগে বলেছেন : يَا يَزِيْدُ لَكَ مَا نَوَيْتَ وَيَا مَعْنُ لَكَ مَا أَخَذْتَ
–হে ইয়াযীদ, তুমি যা নিয়্যত করেছো, তা তুমি পাবে। আর হে মা'আন, তুমি যা নিয়েছো তা তোমার

ঘটনা ছিলো এই যে, মা'আন (রা.)-এর আব্বা ইয়াযীদ-এর ওয়াকীল তাঁর সাদাকার অর্থ তার পুত্র মা'আন-কে প্রদান করেছিলেন।

তাছাড়া এ সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া ইজতিহাদ ও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে হয়ে থাকে। নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনার পর যা স্থিরীকৃত হয় তার উপরই বিষয়টি নির্ভরশীল হবে। যেমন যখন কিবলার দিক তার জন্য সন্দেহযুক্ত হয়।[৭]

---

৫. নস' যেহেতু সাদকা ও যাকাতের ক্ষেত্রেই তার হুকুম সীমাবদ্ধ রেখেছে। সেহেতু হুকুমটি সে ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কেননা হুকুমটি কিয়াস বহির্ভূত।

৬. যদি পাক পাত্র ও বস্ত্র এবং নাপাক পাত্র ও নাপাক বস্ত্র একত্র হয়ে যায়, তখন চিন্তা করে দেখতে হবে। যদি তাহারাত উযূ করে বা সালাত আদায় করে এর পরে জানা যায় যে, তা নাপাক ছিলো, সেক্ষেত্রে হুকুম হলো সালাত দোহরাতে হবে। অনুরূপ যাকাতের ক্ষেত্রে ভুল প্রকাশ পেলে যাকাত দোহরাতে হবে।

৭. তখন চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে তাকে কিবলার দিক নির্ধারণ করতে হয়, এবং তার চিন্তার সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করা হয়। যদিও প্রকৃত পক্ষে ভুল দিক নির্ধারিত হয়ে থাকে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মালদার ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্র গুলোতে[৮] প্রদত্ত যাকাত যথেষ্ট হবে না। (পুনরায় যাকাত প্রদান করতে হবে।)

তবে প্রথমোক্ত মতই হলো জাহিরী রিওয়ায়াত। এ সিদ্ধান্ত তখনই হবে, যখন সে চিন্তা-ভাবনা করে যাকাত প্রদান করে আর তার প্রবল ধারণা হয়ে থাকে যে, লোকটি যাকাতের উপযুক্ত পাত্র। পক্ষান্তরে যদি তার সন্দেহ হয়ে থাকে অথচ চিন্তা না করে থাকে, কিংবা চিন্তা করে প্রদান করেছে, অথচ তার প্রবল ধারণা হয়ে ছিলো যে, সে যাকাতের উপযুক্ত পাত্র নয়; তবে প্রদত্ত যাকাত গ্রহণযোগ্য হবে না, তবে যদি পরে সে জানতে পারে যে, সে দরিদ্র। এটাই বিশুদ্ধ মত।

যদি কোন ব্যক্তিকে যাকাত প্রদানের পর জানতে পারে যে, সে তার নিজের গোলাম কিংবা মুকাতাব ছিল, তাহলে প্রদত্ত যাকাত যথেষ্ট হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে মালিক বানানো অনুপস্থিত। কারণ (তাদের মধ্যে) মালিকানার যোগ্যতা নেই, অথচ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মালিক বানানো হলো যাকাত আদায়ের রুকন।

যে ব্যক্তি যে কোন মালের নিসাব পরিমাণের মালিক হবে, তাকে যাকাত প্রদান করা জাইয নয়। কেননা শরীআতের পরিভাষায় মালদার হওয়া নিসাব দ্বারাই নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে শর্ত এই যে, এ নিসাব তার মৌলিক প্রয়োজন থেকে উদ্বৃত্ত হতে হবে।

সম্পদের বর্ধনশীলতার গুণটি হলো যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত।

নিসাবের কম পরিমাণ মালের অধিকারীকে যাকাত প্রদান করা জাইয, যদি ও সে সুস্থ ও উপার্জনযোগ্য হয়ে থাকে। কেননা সে দরিদ্র, আর দরিদ্ররাই হলো যাকাতের ক্ষেত্র।

তাছাড়া যেহেতু প্রকৃত প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু প্রয়োজনের প্রমাণের উপর হুকুম আবর্তিত হবে। আর প্রমাণ হলো নিসাব পরিমাণ মাল না থাকা।

এক ব্যক্তিকে দু'শ দিরহাম বা তার বেশী প্রদান করা মাকরূহ। তবে যদি প্রদান করে তবে জাইয হবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, জাইয হবে না। কেননা তার সচ্ছলতা যাকাত প্রদানের সংগে যুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং মালদার ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া হয়ে গেল।

আমাদের যুক্তি এই যে, মালদার হওয়া যাকাত প্রদানের ফল, সুতরাং তা যাকাত প্রদানের পরেই সাব্যস্ত হবে, তবে সচ্ছলতাটা যাকাত আদায়ের অতি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তা মাকরূহ হবে।

যেমন কেউ নাজাসাতের পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করল।

---

৮. অর্থাৎ যদি জানা যায় যে, যাকে যাকাত প্রদান করা হয়েছে সে হাশিমী, কিংবা কাফির, কিংবা তার পিতা কিংবা তার পুত্র।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যাকাত প্রদান করে এক ব্যক্তিকে সচ্ছল করে দেওয়া আমার নিকট পসন্দনীয়।

এর অর্থ হলো সওয়াল করার প্রয়োজন থেকে তাকে মুক্ত করে দেওয়া। কেননা একেবারেই মালদার করে দেওয়া মাকরূহ।

এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাত স্থানান্তরিত করা মাকরূহ। বরং প্রত্যেক সমাজের সাদাকা তাদের (দরিদ্রদের) মাঝেই বন্টন করা হবে।

দলীল হলো আমাদের পূর্ব বর্ণিত মু'আয (রা.)-এর হাদীছ। তাছাড়া এতে প্রতিবেশতার হক রক্ষা হয়।

তবে মানুষ তার নিকটাত্মীয়দের কাছে যাকাত পাঠাতে পারে কিংবা এমন জনগোষ্ঠীর কাছে পাঠাতে পারে, যাদের প্রয়োজন তার শহরের লোকদের চেয়ে বেশী। কেননা, এতে আত্মীয়তার হক রক্ষার কিংবা অধিক পরিমাণ প্রয়োজন দূর করার বিষয় রয়েছে। তবে এদের ব্যতীত অন্যদের নিকট স্থানান্তরিত করলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যদিও তা মাকরূহ। কেননা শরীআতের বিধানে যাকাতের ক্ষেত্র নিঃশর্তভাবে যে কোন দরিদ্র। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

সাদাকুতুল ফিত্‌র

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *সাদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব সে স্বাধীন মুসলমানের উপর, যে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয় এবং তা তার বাসস্থান, বস্ত্র, ব্যবহারিক সামগ্রী, ঘোড়া, অস্ত্র ও দাসদাসীদের থেকে অতিরিক্ত হয়।*

ওয়াজিব হওয়ার দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর খুতবায় বলেছেন : أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ –প্রত্যেক স্বাধীন ও ছোট বা বড় দাস ব্যক্তির পক্ষ হতে অর্ধ সা'আ গম কিংবা এক সা'আ যব আদায় করো।

ছা'আলাবা ইব্‌ন দু'আয়র আল-আদাবী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর এ ধরনের হাদীছ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। অকাট্য না হওয়ার কারণে (ফরয সাব্যস্ত হয় না।)

স্বাধীনতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য। আর ইসলামের শর্ত আরোপ করা হয়েছে যেন কাজটি ইবাদত হিসাবে পরিগণিত হয়। সচ্ছলতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : لَاصَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى –মালদার ছাড়া সাদাকা আরোপিত হয় না।

এ হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলীল। তাঁর বক্তব্য হল, যে ব্যক্তি নিজের ও পরিবারের এক দিনের আহার সামগ্রীর অতিরিক্ত মালের অধিকারী হবে তার উপর সাদাকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব হবে।

সচ্ছলতার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে নিসাব দ্বারা। কেননা শরীআতে নিসাব দ্বারাই মালদারী সাব্যস্ত হয়, যা উপরোক্ত জিনিষগুলো থেকে অতিরিক্ত থাকে। কেননা সেগুলো মৌলিক প্রয়োজনে দায়বদ্ধ। আর মৌলিক প্রয়োজনে দায়বদ্ধ জিনিসকে অস্তিত্বহীন ধরে নেয়া হয়।

এ হিসাবে বর্ধনশীলতার শর্ত নেই। আর এই নিসাবের সংগে সাদাকা গ্রহণের অযোগ্যতা এবং কুরবানী ও সাদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *ছাদাকাতুল ফিত্‌র সে আদায় করবে নিজের পক্ষ থেকে।* কেননা ইব্‌ন উমর (রা.) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে : فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَ الْأُنْثٰى –রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্ত্রী ও পুরুষের উপর সাকাতুল ফিত্‌র ফরয করেছেন।

আর আদায় করবে নিজে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের পক্ষ থেকে। কেননা, সাদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার সবব (কারণ) হলো সে সব ব্যক্তি, যার সে ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালন করে। কেননা সাদাকা ব্যক্তির সংগে সম্পর্কিত করা হয় এবং বলা হয় زكوة الراس অর্থাৎ ব্যক্তির যাকাত। আর সম্বন্ধই হল সবব বা কারণ হওয়ার আলামত। তবে ঈদুল ফিত্‌র এর দিকে সম্বন্ধ করে সাদাকাতুল ফিত্‌র বলা হয় এই হিসাবে যে, তা হলো সাদাকাতুল ফিতরের সময়।

যেহেতু ব্যক্তিই হলো সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার কারণ, সেহেতু দিন একটি হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি বিভিন্ন হওয়ার কারণে সাদাকাতুল ফিত্‌র বিভিন্ন হয়ে থাকে।

তবে সাদাকা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে মূল হলো তার নিজ সত্তা। কেননা, নিজের সত্তার সে প্রতিপালন ও ভরণ-পোষণ করে তাকে। সুতরাং তার সংগে তারা যুক্ত হবে যারা তার পর্যায়ভুক্ত। যেমন তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানগণ। কেননা সে-ই তাদের প্রতিপালন ও ভরণ-পোষণ করে থাকে।

আর আদায় করবে আপন গোলামদের পক্ষ থেকে। কেননা (এদের ক্ষেত্রেও) ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালন বিদ্যমান রয়েছে।

অবশ্য গোলামের পক্ষ থেকে ফিতরা তখনই ওয়াজিব হবে, যখন তারা খিদমতের জন্য হয়, এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের পক্ষ থেকে, যখন তাদের নিজস্ব সম্পদ না থাকে। আর যদি তাদের মাল থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তাদের মাল থেকেই ফেতরা আদায় করবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা, শরীআত এটাকে আর্থিক দায়-দায়িত্বের পর্যায়ভুক্ত করেছে। সুতরাং তা ভরণ-পোষণের সদৃশ হলো।[১]

আর তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে না। কেননা অভিভাবকত্ব ও আর্থিক দায়িত্ব অসম্পূর্ণ। কারণ বিবাহ সম্পর্কিত হকসমূহ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে সে তার অভিভাবকত্বের অধিকারী নয়। এবং নির্ধারিত বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে সে তার আর্থিক দায় বহন করে না। যেমন, ঔষধপত্রের ব্যয়।

তদ্রূপ তার প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে না, যদিও তারা তার পরিবারভুক্ত। কেননা তাদের ক্ষেত্রে 'অভিভাবত্ব' নেই।

তবে তাদের পক্ষ থেকে কিংবা তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে তাদের সম্মতি ছাড়া যদি সে আদায় করে দেয়, তাহলে তাদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। এটা সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। কেননা তাদের সম্মতি থাকাটাই স্বাভাবিক।

তদ্রূপ আপন মুকাতাবের পক্ষ থেকেও আদায় করতে হবে না। কেননা, অভিভাবকত্ব বিদ্যমান নেই।

---

১. নাবালেগ সন্তানের নিজস্ব সম্পদ থাকলেও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পিতার উপর অর্পিত হয়। সুতরাং সাদাকাতুল ফিত্‌রও সে-ই প্রদান করবে।

মুকাতাব নিজেও তার পক্ষ হতে আদায় করবে না। কেননা, সে দরিদ্র।

মুদাব্বার ও উম্মু ওয়ালাদের উপর মনিবের অভিভাকত্ব বিদ্যমান রয়েছে। তাই সে তাদের পক্ষ হতে ফিতরা আদায় করবে।

আর তার ব্যবসায়ের গোলামদের পক্ষ থেকেও আদায় করতে হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে সাদাকাতুল ফিত্র ওয়াজিব হয় গোলামের উপর আর যাকাত ওয়াজিব হয় মনিবের উপর। সুতরাং একটি আর একটির প্রতিবন্ধক হবে না।

আমাদের মতে যাকাতের মত গোলামের কারণে সাদাকাতুল ফিত্রও মনিবের উপর ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। যাতে তার উপর দু'টি ওয়াজিব আরোপিত হয়ে যায়।[২] (যা শরীআত বিধি বহির্ভূত)।

একটি গোলাম দু'জন মনিবের মাঝে শরীক হলে কারো উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে না। কেননা তাদের প্রত্যেকের অভিভাবকত্ব ও ভরণ-পোষণ অসম্পূর্ণ।

তদ্রূপ দু'জনের মাঝে বহু গোলাম শরীকানায় থাকলে (কারো উপরই ফিতরা ওয়াজিব হবে না।)

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত।

আর সাহেবাইন বলেন, প্রত্যেকের হিস্সায় যে ক'টি পূর্ণ মাথা আসবে, প্রত্যেকের উপর সেগুলোর ফিতরা ওয়াজিব হবে, ভগ্নাংশটির উপর নয়।[৩]

এই মতানৈক্যর ভিত্তি এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) গোলামদের ভাগের প্রতি লক্ষ্য করেন না, আর সাহেবাইন তা ভাগের প্রতি লক্ষ্য করেন।

কোন কোন মতে এটা (কারো উপর ওয়াজিব না হওয়া) সর্বসম্মত মাযহাব। কেননা, তাকসীমের পূর্বে হিস্সা একত্র হয় না। সুতরাং দু'জনের কারোরই কোন গোলামের উপর মালিকানা পূর্ণ হলো না।

মুসলমান তার কাফির গোলামের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করবে। এর দলীল হল আমাদের পূর্ব বর্ণিত মুতলক ও নিঃশর্ত হাদীছ।[৪]

তাছাড়া হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ (رواه الدارقطنى) –প্রত্যেক স্বাধীন ও দাসের পক্ষ থেকে আদায় কর, সে দাস ইয়াহূদী থাক কিংবা নাসরানী কিংবা মাজুসী হোক।

তাছাড়া যুক্তিগত প্রমাণ এই যে, সাদাকাতুল ফিতরের সবব সাব্যস্ত হয়ে গেছে[৫] আর মনিব ফিতরা আরোপের যোগ্য।

---

২. অর্থাৎ একই বছরে একই মালের উপর দু'টি আর্থিক দায় আরোপিত হচ্ছে, যা বৈধ নয়। কেননা হাদীছ শরীফে আছে, এক বছরে দু'বার সাদাকা উসূল করা যাবে না।

৩. যেমন দু'জনের শরীকানায় পাঁচটি গোলাম থাকলে উভয়ের উপর দু'টি গোলামের সাদাকা ওয়াজিব হবে। পঞ্চমটির সাদাকা কারো উপর ওয়াজিব হবে না, কেননা পঞ্চমটি উভয়ের মাঝে ভাগ হবে।

৪. অর্থাৎ সেখানে গোলামের মুসলমান হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়নি।

৫. সবব হলো এমন মাথা, যার প্রতিপালন সে করে।

এক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা তাঁর মতে ফিতরা ওয়াজিব হয় গোলামের উপর। আর সে ফিতরা ওয়াজিব হওয়া যোগ্য নয়। যদি বিষয়টি বিপরীত হয় তবে সর্ব সম্মতিক্রমেই ফিতরা ওয়াজিব হবে না।

গ্রন্থকার বলেন, ***যদি কেউ একটি গোলাম বিক্রি করে আর তা উভয়ের মধ্যে একজনের ইখতিয়ার থাকে,[৬] তবে গোলাম অবশেষে যার হবে, ফিতরা তার উপরই ওয়াজিব হবে।***

অর্থাৎ যদি ইখতিয়ার বাকি থাকা অবস্থায় ঈদুল ফিতরের দিন অতিবাহিত হয়।

যুফার (র.) বলেন, যার অনুকূলে ইখতিয়ার থাকবে, তার উপরই ফিতরা ওয়াজিব। কেননা, তারই অধিকারভুক্ত রয়েছে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, মালিকানা যার জন্য সাব্যস্ত (অর্থাৎ ক্রেতা) তার উপরই ফিতরা ওয়াজিব। কেননা এটা মালিকানার সম্পর্কিত বিষয়। যেমন ভরণ-পোষণের ব্যাপার। আমাদের যুক্তি এই যে, (এমতাবস্থায়) মালিকানা স্থগিত থাকে। কেননা যদি (ক্রেতা) ফিরিয়ে দেয় তবে তা বিক্রেতার মালিকানায় ফিরে আসবে। পক্ষান্তরে বিক্রয় যদি বহাল রাখে, তবে চুক্তির সময় হতেই মালিকানা সাব্যস্ত হবে। সুতরাং মালিকানার উপর যে জিনিসের ভিত্তি-সেটাও স্থগিত থাকবে।[৭] ভরণ-পোষণের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে আরোপিত, যা স্থগিত রাখা সম্ভব নয়।

ব্যবসায়ের যাকাত সম্পর্কেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে।

পরিচ্ছেদ ঃ সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ ও সময়

ফিতরার পরিমাণ হলো অর্ধ সা'আ গম, বা আটা, ছাতু বা কিশমিশ অথবা এক সা'আ খেজুর বা যব। সাহেবাইনের মতে কিশমিশ যবের পর্যায়ভুক্ত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও এ মত বর্ণিত আছে। প্রথম মতটি جامع الصغير - কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী।

ইমাম শাফিঈ (রা.)-এর মতে উল্লেখিত সব ক'টি জিনিসের ক্ষেত্রেই এক সা'আ ওয়াজিব হবে। কেননা আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) তাঁর বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যামানায় আমরা এই পরিম্যণ আদায় করতাম।

আমাদের দলীল হলো সা'লাবা (রা.) বর্ণিত হাদীছ যা ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। আর এটা একদল সাহাবা ও মাযহাব, যাঁদের মাঝে খুলাফায়ে রাশেদীন (রা.) ও রয়েছেন।

---

৬. অর্থাৎ বাকি ক্রেতা তিন দিনের শর্ত করে যে, পসন্দ হলে রাখাবে বা ফেরৎ দিবে।

৭. মাসাআলাটির সুরত এই যে, একজনের ব্যবসায়ের গোলাম রয়েছে। সে তা ইখতিয়ার থাকার শর্তে বিক্রি করলো। এবং এই অবস্থায় বর্ষপূর্তি হয়ে গেলো। এখন যাকাত কার উপর ওয়াজিব হবে? ইখতিয়ার শেষে মালিকানা যার হবে, তার উপর; নাকি যার অনুকূলে ইখতিয়ার রয়েছে তার উপর; নাকি সেদিন মালিকানা যার জন্য সাব্যস্ত হয়েছে, তার উপর?

ইমাম শাফিঈ (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তা নফল রূপে অতিরিক্ত দানের সংগে সম্পৃক্ত।

কিশমিশ সম্পর্কে সাহেবাইনের বক্তব্য এই যে, কিশমিশ ও খেজুর উদ্দেশ্যের দিক থেকে নিকটবর্তী।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, কিশমিশ ও গম গুণগত দিক থেকে নিকটবর্তী। কেননা উভয়টি সর্বাংশে ভক্ষণ করা হয়। অথচ খেজুরের বীচি এবং যবের খোসা ফেলে দিতে হয়। এখান থেকেই গম ও খেজুরের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

মতনে উল্লেখিত আটা ও ছাতুর দ্বারা (ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর) উদ্দেশ্য হলো গমের আটা ও ছাতু। যবের ছাতু যবেরই শ্রেণীভুক্ত হবে। তবে সর্তকতার খাতিবে উভয়ের মধ্যে পরিমাণ ও মূল্য বিবেচনা করা উত্তম। যদিও কোন কোন বর্ণনায় 'আটা' কথাটা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় উপর নির্ভর করে الجامع الصغير - কিতাবে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়নি।

রুটির ক্ষেত্রে মূল্য বিবেচ্য হবে। এ-ই বিশুদ্ধ মত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে অর্ধ সা'আ গম পাল্লার ওযনে বিবেচনা করা হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বর্ণনা মতে পাত্রের মাপ ধর্তব্য হবে।

গমের চেয়ে আটা দ্বারা পরিশোধ করাই উত্তম। আর দিরহাম দ্বারা আদায় করা আটার চেয়ে উত্তম। এ হল ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত মত। ফকীহ্ আবূ জা'ফর এ মতই গ্রহণ করেছেন। কেননা, এ দ্বারা প্রয়োজন অধিক ও ত্বরায় সম্পন্ন হয়।

ইমাম আবূ বকর আল আ'মাশ থেকে অবশ্য গমকে অগ্রাধিকার প্রদানের কথা বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এটা মতভেদ থেকে অধিক দূরবর্তী। কারণ আটা ও মূল্য দ্বারা ফিতরা আদায় হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এক সা'আ-এর পরিমাণ হচ্ছে আট ইরাকী 'রতল'। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে পাঁচ রতল ও এক রতলের এক-তৃতীয়াংশ।

এটা ইমাম শাফিঈ (র.)-এরও মত। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমাদের সা'আ হলো সকল সা'আ-এর মধ্যে ক্ষুদ্রতম।

আমাদের দলীল হলো বর্ণিত হাদীছ যে, নবী (সা.) 'মুদ্দ' পাত্র দ্বারা উযূ করতেন যার পরিমাণ ছিলো দুই রতল এবং গোসল করতেন এক সা'আ দ্বারা, যার পরিমাণ ছিলো আট 'রতল'। উমর (রা.)-এর সা'আও অনুরূপ ছিলো।

আর হাশেমী সা'আ-এর তুলনায় এটা ছোট আর তারা সাধারণত। হাশিমী সা'আ-ই ব্যবহার করতেন।

কুদূরী (র.)-এর ভাষ্য, ঈদুল ফিতরের দিন ফজর উদয় হওয়ার সাথে ফিতরা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কিত।

আর ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, রমাযানের শেষ দিন সূর্যাস্তের সংগে সম্পর্কিত। সুতরাং যে ঈদের রাতে ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা জন্মগ্রহণ করে, আমাদের মতে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে। কিন্তু তাঁর মতে ওয়াজিব হবে না। আর ঈদের রাত্রে তার যে গোলাম কিংবা সন্তান মারা যাবে, তাদের ক্ষেত্রে মতামত হল বিপরীত।

তাঁর যুক্তি এই যে, এটার সম্পর্ক হলো 'ফিত্‌র' তথা রোযা ভংগের সংগে। আর এ-ই হলো তার সময়।

আমাদের দলীল এই যে, ফিতরের সাথে সাদাকার সম্পর্ক হল বিশেষত্ব প্রকাশের জন্য আর ফিতর (বা রোযা রাখা না রাখা) এর সম্পর্ক হলো দিনের সাথে, রাত্রের সাথে নয়।

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগায় রওয়ানা হওয়ার পূর্বে ফিত্‌রা আদায় করা মুসতাহাব। কেননা নবী করীম (সা.) রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করতেন।

তাছাড়া যুক্তিগত দলীল এই যে, সচ্ছল করে দেয়ার আদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য হলো, যেন গরীব লোকটি ব্যস্ততায় লিপ্ত না হয়ে পড়ে।

এটা আগেভাগে আদায় করার মাধ্যমেই সম্ভব।

যদি ফিতরা ঈদুল ফিতরের আগেই আদায় করে দেয়, তবে জাইয হবে। কেননা সবব (রামাযান) আগমনের পরেই সে তা আদায় করেছে। সুতরাং আগে-ভাগে যাকাত আদায় করার অনুরূপ হবে।

আর সময়ের পরিমাণে কোন তারতম্য নেই। এ-ই বিশুদ্ধ মত।

যদি ঈদুল ফিতরের দিন আদায় না করে বিলম্বিত করে, তবে ওয়াজিব রহিত হবে না। বরং তা আদায় করতেই হবে।

এটা ইবাদত হওয়ার কারণ যুক্তিসম্মত। সুতরাং এ সাদাকার ক্ষেত্রে আদায় করার সময় সীমাবদ্ধ হবে না। কুরবানীর বিষয়টি এর বিপরীত।[৮]

আল্লাহ্‌ই অধিক জানেন।

---

৮. আইয়ামে নহরের নির্দিষ্ট তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর কুরবানীর হুকুম রহিত হয়ে যায়। কেননা রক্ত প্রবাহিত করাই হলো ইবাদত, আর এটা ইবাদত হওয়া বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। সুতরাং مورد النص বা শরীআতের বাণীর নির্ধারিত ক্ষেত্রেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে।

كِتَابُ الصِّيَامُ

অধ্যায় ঃ সিয়াম

অধ্যায় ঃ সিয়াম

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, রোযা দু'প্রকার। ওয়াজিব ও নফল। আবার ওয়াজিব দু'প্রকার। এক প্রকার হলো নির্ধারিত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন রমাযানের রোযা এবং নির্ধারিত দিনের মান্নাতের রোযা। এই প্রকার রোযা রাত্রে নিয়্যত করা দ্বারা জাইয হয়। আর যদি নিয়্যত না করে অথচ ভোর হয়ে যায়, তাহলে ভোর ও যাওয়াল এর মধ্যবর্তী সময়ে নিয়্যত করলেও যথেষ্ট হবে।

কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তা যথেষ্ট হবে না। জেনে রাখা কর্তব্য যে, রমাযানের রোযা হলো ফরয। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ –তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে। তাছাড়া রোযার ফরয হওয়া সম্পর্কে 'ইজমা' সংগঠিত হয়েছে। এ জন্যই রমাযানের রোযা অস্বীকারকারীকে কাফির সাব্যস্ত করা হয়।

নযরের রোযা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ –তারা যেন তাদের মান্নতসমূহ পুরা করে। প্রথমটির সবব হলো (রমাযান) মাসের উপস্থিতি। এ কারণেই উক্ত রোযাকে মাসের দিকে সম্বোধন করা হয় এবং মাসের পুনরাগমনে রোযারও পুনরাগমন ঘটে। আর রমাযানের প্রতিটি দিবস হচ্ছে সেই দিবসের রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবব।

দ্বিতীয় প্রকার রোযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হচ্ছে মান্নত করা। আর নিয়ত হচ্ছে তার জন্য শর্ত। ইনশাআল্লাহ্ এ বিষয়ে সামনে বিশদ আলোচনা করবো।

বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বক্তব্যের প্রমাণ হলো নবী (সা.)-এর বাণীঃ لَاصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ –যে ব্যক্তি রাত্রে রোযার নিয়্যত করেনি, তার রোযা নেই।

তাছাড়া নিয়্যত না থাকার কারণে রোযার প্রথম অংশটুকু যখন ফাসিদ হয়ে গেলো তখন দ্বিতীয় অংশটুকুও অনিবার্যভাবে ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা (ফরয) রোযা বিভক্তিযোগ্য নয়। নফলের বিষয়টি এর বিপরীত, কারণ নফল রোযা তার মতে বিভক্তিযোগ্য।

আমাদের দলীল এই যে, জনৈক বেদুঈন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদানের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ اَلاَ مَنْ اَكَلَ فَلاَ يَاكُلَنَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَاكُلْ فَلْيَصُمْ –শোন, যে ব্যক্তি পানাহার করে ফেলেছে, সে যেন অবশিষ্ট দিন পানাহার না করে। আর যে পানাহার করেনি, সে যেন রোযা রাখে।

আর ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছটি পূর্ণতা ও ফযীলত অর্জিত না হওয়ার উপর প্রযোজ্য। কিংবা এর অর্থ এই যে, সে এই নিয়্যত করেনি যে, তার রোযা রাত্র থেকে শুরু হবে।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, এটা হলো রোযার জন্য নির্ধারিত দিন। সুতরাং প্রথমাংশের পানাহার থেকে বিরত থাকাটা বিলম্বিত নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল হবে। যা উক্ত রোযার অধিকাংশের সংগে যুক্ত, যেমন নফলের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

এর কারণ এই যে, রোযা হচ্ছে একটি দীর্ঘায়িত রুকন। আর নিয়্যতের প্রয়োজন হলো সেটাকে আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং আধিক্যের দ্বারা রোযার অস্তিত্বের দিকটি অগ্রাধিকার লাভ করবে।

নামায ও হজ্জের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা নামায ও হজ্জ হচ্ছে কয়েকটি রুকন সমন্বিত : সুতরাং ইবাদাত দু'টি আদায়ের সংঘটনের সময়ের সংগে নিয়্যত যুক্ত হওয়া জরুরী।

কাযা রোযার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, তা ঐ দিনের রোযার উপর নির্ভরশীল। আর ঐ রোযাটি হলো নফল।[১]

যাওয়ালের পরে নিয়্যত করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, সেক্ষেত্রে রোযার নিয়্যতটি দিনের অধিকাংশের সংগে যুক্ত হয়নি। ফলে রোযা ফউত হওয়ার দিকটি অগ্রাধিকার লাভ করবে।

মুখতাসারুল কুদূরীতে (নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে) ভোর ও যাওয়ালের মধ্যবর্তী সময়ের কথা বলা হয়েছে। আর জামেউস্ সাগীর কিতাবেও অর্ধ দিবসের পূর্বের কথা বলা হয়েছে। এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা দিবসের অধিকাংশ সময় নিয়্যত বিদ্যমান থাকা জরুরী। আর (শরীআত মতে) দিবসের অর্ধেক হলো ফজরের উদয় থেকে বৃহৎ পূর্বাহ্ন পর্যন্ত, যাওয়ালের সময় পর্যন্ত নয়। সুতরাং এর পূর্বেই নিয়্যত বিদ্যমান হওয়া জরুরী, যাতে নিয়্যত দিবসের অধিকাংশে বিদ্যমান থাকে।

(দিবসের নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে) মুসাফির-মুকীমের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা আমাদের বর্ণিত দলীলে কোন 'পার্থক্য নির্দেশ' নেই। অবশ্য ইমাম যুফার ভিন্ন মত পোষণ করেন।

এই প্রকার রোযা সাধারণ নিয়্যত দ্বারা, নফলের নিয়্যত দ্বারা এবং অন্য ওয়াজিব রোযার নিয়্যত দ্বারা আদায় হয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, নফলের নিয়্যত করলে তা নিরর্থক হবে। (ফরযও হবে না, নফলও হবে না।)

সাধারণ নিয়্যত সম্পর্কে তাঁর দু'টি মত রয়েছে। কেননা নফলের নিয়্যত দ্বারা সে ফরয রোযার উপেক্ষাকারী হলো। সুতরাং তার জন্য ফরয আদায় হবে না।

---

১. সুতরাং নফল রোযার সময় আরম্ভ হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ রাত্রে নিয়্যত না করলে দিনের বেলা নিয়্যতের দ্বারা নফলকে কাযা হিসাবে রূপান্তরিত করা যাবে না।

আমাদের দলীল এই যে, সেই দিনটিতে ফরয নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং মূল নিয়্যত দ্বারাই তা হাছিল হয়ে যাবে। যেমন ঘরে একা বিদ্যমান ব্যক্তিকে তার জাতিবাচক নামে ডাকলেও উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে যায়।

আর যদি নফল কিংবা অন্য ওয়াজিব রোযার নিয়্যত করে থাকে, তাহলেও সে মূল রোযা এবং অন্য একটি অতিরিক্ত দিকের নিয়্যত করলো। সুতরাং যখন অতিরিক্ত দিকটি বাতিল হয়ে গেলো তখন মূল বিষয় (রোযা) অবশিষ্ট থাকলো। আর তা-ই ফরয রোযা আদায়ের জন্য যথেষ্ট।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মুসাফির ও মুকীম এবং সুস্থ ও অসুস্থ ব্যক্তির মাঝে এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। কেননা (রোযা না রাখার) অবকাশ দানের কারণ এই যে, 'মাযূর' ব্যক্তির যেন কষ্ট না হয়। কিন্তু যখন সে স্বেচ্ছায় কষ্ট গ্রহণ করে নিলো, তখন সে 'অ-মাযূর' ব্যক্তির সংগে যুক্ত হয়ে গেলো।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তি যখন অন্য ওয়াজিব রোযার নিয়্যতে রোযা রাখে, তখন সেই রোযাই সাব্যস্ত হবে।

কারণ 'সময়'-কে সে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়োজিত করেছে। কেননা অন্য ওয়াজিবের কাযা এই মুহূর্তে তার উপর আরোপিত। পক্ষান্তরে রমাযানের রোযার ব্যাপারে পরবর্তীতে সময় লাভ করা পর্যন্ত সে ইখতিয়ার প্রাপ্ত।

নফলের নিয়্যত করার ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে দু'টি মত বর্ণিত হয়েছে।

একটি বর্ণনা (অর্থাৎ ফরয হিসাবে গণ্য হওয়ার) মতে পার্থক্যের কারণ এই যে, এখানে সময়টিকে সে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিযুক্ত করেনি।

দ্বিতীয় প্রকার হলো এমন রোযা, যা (অনির্ধারিত ভাবে) তার যিম্মায় ওয়াজিব। যেমন, রমাযান মাসের রোযা এবং কাফফারার রোযা। সুতরাং রাত্রেকৃত নিয়্যত ছাড়া তা দুরস্ত হবে না। কেননা তা নির্ধারিত নয়। অথচ প্রথম থেকে নির্ধারণ করা জরুরী।

সকল নফল রোযা যাওয়ালের পূর্বে নিয়্যত করা দ্বারা জাইয।

ইমাম মালিক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি আমাদের উল্লেখিত হাদীছটির ব্যাপকতা প্রমাণ রূপে গ্রহণ করেন।[২]

আমাদের প্রমাণ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অ-রোযাদার অবস্থায় ভোর বেলা হওয়ার পরে বলেছেন ঃ اِنِّى اِذًا لَصَائِمٌ (এখন থেকে আমি রোযা রেখে নিলাম।)

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, রমাযানের বাইরে নফল রোযা শরীআত অনুমোদিত ইবাদত। সুতরাং দিবসের প্রথমাংশের পানাহার সংযমটি রোযা রূপে গৃহীত হওয়া নিয়্যতের উপর নির্ভর করবে। যেমন আমরা আগে উল্লেখ করে এসেছি।

---

২. অর্থাৎ এই হাদীছটি لاصيام لمن لم ينو الصيام من الليل

মতে রোযা বিভাজন গ্রহণ করে। কারণ নফলের ভিত্তি হচ্ছে মনের প্রফুল্লতার উপর। আর এমন হতে পারে যে, যাওয়ালের পর সে প্রফুল্লতা অনুভব করলো। তবে তার জন্য শর্ত এই যে, দিবসের শুরু থেকেই পানাহার থেকে বিরত থাকা।

আমাদের মতে দিবসের শুরু থেকেই সে রোযাদার গণ্য হবে। কেননা, এটা হলো আত্ম-দমনের বিশেষ ইবাদত। আর তা নির্ধারিত সময়ে রোযা বিরুদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা দ্বারা সংঘটিত হয়। সুতরাং দিবসের অধিকাংশ সময়ের সংগে নিয়্যত যুক্ত হওয়া বিবেচ্য হবে।

ইমাম কুদূরী বলেন, *মানুষের কর্তব্য হলো শা'বান মাসের উনত্রিশ তারিখে চাঁদ অনুসন্ধান করা। যদি তারা চাঁদ দেখতে পায়, তাহলে রোযা রাখবে। আর যদি (মেঘের কারণে) চাঁদ তাদের অগোচরে থাকে তাহলে শা'বান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। অতঃপর রোযা রাখবে।* কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَافْطِرُوْا لِرُؤْيَتِه فَانْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الهِلاَلُ فَاكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلْثِيْنَ يَوْمًا –তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো। আর যদি চাঁদ তোমাদের অগোচরে থাকে তাহলে শা'বান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।

তাছাড়া এই কারণে যে, প্রকৃত অবস্থা হল মাস অব্যাহত থাকা। সুতরাং প্রমাণ ছাড়া উক্ত মাস থেকে বের হওয়া যাবে না। আর এখানে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

(ত্রিশ তারিখের) সন্দেহ পূর্ণ দিনটিতে নফল ছাড়া অন্য কোন রোযা রাখবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ لاَيُصَامُ الْيَوْمُ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ اَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ اِلاَّ تَطَوُّعًا –যে দিনটি সম্পর্কে সন্দেহ হয় যে, তা রমাযান কিনা, সে দিনে নফল ছাড়া অন্য কোন রোযা রাখা যাবে না।

এই মাসআলাটি কয়েক প্রকার।

(১) প্রথমতঃ রমাযানের নিয়্যত করে রোযা রাখা মাকরূহ। প্রমাণ হলো আমাদের উপরে বর্ণিত হাদীছ।

আরো এ কারণে যে, এতে আহলে কিতাবের সংগে সাদৃশ্য হয়। কেননা তারা তাদের রোযার পরিমাণে বর্ধিত করেছিল।

তবে রোযা রাখার পর যদি দেখা যায় যে, দিনটি রমাযানেরই দিন, তাহলে তা রমাযানের রোযা হিসাবে যথেষ্ট হবে। কেননা সে মাস পেয়েছে এবং তাতে রোযা রেখেছে। আর যদি প্রকাশ পায় যে, দিনটি শা'বান মাসের ছিল, তাহলে তা নফল হয়ে যাবে। আর যদি রোযা ভংগ করে তাহলে তার কাযা করবে না। কেননা তা ধারণা পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

(২) দ্বিতীয় প্রকার এই যে, (রমাযান ছাড়া) অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়্যত করলো। সেটাও মাকরূহ। প্রমাণ ইতোপূর্বে উপরে বর্ণিত হাদীছ। তবে মাকরূহ হওয়ার ক্ষেত্রে এটি প্রথমটার তুলনায় গৌণ।

এরপর যদি দেখা যায় যে, দিনটি রমাযানের দিন ছিল, তাহলে রমাযানের রোযা হিসাবে যথেষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, রোযার মূল নিয়্যত বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি প্রকাশ পায় যে, তা শা'বানের দিন ছিল, তাহলে কারো কারো মতে তা নফল হবে। কেননা, এ রোযা নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং তা ছাড়া ওয়াজিব রোযা আদায় হবে না।

কোন কোন মতে যে রোযার নিয়্যত করেছে, তা আদায় হয়ে যাবে। এটা শুদ্ধতম মত। কেননা যে রোযাকে নিষেধ করা হয়েছে, তা হল রমাযানের উপর রমাযানের রোযাকে নিষেধ করা হয়েছে, তা হল রমাযানের উপর রমাযানের রোযাকে অগ্রবর্তী করা। অন্য রোযা দ্বারা তা বাস্তবায়িত হয় না।

ঈদের দিনের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা এখানে নিষিদ্ধ বিষয়টি অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দাওয়াত গ্রহণকে বর্জন করা যে কোন রোযা দ্বারা অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর সেখানে মাকরূহ হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে নিষেধ রূপের কারণে।

(৩) তৃতীয় প্রকার এই যে, নফলের নিয়্যত করে। এটি মাকরূহ নয়। প্রমাণ ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ। আর এই হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপক্ষে প্রমাণ। তাঁর মতে (পূর্ব অভ্যাস ছাড়া) নতুনভাবে ঐদিন রোযা রাখা মাকরূহ।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিম্নোক্ত বাণী ঃ لَاتَتَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوم وَلَا بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ (তোমরা একটি বা দু'টি রোযা দ্বারা রামাযানের অগ্রগামী হয়ো না।) -এর উদ্দেশ্য হলো রমাযানের রোযা রেখে অগ্রবর্তী হওয়া থেকে নিষেধ করা। কেননা এতে সময়ের পূর্বেই রমাযানের রোযা রাখা হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে যদি ঐ দিবসটি এমন কোন দিবস হয়, যা সে পূর্ব হতেই রোযা রেখে আসছে তাহলে সকলের ঐকমত্যেই রোযা রাখা উত্তম।

তদ্রূপ যদি এমন হয় যে, (শা'বান) মাসের (কিংবা প্রত্যেক মাসের) শেষ তিন দিন কিংবা ততোধিক দিন সে রোযা রেখে এসেছে, তা হলে রোযা রাখাই উত্তম। পক্ষান্তরে যদি শুধু ঐ একদিন রোযা রাখার অভ্যাস হয়ে থাকে, তাহলে কোন কোন মতে বাহ্যতঃ নিষেধ থেকে বেঁচে থাকার জন্য রোযা না রাখাই উত্তম। আর কোন কোন মতে 'আলী ও 'আইশা (রা.)-এর অনুসরণে রোযা রাখাই উত্তম। কেননা তাঁরা ঐ দিন রোযা রাখতেন।

আর স্বীকৃত মত এই যে, মুফতী (ও অন্যান্য বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিগণ) সতর্কতার খাতিরে নিজে তো রোযা রাখবেন কিন্তু সাধারণ লোকদের যাওয়াল পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর পানাহার করার ফাতওয়া দান করবেন। (নিজে গোপনে রোযা রাখবেন) অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য।

(৪) চতুর্থ প্রকার এই যে, মূল নিয়্যতের মধ্যে দোদুল্যমান হওয়া। অর্থাৎ এভাবে নিয়্যত করা যে, আগামীকাল রমাযান হলে রোযা রাখবে, আর শা'বান হলে রোযা রাখবে না। এইভাবে সে রোযাদার হবে না। কেননা তার নিয়্যতকে স্থির করেনি। সুতরাং এমনই হলো, যেন সে নিয়্যত করলো যে, আগামীকাল যদি সে খাবার পায় তাহলে রোযা রাখবে না, আর খাবার না পেলে রোযা রাখবে।

(৫) পঞ্চম প্রকার এই যে, নিয়্যতের প্রকৃতির ক্ষেত্রে দ্বিধা পোষণ করে। অর্থাৎ এই নিয়্যত করে যে, আগামীকাল রমাযানের দিন হলে রমাযানের রোযা রাখবে। আর শা'বানের দিন হলে অন্য ওয়াজিব রোযা রাখবে। এটা মাকরূহ। কেননা সে দু'টি মাকরূহ বিষয়ের মাঝে

দোদুল্যমান রয়েছে। অতঃপর যদি প্রকাশ পায় যে, দিবসটি রমাযানের দিবস, তাহলে ঐ রোযাই যথেষ্ট হবে। কেননা মূল নিয়্যতের ক্ষেত্রে তো দ্বিধা নেই। পক্ষান্তরে যদি প্রকাশ পায় যে, তা শা'বানের দিবস, তা হলে এ রোযা অন্য কোন ওয়াজিব রোযা রূপে যথেষ্ট হবে না। কেননা দ্বিধান্বিত থাকার কারণে দিক নির্ধারিত হয়নি। আর মূল নিয়্যত তার জন্য যথেষ্ট নয়। তবে তা এমন নফল রোযায় রূপান্তরিত হবে, যা (ভঙ্গ করলে) কাযা যিম্মায় আসে না। কেননা তা সে শুরুই করেছে যিম্মা থেকে অব্যাহতির নিয়্যতে।

আর যদি সে এই নিয়্যত করে যে, আগামীকাল রমাযান হলে তার রোযা রমাযানের হবে; আর শা'বানের হলে নফল রোযা হবে, তাহলে তাও মাকরূহ। কেননা এক দিক থেকে সে (রমাযানের) ফরয রোযার নিয়্যত করছে। অতঃপর যদি প্রকাশ পায় যে দিবসটি রমাযানের দিবস, তাহলে তা রমাযানের রোযা হিসাবে যথেষ্ট হবে। কারণ ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।[৩]

আর যদি প্রকাশ পায় যে, তা শা'বানের দিবস, তাহলে নফল হিসাবে তা জাইয হবে। কেননা নফল মূল নিয়্যতের দ্বারা আদায় হয়ে যায়।

যদি তা ফাসিদ করে ফেলে তাহলে কাযা না হওয়াই উচিত। কেননা, তার নিয়্যতের মধ্যেই এক হিসাবে যিম্মা থেকে অব্যাহতির লক্ষ্য বিদ্যমান।

যে ব্যক্তি একা রমাযানের চাঁদ দেখলো, সে রোযা রাখবে। যদিও ইমাম তার সাক্ষ্য গ্রহণ না করেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِه –তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোযা ইফতার কর।

আর সে তো স্পষ্টভাবে চাঁদ দেখেছে। যদি সে রোযা ভংগ করে ফেলে, তাহলে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যদি স্ত্রী সহবাস দ্বারা রোযা ভংগ করে, তাহলে তার উপর কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে। কেননা সে রমাযান সম্পর্কে, নিশ্চিত ছিল। আর হুকুম হিসাবেও (সে রমাযানের রোযা ভংগ করেছে) কেননা, তার উপর রোযা ওয়াজিব ছিল।

আমাদের মতে কাযী শরীআত সম্মত দলীলের ভিত্তিতে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। দলীলটি হলো ভুল দেখার সম্ভাবনা। ফলে তা সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। আর এরূপ কাফ্ফারা সন্দেহের দ্বারা রহিত হয়ে যায়।

ইমাম তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করার পূর্বেই যদি সে রোযা ভংগ করে ফেলে, তাহলে সে বিষয়ে মাশায়েখগণের মতভেদ রয়েছে।

(সাক্ষ্য-প্রত্যাখ্যাত) এই লোক যদি ত্রিশদিন রোযা পূর্ণ করে, তাহলেও সে ইমামের সংগে ছাড়া রোযা বর্জন করতে পারবে না। কেননা সতর্কতা হিসাবেই তার উপর রোযা ওয়াজিব হয়েছিলো। আর পরবর্তীতে সতর্কতা হলো 'রোযা' বর্জন বিলম্বিত করার মধ্যে।

---

৩. অর্থাৎ মূল নিয়্যতে কোন দ্বিধা নেই।

তবে যদি রোযা ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে তাঁর ধারণা অনুযায়ী সাব্যস্ত প্রকৃত অবস্থার প্রেক্ষিতে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

যদি আকাশ অপরিষ্কার থাকে তাহলে চাঁদ দেখার ব্যাপারে ইমাম একজন 'আদিল' (সৎ ব্যক্তি) ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন, সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক, স্বাধীন হোক কিংবা দাস। কেননা, এটা দীনী বিষয়। সুতরাং তা হাদীছ বর্ণনার সদৃশ হলো। এ জন্য তা 'সাক্ষ্য' শব্দের উপর নির্ভরশীল নয়। ন্যায়-পরায়ণতার শর্ত আরোপ করার কারণ এই যে, দীনী বিষয়ে কাফিরের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম তাহাবীর বক্তব্য 'ন্যায়পরায়ণ হোক কিংবা ন্যায়পরায়ণ না হোক; তা এ অবস্থায় উপর প্রযোজ্য, যখন তার ন্যায়পরায়ণতা অজানা থাকে।

আর আকাশ 'অপরিষ্কার'-এর অর্থ মেঘ, ধুলিঝড় ইত্যাদি থাকা। ইমাম কুদূরীর নিঃশর্ত বিবরণে ঐ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত, যে যিনার অপবাদ দেওয়ার কারণে-শাস্তিপ্রাপ্তির পর তওবা করে নিয়েছে।

এ হল জাহিরে রিওয়ায়াত। কেননা এটা হচ্ছে খবর প্রদান। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত এক মতে তার কথা গ্রহণ করা হবে না। কেননা একদিক থেকে এটি সাক্ষ্যের পর্যায়ের।

ইমাম শাফিঈ (র.) থেকে বর্ণিত দু'টি মতের একটিতে দু'জনের শর্ত আরোপ করেছেন। তাঁর বিপক্ষে আমাদের দলীল তাই, যা উপরে আমরা উল্লেখ করেছি।

তাছাড়া বিশুদ্ধ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) রমাযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন।

এরপর ইমাম এক জনের সাক্ষ্য গ্রহণের ভিত্তিতে যদি লোকেরা রোযা ত্রিশদিন পূর্ণ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাসান (ইব্ন যিয়াদ) কর্তৃক বর্ণিত মতে সতর্কতা হিসাবে রোযা ত্যাগ করবে না। কেননা, রোযা ত্যাগ করার বৈধতা একজনের সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয় না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা সিয়াম ত্যাগ করে ফেলবে। কেননা রোযা ত্যাগ করার বৈধতা এই ভিত্তিতে সাব্যস্ত হবে যে, রমাযান এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছিলো। যদিও স্বতন্ত্রভাবে প্রথম অবস্থায় এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা সিয়াম ত্যাগ করার বৈধতা প্রমাণিত হয় না। যেমন ধাত্রীর সাক্ষ্য ছাড়া প্রমাণিত 'নসব'-এর উপর ভিত্তি করে মীরাসের অধিকার সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

আকাশ যদি অপরিষ্কার না থাকে তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না, যতক্ষণ না এমন একটা বড় দল তা দেখতে পায়, যাদের সংবাদে নিশ্চিত হওয়া যায়। কেননা, এমন অবস্থায় একা চাঁদ দেখার মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং একটা বড় দলের দেখা পর্যন্ত সে বিষয়ে অপেক্ষা

করা কর্তব্য হবে। আকাশ অপরিষ্কার থাকার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা কখনো কখনো চাঁদের স্থান থেকে মেঘ কেটে যায়, ফলে কারো পক্ষে চাঁদ দেখে ফেলা সম্ভব হতে পারে। 'বড় দলের' সংজ্ঞা হিসাবে কেউ কেউ মহল্লাবাসী বুঝিয়েছেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে পঞ্চাশ জনের কথা বর্ণিত হয়েছে 'কাসামাহ্'-এর উপর কিয়াস করে।

শহরবাসী এবং শহরের বাহির থেকে আগত লোকদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, শহরের বাহির থেকে আগত হলে এক জনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা (তথায় ধুয়া-ধুলা ইত্যাদির) প্রতিবন্ধকতা কম। কিতাবুল ইসতিহসান'-এ এ দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

যদি কেউ শহরের কোন উঁচু স্থান থেকে চাঁদ দেখে তবে তার হুকুম অনুরূপ। যে ব্যক্তি একা ঈদের চাঁদ দেখেছে সে সিয়াম ভঙ্গ করবে না। এর কারণ সতর্কতা অবলম্বন। আর সিয়ামের ক্ষেত্রে ওয়াজিব করার মধ্যেই হলো সতর্কতা।

যদি আকাশ অপরিষ্কার থাকে তাহলে ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হবে না কমপক্ষে দু'জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রী লোকের সাক্ষ্য ব্যতীত। কেননা, এই চাঁদ দেখার সাথে বান্দার উপকার সম্পর্কিত। আর তা হলো রোযা না রাখা। সুতরাং এটা তাঁর অন্যান্য হকসমূহের সদৃশ হয়ে গেলো। যাহিরে রিওয়ায়াত অনুযায়ী ঈদুল আযহা এ ক্ষেত্রে ঈদুল ফিতরের অনুরূপ। এ-ই বিশুদ্ধতম মত।

অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ভিন্নমত বর্ণিত আছ, এ জন্য যে, তা রমাযানের চাঁদ দেখার মতো।

(যাহিরে রিওয়ায়াতের দলীল এই যে)-এর সাথে বান্দাদের উপকার সম্পর্কিত রয়েছে। আর তা হলো কুরবানীর গোশত আহারের সুযোগ গ্রহণ।

আর যদি আকাশ অপরিষ্কার না থাকে তাহলে এমন এক জা'মাআতের সাক্ষ্য ব্যতীত চাঁদ প্রমাণিত হবে না, যাদের সংবাদ দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়।

যেমন ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

রোযার সময় হলো ফজরে ছানী (সুবহে সাদিক)-এর উদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ-

—শুভ্র রেখা ফজরের কৃষ্ণরেখা হতে পৃথক হওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করো। এরপর তোমরা রাত্র পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো (২ ঃ ১৮৭)।

আর উভয় রেখা দ্বারা দিবসের শুভ্রতা এবং রাত্রির কৃষ্ণতা উদ্দেশ্য।

সিয়াম হলো নিয়্যতসহ দিবসে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা–শরীআতের পরিভাষায়। কেননা, আভিধানিক অর্থে শুধু বিরত থাকার নামই সিয়াম। কারণ, এ অর্থে তার ব্যবহার রয়েছে। তবে শরীআত তার সংগে নিয়্যত যুক্ত করেছে, যাতে ইবাদত অভ্যাস হতে পৃথক হয়ে যায়।

দিবসের সংগে বিশিষ্ট হওয়ার কারণ হলো আমাদের বর্ণিত আয়াত।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, দিনরাতের একটানা রোযা রাখা যখন দুঃসাধ্য তখন দিবসের অংশকে নির্ধারণ করাই উত্তম। যাতে আমলটি অভ্যাসের বিপরীত হয়। আর ইবাদতের ভিত্তিই হলো অভ্যাসের বিপরীত করার উপর।

নারীদের ক্ষেত্রে রোযা আদায়ের বৈধতা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য হায়িয ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া শর্ত।

যে কারণে কাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়

রোযাদার যখন ভুলে পানাহার বা সহবাস করে ফেলে তখন তার রোযা ভংগ হয় না। আর কিয়াসের দাবী হলো ভংগ হয়ে যাওয়া। এটি ইমাম মালিক (র.)-এর মত। কেননা রোযার বিপরীত কর্ম পাওয়া গেছে। সুতরাং এটা নামাযের মধ্যে ভুলে কথা বলার মতো হয়ে গেলো।

ইস্তিসসানের (সূক্ষ্ম কিয়াসের) কারণ হলো ভুলে পানাহারকারী ব্যক্তিকে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ تم عَلٰى صَوْمِكَ فَانَّمَا اَطْعَمَكَ اللّٰهُ وَسَقَاكَ –তুমি তোমার সিয়াম পূর্ণ করো। কেননা আল্লাহ্ই তোমাকে আহার করিয়েছেন এবং পান করিয়েছেন।

পানাহারের ক্ষেত্রে যখন এটি প্রমাণিত হলো তখন সহবাসের ক্ষেত্রেও তা প্রমাণিত হবে। আর রুকন হিসাবে সবগুলোই সমান। সালাতের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সালাতের অবস্থাই স্মরণকারী। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ভুল প্রভাব বিস্তার করে না। পক্ষান্তরে সাওমের ক্ষেত্রে স্মরণ করিয়ে দেয়ার মত কিছু নেই। সুতরাং ভুল প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

ফরয ও নফল সাওমের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেননা উক্ত হাদীছে কোন পার্থক্য করা হয়নি। আর যদি বিচ্যুতি কিংবা জবরদস্তির কারণে তা করে থাকে তাহলে তার উপর কাযা ওয়াজিব।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা তিনি এ দু'জনকে ভুলকারী ব্যক্তির উপর কিয়াস করেন। আমাদের দলীল এই যে, এ দু'টি অবস্থার অস্তিত্ব অধিক নয়। পক্ষান্তরে ভুলের ওয়র অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে।

তাছাড়া বিস্মৃতি ঐ সত্তার পক্ষ থেকে ঘটে থাকে, যিনি রোযার হকদার। পক্ষান্তরে বল প্রয়োগ অন্যের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং এ দু'টির হুকুমে পার্থক্য হবে।[১]

যেমন, সালাত কাযা করার ক্ষেত্রে শৃংখলিত ও অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে (পার্থক্য) রয়েছে।

যদি ঘুমের মাঝে কারো স্বপ্নদোষ ঘটে তাহলে তার সাওম ভংগ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ ثَلٰثٌ لَايُفَطِّرْنَ الصِّيَامَ القَئُ وَالْحِجَامَةُ وَالْاِحْتِلَامُ –তিনটি বিষয় সওম ভংগ করেনা। যথা, বমি, শিংগা লাগানো ও স্বপ্নদোষ।

আর এই জন্য যে, এখানে প্রকৃত সহবাস পাওয়া যায়নি বাহ্যতঃ ও মর্মগতভাবে। আর সহবাসের মর্মার্থ হলো সংগম যোগে উত্তেজনা সহকারে বীর্যপাত।

---

১. যদি শৃংখলিত ব্যক্তি বসে বা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে থাকে তবে মুক্তি পাওয়ার পর এগুলোর কাযা করতে হবে। কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তির উপর কাযা নেই।

তদ্রূপ (সিয়াম ভংগ হবে না) যদি কোন স্ত্রী লোকের দিকে তাকানোর কারণে বীর্যস্খলিত হয়ে যায়। একইভাবে চিন্তা করার দ্বারা বা হস্তমৈথুনের দ্বারা

আর যদি তৈল লাগায় তাহলে সাওম ভংগ হবে না। কেননা, এতে সাওম বিরোধী কিছু পাওয়া যায়নি।

তদ্রূপ সিংগা লাগালেও সাওম ভংগ হবে না। উক্ত কারণে এবং ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী।

যদি সুরমা ব্যবহার করে তাহলে সাওম ভংগ হবে না। কেননা চক্ষু ও মস্তিষ্কের মাঝে কোন ছিদ্রপথ নেই। আর যে অশ্রুঘামের মতো চুইয়ে বের হয় এবং লোমকূপ দিয়ে যা প্রবেশ করে, তা সিয়ামের বিরোধী নয়। যেমন যদি কেউ ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করে তবে সিয়াম ভঙ্গ হয় না।

যদি স্ত্রীকে চুম্বন করে তবে তার সিয়াম ভংগ হবে না। অর্থাৎ যদি বীর্যস্খলন না হয়। কেননা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সিয়াম বিরোধী কোন কিছুই ঘটে নি। রুজু করা এবং মুছাহারাতের সম্পর্ক[২] সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা এখানে হুকুমটি সবব বা কার্যকারণের উপর আবর্তিত। যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ্ তা আলোচিত হবে।

তদ্রূপ কোন বেগানা স্ত্রী লোককে চুম্বন করলে তার উর্ধ্বতন (মা, নানী ইত্যাদি) অধঃস্তন সকল নারী (কন্যা, নাতনী ইত্যাদি) উক্ত লোকের জন্য হারাম হয়ে যায় এটাকে حرمة المصاهرة বলে। যদি চুম্বন কিংবা স্পর্শের কারণে বীর্যস্খলিত হয়ে যায়, তাহলে তার সিয়ামের কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, এতে সহবাসের মর্ম বিদ্যমান। আর সতর্কতার খাতিরে বাহ্যিক কিংবা আভ্যন্তরীণ যে কোন রূপে রোযা বিরোধী বিষয়ের অস্তিত্ব রোযার কাযা ওয়াজিব করার জন্য যথেষ্ট। পক্ষান্তরে কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার জন্য অপরাধ পূর্ণভাবে সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা তা হদসমূহের মত সন্দেহ দ্বারা রহিত হয়ে যায়।

যদি নিজের ব্যাপারে আশ্বস্ত থাকে আর চুম্বন করাতে কোন দোষ নেই, যদি নিজের উপর নির্ভরতা থাকে। অর্থাৎ সহবাস কিংবা বীর্যস্খলনে গড়াবে না। যদি এই ভরসা না থাকে তাহলে মাকরূহ্ হবে। কেননা মূল চুম্বন রোযা ভংগকারী নয়। বরং পরিণতির দিক থেকে হয়ত তা কখনো বা ভংগকারী হয়ে যেতে পারে। সুতরাং যদি নিজের উপর ভরসা থাকে তাহলে মূল চুম্বনের দিকটি বিবেচনা করে তা তার জন্য মুবাহ্ হবে। পক্ষান্তরে যদি নিজের উপর ভরসা না থাকে তা হলে চুম্বনের পরিণতির দিকটি বিবেচনা করে তার জন্য তা মাকরূহ হবে।

---

২. অর্থাৎ স্ত্রীকে তালাকে রাজঈ প্রদানের পর তাকে চুম্বন করলে স্ত্রী রূপে ফিরিয়ে নেয়া সাব্যস্ত হবে।

নগ্নদেহে পরস্পর জড়াজড়ি যাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী চুম্বনেরই অনুরূপ। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নগ্নদেহে পরস্পর জড়াজড়ি মাকরূহ। কেননা এরূপ আচরণ খুব কমই অবৈধ কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে থাকে।

সিয়াম স্মরণ থাকা অবস্থায় যদি তার গলার ভিতরে মাছি প্রবেশ করে তাহলে রোযা ভংগ হবে না।

কিয়াস অনুযায়ী তার রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা রোযা ভংগকারী বস্তু তার উদরে পৌঁছে গেছে যদিও তা খাদ্যজাতীয় নয়, যেমন মাটি ও কংকর।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, এ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং তা ধুলো ও ধোঁয়ার সদৃশ হলো। বৃষ্টি ও বরফ সম্পর্কে মাশায়েখগণ মতভেদ করেছেন। তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, তাতে সিয়াম ভংগ হবে। কেননা তাঁবুতে বা ঘরে আশ্রয় নিয়ে তা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।

যদি দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা গোশত 'ভক্ষণ' করে তবে কম হলে রোযা ভংগ হবে না। কিন্তু বেশী পরিমাণে হলে ভংগ হবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, উভয় অবস্থাতেই রোযা ভংগ হবে। কেননা মুখ বাইরের অংশ-রূপে বিবেচিত। এ কারণেই কুলি করার কারণে তার রোযা নষ্ট হয় না।

আমাদের দলীল এই যে, অল্প পরিমাণ দাঁতের অনুগত যেমন তার থুথু।

পরিমাণের অবস্থা ভিন্ন। কেননা, শেষ পর্যন্ত তা দাঁতের ফাঁকে বিদ্যমান থাকে না। কম ও বেশীর মাঝে পার্থক্য নির্ধারণকারী হলো একটি বুটের পরিমাণ। এর চাইতে কম অল্প হিসাবে গণ্য।

যদি তা বের করে হাতে নেয় অতঃপর তা ভক্ষণ করে তাহলে রোযা ফাসিদ হওয়াই যুক্তিসংগত। যেমন- ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, কোন সিয়াম পালনকারী যদি দাঁতের ফাঁকে (আটকে থাকা) তিল গিলে ফেলে তবে সিয়াম নষ্ট হবে না। আর যদি সরাসরি তা মুখে নিয়ে খায় তাহলে তার সিয়াম ভংগ হবে। আর যদি তা শুধু চিবায় তাহলে সিয়াম ভংগ হবে না। কেননা তা মিশে যায়। আর চনাবুটের পরিমাণের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা নয়। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে তার উপর কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে। কেননা তা বিকৃত খাদ্য। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলীল এই যে, মানুষের রুচি তা ঘৃণ্য করে।

যদি অনিচ্ছাকৃত বমি এসে পড়ে তাহলে তাতে রোযা ভংগ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : مَنْ قَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ –যে ব্যক্তি বমি করে, তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যে ইচ্ছাকৃত বমি করে, তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। অনিচ্ছাকৃত বমির ক্ষেত্রে মুখ ভরা বমি ও কম বমির হুকুম সমান।

যদি বমি ভিতরে ফেরত যায় আর তা মুখ ভরা থাকে, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তাতে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা তা বাইরের, এমনকি এতে উযূ ভংগ হয়ে যায়। আর তা-ই ভিতরে প্রবেশ করেছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে রোযা ফাসিদ হবে না। কেননা রোযা ভংগের বাহ্যরূপ অর্থাৎ গলাধঃকরণ পাওয়া যায়নি। তদ্রূপ রোযা ভংগ করার প্রকৃত মর্মও পাওয়া যায়নি। কেননা তা সাধারণতঃ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না।

যদি উক্ত বমি সে নিজে পালটিয়ে নেয় তাহলে সকলের মতেই রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে. কেননা বাহির হওয়ার পর প্রবেশ করানো পাওয়া গেছে। সুতরাং রোযা ভংগের বাহ্যরূপ বিদ্যমান হয়।

বমি যদি মুখভরা থেকে কম হয় আর নিজেই ফেরত যায় তাহলে তার রোযা ভংগ হবে না। কেননা এটা বাইরের নয় এবং এর প্রবেশের ব্যাপারে তার কোন প্রয়াস নেই।

যদি সে নিজে ইচ্ছা করে গিলে ফেলে তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে একই হুকুম হবে। কেননা, বের হওয়া সাব্যস্ত হয়নি। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে তার প্রয়াস রয়েছে।

যদি রোযা স্মরণ থাকা অবস্থায় মুখ ভরে বমি করে তাহলে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। প্রমাণ হলো আমাদের বর্ণিত হাদীছ। আর এই হাদীছের কারণে কিয়াস বর্জিত হয়। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না; কেননা (রোযা ভংগ হওয়ার) বাহ্য রূপ পাওয়া যায়নি। যদি উক্ত বমি ভরা মুখের কম হয় তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একই হুকুম হবে। কেননা হাদীছটি নিঃশর্ত।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে রোযা ফাসিদ হবে না। কেননা, শরীআতের হুকুম মতে বাহির হওয়া সাব্যস্ত হয় নি।

অতঃপর যদি তা ফেরত যায়, তাহলে তার মতে রোযা ফাসিদ হবে না। কেননা ফেরত যাওয়ার পূর্বে বের হওয়া সাব্যস্ত হয়নি। যদি সে ইচ্ছা করে ফেরত নেয় তবে তার পক্ষ হতে বর্ণিত একটি মতে পূর্ববর্ণিত কারণেই ফাসিদ হবে না। কিন্তু তার পক্ষ হতে বর্ণিত অন্য একটি মতে ফাসিদ হবে। কেননা, এটাকে তিনি মুখভরা বমির সাথে যুক্ত করেছেন। কারণ, তার ইচ্ছাকৃত কর্মের (ইচ্ছাকৃত বমন ও গলাধঃকরণ) আধিক্যের কারণে।

যে ব্যক্তি কংকর কিংবা লোহা গিলে ফেলে তার রোযা ভংগ হয়ে যাবে। কেননা, রোযা ভঙ্গের 'বাহ্যরূপ' পাওয়া গেছে।

তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। কারণ (আহারের) প্রকৃত মর্ম পাওয়া যায়নি।

যে ব্যক্তি (রোযার) স্মরণ অবস্থায় দু'পথের কোন এক পথে সংগম করবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে।

কাযা ওয়াজিব রোযার বিনষ্ট উদ্দেশ্য পুনঃ অর্জনের জন্য। ***আর কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে,*** অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণে। উভয় সংগমের ক্ষেত্রেই বীর্যস্খলনের শর্ত নেই. এটাকে গোসলের উপর কিয়াস করা হয়েছে।[৩] এর কারণ এই যে, বীর্যস্খলন ছাড়াই আনন্দ পাওয়া যায়। তা দ্বারা তো-তৃপ্তি লাভ হয়।

---

৩. যদি লিংগ প্রবিষ্ট হয় কিন্তু বীর্যস্খলন না হয় তবু গোসল ওয়াজিব হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে আরেক বর্ণনায় রয়েছে যে, ঘৃণিত স্থানে (গুহ্যদ্বারে) সংগম দ্বারা কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। তাঁর মতে কাফ্ফারা হদের সাথে বিবেচ্য।[৪]

আর বিশুদ্ধ মত এই যে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কেননা শাহওয়াত পূর্ণ হওয়ার কারণে অপরাধ পূর্ণতা লাভ করেছে। ***মৃতদেহের সাথে কিংবা জন্তুর সাথে সংগম করলে বীর্যস্খলন ঘটুক কিংবা না ঘটুক, তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।***

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। (আমাদের দলীল) কেননা 'স্বাভাবিক আকর্ষণীয় স্থানে' বাসনা চরিতার্থ করা দ্বারা অপরাধ পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু এখানে তা পাওয়া যায়নি।

অতঃপর আমাদের মতে সংগম দ্বারা পুরুষের উপর যেমন কাফ্ফারা ওয়াজিব, তেমনি স্ত্রীলোকের উপরও ওয়াজিব।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর একটি মতে স্ত্রী লোকের উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা কাফ্ফারার সম্পর্ক হলো সংগমের সাথে। আর এটা হলো পুরুষের কাজ, স্ত্রী লোকটি হলো সংগম ক্ষেত্র।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অন্য একটি মতে স্ত্রী লোকের উপরও ওয়াজিব হবে। তবে (এ দায়) তার পক্ষ হতে পুরুষ বহন করবে; পানির ব্যয় ভারের উপর কিয়াস করে।

আমাদের প্রমাণ হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ مَنْ اَفْطَرَ فِيْ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ। –যে রমাযানে রোযা ভংগ করবে তার উপর তাই ওয়াজিব হবে, যা যিহারকারীর উপর ওয়াজিব হয়।

مَنْ (বা যে) শব্দটি পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। তাছাড়া এ জন্য যে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হচ্ছে রোযা নষ্ট করা। শুধু সহবাসই নয়। আর উক্ত অপরাধে সেও পুরুষের সাথে শরীক। আর দায় বহনের প্রশ্নই ওঠে না। কেননা এ কাফ্ফারা হয় ইবাদত, না হয়ে শাস্তি। আর উভয়টির মধ্যে অন্যের বহন চলে না।

যদি এমন কিছু আহার করে বা পান করে, যা খাদ্যরূপে কিংবা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় তাহলে তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা দুটোই ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। কেননা, সহবাসের ক্ষেত্রে শরীআত কিয়াসের বিরুদ্ধে কাফ্ফারা প্রবর্তন করেছে। কারণ পাপ তো তওবা দ্বারাই মোচন হয়ে যায়। এ কারণে (রোযাভংগের) অন্য ব্যাপারকে সহবাসের উপর কিয়াস করা যাবে না।

আমাদের দলীল এই যে, কাফ্ফারার সম্পর্ক হলো রমাযান মাসে পূর্ণরূপে রোযা ভংগ করার সাথে। আর আলোচ্য অবস্থায় তা সাব্যস্ত হয়। আর কাফ্ফারা হিসাবে গোলাম আযাদ ওয়াজিব করার দ্বারা বোঝা যায় যে, এই অপরাধ তওবা দ্বারা মোচন হয় না।

---

৪. অর্থাৎ গুহ্যদ্বারে সংগম দ্বারা যেমন হদ্দে যিনা ওয়াজিব হয় না, তেমনি কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে না।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *(রোযার) কাফ্ফারা যিহারের কাফ্ফারার অনুরূপ।* প্রমাণ হলো আমাদের বর্ণিত হাদীছ।[৫] এবং জনৈক বেদুঈন সাহাবীর ঘটনা সম্পর্কিত হাদীছ। তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, নিজে হালাক হয়েছি এবং (স্ত্রীকেও) হালাক করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি করেছো? সাহাবী আরয করলেন, রমাযানের দিবসে ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী সহবাস করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, একটি গোলাম আযাদ করো। তিনি আরয করলেন, নিজের এই গ্রীবা ছাড়া আমি আর কারো মালিক নই। তখন তিনি বললেন, তাহলে লাগাতার দুইমাস রোযা রাখো। তিনি আরয করলেন, আমি যে বিপদে এসেছি তাতো এ রোযার কারণেই এসেছে। তখন তিনি বললেন, তাহলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। তিনি আরয করলেন, এ সামর্থ্যও আমার নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক 'ফারাক'[৬] খেজুর আনার হুকুম দিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি পনের সা'আ খেজুরে পূর্ণ একটি থলে আনার হুকুম দিলেন এবং বললেন, এগুলো মিসকীনদের মাঝে বন্টন করে দাও। তিনি আরয করলেন, আল্লাহ্র কসম, মদীনার দুই প্রান্তরের মধ্যবর্তী স্থানে আমার এবং আমার পরিজনের চেয়ে অভাবী কেউ নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তুমি এবং তোমার পরিবার পরিজন তা খাও। তবে তোমার জন্যই এটা যথেষ্ট, কিন্তু তোমার পরে আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

এ হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.)-এর এ মতামতের বিপক্ষে দলীল যে, তার জন্য এর মধ্যে যে-কোন একটি করার অধিকার রয়েছে। কেননা হাদীছের দাবী হেলা (তিনটির মাঝে) তারতীব রক্ষা করা।

তদ্রূপ ইমাম মালিক (র.)-এর বিপক্ষেও দলীল যে, রোযা লাগাতার করতে হবে না। কেননা হাদীছে লাগাতার করার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।

যে ব্যক্তি স্ত্রীর লজ্জাস্থান ছাড়া অন্যভাবে সংগম করে এবং বীর্যপাত ঘটে, তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। কেননা এতে সংগমের মর্ম বিদ্যমান।

আর তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা সংগমের বাহ্যরূপ পাওয়া যায় নি।

রমাযান ছাড়া অন্য রোযা নষ্ট করার ক্ষেত্রে কাফ্ফারা নেই। কেননা রমাযান মাসে রোযা ভংগ করা গুরুতর অপরাধ। সুতরাং অন্য রোযাকে তার সাথে যুক্ত করা যাবে না।

যে ব্যক্তি ডুশ ব্যবহার করে কিংবা নাক দ্বারা ঔষধ প্রবেশ করায় কিংবা কানে ঔষধের ফোঁটা দেয়, তার রোযা ভংগ হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ الفِطْرُ ممَّا دَخَلَ (ابو يعلى فى مسنده) –কিছু প্রবেশ করার কারণে রোযা ভংগ হয়। এই কারণে যে, রোযা ভংগের মর্ম পাওয়া গেছে, আর তা হল শরীরের উপকারী বস্তু ভিতরে প্রবেশ করা, ***তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।*** কেননা রোযা ভঙ্গের বাহ্যরূপ পাওয়া যায়নি।

---

৫. অর্থাৎ من افطر فى رمضان فعليه ما على المظاهر

৬. পাত্র বিশেষ যাতে আট সেরের মত ধরে।

যদি কানে পানির ফোঁটা ঢেলে দেয় কিংবা নিজে নিজেই প্রবেশ করে তাহলে তার রোযা নষ্ট হবে না। কেননা, রোযা ভংগের মর্ম ও বাহ্যরূপ কোনটাই পাওয়া যায়নি। কিন্তু তেল প্রবেশ করানোর বিষয়টি এর বিপরীত।

যদি পেটের ভিতর পর্যন্ত কিংবা মাথার ভিতর পর্যন্ত উপনীত ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা করে আর ঔষধ পেটে কিংবা মস্তিকে পৌঁছে যায়, তাহলে রোযা ভংগ হয়ে যাবে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। আর যে ঔষধ পৌঁছে, তা হলো তরল জাতীয়। সাহেবাইন বলেন, রোযা ভংগ হবে না। কেননা, ঔষধ পৌছার ব্যাপারে নিশ্চয়তা নেই। কারণ ছিদ্রপথ কখনো প্রসারিত হয় আবার কখনো সংকুচিত হয়। যেমন শুষ্ক ঔষধের ক্ষেত্রে (রোযা ভংগ হয় না)।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, ওষধের তরলতা ক্ষতের তরলতার সাথে যুক্ত হয়ে নিম্নমুখী প্রবণতা বৃদ্ধি লাভ করে। ফলে তা ভিতরে পৌঁছে যাবে। শুষ্ক ঔষধের অবস্থায় বিষয়টি বিপরীত। কেননা, ঔষধ ক্ষতের তরলতা শুষে নেয়। ফলে ক্ষতের মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

যদি পুরুষাংগের ছিদ্রপথে ফোঁটা ফোঁটা করে (ঔষধ) ঢালে তাহলে তাতে রোযা ভংগ হবে না।

এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে রোযা ভংগ হয়ে যাবে। আর এ বিষয়ে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতামত স্ববিরোধী। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) সম্ভবতঃ মনে করেছেন যে, পেট ও পুরুষাংগের মাঝে সংযোগ পথ রয়েছে। এ জন্যই পুরুষাংগ দিয়ে পেশাব নির্গত হয়।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) মনে করেছেন যে, অণ্ডকোষ হলো উভয়ের মাঝে আড় স্বরূপ। আর পেশাব তা থেকে চুইয়ে পড়ে। এটি অবশ্য ফিকাহ সংক্রান্ত বিষয় নয়।

যে ব্যক্তি মুখে কিছু চেখে দেখে তার রোযা ভংগ হবে না। কেননা রোযা ভংগের বাহ্যরূপ ও মর্ম কোনটাই বিদ্যমান নেই।

তবে তা মাকরূহ হবে। কেননা এতে রোযা ভংগ হওয়ার উপক্রম হয়।

স্ত্রীলোকের যদি বিকল্প কোন উপায় থাকে তাহলে তার পক্ষে আপন সন্তানের খাদ্য চিবিয়ে দেওয়া মাকরূহ। কারণ আমরা (উপরে) বর্ণনা করেছি।

আর যদি বিকল্প কোন উপায় না পায় তাহলে এতে কোন দোষ নেই। সন্তান রক্ষার নিমিত্ত। তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, সন্তানের জীবনাশংকা দেখা দিলে তার জন্য রোযা ভংগ করার অনুমতি রয়েছে।

গঁদ চিবালে রোযাদারের রোযা ভংগ হয় না। কেননা তা তার উদরে পৌঁছে না। কোন কোন মতে যদি তা জমাট না হয় তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা তখন কিছু অংশ উদরে

পৌছবে। কোন কোন মতে যদি তা কালো জাতীয় হয় তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। এমন কি জমাট হলেও রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা তা ভেংগে ভেংগে যায়।

তবে রোযাদারের জন্য তা ব্যবহার মাকরূহ। কেননা, এতে রোযা নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। তাছাড়া (মুখ নাড়ার কারণে) তার প্রতি রোযা না রাখার অভিযোগ আরোপিত হবে। তবে রোযাদার না হলে স্ত্রী লোকের জন্য তা মাকরূহ্ নয়। কেননা তাদের ক্ষেত্রে তা মিসওয়াকের স্থলবর্তী।

কেউ কেউ বলেন, দন্তরোগের কারণে না হলে পুরুষদের জন্য তা মাকরূহ। আবার কেউ বলেন, তা পসন্দনীয় নয়। কেননা, এতে স্ত্রী লোকদের সংগে সাদৃশ্য রয়েছে।

সুরমা ব্যবহার করা এবং মোচে তেল দেওয়াতে কোন দোষ নেই। কেননা এটা হলো এক ধরনের উপকার লাভ। আর তা রোযার নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাছাড়া নবী (সা.) আশুরা দিবসে সুরমা ব্যবহার করা ও রোযা রাখার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

যদি সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে না হয়ে চিকিৎসাগত উদ্দেশ্যে হয় তাহলে পুরুষদের জন্য সুরমা ব্যবহারে কোন দোষ নেই। তদ্রূপ সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে না হলে মোচে তেল দেওয়া উত্তম। কেননা এটা খেযাবের কাজ করে। তবে দাড়ি সুন্নাত পরিমাণ তথা একমুঠ পরিমাণ থাকলে তা লম্বা করার উদ্দেশ্যে এটা করবে না।

রোযাদারের পক্ষে সকালে ও বিকাল বেলায় কাঁচা মিসওয়াক ব্যবহার করাতে কোন দোষ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ خَيْرُ خِلَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ –রোযাদারের সর্বোত্তম আমল হলো মিসওয়াক করা। এতে সময়ের কোন পার্থক্য করা হয়নি।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, বিকেল বেলা মিসওয়াক করা মাকরূহ। কেননা তাতে একটি প্রশংসিত চিহ্ন দূর করা হয়। আর তা হলো রোযদারের মুখের গন্ধ। সুতরাং তা শহীদের রক্তের সদৃশ।[৭]

আমাদের বক্তব্য এই যে, এটা হলো ইবাদাতের চিহ্ন। আর এ ব্যাপারে গোপনীয়তাই হলো অধিক উপযুক্ত। শহীদের রক্তের অবস্থা ভিন্ন। কেননা, এটি হলো যুলমের চিহ্ন।

আমাদের বর্ণিত হাদীছের আলোকে কাঁচা আর্দ্র এবং পানি দ্বারা ভিজান মিসওয়াকের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

পরিচ্ছেদ ঃ রোযা ভংগ

কেউ যদি রামাযানে অসুস্থ থাকে এবং এই আশংকা করে যে, রোযা রাখলে তার অসুস্থতা বেড়ে যাবে, তাহলে রোযা রাখবে না এবং কাযা করবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, রোযা ভাঙবে না। তিনি তায়াম্মুমের মতো এখানেও প্রাণ-নাশের কিংবা অংগহানীর আশংকার কথা বিবেচনা করেন।

---

৭. আর শহীদের রক্ত মুছে না ফেলার আদেশ করা হয়েছে। রোযাদারের মুখের গন্ধ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহ্র নিকট মেশকের সুগন্ধের চেয়ে প্রিয়।

আমরা বলি রোগ-বৃদ্ধি ও রোগের দীর্ঘায়িত হওয়া কখনো প্রাণ-নাশের দিকে উপনীত করে। সুতরাং তা থেকেও বেঁচে থাকা জরুরী।

মুসাফিরের যদি রোযার কারণে কষ্ট না হয় তাহলে তার রোযা রাখাই উত্তম। তবে রোযা না রাখাও জাইয। কেননা সফর কষ্ট শূন্য হয় না। সুতরাং মূল সফরকেই ওযর রূপে গণ্য করা হয়েছে। অসুস্থতার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা কোন কোন অসুস্থতা রোযা দ্বারা উপশম হয়। সুতরাং রোযার ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, রোযা না রাখাই উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ –সফরে রোযা রাখা নেকিতে গণ্য নয়। (বুখারী)

আমাদের দলীল এই যে, রমাযান হলো দুই সময়ের মধ্যে অধিকতর উত্তম সময়। সুতরাং তাতে আদায় করাই উত্তম হবে।

আর ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছটি কষ্টের অবস্থার উপর প্রযুক্ত হবে।

অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফির ব্যক্তি তারা যদি তাদের সেই অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তাদের উপর কাযা ওয়াজিব হবে না। কেননা عِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ (বা অন্য দিনসমূহের পর্যাপ্ত সংখ্যা) সে পায়নি।

আর অসুস্থ ব্যক্তি যদি সুস্থতা লাভ করে এবং মুসাফির যদি মুকিম হয়ে যায় তারপর মারা যায়, তাহলে সুস্থ হওয়ার এবং মুকিম হওয়ার দিনের পরিমাণ কাযা তার উপর ওয়াজিব হবে। কেননা সে পরিমাণ সময় সে পেয়েছে।

কাযা ওয়াজিব হওয়ার ফল এই দাঁড়ায় যে, (কাযা আদায় না করে থাকলে রোযার ফলে) ফিদইয়া দানের ওসীয়ত করা ওয়াজিব হবে।

ইমাম তাহাবী (র.)-এ বিষয়ে শায়খাইন এবং মুহাম্মদ (র.)-এর মধ্যে মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। বরং মত পার্থক্য হলো মান্নতের ক্ষেত্রে[৮] শায়খাইনের মতে পার্থক্যের কারণ এই যে, নযর হল রোযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ। সুতরাং (রোযার) স্থলবর্তীর ক্ষেত্রে ওয়াজিব হওয়ার কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে। পক্ষান্তরে আলোচ্য মাসআলায় (রোযা ওয়াজিব হওয়ার) কারণ হলো নির্ধারিত সময় পাওয়া। সুতরাং যে পরিমাণ সময় সে পাবে, সেই পরিমাণ সময়ের সাথেই ওয়াজিব হওয়ার হুকুম সীমিত হবে।

রামযানের কাযা ইচ্ছা করলে বিচ্ছিন্নভাবে রাখবে আবার ইচ্ছা করলে লাগাতার রাখবে। কেননা নাস শর্ত মুক্ত। তবে ওয়াজিব দ্রুত আদায়ের লক্ষ্য লাগাতার রাখাই মুস্তাহাব।

---

৮. উদাহরণ স্বরূপ অসুস্থ ব্যক্তি যদি মান্নত করে যে, আমি রোযা রাখবো, এরপর সুস্থ হয়ে মারা যায়; সেক্ষেত্রে শায়খাইনের বক্তব্য হলো পুরো এক মাসের রোযা তার উপর ওয়াজিব হবে। সুতরাং একমাসের রোযার পরিমাণ ফিদইয়া দানের ওসীয়ত করা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যেই পরিমাণ দিন সুস্থ ছিল, সে কয়দিনের রোযা ওয়াজিব হবে।

আর যদি তা বিলম্বিত করে এমনকি অন্য রমাযান এসে পড়ে তাহলে দ্বিতীয় রমাযানের রোযা রাখবে। কেননা তা দ্বিতীয় রমাযানেরই সময়। আর প্রথমের রোযার কাযা তার পরে করবে। কেননা রামাযান বহির্ভূত সময়ই হলো 'কাযা'-এর সময়। তবে তার উপর 'ফিদ্‌ইয়া' ওয়াজিব হবে না। কেননা বিলম্বের (অবকাশের) ভিত্তিতেই কাযা ওয়াজিব হয়। এজন্যই তো সে (কাযা আদায় না করে) নফল রোযা রাখতে পারে।

গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণী যদি নিজেদের কিংবা তাদের শিশুর ক্ষতির আশংকা করে তাহলে রোযা পরিহার করতে পারে এবং পরে কাযা করবে। এ হুকুমের উদ্দেশ্য হলো অসুবিধা দূরীভূত করা।

আর তাদের উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা এ রোযা-ভংগ হলো ওযরের কারণে। তদ্রূপ তাদের উপর 'ফিদ্‌ইয়া' ওয়াজিব হবে না। তবে (ফিদ্‌ইয়ার ব্যাপারে) ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন, যখন শিশুর ব্যাপারে আশংকা করে। তিনি শায়খে ফানী বা অতি বৃদ্ধের উপর কিয়াস করেন।

আমাদের দলীল এই যে, শায়খে ফানীর ক্ষেত্রে ফিদ্‌ইয়া ওয়াজিব হয়েছে কিয়াসের বিপরীতে (নাই দ্বারা।) আর শিশুর আশংকার কারণে রোযা ভংগ করা তার সমপর্যায়ের নয়। কেননা শায়খে ফানী তার উপর রোযা ওয়াজিব হওয়ার পর অপারগ হয়েছে। পক্ষান্তরে শিশুর উপর তো মূলতঃ ওয়াজিবই হয়নি (বরং তার মায়ের উপর; এবং সে পরবর্তীতে কাযা করবে)।

শায়খে ফানী, যিনি রোযা রাখতে সক্ষম নন, তিনি প্রতিদিনের পরিবর্তে রোযা না রেখে একজন মিসকীনকে খাওয়াবেন, যেমনিভাবে কাফ্‌ফার ক্ষেত্রে খাওয়াতে হয়।

এ বিষয়ে দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ –যারা রোযা রাখতে সক্ষম নয়, তাদের উপর ফিদইয়া ওয়াজিব এক মিসকীনের আহার। কোন কোন তাফসীর মতে يُطِيْقُوْنَ -এর মানে হলো لَا يُطِيْقُوْنَ অর্থাৎ সক্ষম না হওয়া। ফিদ্‌ইয়া আদায় করার পর যদি রোযা রাখতে পুনঃসক্ষম হয় তাহলে ফিদ্‌ইয়ার হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। কেননা স্থলবর্তিতার জন্য শর্ত হলো অক্ষমতা অব্যাহত থাকা।

যে ব্যক্তি রমাযানের কাযা যিম্মায় থাকা অবস্থায় মৃত্যুর সম্মুখীন হয় আর সে ঐ বিষয়ে ওসীয়ত করে তাহলে তার ওয়ালী বা তত্ত্বাবধায়ক তার পক্ষ হতে প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকীনকে অর্ধ সা'আ গম কিংবা এক সা'আ খেজুর বা যব দান করবে। কেননা জীবনের শেষ মুহূর্তে সে রোযা আদায় করতে অপরাগ হয়েগেছে। সুতরাং সে 'শায়খে ফানী'-এর অনুরূপ হয়ে যাবে।

তবে আমাদের মতে ওসীয়ত করে যাওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। যাকাতের ক্ষেত্রেও এই মতভিন্নতা রয়েছে। এটাকে তিনি বান্দাদের ঋণের উপর কিয়াস করেন।[১] কেননা দু'টোই অর্থ সংক্রান্ত হক, যাতে স্থলবর্তিতা কার্যকর হবে।

---

১. অর্থাৎ তার উপর মানুষের যে সকল ঋণ রয়েছে, সেগুলো যেমন ওসীয়ত না করলেও আদায় করতে হয়, তেমনি এটাও ওসীয়ত ছাড়াই আদায় করতে হবে।

আমাদের দলীল এই যে, এটা ইবাদত। আর তাতে ইচ্ছার প্রয়োগ অপরিহার্য। আর তা ওসীয়তের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, উত্তরাধিকার-এর মাধ্যমে নয়। কেননা উত্তরাধিকারিতা তো বাধ্যতামূলক ব্যাপার। আর যেহেতু এই ওসীয়ত একটি নতুন দান, সুতরাং তা সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে কার্যকরী।

মাশায়েখগণের সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী নামায রোযার মতই[১০] এবং প্রতিটি নামায এক-দিনের রোযার সমান। এটিই বিশুদ্ধ মত।

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওয়ালী নিজে সিয়াম পালন করবে না বা সালাত আদায় করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : لَايَصُوْمُ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ وَلَايُصَلِّيْ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ –কেউ কারো পক্ষ থেকে সিয়াম পালন করবে না এবং কেউ কারো পক্ষ থেকে সালাত আদায় করবে না।

যে ব্যক্তি নফল নামায কিংবা নফল রোযা শুরু করলো অতঃপর তা নষ্ট করে ফেললো, সে তা কাযা করবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর দলীল এই যে, আদায়কৃত অংশটুকু সে স্বেচ্ছায় করেছে। সুতরাং পরবর্তী যেটুকু সে স্বেচ্ছায় করেনি, তা তার উপর অনিবার্য হতে পারে না।

আমাদের দলীল এই যে, আদায়কৃত অংশটুকু একটি আমল ও ইবাদত। সুতরাং অব্যাহত রাখার মাধ্যমে উক্ত আমলকে বাতিল হওয়া থেকে হিফাযত করা ওয়াজিব হবে। আর যখন পূর্ণ করা ওয়াজিব, তখন তা তরক করার কারণে কাযা করাও ওয়াজিব হবে।

আমাদের নিকট দু'টি বর্ণনার একটি বর্ণনা মতে বিনা ওযরে সিয়াম ভংগ করা জাইয নয়। এর কারণ ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি। অবশ্য ওযরের কারণে জাইয হবে। মেহমানদারি গ্রহণ করাও একটি ওযর। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : اَفْطِرْ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ –রোযা ভংগ কর এবং তদস্থলে একদিন কাযা সিয়াম পালন কর।

বালক যদি রমাযানের দিবসে প্রাপ্তবয়স্ক হয় কিংবা কাফির যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে উভয়ে দিনের অবশিষ্ট অংশ (পানাহার থেকে) বিরত থাকবে। যাতে (রোযাদারদের সংগে) সাদৃশ্যের মাধ্যমে সময়ের হক আদায় করা যায়।

তবে যদি দিনের অবশিষ্ট অংশে তারা পানাহার করে ফেলে তাহলে তাদের উপর কাযা ওয়াজিব হবে না। কেননা ঐ দিনে তার সিয়াম ওয়াজিব ছিল না।

তবে পরবর্তী দিনগুলোতে সিয়াম পালন করবে। কেননা সিয়ামের (ওয়াজিব হওয়ার) কারণ এবং (তা আদায় করার) যোগ্যতা সাব্যস্ত হয়েছে।

---

১০. কিয়াসের দাবী হলো নামাযের ক্ষেত্রে ফিদ্ইয়া জাইয না হওয়া। কেননা জীবদ্দশায় নামায মাল দ্বারা আদায় হয় না। সুতরাং মৃত্যুর পরও আদায় হবে না। কিন্তু মাশায়েখগণের সূক্ষ্ম চিন্তার কারণ এই যে, নামায এই হিসাবে রোযার সদৃশ যে, উভয়টি দৈহিক ইবাদত।

আর সেই দিনটির এবং পূর্ববর্তী দিনগুলোর কাযা করবে না। কেননা (ঐ দিনগুলোতে তার প্রতি) সিয়ামের নির্দেশ ছিল না। এটি সালাতের বিপরীত।[১১]

কেননা সালাতের ক্ষেত্রে (ওয়াজিব হওয়ার) কারণ হলো সময়ের আদায়ের নিকটবর্তী অংশটি। আর সেই মুহূর্তটিতে (উভয়ের মধ্যে সালাত আদায় করার) যোগ্যতা পাওয়া গেছে। পক্ষান্তরে সিয়ামের ক্ষেত্রে (ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো) দিনের প্রথম অংশটি। আর সেই মুহূর্তে যোগ্যতা অনুপস্থিত ছিল।

ইমাম আবূ ইসুফুফ (র.)-এর মতে যদি যাওয়ালের পূর্বে কুফরি বা অপ্রাপ্তবয়স্কতা বিলুপ্ত হয় তাহলে তার উপর সাওমের কাযা ওয়াজিব হবে। কেননা সে নিয়্যতের সময় পেয়েছে যাহেরী রিওয়ায়াতের কারণ এই যে, ওয়াজিব হওয়ার দিক থেকে সাওম বিভাজ্য নয়। আর দিবসের প্রথমাংশে ওয়াজিব হওয়ার যোগ্যতা ছিল না। তবে বালকের ক্ষেত্রে এই অবস্থায় নফল সিয়ামের নিয়্যত করা জাইয রয়েছে। কিন্তু কাফিরের ক্ষেত্রে নেই, যেমন মাশায়েখগণ বলেছেন। কেননা কাফির (দিনের প্রথমাংশ) সিয়াম পালনের যোগ্য ছিল না। আর বালক নফলের যোগ্য ছিল।

মুসাফির যদি (রমাযানের ছাড়া অন্য সময়ে) সিয়াম না রাখার নিয়্যত করে অতঃপর যাওয়ালের পূর্বে শহরে প্রবেশ করে সিয়ামের নিয়্যত করে নেয় তাহলে (সিয়াম বৈধ হওয়ার জন্য) তা যথেষ্ট হবে। কেননা সফর সিয়াম ওয়াজিব হওয়ার যোগ্যতার বিরোধী নয় এবং সিয়াম শুরু করার বৈধতারও বিরোধী নয়।

আর যদি বিষয়টি রমাযানের দিবসে হয় তা হলে সিয়াম পালন তার জন্য ওয়াজিব। কেননা নিয়্যতের সময় সীমার মাঝেই রুখসতের কারণের অবসান ঘটেছে।

দেখুন না যদি সে দিবসের প্রথমাংশে মুকীম থাকতো, অতঃপর সফরে বের হতো তাহলে মুকীম হওয়ার দিকটিকে অগ্রাধিকার প্রদানের প্রেক্ষিতে সিয়াম ভংগ করা তার জন্য বৈধ হতো না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বৈধ না হওয়াই অধিকতর সংগত। তবে উভয় ক্ষেত্রে যদি সিয়াম ভংগ করে ফেলে তাহলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, বৈধতার সন্দেহ বিদ্যমান রয়েছে।

যে ব্যক্তি রমাযানের দিবসে বেহুঁশ হয়ে গেল, সে সেদিনের সিয়ামের কাযা করবে না যেদিন বেহুঁশ হয়েছে। কেননা ঐ দিবসটিতে সিয়াম অর্থাৎ (পানাহার ও সংগম থেকে) বিরতি পাওয়া গেছে। কারণ, বাহ্যতঃ নিয়্যত বিদ্যমান থাকাটাই স্বাভাবিক।

পরবর্তী দিনগুলোর কাযা করতে হবে। কেননা নিয়্যত পাওয়া যায়নি।

যদি রমাযানের প্রথম রাত্রেই বেহুঁশ হয়ে যায় তাহলে ঐ রাত্রের পরবর্তী দিবসটি ছাড়া পূর্ণ রমাযানের কাযা করবে। এর কারণ আমরা ইতোপূর্বে বলেছি।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, পরবর্তী দিনগুলোর রোযাও কাযা করবে না। কেননা তার মতে ই'তিকাফের ন্যায় রমাযানের সিয়ামও একই নিয়্যতে আদায় হয়ে যায়।

১১. অর্থাৎ যেই ওয়াক্তে অপ্রাপ্ত বয়স্কতা বা কুফুরী বিলুপ্তি হবে সেই ওয়াক্তের সালাত ওয়াজিব হবে।

আর আমাদের মতে প্রত্যেক দিনের জন্য স্বতন্ত্র নিয়্যত অপরিহার্য। কেননা এগুলো বিচ্ছিন্ন ইবাদত। কারণ প্রতি দুই দিনের মাঝে এমন সময়, যা উক্ত ইবাদতের সময়ভুক্ত নয়। ই'তিকাফের বিষয়টি এর বিপরীত।

যে ব্যক্তি পুরো রমাযান মাস বেহুঁশ অবস্থায় থাকে সে তা কাযা করবে। কেননা, সংজ্ঞাহীনতা হলো এক ধরনের অসুস্থতা, যা শক্তিকে দুর্বল করে দেয়, কিন্তু তা আকলকে বিলুপ্ত করে না। সুতরাং তা সাওমকে বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে ওযর রূপে গণ্য হবে, রহিত করার ক্ষেত্রে নয়।

যে ব্যক্তি পুরো রমাযান পাগল থাকে, সে তার কাযা করবে না।

ইমাম মালিক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি এটাকে বেহুঁশীর উপর কিয়াস করেন।

আমাদের দলীল এই যে, প্রকৃতপক্ষে রহিতকারী হলো কষ্টে-সাধ্য হওয়া; আর বেহুঁশী সাধারণত ঃ মাস ব্যাপী হয় না। সুতরাং তা কষ্টসাধ্য নয়। পক্ষান্তরে মস্তিষ্ক বিকৃতি মাসব্যাপী হতে পারে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে অসুবিধা আপতিত হবে।

যদি বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি রমাযানের কোন অংশে সুস্থতা লাভ করে তাহলে সে বিগত দিনগুলোর কাযা করবে।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা উভয়ে বলেন, যোগ্যতা না থাকার কারণে তার উপর আদায় করা ওয়াজিব হয়নি। আর কাযা প্রবর্তিত হয় আদায় ওয়াজিব হওয়ার ভিত্তিতে। সুতরাং সে পূর্ণ রমাযানব্যাপী বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির মত হবে।

আমাদের দলীল এই যে, রোযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ অর্থাৎ রমাযান মাস তো বিদ্যমান রয়েছে। আর যোগ্যতা দায়িত্ব পালনে সক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত।

আর এ ক্ষেত্রে ওয়াজিব হওয়ার ফলাফল রয়েছে।[১২] আর তা হলো (শরীআতের পক্ষ হতে) এমনভাবে দায়বদ্ধ হওয়া, যা আদায় করতে কোন অসুবিধা হবে না। মাসব্যাপী বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সে ক্ষেত্রে আদায়ে অসুবিধা রয়েছে। সুতরাং ওয়াজিব হওয়ার কোন ফলাফল নেই। পূর্ণ আলোচনা মতপার্থক্য বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে রয়েছে।

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্ব থেকেই মস্তিষ্ক বিকৃতি থাকা এবং পরবর্তীতে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটা এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেউ কেউ বলেন, তা হল যাহেরী রিওয়ায়াত অনুসারে।

---

১২. কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, যোগ্যতা প্রসংগে আপনাদের বক্তব্য যদি সঠিক হয় তাহলে তো মাসব্যাপী বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির উপরও রোযার কাযা ওয়াজিব হওয়ার কথা। এই সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর হিসাবে উপরোক্ত কথা বলা হয়েছে যে, ওয়াজিব হওয়ার ফায়দা হলো 'কাযা'-এর আবশ্যকতা সাব্যস্ত করার মাঝে। আর ওযর যখন দীর্ঘ হয়ে যায় (এবং এক্ষেত্রে দীর্ঘতার মাপকাঠী হলো পূর্ণ মাস তা বিদ্যমান থাকে।) তখন সেটা কাযা করা কষ্টকর ও অসুবিধাজনক। আর অসুবিধা শরীআতের পক্ষ হতে রহিত। সুতরাং কাযা ওয়াজিব হবে না। আর কাযা ওয়াজিব না হলে রোযা ওয়াজিব করার কোন সার্থকতা থাকলো না।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কেননা যদি সে বিকৃত মস্তিষ্ক অবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক হয় তাহলে সে অপ্রাপ্ত-বয়স্কের সংগেই যুক্ত তখন শরীআতের পক্ষ থেকে তার প্রতি নির্দেশ অনুপস্থিত। যদি সুস্থ মস্তিষ্ক অবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক হয় তারপর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে, তার অবস্থা তার বিপরীত। আর এটা হল পরবর্তী কোন কোন মাশায়েখগণের কাছে গ্রহণীয়।

যে ব্যক্তি পূর্ণ রমাযান (বিরতি পালন সত্ত্বেও) রোযা রাখার বা না রাখার কোন নিয়ত করেনি, তার উপর পূর্ণ রমাযানের কাযা ওয়াজিব হবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, রমাযানের রোযা সুস্থ ও মুকীম ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিয়্যত ছাড়াই আদায় হয়ে যাবে। কেননা সংযম পালন তার উপর অপরিহার্যকৃত বিষয়। সুতরাং যেভাবেই সে তা আদায় করবে, তা তার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। যেমন (নিয়্যত ছাড়া) কেউ পূর্ণ নিসাব কোন ফকীরকে দান করে দিল (তবে যাকাত আদায় হয়ে যায়)।

আমাদের দলীল এই যে, বান্দার উপর ফরযকৃত বিষয় হলো ইবাদত হিসাবে সংযম পালন করা। আর নিয়্যত ছাড়া ইবাদত হয় না। আর পুরা নিসাব দান করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সওয়াবের নিয়্যত বিদ্যমান রয়েছে। যাকাত অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি রোযার নিয়্যত না করেই ভোর করেছে, এরপর পানাহারও করেছে, তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না– ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কেননা তাঁর মতে নিয়্যত ছাড়া রোযা আদায় হয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, যাওয়ালের পূর্বে যদি পানাহার করে তাহলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কেননা সে ফরয আদায়ের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং সে গসবকারী ব্যক্তির নিকট থেকে গসবকারীর ন্যায় হলো।[১৩]

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, কাফ্ফারার সম্পর্ক হলো ফাসিদ করার সাথে। কিন্তু এটা তো বিরত থাকা। কেননা নিয়্যত ছাড়া রোযাই নেই।

রোযা অবস্থায় যদি স্ত্রী লোকের ঋতুস্রাব হয় কিংবা সন্তান প্রসব করে তাহলে তার রোযা ভেংগে যাবে এবং তার কাযা করতে হবে। সালাতের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা (সংখ্যাধিক্যের কারণে) নামায কাযা করতে হলে সে অসুবিধার সম্মুখীন হবে। সালাত অধ্যায়ে এ আলোচনা বিগত হয়েছে।

---

১৩. অর্থাৎ একজন কোন একটি জিনিস মালিকের নিকট হতে জোরপূর্বক নিয়ে নিলো। পরে তার নিকট হতে আরেক ব্যক্তি একইভাবে জোরপূর্বক তা নিয়ে গেলো। এখন মালিক প্রথম ব্যক্তির নিকট ক্ষতি পূরণ দাবী করতে পারে। কেননা সে মূল জিনিসটা নষ্ট করেছে। আবার দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকটও ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে। কেননা সে প্রথম ব্যক্তির ফেরত দেয়ার সম্ভাবনা নষ্ট করেছে। মোট কথা সম্ভাবনা নষ্ট করার দায়বদ্ধতা সাব্যস্ত হলো।

মুসাফির যদি রমাযানের দিবসের কোন অংশে (বাড়িতে) ফিরে আসে কিংবা ঋতুগ্রস্ত স্ত্রী লোক যদি পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে দিনের অবশিষ্ট অংশ তারা বিরতি পালন করবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, বিরতি পালন ওয়াজিব নয়। আর এই মতপার্থক্য রয়েছে ঐ সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেও, যারা রোযা ওয়াজিব হওয়ার যোগ্য হয়ে যায়, অথচ দিবসের শুরুতে তাদের যোগ্যতা ছিল না। তিনি বলেন, সাদৃশ্যের অবলম্বন হলো মূলের স্থলবর্তী। সুতরাং এটি তার উপরই ওয়াজিব হবে, যার উপর মূল রোযা ওয়াজিব হয়েছিল, যেমন কেউ রোযা ভেংগে ফেলল ইচ্ছাকৃতভাবে বা বিভ্রান্তিতে।[১৪]

আমাদের দলীল এই যে, তা ওয়াজিব হয়েছে সময়ের হক আদায়ের জন্য, স্থলবর্তী হিসাবে নয়। কেননা, এটি হলো মর্যাদাপূর্ণ সময়। ঋতুগ্রস্ত, নিফাসগ্রস্ত, অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তিগণের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা এ সকল ওযর বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাদের উপর বিরতি পালন ওয়াজিব নয়। কেননা এগুলো রোযার ক্ষেত্রে যেমন প্রতিবন্ধক, তেমনি সাদৃশ্যের ক্ষেত্রেও।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***কেউ যদি এই মনে করে সাহরী খায় যে, এখনও ফজর হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে জানা গেলো যে, আসলে তখন ফজর হয়ে গিয়েছিল, কিংবা কেউ একথা মনে করে ইফতার করলো যে, সূর্য অস্ত গিয়েছে, কিন্তু পরে জানা গেলো যে, সূর্য তখনও অস্ত যায়নি, তাহলে ঐ দিনের অবশিষ্ট সময় সে বিরতি পালন করবে।*** উদ্দেশ্য হলো যথাসম্ভব সময়ের মর্যাদা রক্ষা করা কিংবা অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকা।

তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব। কেননা রোযা আদায় করার হুকুম এমন একটি হক, যা অনুরূপ আমলের মাধ্যমে আদায় করা তার যিম্মায় রয়েছে। যেমন অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফিরের ক্ষেত্রে। তবে তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব নয়। কেননা, ইচ্ছা না থাকায় অপরাধ এখানে লঘু। এ প্রসংগে উমর (রা.) বলেছেন, গুনাহ করার মনোবৃত্তি আমাদের ছিল না। আর একদিনের রোযা কাযা করা আমাদের পক্ষে সহজ।

উল্লেখিত ফজর দ্বারা দ্বিতীয় ফজর (সুবিহ সাদিক) উদ্দেশ্য। সালাত অধ্যায়ে আমরা তা ব্যাখ্যা করে এসেছি।

আর সাহরী খাওয়া মুস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السُّحُوْرِ بَرَكَةً। –তোমরা সাহরী খাও। কেননা সাহরীতে বরকত রয়েছে। তবে সাহরীকে বিলম্বিত করা মুস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ ثَلَاثٌ مِنْ اَخْلَاقِ الْمُرْسَلِيْنَ تَعْجِيْلُ الْاِفْطَارِ وَتَاْخِيْرُ السُّحُوْرِ وَالسِّوَاكُ। –তিনটি বিষয় রাসূলগণের আচরণের অন্তর্ভুক্ত। ইফতার তরান্বিত করা, বিলম্বে সাহরী খাওয়া এবং মিসওয়াক করা।

তবে যদি ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, অর্থাৎ ফজর উদয় হয়েছে কি হয়নি, উভয়ের সম্ভাবনাই সমান।

---

১৪. যেহেতু তাদের উপর মূল রোযা ফরয ছিল, তাই তাদের জন্য সাদৃশ্য পালন ওয়াজিব। যা অনুরূপ আদায়ের মাধ্যমে আদায় তার ফিদইয়া জরুরী।

তখন পানাহার পরিহার করাই উত্তম, যাতে হারাম থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু তার উপর তা ওয়াজিব নয়। সুতরাং যদি পানাহার করে তবে তার রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা রাত্র বিদ্যমান থাকা হলো মূল অবস্থা। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত। যদি সে এমন কোন স্থানে থাকে, যেখানে ফজর বোঝা যায় না, কিংবা পূর্ণিমার রাত হয় কিংবা মেঘাচ্ছন্ন রাত হয় কিংবা তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয় আর এই সকল কারণে তার সন্দেহ হয়, তাহলে পানাহার করবে না। যদি করে তাহলে সে গুনাহ্গার হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ –যা তোমাকে সন্দেহ ফেলে তা পরিহার করে ঐ বিষয় গ্রহণ কর, যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না।

যদি তার প্রবল ধারণা এই হয় যে, সে ফজর উদয় হওয়া অবস্থায় পানাহার করেছে, তাহলে প্রবল ধারণার উপর আমল হিসাবে কাযা করা তার উপর ওয়াজিব হবে। এতেই সতর্কতা রয়েছে।

তবে যাহির রিওয়ায়াতে অনুযায়ী তার উপর কাযা নেই। কেননা, কোন নিশ্চিত বিষয় অনুরূপ নিশ্চিত বিষয় ছাড়া বিলুপ্ত হয় না।

যদি প্রকাশ পায় যে, ফজর উদিত হয়েছে, তাহলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে মূল অবস্থার উপর বিষয়টির ভিত্তি করেছে। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার সাব্যস্ত হয় না।

যদি সূর্যাস্তের ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তাহলে তার জন্য ইফতার করা জাইয হবে না। কেননা এখানে দিন অব্যাহত থাকাই হলো মূল অবস্থা।

যদি পানাহার করে তাহলে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে মূল অবস্থা কার্যকর করার প্রেক্ষিতে।

আর যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, সে ফজরের সূর্যাস্তের পূর্বে পানাহার করেছে তাহলে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। বিষয়ে একই বর্ণনা রয়েছে (এতে কোন দ্বিমত নেই)। কেননা দিবস অব্যাহত থাকাই হলো মূল অবস্থা। যদি এ বিষয়ে সন্দিহান হয় আর পরে প্রকাশ পায় যে, সূর্য অস্ত যায়নি, তাহলে মূল অবস্থার অর্থাৎ দিবস অব্যাহত থাকার দিকে লক্ষ্য করে কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়াই উচিত।[১৫]

যে ব্যক্তি রমাযানের দিবসে ভুলে পানাহার করে ফেললো এবং (অজ্ঞতাবশতঃ) ধারণা করে বসলো যে, ভুলক্রমের পানাহার রোযা ভংগ করে, তাই অতঃপর সে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলো, তাহলে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা তার ধারণা কিয়াস নির্ভর ছিল।[১৬] সুতরাং এখানে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। যদি এতদ্সংক্রান্ত হাদীছ তার গোচরে এসেও থাকে তবুও যাহেরী রিওয়ায়াত মতে একই হুকুম।[১৭]

---

১৫. এভাবে বলার কারণ এই যে বিষয়টিতে মাশায়েখগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১৬. কেননা কিয়াসের দাবী তো এটাই যে পানাহারের কারণে রোযা ভংগ হয়ে যায়।

১৭. হাদীছে এসেছে- "রোযাদার অবস্থায় রোযার কথা ভুলে গিয়ে যে ব্যক্তি পানাহার করে ফেলেছে, সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ্ তাকে আহার করিয়েছেন এবং পান করিয়েছেন।"

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি মত বর্ণিত আছে যে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। কেননা এখানে অস্পষ্টতা নেই, সুতরাং সন্দেহেরও অবকাশ নেই।

প্রথমোক্ত মতের দলীল এই যে, কিয়াসের দিকে লক্ষ্য করলে 'নীতিগত সংশয়' অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং অবগতির কারণে তা রহিত হবে না। যেমন পুত্রের দাসীর সংগে পিতার সংগমের বিষয়।[১৮]

যদি কেউ শিংগা লাগায় আর ধারণা করে যে তাতে রোযা ভংগ হয়ে যায়, এরূপর ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে ফেলে তাহলে, তার উপর কাযা ও কাফ্ফার দু'টোই ওয়াজিব হবে। কেননা এ ধারণা শরীআতী কোন দলীলের উপর নির্ভরশীল নয়। তবে যদি কোন নির্ভরযোগ্য ফকীহ্ রোযা ফাসিদ হয়েছে বলে ফাতওয়া দান করে থাকেন। কেননা তার জন্য ফাতওয়া শরীআতী দলীল রূপেগণ্য।

আর যদি তার নিকট এতদসংক্রান্ত হাদীছ[১৯] পৌছে থাকে এবং তার উপর সে নির্ভর করে থাকে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একই হুকুম হবে। (অর্থাৎ কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।) কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী মুফতির ফাতওয়ার নিম্নে যেতে পারে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট থেকে এর বিপরীত মত (অর্থাৎ কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার মত) বর্ণিত হয়েছে। কেননা সাধারণ লোকের পক্ষে যেহেতু হাদীছ জানা ও বোঝা সম্ভব নয়। সেহেতু ফকীহ্গণের ইকতিদা ও অনুসরণ করাই তার অবশ্য কর্তব্য।

যদি হাদীছের ব্যাখ্যা জেনে থাকে তাহলে সংশয় রহিত হওয়ার কারণে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর কিয়াসের বিপরীত হওয়ার কারণে ইমাম[২০] আওযায়ী (র.)-এর মতামত সংন্দেহ সৃষ্টিকারী বলে গণ্য হবে না।

গীবত করার পর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে বসে তাহলে যে ভাবেই করে থাকুক[২১] কাযা ও কাফ্ফারা দু'টোই তার উপর ওয়াজিব হবে। কেননা গীবতের কারণে রোযা ভংগ হওয়া কিয়াসের বিপরীত। আর সংশ্লিষ্ট হাদীছ সর্বসম্মত ভাবেই অন্য (অর্থাৎ সাওয়াব না হওয়ার) অর্থে পযোজ্য।

---

১৮. কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ انت ومالك لابيك –তুমি এবং (তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য। এ হাদীছ তো দাবী করে যে, পুত্রের সম্পদ পিতারই মালিকানাধীন। কিন্তু অন্য একটি দলীল দ্বারা তা রহিত হয়েছে। সুতরাং পিতার দিকে পুত্রের সম্পদের সম্বোধন ‸ সন্দেহ উদ্রেককারী রূপে থেকেই যাবে। সুতরাং রহিতকারী দ্বিতীয় দলীলটি জানা ও না জানা– দুটোই সমান হবে। কেননা সন্দেহটির মূল রয়েছে।

১৯. হাদীছটি এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একবার রমাযানের দিবসে এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন শিংগা লাগাচ্ছিল। তা দেখে তিনি বললেন, যে শিংগা লাগাচ্ছে ও যাকে শিংগা লাগাচ্ছে, উভয়ের রোযা ভংগ হয়ে গেছে।

২০. ইমাম আওযায়ী (র.)-এর মতে শিংগা লাগালে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়।

২১. অর্থাৎ চাই এ ধারণা করে থাকুক যে, গীবত রোযাদারের রোযা ভংগ করে দেয়। কেননা এ বিষয়ে হাদীছ রয়েছে; কিংবা কোন মুফতীকে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি রোযা ফাসিদ হওয়ার হুকুম দিয়ে থাকুন।

যদি ঘুমন্ত কিংবা বিকৃত মস্তিষ্ক স্ত্রী লোকের সংগে সংগম করা হয় আর ঐ স্ত্রীলোক রোযাদার থাকে তাহলে স্ত্রীলোকটির উপর কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

ইমাম যুফার ও শাফিঈ (র.) বলেন, ঐ স্ত্রী লোকদ্বয়ের উপর কাযাও ওয়াজিব হবে না। এটা তাঁরা বলেছেন ভুলে পানাহারকারীর উপর কিয়াস করে। বরং এদের ওযর আরো প্রবল। কেননা এখানে তাদের কোন ইচ্ছাই পাওয়া যায়নি।

আমাদের দলীল এই যে, ভুল সচরাচর হয়ে থাকে। আর উক্ত ঘটনাবলী বিরল।[২২] কাফ্ফারা ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হলো (তার পক্ষ থেকে) অপরাধ না হওয়া।

পরিচ্ছেদ ঃ সে সিয়াম প্রসঙ্গে যা বান্দা নিজের উপর ওয়াজিব করে

কেউ যদি বলে আল্লাহর ওয়াস্তে কুরবানীর দিনে আমার যিম্মায় সিয়াম, সে ঐ দিন সাওম পালন না করে কাযা করবে।

অর্থাৎ আমাদের নিকট এই মান্নত বিশুদ্ধ। ইমাম যুফার ও শাফিঈ (র.) এ সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করেন।

তাদের বক্তব্য এই যে, সে এমন বিষয়ের মান্নত করেছে, যা গুনাহ। কেননা এই দিনগুলোতে সাওম পালনের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (সুতরাং তার মান্নত সংঘটিত হবে না)।

আমাদের দলীল এই যে, সে শরীআত প্রমাণিত রোযার মান্নত করেছে। আর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ভিন্ন কারণে। সেটা হলো আল্লাহর দাওয়াতে সাড়াদান বর্জন করা। সুতরাং মান্নত তো শুদ্ধ হবে। তবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট গুনাহ্ পরিহার করার উদ্দেশ্যে সিয়াম থেকে বিরত থাকবে। এরপর তা কাযা করবে যিম্মার ওয়াজিব আদায়ের জন্য।

আর যদি সে দিন রোযা রেখে ফেলে তাহলে সে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা সে যেভাবে নিজের উপর বাধ্যবাধকতা করেছিলো, সেভাবেই আদায় করেছে।

যদি উপরোক্ত বাক্য দ্বারা কসমের নিয়্যত করে থাকে, তাহলে তার উপর কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। যদি সে সেদিন রোযা না রেখে থাকে।

আলোচ্য মাসআলাটি মোট ছয় প্রকার। প্রথমতঃ (উক্ত বাক্য দ্বারা কসম বা নযর) কোনটারই নিয়্যত করল না। দ্বিতীয়তঃ শুধু নযরের নিয়্যত করলো, অন্য কিছু নিয়্যত করলো না। তৃতীয়তঃ নযরের নিয়্যত করলো এবং ইয়ামীন না হওয়ার নিয়্যত করলো, এই তিন অবস্থায় নযর হবে। কেননা বাক্যটি শব্দগত দিক থেকেই 'নযর' নির্দেশক। আর তা কেন হবে না। অথচ তার নিয়্যত দ্বারা নযরকে স্থির করেছে।

যদি সে উক্ত বাক্য দ্বারা কসমের নিয়্যত করে থাকে এবং নযর না হওয়ার নিয়্যত করে থাকে, তাহলে তা কসম হবে। কেননা, উক্ত বাক্যে কসমের সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা সে নিয়্যত দ্বারা নির্ধারিত করে নিয়েছে এবং অন্যটিকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে।

---

২২. কাজেই একে ভুলের উপর কিয়াস করা যায় না।

যদি উভয়টির নিয়্যত করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নযর ও কসম দুটোই হবে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে শুধু নযর হবে।

আর যদি কসমের নিয়্যত করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একই হুকুম হবে (অর্থাৎ নযর ও ইয়ামীন দু'টোই হবে)। কিন্তু আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে শুধু কসম হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলীল এই যে, এ বাক্যের মৌলিক অর্থ হল নযর। আর কসমের অর্থ হলো রূপক। এ কারণেই প্রথমটি নিয়্যতের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু দ্বিতীয়টি নিয়্যতের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এ বাক্য একই সংগে উভয় অর্থ অন্তর্ভুক্ত করবে না।[২৩]

সুতরাং নিয়্যতের দ্বারা রূপক অর্থ নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর উভয়টি নিয়্যত করার ক্ষেত্রে মূল অর্থই অগ্রাধিকার লাভ করবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলীল এই যে, নযর ও কসম এ উভয়ের লক্ষ্যের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা উভয়টির চাহিদা হল ওয়াজিব হওয়া। তবে 'নযর' তা দাবী করে স্বকীয়ভাবে আর কসম তা দাবী করে ভিন্ন কারণে।[২৪] সুতরাং উভয় দলীলকে কার্যকরী করার জন্য উভয় অর্থকে এখানে আমরা একত্র করেছি, যেমন বিনিময় শর্তে 'হেবা'-এর ক্ষেত্রে দান ও বিনিময়-এ উভয় দিক কে আমরা একত্র করেছি।[২৫]

যদি সে বলে যে, আমার যিম্মায় আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এই বছরের রোযা। তাহলে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও তাশরীকের দিনগুলোতে রোযা হতে বিরত থাকবে এবং পরবর্তীতে সেগুলোর কাযা আদায় করে নিবে। কেননা নির্দিষ্ট বছরের নযরের মধ্যে অর্থ এই দিনগুলোর নযরও অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ হুকুম যদি বছর নির্ধারণ না করে কিন্তু লাগাতার হওয়ার শর্ত আরোপ করে। কেননা লাগাতার হওয়া ঐ দিনগুলো থেকে মুক্ত হতে পারে না। তবে এই সুরতে সেই দিনগুলোর রোযা ধারাবাহিক কাযা করবে, যথাসম্ভব লাগাতারের মর্ম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে।

আর এখানেও ইমাম যুফার ও শাফিঈ (র.)-এর ভিন্নমত প্রযুক্ত হবে। কেননা এই দিনগুলোতে রোযা নিষিদ্ধ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ اَلَا لَا تَصُوْمُوْا فِيْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ فَاِنَّهَا اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ –শোনো, এ দিনগুলোতে রোযা রেখো না, এগুলো হচ্ছে পানাহার ও সহবাসের দিন।

---

২৩. অথচ মূল ও রূপক উভয় অর্থের একত্র সমাবেশ বৈধ নয়।

২৪. কেননা উপরোক্ত শব্দটি নিজ মর্মে ওয়াজিব ছাবিত করে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করো' এবং 'তারা যেন তাদের নযরসমূহ পূর্ণ করে।' আর কসমও ওয়াজিব হওয়া দাবী করে ভিন্ন কারণে; অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামকে অসম্মান থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। যখন সে কসম ও নযর উভয়ের নিয়্যত গ্রহণ করবে। মূল ও রূপক উভয় অর্থকে একত্র করার হিসাবে নয়, বরং ভিন্ন নির্দেশ পালনের জন্য।

২৫. এখানে 'হিবা' শব্দের দিকে লক্ষ্য করে বিষয়টিকে শুরুতে হিবা রূপে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু বিনিময়ের দিকে লক্ষ্য করে পরবর্তীতে এটাকে 'বিক্রয়' রূপে বিবেচনা করা হয়। তাইতো দান বা হেবা হিসাবে 'কবয' সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে তা প্রত্যাহার করার অবকাশ রয়েছে। পক্ষান্তরে বিক্রয় হিসাবে তাতে শোফা দাবী করার অধিকার অর্জিত হয়।

আমরা পূর্বে রোযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ এবং হাদীছের ব্যাখ্যা বর্ণনা করে এসেছি।

আর যদি লাগাতার রাখার শর্ত না করে থাকে তাহলে এই দিনগুলোতে রোযা রাখা যথেষ্ট হবে না। কেননা যে রোযা সে নিজের যিম্মায় লাযিম করেছে, তার পরিপূর্ণ হওয়াটাই হলো স্বাভাবিক। আর এ দিনগুলোতে আদায়কৃত রোযা হবে ক্রটিপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে।

পক্ষান্তরে যদি বছর নির্ধারণ করে থাকে তাহলে এই দিনগুলোতে রোযা রাখা যথেষ্ট হবে। কেননা সে ক্রটির গুণসহ নিজের যিম্মায় লাযেম করেছিল। সুতরাং নিজের উপর আরোপিত গুণ অনুযায়ী আদায় হবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***তবে যদি সে এই বাক্য দ্বারা কসমের নিয়্যত করে থাকে, তাহলে কসমের কাফ্ফারা তার উপর ওয়াজিব হবে।*** এ বাক্যটির বিভিন্ন প্রকার পিছনে বর্ণিত হয়েছে।

যে ব্যক্তি কুরবানীর দিন রোযা অবস্থায় সকাল যাপন করে অতঃপর রোযা ভংগ করে ফেলে, তার উপর (কাযা কাফ্ফারা) কিছুই ওয়াজিব হবে না।

তবে নাওয়াদির (বা অপ্রকাশিত বর্ণনা) মতে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। কেননা কোন আমল শুরু করা ঐ আমলকে লাযিম করে, যেমন নযর করা আমলকে লাযিম করে। এটা মাকরূহ ওয়াক্তে (নফল) সালাত শুরু করার মতো হলো।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত অনুসারে– আর এটি যাহির রিওয়ায়াত পার্থক্যের কারণ এই যে, রোযা শুরু করা মাত্র লোকটিকে রোযাদার বলা হয়। এ কারণেই রোযা না রাখার কসমকারী ব্যক্তি এই দিন রোযা শুরু করা মাত্র কসম ভংগকারী হয়ে যাবে। সুতরাং রোযা শুরু করা দ্বারা সে গুনাহে লিপ্ত বলে সাব্যস্ত হবে তাই তা বাতিল করা ওয়াজিব হবে, অতএব তা রক্ষা করা ওয়াজিব হবে না। আর এর উপরই কাযা ওয়াজিব হওয়া নির্ভর করে। কিন্তু শুধু 'নযর'-এর কারণে গুনাহে লিপ্ত বলে সাব্যস্ত হবে না। আর নযরই হলো রোযাকে ওয়াজিবকারী।

তদ্রূপ শুধু সালাত শুরু করার দ্বারা গুনাহে লিপ্ত বলা যায় না। যতক্ষণ না এক রাকাআত পূর্ণ করে। একারণেই নামায না পড়ার কসমকারী ব্যক্তি নামায শুরু করার করণে কসম ভংগকারী বলে সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং আদায়কৃত অংশকে রক্ষা করা ওয়াজিব হবে। তাই কাযা করা তার যিম্মায় এসে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নামাযের ক্ষেত্রেও কাযা ওয়াজিব হবে না। তবে প্রথমোক্ত মতই অধিক প্রবল। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ই'তিকাফ

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***ই'তিকাফ হলো মুস্তাহাব।*** তবে শুদ্ধতম এই যে, তা সুন্নতে মুআক্কাদা। কেননা নবী করীম (সা.)-এর শেষ দশদিন নিয়মিত্‌ ভাবে তা পালন করেছেন। আর নিয়মিত আমল সুন্নত প্রমাণ করে।

ই'তিকাফ অর্থ সায়েম অবস্থায় মসজিদে ই'তিকাফের নিয়্যতসহ অবস্থান করা। অবস্থান করাতো ই'তিকাফের রুকন। কেননা ই'তিকাফ শব্দটি অবস্থানের অর্থ প্রদান করে। সুতরাং অবস্থান দ্বারাই ই'তিকাফের অস্তিত্ব হবে। আমাদের নিকট সাওম হলো ই'তিকাফের শর্ত। ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। আর নিয়্যত হলো সমস্ত ইবাদতের শর্ত। তিনি বলেন, সাওম একটি ইবাদত এবং তা স্বতন্ত্র ও মৌলিক ইবাদত। সুতরাং তা অন্য ইবাদতের শর্ত হতে পারে না।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর বাণী ঃ لاَ اعْتِكَافَ اِلاَّ بِالصَّوْمِ ই'তিকাফ হয় না সাওম ব্যতীত।

আর বর্ণিত হাদীছের মুকাবিলায় কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে সিয়াম ওয়াজিব ই'তিকাফে শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। এ সম্পর্কে একটি মাত্র বর্ণনাই রয়েছে (অর্থাৎ দ্বিমত নেই)।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাসান (ইব্‌ন যিয়াদ) যে মত বর্ণনা করেছেন তাতে নফল ই'তিকাফ শুদ্ধ হওয়ার জন্যও সিয়াম শর্ত। আমাদের বর্ণিত হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের প্রেক্ষিতে।

এই বর্ণনা মুতাবিক ই'তিকাফ এক দিনের কমে হতে পারে না। কিন্তু মাবসূতের বর্ণনা মতে– আর তা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত– নফল ই'তিকাফের সর্ব নিম্ন পরিমাণ হলো এক মুহূর্ত। সুতরাং তা সিয়াম ছাড়া হতে পারে। কেননা, নফলের ভিত্তি হলো সহজতার উপর। তুমি কি জান না যে, দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নফল সালাত বসে আদায় করা যায়। আর যদি নফল ই'তিকাফ শুরু করার পর ভংগ করে ফেলে তাহলে মাবসূতের বর্ণনা মতে তা কাযা করা জরুরী নয়। কেননা, তার সময় নির্ধারিত ছিল না। সুতরাং তা ভংগ করার দ্বারা বাতিল করা নয়।

হাসান (রা.)-এর বর্ণনা মতে কাযা করা জাইয হবে। কেননা তা সিয়ামের মত একদিন এর সাথে সীমাবদ্ধ।

আর জামা'আত হয় এমন মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ সহীহ্‌ নয়। কেননা হুযায়ফা (রা.) বলেছেন ঃ لاَ اعْتِكَافَ اِلاَّ فِيْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ –জামা'আত অনুষ্ঠিত মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ হতে পারে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত একটি মতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হয়, এমন মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ই'তিকাফ সহীহ্ নয়। কেননা ই'তিকাফ হলো সালাতের জন্য অপেক্ষা করার ইবাদত। সুতরাং তা এমন স্থানের সাথে সম্পৃক্ত হবে, যেখানে তা নিয়মিত আদায় করা হয়।

অবশ্য স্ত্রী লোক তার ঘরের মসজিদে (অর্থাৎ সালাত আদায়ের নির্ধারিত স্থানে) ই'তিকাফ করবে। কেননা সেটাই হলো তার সালাতের স্থান। সুতরাং সালাতের জন্য তার অপেক্ষা সেখানেই বাস্তবায়িত হয়। যদি ঘরে পূর্ব থেকে তার জন্য সালাতের নির্ধারিত কোন স্থান না থাকে তাহলে একটি স্থান নির্ধারণ করে নেবে এবং সেখানে ই'তিকাফ করবে।

প্রাকৃতিক প্রয়োজনে এবং জুমুআর উদ্দেশ্য ছাড়া মসজিদ থেকে বের হতে পারবে না। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হওয়ার বৈধতার প্রমাণ হলো 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছ যে, নবী করীম (সা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া তাঁর ই'তিকাফের স্থল থেকে বের হতেন না।

তাছাড়া এ প্রয়োজন দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী ও জানা বিষয়। আর তা সারার জন্য বের হওয়া অনিবার্য, সুতরাং এ প্রয়োজনে বের হওয়াটা ই'তিকাফের আওতা বহির্ভূত। তবে তাহারাত থেকে ফারেগ হওয়ার পর বাইরে বিলম্ব করবে না। কেননা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যা কার্যকরী, তা প্রয়োজন পরিমাণেই সীমাবদ্ধ। আর জুমুআর বিষয় এ কারণে যে, তা তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ (দীনী) প্রয়োজন। এবং এ প্রয়োজন দেখা দেওয়া জানা কথা।

আর ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, জুমুআর উদ্দেশ্যে বের হওয়া ই'তিকাফকে ফাসিদ করে দিবে। কেননা জামে মসজিদে ই'তিকাফ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো।

আর এর উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, সকল মসজিদেই ই'তিকাফ করা শরীআত সম্মত। আর শুরু করা যখন শুদ্ধ হলো তখন প্রয়োজন বের হওয়ার বৈধতা অবশ্যই দান করবে।

সূর্য যখন ঢলে পড়বে তখনই বের হবে। কেননা (জুমুআর সালাত আদায়ের জন্য) ঐ সময়ের পরই সম্বোধন তার অভিমুখী হয়। যদি তার ই'তিকাফের স্থান জুমুআর মসজিদ থেকে দূরে হয়, তাহলে এমন সময়ে বের হবে যেন জুমুআর সালাত পাওয়া সম্ভব হয়, এবং তার পূর্বে চার রাকাআত, আরেক বর্ণনা মতে ছয় রাকাআত– চার রাকাআত সুন্নাত এবং দু'রাকাআত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় করতে পারে। আর সেখানে জুমুআর পরে জুমুআর সুন্নাত সম্পর্কিত মতভেদ অনুযায়ী চার বা ছয় রাকাআত আদায় করবে।

জুমুআর সুন্নাত হলো জুমুআর আনুষাঙ্গিক। সুতরাং এ গুলোকে জুমুআর সংগেই যুক্ত করা হয়।

যদি জামে মসজিদে এর চেয়ে বেশী সময় অবস্থান করে তাহলে তার ই'তিকাফ নষ্ট হবে না। কেননা, এটাও ই'তিকাফের স্থান। তবে তা পসন্দনীয় নয়। কেননা সে এক মসজিদে ই'তিকাফ আদায়ের বাধ্যবাধ্যকতা গ্রহণ করেছে, সুতরাং বিনা প্রয়োজনে দুই মসজিদে তা আদায় করবে না।

যদি বিনা প্রয়োজনে কিছু সময়ের জন্যও মসজিদ থেকে বাইরে যায় তাহলে তার ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। কেননা ই'তিকাফের বৈপরিত্য পাওয়া গেছে। এটাই কিয়াসের দাবী।

সাহেবাইন বলেন, অর্ধেক দিনের বেশী না হলে ই'তিকাফ ফাসিদ হবে না। এটাই সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। কেননা সামান্য সময় প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***পানাহার ও ঘুম ই'তিকাফ স্থলেই হবে।*** কেননা, নবী (সা.)-এর মসজিদ ছাড়া এসবের জন্য আর কোন স্থান ছিলো না। তাছাড়া এই প্রয়োজনগুলো তো মসজিদে সমাধা করা সম্ভব। সুতরাং বের হওয়ার প্রয়োজন নেই।

মসজিদে পণ্য উপস্থিত না করে ক্রয়-বিক্রয় করাতে কোন দোষ নেই। কেননা এর প্রয়োজন হতে পারে। যেমন তার প্রয়োজন সম্পন্ন করে দেয়ার মতো কাউকে পায় না। তবে ফকীহ্গণ বলেছেন যে, ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য পণ্য উপস্থিত করা মাকরূহ্। কেননা মসজিদ বান্দাহর হক থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। আর পণ্য উপস্থিত করায় মসজিদকে তাতে লিপ্ত করা হয়।

মু'তাকিফ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরূহ্। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ ..... وَبَيْعَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ –তোমরা তোমাদের মসজিদগুলোকে তোমাদের বাচ্চাদের থেকে পৃথক রাখবে এবং তোমাদের ক্রয়-বিক্রয় থেকেও।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***আর ই'তিকাফকারী কল্যাণমূলক ছাড়া কোন কথা বলবে না। তবে তার পক্ষে একেবারে চুপ থাকা মাকরূহ্।*** কেননা আমাদের শরীআতে নীরবতার রোযা ইবাদতরূপে গণ্য নয়। কিন্তু যেসব কথায় গুনাহ্ হয়, তা পরিহার করে চলবে।

আর মু'তাকিফের জন্য সহবাস হারাম। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : وَلَاتُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ –তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ করা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করবে না।

অনুরূপভাবে স্পর্শ ও চুম্বনও হারাম। কেননা, তা সহবাসের আবেদন সৃষ্টিকারী। সুতরাং তা হারাম হবে। কারণ সহবাস হলো ই'তিকাফের নিষিদ্ধ কাজ– যেমন ইহরাম অবস্থায় (এগুলো হারাম)। সিয়াম বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা বিরত থাকা সিয়ামের রুকন। সিয়ামের নিষিদ্ধ কাজ নয়। সুতরাং আবেদন সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর দিকে তা সম্প্রসারিত হবে না।

যদি রাত্রে কিংবা দিনে ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলে সহবাস করে তাহলে তার ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা (দিবসের ন্যায়) রাত্রও ই'তিকাফের সময়। রোযার বিষয়টি এর বিপরীত। (অর্থাৎ ভুলের দ্বারা ফাসিদ হয় না কিন্তু) ই'তিকাফকারীর অবস্থা স্বয়ং স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং ভুলের কারণে তাকে মা'যূর ধরা হবে না।

যদি 'যোনিপথ' ছাড়া অন্যভাবে সংগম করে আর বীর্যস্খলন ঘটে কিংবা যদি স্পর্শ বা চুম্বন করে, ফলে বীর্যস্খলন ঘটে তাহলে তার ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এর মধ্যে সংগমের মর্ম বিদ্যমান। এ কারণেই তা দ্বারা রোযা ফাসিদ হয়ে যায়। যদি বীর্যস্খলন না ঘটে তাহলে ই'তিকাফ ফাসিদ হবে না, যদিও তা হারাম। কেননা, তাতে সংগমের মর্ম বিদ্যমান নেই। আর সেটাই হলো ফাসিদকারী। এ কারণেই তা দ্বারা রোযা ফাসিদ হয় না

যে ব্যক্তি নিজের উপর কতক দিনের ই'তিকাফ ওয়াজিব করলো, তার উপর সেই দিনগুলোর রাত্রিসহ ই'তিকাফ ওয়াজিব হবে। কেননা বহুবচন রূপে দিনগুলো উল্লেখ করলে তার পাশাপাশি রাত্রগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন বলা হয় তোমাকে কয়েক দিন থেকে দেখিনি। এখানে সে দিনগুলোর রাত্রও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

আর দিনগুলো অবিরাম হবে, যদিও অবিরমতার শর্ত আরোপ না করা হয়। কেননা ই'তিকাফের ভিত্তিই হলো অবিরমতার উপর। কারণ রাত্র দিন সমগ্র সময়টুকুই ই'তিকাফ যোগ্য। রোযার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা রোযার ভিত্তি হলো বিচ্ছিন্নতার উপর। কারণ রাত্রগুলো রোযার উপযুক্ত নয়, সুতরাং যতক্ষণ না অবিরামতার কথা স্পষ্ট বলবে, ততক্ষণ বিচ্ছিন্নভাবে রোযা ওয়াজিব হবে।

কিন্তু যদি শুধু দিবসগুলোর ই'তিকাফের নিয়্যাত করে থাকে তাহলে তার নিয়্যাত সহীহ্ হবে। কেননা সে শব্দটির হাকীকত বা মৌল অর্থ উদ্দেশ্য করেছে।

যে ব্যক্তি দু'দিনের ই'তিকাফ নিজের উপর ওয়াজিব করলো, তার উপর ঐ দু'দিনের রাত্রসহ ই'তিকাফ ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, প্রথম রাত্রটি দাখিল হবে না। কেননা দ্বিবচন তো বহুবচন থেকে ভিন্ন। আর মধ্যবর্তী রাত্রটি সংযুক্তির প্রয়োজনে অন্তর্ভুক্ত হবে।

যাহিরী রিওয়ায়াতের দলীল এই যে, দ্বিবচনের মাঝে বহুবচনের অর্থ রয়েছে। সুতরাং ইবাদতের ক্ষেত্রে সতর্কতার জন্য দ্বিবচনকে বহুবচনের সংগে যুক্ত করা হবে। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

كِتَابُ الْحَجِّ

অধ্যায় ঃ হজ্জ

অধ্যায় ঃ হজ্জ

হজ্জ ওয়াজিব সে সকল লোকের উপর যারা স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক ও সুস্থদেহের অধিকারী। যখন তারা পাথেয় ও বাহনে সক্ষম হয়, আর তা বাসস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে এবং ফিরে আসা পর্যন্ত আপন পোষ্য পরিজনের খোরপোষ থেকে অতিরিক্ত হয় আর পথও নিরাপদ হয়।

গ্রন্থকার এখানে ওয়াজিব শব্দটি ব্যবহার করেছেন অথচ তা অকাট্য ফরয এবং তার ফরয হওয়া কিতাবুল্লাহ্ দ্বারা প্রমাণিত। আর তা হলো, আল্লাহ্ পাকের নিম্নোক্ত বাণী ঃ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً –আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষের উপর বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ ফরয .... শেষ পর্যন্ত।

জীবনে তা একবারই শুধু ফরয হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। হজ্জ কি প্রতি বছর ফরয, না শুধু একবার? তখন তিনি বললেন, না, বরং একবার; এর অতিরিক্ত যা করা হবে তা নফল হবে।

তাছাড়া হজ্জ ফরয হওয়ার কারণ তো হলো বায়তুল্লাহ্ আর তা একাধিক নয়। সুতরাং বারংবার ওয়াজিব হতে পারে না।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে হজ্জ ওয়াজিব অবিলম্বে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এক বর্ণনায় এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

আর ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে তা বিলম্বে আদায় করা যায়। কেননা তা পূর্ণ জীবনে অর্পিত ওয়াজিব। সুতরাং হজ্জের ক্ষেত্রে পূর্ণ জীবন হলো সালাতের ক্ষেত্রে সময়ের মতো।

প্রথমোক্ত মতের দলীল এই যে, হজ্জ বিশেষ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। আর এক বছর সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। আর এক বছর সময়ে মৃত্যু ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই সতর্কতার জন্য (সময়সীমা) সংকুচিত করা হয়েছে। আর এই সতর্কতার প্রেক্ষিতেই তাড়াতাড়ি আদায় করা (সর্বসম্মতিক্রমে) উত্তম। সালাতের সময়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এত অল্প সময়ে মৃত্যু ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক।

স্বাধীনতা ও প্রাপ্তবয়স্কতার শর্তের কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

اَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ اُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْاِسْلَامِ وَاَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ بَلَغَ
فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْاَسْلَامِ وَاَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حجة الاِسْلَامِ۔

যে কোন গোলাম যদি দশবারও হজ্জ করে অতঃপর স্বাধীন হয়, তাহলে তার উপর ইসলামের ফরয হজ্জ ওয়াজিব হবে। আর কোন নাবালিগ যদি দশবারও হজ্জ করে অতঃপর বালিগ হয় তাহলে তার উপর ইসলামের ফরয ওয়াজিব হবে। তাছাড়া এই জন্য যে, হজ্জ হলো একটি ইবাদত। আর যাবতীয় ইবাদত নাবালিগদের থেকে রহিত।

আর মস্তিষ্কের সুস্থতা শর্ত দায়িত্ব আরোপের বৈধতার জন্য। অনুরূপভাবে অংগ-প্রত্যংগের সুস্থতা (এরও শর্ত রয়েছে)। কেননা তা ছাড়া অক্ষমতা অনিবার্য। অন্ধ ব্যক্তি যদি এমন কাউকে পায়, যে তার সফরের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে (অর্থাৎ চলা-ফেরায় তাকে সাহায্য করবে।) এবং পাথেয় ও বাহনেও সমর্থ হয়, তবুও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে না।

সাহেবাইন ভিন্নমত পোষণ করেন। সালাত অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পংগু সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে। কেননা, অপরের সাহায্যে সে সক্ষম। সুতরাং সে বাহনের সাহায্যে সক্ষমতা অর্জনকারীর সদৃশ।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে নিজে হজ্জের রোকনসমূহ আদায় করতে সক্ষম নয়। পক্ষান্তরে অন্ধ ব্যক্তিকে যদি পথ বাতলিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সে নিজেই আদায় করতে পারে। ফলে সে পথ হারিয়ে ফেলা ব্যক্তি সদৃশ হলো।

পাথেয় ও বাহন ব্যবস্থায় সক্ষম হওয়া জরুরী। বাহন সংগ্রহে সক্ষম হওয়ার অর্থ এই পরিমাণ অর্থ থাকা, যাতে হাওদার একাংশ এবং সামান পত্র বহনে একটি উট ভাড়া করতে সমর্থ হয়।

যাওয়া ও আসার সময় পর্যন্ত খরচের ব্যবস্থায় সক্ষম হওয়া জরুরী। কেননা নবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 'বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত রাস্তার সক্ষম হওয়ার অর্থ কি? তখন উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ الزاد والراحلة (পাথেয় ও বাহন।)

যদি সে 'পালাক্রমে' সওয়ারী ভাড়া করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে না। কেননা দু'জন যদি পালাক্রমে সওয়ার হয় তাহলে পুরা সফরে বাহন পাওয়া হল না।

এই সম্পূর্ণ খরচ বাসস্থান ও অন্যান্য জরুরী প্রয়োজন হতে উদ্বৃত্ত থেকে হবে। যেমন, খাদিম, ঘরের আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড়। কেননা এগুলো তার মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।

(তদ্রূপ এই সম্পূর্ণ খরচ) তার ফিরে আসা পর্যন্ত তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ থেকে উদ্বৃত্ত হতে হবে। কেননা ভরণ-পোষণ হলো স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার, আর শরীআতের নির্দেশ মতেই শরীআতের হকের উপর বান্দার হক অগ্রগণ্য।

মক্কাবাসীদের উপর এবং তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য সওয়ারী শর্ত নয়। কেননা হজ্জ আদায় করার জন্য তাদের উপর অতিরিক্ত কষ্টে লিপ্ত হতে হয় না। সুতরাং

তা জুমুআর জন্য পথ চলার অনুরূপ হলো। পথের নিরাপত্তা অপরিহার্য। কেননা এছাড়া সক্ষমতা সাব্যস্ত হয় না।

কোন কোন মতে এটা হলো হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত। এমনকি (মৃত্যুর সময়) ওসীয়ত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব নয়। এ মত ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত। কারো কারো মতে এটা হজ্জ আদায় করার শর্ত, ওয়াজিব হওয়ার জন্য নয়। কেননা নবী করীম (সা.) সক্ষমতার ব্যাখ্যা করেছেন শুধু 'পাথেয় ও বাহন' দ্বারা।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে শর্ত এই যে, তার সংগে তার স্বামী কিংবা কোন মাহরাম থাকতে হবে, যাকে সংগে নিয়ে সে হজ্জ করে আসবে। যদি তার ও মক্কা শরীফের মাঝে তিন দিনের দূরত্ব থাকে তাহলে স্বামী বা মাহরাম ছাড়া হজ্জ করতে যাওয়া তার জন্য জাইয নয়।***

শাফিঈ (র.) বলেন, যদি কাফেলার সাথে রওয়ানা হয় আর তার সংগে নির্ভরযোগ্য কতিপয় স্ত্রীলোক থাকে, তাহলে তার জন্য হজ্জ করা জাইয হবে। কেননা সফর সংগী থাকার কারণে নিরাপত্তা পাবে।

আমাদের দলীল এই যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ "لَاتَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ اِلَّا وَمَعَهَا مُحْرِمٌ" –কোন স্ত্রীলোক যেন মাহরাম ছাড়া হজ্জে না যায়। আর এ জন্য যে, মাহরাম ছাড়া তার ব্যাপারে ফিতনার আশংকা রয়েছে। আর অন্যান্য স্ত্রীলোক তার সংগে যুক্ত হওয়ার দ্বারা ফিতনার আশংকা আরো বৃদ্ধি পাবে। এ কারণেই সংগে অন্য স্ত্রীলোক থাকা সত্ত্বেও পর নারীর সংগে একান্তে মিলিত হওয়া হারাম। পক্ষান্তরে তার ও মক্কার মধ্যবর্তী দূরত্ব তিন দিনের কম হওয়ার বিষয়টি এর বিপরীত, কেননা সফরের কম দূরত্বে মাহরাম ছাড়া বের হওয়া তার জন্য জাইয রয়েছে।

যদি সে মাহরাম পেয়ে যায় তাহলে স্বামীর তাকে বাধা দেয়ার অধিকার থাকবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তার বাধা দেয়ার অধিকার থাকবে। কেননা, সফরে বের হওয়াতে তার হক নষ্ট হয়।

আমাদের দলীল এই যে, ফরযসমূহের ক্ষেত্রে স্বামীর অধিকার প্রকাশ পাবে না। আর হজ্জ ফরযসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি নফল হজ্জের ক্ষেত্রে তার বাধা প্রদানের অধিকার রয়েছে।

মাহরাম যদি ফাসিক হয় সেক্ষেত্রে ফকীহ্গণ বলেছেন যে, তার উপর হজ্জ ফরয হবে না। কেননা সফর সংগী হওয়ার উদ্দেশ্য তার দ্বারা হাছিল হবে না।

যে কোন মাহরামের সংগে বের হওয়া তার জন্য জাইয হবে। কিন্তু মাজূসী হলে জাইয হবে না। কেননা, সে তো তার সংগে বিবাহের বৈধতার কথা বিশ্বাস করে। বাচ্চা কিংবা বিকৃত মস্তিষ্ক মাহরাম গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তাদের পক্ষ থেকে হিফাজত হাসিল হবে না।

যে বালিকা যৌনাবেদনের সীমায় উপনীত হয়ে গেছে, সে প্রাপ্ত বয়স্কার সমতুল্য। কাজেই মাহরাম ছাড়া তাকে নিয়ে সফর করা জাইয নেই। মাহরামের ব্যয়ভার স্ত্রী লোকটিকেই বহন করতে হবে। কেননা সে তার মাধ্যমেই হজ্জ আদায়ে সক্ষম হচ্ছে।

মাহরামের সংগে কি হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত, না হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত, এ বিষয়ে ফকীহ্‌গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে ঃ যেমন পথের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তাঁদের মতভেদ রয়েছে।

ইহরাম বাঁধার পর নাবালক যদি 'সাবালক' হয় কিংবা দাস স্বাধীনতা লাভ করে, তার পর হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করে, তাহলে তা তাদের ফরয হজ্জের জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা তাদের ইহরাম তো নফল আদায়ের জন্য সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং তা ফরয আদায়ের ইহরামে পরিবর্তিত হবে না।

যদি নাবালক (বালেগ হওয়ার পর) ওকূফে আরাফার পূর্বে ইহরামের নবায়ণ করে ফরয হজ্জের নিয়্যত করে নেয়, তাহলে জাইয হবে। কিন্তু দাস এরূপ করলে জাইয হবে না। কেননা যোগ্যতা না থাকার কারণে বালকের ইহরাম অবশ্যপালনীয় নয়, পক্ষান্তরে দাসের ইহরাম অবশ্য পালনীয়। সুতরাং অন্য ইহরাম শুরু করার মাধ্যমে বর্তমান ইহরাম হতে বের হয়ে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ্ উত্তম জানেন।

পরিচ্ছেদ ঃ ইহরামের স্থানসমূহ

ইহরাম অবস্থা ছাড়া যে সকল স্থান অতিক্রম করা কারো জন্য জাইয নেই সেগুলো মোট পাঁচটি। মদীনাবাসীদের জন্য হলো 'যুল হুলায়ফা' এবং ইরাকবাসীদের জন্য হলো 'যাতু ইরক' এবং সিরিয়াবাসীদের জন্য হলো জুহফা এবং নাজদবাসীদের জন্য হলো 'কারন' এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য হলো ইয়ালামলাম।

এভাবেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এই সকল এলাকার লোকদের জন্য এই সকল স্থানকে 'মীকাত' রূপে নির্ধারণ করেছেন।[১]

এই নির্ধারণের ফলাফল হলো ইহরাম বাঁধার কাজটি এ সকল স্থান থেকে পিছানো নিষিদ্ধ। কেননা এসকল স্থান হতে অগ্রবর্তী করা তো সকলের মতেই জাইয।

বহিরাগত লোকেরা যখন মক্কায় প্রবেশের উদ্দেশ্যে ঐ সকল মীকাত পর্যন্ত উপনীত হয়, তখন আমাদের মতে ইহরাম বেঁধে নেয়া তার জন্য জরুরী। হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্য থাকুক কিংবা অন্য উদ্দেশ্য থাকুক। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ لَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ الْمِيْقَاتَ إِلَّا مُحْرِمًا –ইহরাম অবস্থা ছাড়া কেউ যেন মীকাত অতিক্রম না করে।

তাছাড়া এই জন্য যে, ইহরাম ওয়াজিব হওয়ার উদ্দেশ্য হলো এই পবিত্র অঞ্চলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। সুতরাং এ বিষয়ে হজ্জকারী, উমরাকারী ও অন্যান্যরা সমান হবে।

---

১. অন্যান্য এলাকার লোকেরা যে মীকাত বা মীকাত বরাবর স্থান দিয়ে প্রবেশ করবে, তাদের জন্য সেটাই হবে মীকাত।

যারা মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারী, তাদের জন্য নিজস্ব প্রয়োজনে ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ। কেননা তাকে তো সচরাচর মক্কায় প্রবেশ করতেই হয়। অত: প্রতিবার ইহরাম বাধ্যতামূলক করাতে সুস্পষ্ট অসুবিধা রয়েছে। সুতরাং তারা মক্কাবাসীদের মতই হবে। আর মক্কাবাসীদের জন্য প্রয়োজনে ইহরাম ছাড়া মক্কা হতে বের হওয়া এবং মক্কায় প্রবেশ করার অনুমতি রয়েছে।

আর হজ্জ বা উমরা আদায়ের নিয়্যত করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা বিশেষ সময়ে হয়ে থাকে সুতরাং এতে কোন অসুবিধা নেই।

যদি এ সকল মীকাতে পৌঁছার আগেই ইহরাম বেঁধে নেয়, তাহলে তা জাইয। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ –তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর। আর পূর্ণতা হলো এ দু'টির ইহরাম বাঁধা স্বীয় পরিবারের গৃহ থেকে। আলী ও ইব্ন মাস'উদ (রা.) এ রূপই বলেছেন। সুতরাং ইহরাম মীকাতের আগে বাঁধাই উত্তম। কেননা হজ্জের পূর্ণতা এ ধারায়ই ব্যাখ্যা করা হয়েছে; আর এতে কষ্টও অধিক এবং ভক্তির প্রকাশও অধিক।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আগে থেকে ইহরাম বাঁধা তখনই উত্তম হবে, যখন কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে নিজের উপর তার নিয়ন্ত্রণ থাকে।

যে ব্যক্তি মীকাতের ভিতরে বাস করে, তার জন্য মীকাত হলো 'হিল্ল' (অর্থাৎ হারামের বাইরের এলাকা)। অর্থাৎ হারাম ও মীকাতের মধ্যবর্তী অঞ্চল। কেননা আপন পরিবারের নিকট হতে ইহরাম বেঁধে যাওয়া তার জন্য জাইয রয়েছে। আর মীকাতের পর থেকে হারাম পর্যন্ত অঞ্চলটি অভিন্ন স্থান রূপে বিবেচিত।

যে ব্যক্তি মক্কায় বাস করে, তার মীকাত হলো হজ্জের ক্ষেত্রে হরম এবং উমরার ক্ষেত্রে 'হিল্ল'। কেননা নবী করীম (সা.) তাঁর সাহাবায়ে কিরামকে হজ্জের জন্য মক্কার অভ্যান্তর থেকে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে 'আইশা (রা.)-এর ভাই আবদুর রহমান (রা.)-কে তানঈম থেকে তাঁকে উমরা করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর তানঈম 'হিল্ল' -এ অবস্থিত।

তাছাড়া এই জন্য যে, হজ্জ আদায় করা হয় আরাফাতে। আর তা 'হিল্ল' এর মধ্যে রয়েছে। সুতরাং ইহরাম হরম থেকে হওয়া উচিত, যাতে এক ধরনের সফর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে উমরা আদায় করা হয় হরমের অভ্যন্তরে। সুতরাং উক্ত কারণে হিল্ল থেকে ইহরাম হওয়া উচিত। তবে হাদীছে তানঈম এর কথা উল্লেখিত হওয়ার কারণে তানঈম থেকে ইহরাম করাই উত্তম। আল্লাহ্-ই অধিক অবগত।

ইহরাম

যখন ইহরাম বাঁধতে, মনস্থ করবে তখন গোসল কিংবা উযূ করে নিবে। তবে গোসল করাই উত্তম। কেননা বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা.) তাঁর ইহরামের জন্য গোসল করেছিলেন। তবে এ গোসল হলো পরিচ্ছন্নতার জন্য (পবিত্রতা অর্জনের জন্য নয়)। তাই ঋতুগ্রস্ত স্ত্রীলোককেও গোসল করতে বলা হবে। যদিও তাতে তার গোসলের ফরয আদায় হবে না। সুতরাং উযূ গোসলের স্থলবর্তী হবে, যেমন জুমুআর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তবে গোসলই উত্তম। কেননা, গোসলের মাঝে পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি পূর্ণতর। তাছাড়া নবী করীম (সা.) এটিই গ্রহণ করেছেন।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *এবং নতুন বা ধৌত করা দু'টি কাপড় পরিধান করবে। একটি তহবন্দ অন্যটি চাদর।* কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময় তহবন্দ ও চাদর পরিধান করেছেন। তাছাড়া এই জন্য যে, সেলাই করা কাপড় পরা থেকে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ সতর ঢাকা এবং গরম ও শীত নিবারণ জরুরী, আর তা আমাদের নির্ধারিত কাপড়েই সম্ভব। তবে নতুন কাপড়ই উত্তম। কেননা তা পবিত্রতার অধিক নিকটবর্তী।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *তার কাছে আতর থাকলে তা ব্যবহার করবে।*

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এমন আতর ব্যবহার করা মাকরূহ হবে, যার অস্তিত্ব ইহরামের পরও অবশিষ্ট থেকে যায়। মালিক ও শাফিঈ (র.)-এর-ও এ মত। কেননা সে ইহরামের পর আতর থেকে উপকৃত হচ্ছে।

প্রসিদ্ধ মতামতে দলীল হলো 'আইশা (রা.)-এর হাদীছ। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ইহরামের পূর্বে ইহরামের জন্য সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।

তাছাড়া এই জন্য যে, নিষিদ্ধ বিষয় হলো ইহরামের পরে খুশবু ব্যবহার করা। আর যা অবশিষ্ট থেকে যায়, তা তার সংগে সংযুক্তির কারণে যেন তার আনুষঙ্গিক। কাপড়ের বিষয়টি এর বিপরীত।[১] কেননা তা তার থেকে বিচ্ছিন্ন।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *দু'রাকাআত সালাত আদায় করবে।* কেননা জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) তাঁর ইহরামের সময় 'যুলহুলায়ফা'য় দু'রাকাআত সালাত আদায় করেছেন।

১. অর্থাৎ যদি ইহরামের পূর্বে সেলাই করা কাপড় পরিধান করে আর ইহরামের পরেও তা থেকে যায়, অথবা যদি কাপড়ে সুগন্ধির অস্তিত্ব থেকে যায়, তাহলে তা নিষিদ্ধ হবে। কেননা, তা তার থেকে আলাদা হওয়ার কারণে তা আনুষঙ্গিক নয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *আর এ দু'আ পড়বে ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ –হে আল্লাহ্, আমি হজ্জের নিয়্যত করছি; সুতরাং আপনি আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবূল করুন।* কেননা, হজ্জ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে আদায় করা হয়। সুতরাং সাধারণতঃ তা কষ্টমুক্ত হয় না, তাই সহজ তা প্রার্থনা করবে।

আর ফরয সালাত আদায়ের বেলায় এ ধরনের দু'আর কথা বলা হয়নি। কেননা সালাতের সময় সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ তা আদায় করা সহজ।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *অতঃপর সালাতের পরে তালবিয়া পাঠ করবে।* কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) সালাতের পরে তালবিয়া পড়েছিলেন। তবে বাহন তাকে নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে তালবিয়া পড়ে তাহলেও জাইয হবে। কিন্তু আমাদের বর্ণিত হাদীছটির কারণে প্রথমটিই উত্তম। যদি সে শুধু হজ্জ আদায়কারী হয় তাহলে তালবিয়া দ্বারা শুধু হজ্জের নিয়্যত করবে। কেননা এটা ইবাদত। আর আমল নিয়্যতের উপরই নির্ভরশীল।

আর তালবিয়া হল এ বাক্য বলা ঃ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ –আমি হাযির, হে আল্লাহ্, আমি হাযির। আমি হাযির, আপনার কোন শরীক নেই। আমি হাযির, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য এবং নিয়ামত ও রাজত্ব আপনারই এবং আপনার কোন শরীক নেই।

اِنَّ الْحَمْدَ এর হামযাটি জের যুক্ত, জবরযুক্ত নয়, যাতে বক্তব্যটি স্বতন্ত্র হয়, পূর্বসম্পর্কিত না হয়। কেননা জবরযুক্ত হলে (ব্যাকরণের দৃষ্টিতে) তা পূর্ববর্তী (বাক্যের) বিশেষণ হবে।

এই তালবিয়া হলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আহবানের সাড়াদান, যেমন সংশ্লিষ্ট ঘটনায় সুবিদিত।[২]

উল্লেখিত শব্দগুলোর কোন কিছুই বাদ দেয়া উচিত নয়। কেননা বর্ণনাকারী সর্বসম্মতিক্রমেই তা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তা থেকে কিছুই বাদ দেয়া যাবে না। তবে যদি কিছু বৃদ্ধি করে তাহলে তা জাইয হবে। আর এতে ভিন্ন মত রয়েছে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর এবং তাঁর নিকট থেকে রাবীর বর্ণনা অনুযায়ী।

তিনি একে আযান ও তাশাহুদের উপর কিয়াস করেন, এদিক থেকে যে, তা বিধিবদ্ধ যিকির।

আমাদের দলীল এই যে, ইব্‌ন মাস'উদ, ইব্‌ন উমর ও আবূ হুরায়রা (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবাগণ হাদীছে বর্ণিত শব্দের সংগে অতিরিক্ত যোগ করেছেন।

তাছাড়া এই জন্য যে, তালবিয়ার উদ্দেশ্য হলো প্রশংসা ও বন্দেগীর প্রকাশ। সুতরাং তার সংগে অতিরিক্ত যোগ করা নিষিদ্ধ হবে না।

---

২. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইবরাহীম (আ.) মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, হে লোক সকল, তোমরা সাড়া দাও। আর তারা বললেন, لبيك اللهم لبيك এখন ঐ সকল লোকেরাই হজ্জ করে, যারা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *যখন তালবিয়া পড়বে, তখন ইহরাম বাঁধা হয়ে যাবে।* অর্থাৎ যদি নিয়্যত করে থাকে। কেননা ইবাদত নিয়্যত ছাড়া আদায় হয় না। কিন্তু গ্রন্থকার তা উল্লেখ করেননি। কেননা اللهم اني اريد الحج এ দু'আর মধ্যে নিয়্যতের দিকে ইংগিত রয়েছে।

যতক্ষণ তালবিয়া না বলবে ততক্ষণ শুধু নিয়্যত দ্বারা সে ইহরাম আরম্ভকারী রূপে বিবেচিত হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন।

(আমাদের দলীল) কেননা এ হলো একটি আমল আদায় করার সংকল্প। সুতরাং কোন যিকির জরুরী হবে, যেমন সালাতের তাহরীমার ক্ষেত্রে। তবে জনুবিয়া ছাড়া এমন যিকির যা দ্বারা তাযীম উদ্দেশ্য হয়, ইহরাম শুরুকারী গণ্য হবে। সেটা ফারসীতে হোক কিংবা আরবীতে। আমাদের ইমামদের পক্ষ থেকে এটাই হলো প্রসিদ্ধ রিওয়ায়াত।

সাহেবাইনের নীতি অনুযায়ী হজ্জ ও নামাযের মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে,[৩] হজ্জের মধ্যে সালাতের তুলনায় অধিক অবকাশ রয়েছে। এ কারণেই হজ্জের ক্ষেত্রে গায়র যিকিরকে যিকিরের স্থলবর্তী করা হয়।[৪] যেমন উটকে হার পরিয়ে দেয়া। সুতরাং অন্য যিকিরকে তালবিয়ার স্থলবর্তী এবং আরবী ছাড়া অন্য ভাষাকে (আরবীর) স্থলবর্তী করা যেতে পারে।

সহবাস, পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি যে সকল বিষয় আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন, তা পরিহার করে চলবে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীই হলো মূলঃ فَلاَ رَفَثَ وَلاَفُسُوْقَ وَلاَجِدَالَ فِى الْحَجِّ –হজ্জে সহবাস, পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ নেই। এখানে না-বাচক শব্দে নিষেধ বোঝানো হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত رفث অর্থ সহবাস কিংবা অশ্লীল কথা। কিংবা নারীদের উপস্থিতিতে যৌন বিষয়ক আলোচনা। আয়াতে বর্ণিত فسوق অর্থ নাফরমানি।

ইহরামের অবস্থায় এগুলো কঠোরতর হারাম। جدال বা বিবাদ অর্থ সংগীদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, ঝগড়া না করার অর্থ হলো হজ্জের সময় অগ্রপশ্চাৎ করা নিয়ে মুশরিকদের সংগে বিবাদ না করা।

কোন শিকার হত্যা করবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, মুহরিম অবস্থায় তোমরা শিকার হত্যা করো না।

---

৩. অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) সালাত শুরু করার ক্ষেত্রে তাকবীর শব্দের শর্ত আরোপ করেছেন। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) আরবী ভাষার শর্ত আরোপ করেছেন। কিন্তু হজ্জের ক্ষেত্রে তাঁরা তা আরোপ করেন নি।

৪. অর্থাৎ তালবিয়ার স্থলবর্তী করা হয়েছে হজ্জের। কুরবানীর জন্য নিয়ে যাওয়া পশুর গলায় মালা ঝুলিয়ে দেয়া।

শিকারের প্রতি ইংগিত করবে না এবং শিকার সম্পর্কে অবহিত করবে না। কেননা, আবূ কাতাদা (রা.) বর্ণিত হাদীছে আছে যে, তিনি হালাল অবস্থায় একটি বন্য-গাধা শিকার করেছিলেন। আর তার সংগীরা মুহরিম অবস্থায় ছিলেন। তখন নবী করীম (সা.) তাঁর সাথীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তোমরা কি ইংগিত করেছিলে? তোমরা কি বাতলিয়ে দিয়েছিলে? তোমরা কি সাহায্য করেছিলে? তারা সকলে বললেন, না। তখন তিনি বললেন, তাহলে তোমরা যেতে পারো।

তা ছাড়া এই জন্য যে, এগুলোর দ্বারা শিকারের নিরাপত্তা বিনষ্ট করা হয়। কেননা, শিকার তার বন্যতা ও চক্ষুর আড়ালে থাকার কারণে নিরাপদ ছিলো।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *জামা, পাজামা, পাগড়ী ও মোজা পরবে না। তবে যদি জুতা না পায় তাহলে كعب থেকে নীচের দিকে মোজা কেটে নিবে।* কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) মুহরিমকে এ সকল জিনিস পরিধান করতে নিষেধ করেছেন এবং শেষে বলেছেন ঃ وَلَاخُفَّيْنِ اِلَّا اَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ –এবং মোজা পরবে না। তবে যদি জুতা না পাওয়া যায় তাহলে মোজা দু'টোকে كعب থেকে নীচের দিকে কেটে ফেলবে।

এখানে كعب এর অর্থ হলো পায়ের পাতার মধ্যস্থলের জোড় (গ্রন্থি), যেখানে ফিতা বাঁধা হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে হিশাম তা বর্ণনা করেছেন।

চেহারা এবং মাথা ঢাকবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, পুরুষের জন্য চেহারা ঢাকা জাইয আছে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ (دارقطنى) اِحْرَامُ الرَّجُلِ فِىْ رَاسِهٖ وَاِحْرَامُ الْمَرْاَةِ فِىْ وَجْهِهَا –পুরুষের ইহরাম হলো তার মাথায় এবং স্ত্রীলোকের ইহরাম হলো তার চেহারায়।

আমাদের দলীল হলো নবী (সা.)-এর বাণী ঃ لَاتُخَمِّرُوْا وَجْهَهٗ وَلَا رَاسَهٗ فَاِنَّهٗ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا –তার চেহারা এবং মাথা (কাফনের কাপড়ে) ঢাকবে না। কেননা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া বলা অবস্থায় উত্থিত করা হবে। এ কথা তিনি বলেছেন ঐ মুহরিম সম্পর্কে, যে মারা গিয়েছিল।

তাছাড়া এই জন্য যে, স্ত্রীলোকের চেহারা ঢাকা হয় না। অথচ তা খুলে রাখাতে ফিতনার আশংকা রয়েছে। সুতরাং পুরুষের চেহারা তো খুলে রাখা অধিক সংগত।

ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছের উদ্দেশ্য হলো মাথা ঢাকার মধ্যে পার্থক্যটি প্রকাশ করা।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *আর সুগন্ধি ব্যবহার করবে না।* কেননা নবী (সা.) বলেছেন ঃ الحاج الشعث التفل –হাজী হলেন ধূলিমলিন ও অপরিপাটী।

তদ্রূপ তেল ব্যবহার করবে না। আমাদের বর্ণিত এ হাদীছের প্রেক্ষিতে।

আর মাথা মুড়াবে না এবং শরীরের পশমও না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُوْسَكُمْ –তোমরা তোমাদের মাথা মুড়াবে না।

আর দাড়ি ছাঁটবে না। কেননা এটা মুড়ানোর সমার্থক। তাছাড়া এতে ধুলিমলিনতা এবং ময়লা দূর করা হয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *কুসুম, জাফরান ও উসফোর*[৫] *রঞ্জিত কাপড় পরিধান করবে না।* কেননা নবী (সা.) বলেছেন ঃ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ –মুহরিম এমন কোন কাপড় পরিধান করবে না, যাকে জাফরান বা কুসুম দ্বারা রঞ্জিত করা হয়েছে।

তবে যদি তা এমনভাবে ধোয়া হয় যে, আর সুগন্ধ বেরোয় না। (তাহলে পরা যাবে।) কেননা, নিষেধ করা হয় সুগন্ধের কারণে রংয়ের কারণে, নয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, কুসুম রঞ্জিত কাপড় পরিধানে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এটা শুধু রং, তাতে কোন সুগন্ধ নেই। আমাদের দলীল এই যে, তাতে সুঘ্রাণ রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *গোসল করা এবং হাম্মামখানায় প্রবেশ করাতে কোন দোষ নেই।* কেননা উমর (রা.) মুহরিম অবস্থায় গোসল করেছেন।

গৃহের কিংবা হাওদার (কিংবা অন্য কিছুর) ছায়া গ্রহণ করাতে অসুবিধা নেই।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, শামিয়ানা বা এ ধরনের কিছুর ছায়া গ্রহণ করা মাকরূহ হবে। কেননা এটা মাথা ঢাকার সদৃশ।

আমাদের দলীল এই যে, উছমান (রা.) এর জন্য ইহরামের অবস্থায় শামিয়ানা টাংগানো হতো।

তাছাড়া এই জন্য যে, এটা তার শরীরকে স্পর্শ করে না। সুতরাং তা গৃহের সদৃশ হলো।

যদি কা'বা শরীফের গিলাফের ভিতরে ঢুকে যায় আর তা তাকে ঢেকে ফেলে তবে যদি তার মাথা বা চেহারায় কাপড় না লাগে তাহলে কোন দোষ নেই। কেননা, এটা হলো ছায়া গ্রহণেরই মত।

কোমরে টাকার থলে বাঁধায় কোন দোষ নেই।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, যদি তাতে অন্য কারো খরচের টাকা থাকে তাহলে মাকরূহ হবে। কেননা এর কোন প্রয়োজন নেই।

আমাদের দলীল এই যে, এটা সেলাইকৃত কাপড় পরার সমার্থক নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উভয় অবস্থাই সমান হবে।

মাথা ও দাড়ি 'খিতমি'[৬] *দ্বারা ধুবে না।* কেননা এটা এক ধরনের সুগন্ধি। তাছাড়া এটা মাথার উকুন ধ্বংস করে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *সকল সালাতের পরে এবং যখনই কোন উঁচু স্থানে আরোহণ করবে কিংবা উপত্যকায় অবতরণ করবে কিংবা সওয়ারদের দেখা পাবে তখনই বেশী বেশী তালবিয়া পড়বে এবং শেষ রাতের দিকেও।* কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবাগণ এ সকল অবস্থায় তালবিয়া পড়তেন।

---

৫. সুগন্ধি উদ্ভিদ বিশেষ, যা দ্বারা কাপড় রঞ্জিত করা হয়।

৬. খিত্‌মী এক ধরনের সুগন্ধি উদ্ভিদ, যা দ্বারা চুলও দাড়ি পরিষ্কার করা হয়।

ইহরামের তালবিয়া হলো সালাতের তাকবীরের অনুরূপ। সুতরাং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনের সময় তা বলবে।

উচ্চৈস্বরে তালবিয়া পড়বে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : افضل الحج العج والثج, –শ্রেষ্ঠ হজ্জ হলো 'আজ্জ ও ছাজ্জ'। আজ্জের অর্থ উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়া আর ছাজ্জ হল রক্ত প্রবাহিত করা (কুরবানী করা)।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***যখন মক্কায় প্রবেশ করবে তখন প্রথমে মাসজিদুল হারামে যাবে।*** কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) যখন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন তখন প্রথমে মাসজিদুল হারামে গিয়েছিলেন।

তাছাড়া আসল উদ্দেশ্য তো হলো বায়তুল্লাহ্ যিয়ারত করা। আর তা হলো মাসজিদুল হারামের মধ্যে। আর মাসজিদুল হারামে রাত্রে বা দিনে প্রবেশ করাতে কোন দোষ নেই কেননা তা হলো একটি শহরে প্রবেশ। সুতরাং রাত্র বা দিবস কোন একটির বিশেষত্ব নেই

যখন বায়তুল্লাহ্ দৃষ্টিগোচর হয়, তখন আল্লাহ্ আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়বে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) বায়তুল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভ কালে বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার বলতেন।

মাবছূত গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) হজ্জের স্থানগুলোর জন্য কোন দু'আ নির্ধারণ করেন নি কেননা, দু'আর নির্ধারণে হৃদয়ের বিগলিত ভাব দূরীভূত করে দেয়। তবে কেউ যদি হাদীছে বর্ণিত দু'আ বরকত লাভের উদ্দেশ্যে পাঠ করে তবে তা উত্তম।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***অতঃপর হাজরে আসওয়াদ থেকে (তাওয়াফ) শুরু করবে। অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদের মুখোমুখি হয়ে আল্লাহ্ আকবার ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে।*** কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করে হাজরে আসওয়াদ থেকে আমল (তাওয়াফ) শুরু করেছিলেন, অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদের মুখোমুখি হয়ে আল্লাহ্ আকবার ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়েছিলেন।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***উভয় হাত উপরে তোলবে।*** কেননা নবী (সা.) বলেছেন, সাত স্থান ব্যতীত হস্ত উত্তোলন করবে না। সেগুলোর মধ্যে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার কথা উল্লেখ করেছেন।

কোন মুসলমানকে কষ্ট না দিয়ে যদি সম্ভব হয় তাহলে হাজরে আসওয়াদ (চুম্বন) করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) আপন পবিত্র ওষ্ঠদ্বয় স্থাপন করে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেছিলেন। এবং উমর (রা.)-কে বলেছিলেন, তুমি শক্তিশালী মানুষ, দুর্বলকে কষ্ট দিবে। সুতরাং তুমি হাজরে আসওয়াদের সামনে মানুষের প্রতি চাপ সৃষ্টি করো না। তবে কখনো ফাঁক পেয়ে গেলে তখন তা স্পর্শ করে নিও। অন্যথায় তার মুখোমুখি হয়ে আল্লাহ্ আকবার ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে নিও।

তাছাড়া এই জন্য যে, হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা হলো সুন্নত আর মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *যদি হাতের কোন জিনিস দ্বারা হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা সম্ভব হয়, যেমন খেজুরের ডাল ইত্যাদি দ্বারা, অতঃপর সেটাকে চুম্বন করে তাহলে তাই করে নিবে।* কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) সওয়ারিতে আরোহণ করা অবস্থায় বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করেছিলেন এবং হাতের লাঠি দ্বারা রুকনসমূহ[৭] স্পর্শ করেছিলেন।

যদি তার কিছুই করা সম্ভব না হয় তাহলে শুধু হাজারে আসওয়াদের মুখোমুখি দাঁড়াবে এবং আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে আর আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে এবং নবী (সা.)-এর উপর দুরূদ পাঠ করবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *অতঃপর বায়তুল্লাহ্‌র দরজা সংলগ্ন দিকটি নিজের ডান দিকে রাখবে এবং চাদরকে 'اضطباع' করবে। অতঃপর বায়তুল্লাহ্‌র সাত চক্কর তাওয়াফ করবে।* কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন এবং দরজার সংলগ্ন দিকটি নিজের ডান দিকে রেখেছেন অতঃপর সাতবার বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করেছেন।

اضطباع। অর্থ চাদরকে ডান বগলের নীচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর ফেলবে। এ হল সুন্নত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এ আমল বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *হাতীমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করবে।* হাতীম হলো বায়তুল্লাহ্‌র ঐ স্থানটি, যেখানে মীযাবে রহমত[৮] রয়েছে। (হাতীম অর্থ ভাংগা অংশ) এ অংশটাকে হাতীম বলা হয় এ জন্য যে, সেটাকে বায়তুল্লাহ্ থেকে ভেংগে আলাদা করে রাখা হয়েছে।

আবার এ অংশটাকে হিজরও বলা হয়। কেননা এ অংশটাকে বায়তুল্লাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত হতে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে।

বস্তুতঃ তা বায়তুল্লাহ্‌র অংশ। কেননা 'আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ فَإِنَّ الْحَطِيمَ مِنَ الْبَيْتِ (হাতীম বায়তুল্লাহ্‌র অংশ বিশেষ)। এজন্য হাতীমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করবে। এমন কি যদি কেউ হাতীম ও বায়তুল্লাহ্‌র মধ্যবর্তী ফাঁকে প্রবেশ করে তাওয়াফ করে, তাহলে জাইয হবে না।

অবশ্য যদি কেউ শুধু হাতীমকে কিবলা বানিয়ে সালাত আদায় করে, তাহলে তার সালাত শুদ্ধ হবে না। কেননা সালাতে কা'বা অভিমুখী হওয়া যে ফরয, তা কুরআনের বাণী দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

সুতরাং সতর্কতার প্রেক্ষিতে যা শুধু খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সাব্যস্ত, তাতে ফরয আদায় হবে না।

আর তাওয়াফের ক্ষেত্রে সর্তকতা হলো হাতীমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করা। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *প্রথম তিন চক্করে রমল করবে।*

---

৭. অর্থাৎ হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী।

৮. ছাদের পানি গড়িয়ে পড়ার 'নালা'।

রমল অর্থ হাঁটার সময় কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে চলা, যুদ্ধমুখী দুই সারীর মাঝখানে দম্ভকারী প্রতিদ্বন্দ্বীর মত। আর তা করবে চাদর ডান বগলের নীচে দিয়ে বাম কাঁধের উপর ফেলে। রমলের কারণ ছিলো মুশরিকদের সামনে বীরত্ব প্রকাশ করা। কেননা মুশরিকরা বলাবলি করেছিলো, ইয়াসরিবের জ্বর তাদের কাহিল করে ফেলেছে।

অতঃপর কারণ দূরীভূত হওয়ার পরও নবী (সা.)-এর যামানায় এবং পরবর্তীতেও (রমলের) বিধান বহাল থাকে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***অবশিষ্ট চক্করগুলোতে নিজ স্বাভাবিক অবস্থায় চলবে।*** রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হজ্জের বিবরণ বর্ণনাকারী সবাই এ বিষয়ে একমত। আর রমল অব্যাহত থাকবে হাজরে আসওয়াদ থেকে হাজরে আসওয়াদে পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রমল সম্পর্কে এরূপই বর্ণিত।

রমলের সময় যদি সে মানুষের ভীড়ের চাপে পড়ে তাহলে দাঁড়িয়ে যাবে। আবার যখন ফাঁক পাবে তখন রমল করবে। কেননা রমলের স্থলবর্তী কিছু নেই। তাই সে থেমে থাকবে যেন সুন্নত মুতাবিক তা আদায় করতে পারে। হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা মুখোমুখি হওয়াই তার স্থলবর্তী।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***যখনই হাজরে আসওয়াদের পাশ দিয়ে যাবে, সম্ভব হলে তা স্পর্শ করবে।*** কেননা তাওয়াফের চক্করগুলো সালাতের রাকাআতের মতো। সুতরাং প্রত্যেক রাকাআত যেমন তাকবীর দিয়ে শুরু করা হয়, তেমনি প্রতিটি চক্কর হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে শুরু করবে।

যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তার দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে। যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি।

আর রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করবে। যাহিরে রিওয়ায়াতের মতে তা মুস্তাহাব। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে একটি বর্ণনায় এটি সুন্নত।

এ দু'টি ছাড়া অন্য কোন রোকন স্পর্শ করবে না। কেননা নবী (সা.) এ দু'টি রোকন স্পর্শ করতেন। অন্যকোন রুকন স্পর্শ করতেন না।

আর তাওয়াফ শেষ করবে চুম্বনের মাধ্যমে অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদের চুম্বন করে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***অতঃপর মাকামে (ইবরাহীমে) এসে সেখানে দু'রাকাআত সালাত আদায় করবে। কিংবা মসজিদের যে কোন স্থানে সহজে সম্ভব হয়। আমাদের মতে এ সালাত ওয়াজিব।***

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তা সুন্নত। কেননা, ওয়াজিব হওয়ার কোন দলীল নেই।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ وَلْيُصَلِّ الطَّائِفُ لِكُلِّ اُسْبُوْعٍ رَكْعَتَيْنِ –তাওয়াফকারী যেন প্রতি সাত চক্করের পর দু'রাকাআত সালাত আদায় করে। আর নির্দেশ ওয়াজিব প্রমাণ করে।

অতঃপর হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে আবার তা চুম্বন করবে। কেননা বর্ণিত আছে, নবী (সা.) দু'রাকাআত পড়ার পর হাজরে আসওয়াদের নিকট ফিরে এসিছিলেন। মূলনীতি এই

যে, যে তাওয়াফের পর সাঈ রয়েছে, সে ক্ষেত্রে হাজরে আসওয়াদের নিকট ফিরে আসবে। কেননা, তাওয়াফ যেমন হাজরে আসওয়াদ চুম্বন দ্বারা শুরু করা হয়, তেমনি সাঈ-ও তা দ্বারা শুরু করবে। এর বিপরীত যে তাওয়াফ, যার পর সাঈ নেই।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***এ তাওয়াফের নাম তাওয়াফে কুদূম। এটাকে তাওয়াফুত্তাহিয়্যাতিও বলে। এটা সুন্নাত, ওয়াজিব নয়।***

ইমাম মালিক (র.) বলেন, তা ওয়াজিব। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ مَنْ أَتَى الْبَيْتَ فَلْيُحَيِّهِ بِالطَّوَافِ। –যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ শরীফে উপস্থিত হবে, সে যেন তাওয়াফের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ্কে তাহিয়্যা পেশ (সম্মান প্রদর্শন) করে।

আমাদের দলীল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাওয়াফের আদেশ করেছেন। আর নিঃশর্ত আদেশ পুনরাবৃত্তি দাবী করে না। এদিকে 'ইজমা'-এর মাধ্যমে আদেশের ক্ষেত্র রূপে তাওয়াফে যিয়ারত নির্ধারিত হয়ে গেছে।

আর ইমাম মালিক (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাতে তাওয়াফকে তাওয়াফে তাহিয়্যা বলা হয়েছে। আর তা মুস্তাহাব হওয়া প্রমাণ করে।

মক্কাবাসীদের জন্য তাওয়াফে কুদূম নেই। কেননা তাদের ক্ষেত্রে তো আগমন অবিদ্যমান

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***অতঃপর সাফা পাহাড়ের দিকে গমন করবে ও তাতে আরোহণ করবে। বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করবে এবং আল্লাহু আকবার বলবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে, নবী করীম (সা.)-এর উপর দুরূদ পড়বে এবং উভয় হাত উপরে তোলে আপন প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করবে।*** কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন, এমনকি যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়, তখন বায়তুল্লাহ্ মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করলেন।

তাছাড়া এই জন্য যে, ছানা ও দুরূদকে দু'আর উপর অগ্রবর্তী করা হয় যাতে কবুলিয়াতের নিকটবর্তী হয়, যেমন অন্যান্য দু'আর ক্ষেত্রে।

আর হাত তোলা হলো দু'আর সুন্নাত।

পাহাড়ে এতটুকু উপরে আরোহণ করবে, যাতে বায়তুল্লাহ্ তার দৃষ্টিগোচর হয়। কেননা বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করাই আরোহণের উদ্দেশ্য। আর যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা সাফা পাহাড়ের দিকে যেতে পারে। নবী করীম (সা.) বাবে বনী মাখযূম তথা বাবে সাফা দিয়ে শুধু এজন্য বের হয়েছিলেন যে, সেটা সাফার দিকে যাওয়ার নিকটতম দরজা ছিলো, এজন্য নয় যে, তা সুন্নাত

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***অতঃপর মারওয়ার উদ্দেশ্যে অবতরণ করবে এবং***

ধীর-স্থিরভাবে হেঁটে যাবে। যখন বাতনুল ওয়াদি[৯] পর্যন্ত পৌছবে, তখন সবুজ নিশানদ্বয়ের মাঝে সাধারণভাবে দৌড়াবে। অতঃপর মারওয়া পর্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে হেঁটে যাবে ও তাতে আরোহণ করবে, এবং সাফায় যা করেছে, এখানেও তা করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) সাফা থেকে অবতরণ করে মারওয়ার উদ্দেশ্যে হেঁটে যান এবং বাতনুল ওয়াদিতে দৌড়েছেন। বাতনুল ওয়াদি থেকে বের হয়ে হেঁটে চলেন এবং মারওয়ায় আরোহণ করেন। এখানে যে উভয়ের মাঝে সাত চক্কর তাওয়াফ করেন। এ হলো এক চক্কর।[১০]

এভাবে সাত চক্কর দিবে। সাফা চক্কর দিবে। সাফা থেকে শুরু করবে এবং মারওয়ায় গিয়ে শেষ করবে। আর প্রতি চক্করের সময় বাতনুল ওয়াদিতে দৌড়বে। দলীল হল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ।

আর সাফা থেকে শুরু করার কারণ, এ সম্পর্কে নবী (সা.)-এর এ বাণী ঃ ابدوا بما بدأ الله تعالى –আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে যেটি (অর্থাৎ সাফা) দিয়ে শুরু করেছেন তোমরাও তা থেকে শুরু কর।

আর সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী সাঈ হলো ওয়াজিব।

এটি রুকন নয়। তবে ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এটি রুকন। কেননা নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْىَ فَاسْعَوْا –আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর সাঈ নির্ধারণ করছেন। সুতরাং তোমরা সাঈ করো।

আমাদের দলীল আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا –ঐ দুটির মধ্যে তাওয়াফ করায় তার কোন গুনাহ্ নেই।

এ ধরনের বাক্য বৈধতা প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং তা রুকন হওয়া ওয়াজিব হওয়া উভয়টিকেই 'নফি' করে। তবে আমরা রুকনের পরিবর্তে ওয়াজিব হওয়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। আর এ জন্য যে, আকাট্য দলীল ছাড়া রুকন সাব্যস্ত হয় না। আর এখানে তা পাওয়া যায়নি।

আর ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছে كتب শব্দ মুস্তাহাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর সময় ওসীয়ত করা প্রসংগে বলেছেন ঃ كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا الْوَصِيَّةُ –তোমাদের কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় আর সে কিছু সম্পদ রেখে যায় তাহলে তার উপর ওসীয়ত করার বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে (অথচ ওসীয়ত ওয়াজিব নয়)।

অতঃপর মক্কা শরীফে ইহরাম অবস্থায় অবস্থান করবে। কেননা সে হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে। সুতরাং হজ্জের ক্রিয়াকর্ম আদায় করার পূর্বে সে ইহরাম মুক্ত হতে পারবে না।

---

৯. অতি ঢালু একটি স্থানের নাম ছিলো বাতনুল ওয়াদি। পরবর্তীতে ঢালু স্থানটিকে সমান করে দেয়া হয়েছে এবং দুই প্রান্তে সবুজ বাতির সাহায্যে স্থানটি নির্দেশ করা হয়েছে সাঈকারীরা ঐ স্থানটি দৌড়ে পার হন।

১০. অর্থাৎ সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত হল এক চক্কর আবার সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত হল দ্বিতীয় চক্কর।

যখনই তার ইচ্ছা হবে সে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করবে। কেননা তাওয়াফ হলো সালাত সদৃশ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ الطواف بالبيت صلوة (বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ হলো সালাত) আর সালাত হলো নির্ধারিত ইবাদতের মধ্যে উত্তম। সুতরাং তাওয়াফও অনুরূপ। তবে এই সময়ের মধ্যে এ সকল তাওয়াফের পরে সাঈ করবে না। কেননা সাঈ একবারই শুধু ওয়াজিব হয়। আর নফল সাঈ শরীআত অনুমোদিত নয়। আর প্রতি সাত চক্করের জন্য দুই রাকাআত সালাত আদায় করবে। এ দু'রাকাআত হলো তাওয়াফের সালাত। যেমন ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *ইয়াওমুত্তারবিয়ার (৮ই যিলহাজ্জার) পূর্বের দিন ইমাম একটি খুতবা বা ভাষণ দান করবেন, যাতে মানুষকে মিনায় যাওয়া আরাফায় সালাত আদায় করা, উকুফ করা এবং আরাফা থেকে ফিরে আসার নিয়মাবলী শিক্ষা দিবেন।*

মোট কথা হচ্ছে তিনটি খুতবা রয়েছে। প্রথমটি যা আমরা উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয়টি হলো আরাফার দিবসে আরাফাতে আর তৃতীয়টি হলো এগার তারিখে মিনায়। অতএব প্রতি দুই খুতবার মাঝে এক দিনের ব্যবধান রয়েছে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, লাগাতার তিনদিন খুতবা প্রদান করা হবে। তম্মধ্যে প্রথমটি হলো ইয়াওমুত্তারবিয়া (৮ই যিলহাজ্জ)। কেননা এই দিনগুলো হজ্জ মৌসুমের দিন এবং হাজীদের একত্র হওয়ার সময়।

আমাদের দলীল এই যে, খুতবাগুলোর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষাদান। অথচ ইয়াওমুত্তারবিয়া ও ইয়াওমুন নহর হলো ব্যস্ততার দিন। সুতরাং আমরা যা বলেছি সেটাই হবে অধিকতর উপকারী এবং অন্তরে অধিক ক্রিয়াশীল।

আট তারিখে মক্কায় ফজরের সালাত আদায় করে মিনার উদ্দেশ্য বের হবে এবং আরাফা-দিবসের ফজরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) আট তারিখে মক্কায় ফজরের সালাত আদায় করেন আর সূর্যোদয়ের পর মিনার উদ্দেশ্যে যান এবং সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব, ঈশা ও ফজর আদায় করেন। অতঃপর আরাফার উদ্দেশ্য রওয়ানা হন।

যদি হাজী আরাফার রাত্র মক্কায় যাপন করে আর সেখানেই ফজর পড়ে অতঃপর আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় এবং মিনা দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে যথেষ্ট হবে। কেননা এই দিনে মিনায় হজ্জের কোন ক্রিয়াকর্ম নেই। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নত অনুসরণ না করার কারণে সে মন্দ কাজ করল।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *অতঃপর আরাফা অভিমুখে রওয়ানা হবে এবং সেখানে অবস্থান করবে।* এর দলীল হল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ।

এ হলো উত্তমতার বিবরণ। তবে কেউ যদি মীনা থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বেই চলে যায় তাহলে তা জাইয। কেননা এই স্থানের সংগে তার পালনীয় আর কোন হুকুম নেই।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাব্‌সূত কিতাবে বলেছেন, আরাফা মাঠে লোকদের সাথে অবস্থান করবে। কেননা, আলাদা অবস্থানে অহংকার প্রকাশ পায়। অথচ অবস্থা হলো বিনয় প্রকাশের। আর সমাবেশের মাঝে দু'আ কবূলের আশা অধিক। কোন কোন মতে লোকদের সাথে বসার উদ্দেশ্য চলাচলের পথে অবতরণ না করা, যাতে চলাচলকারীদের অসুবিধা না হয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***সূর্য যখনই হেলে পড়বে তখন ইমাম লোকদের নিয়ে যুহর ও আসর পড়বেন। তিনি প্রথমে খুতবা পাঠ করবেন। আর খুতবায় লোকদের আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান, কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী, মাথা মুড়ানো এবং তাওয়াফে যিয়ারত করার নিয়মাবলী শিক্ষা দান করবেন। দু'টি খুতবা দিবেন। উভয় খুতবার মধ্যে একটি বৈঠকের দ্বারা পার্থক্য করবেন।*** রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরূপ করেছেন।

আর ইমাম মালিক (র.) বলেন, সালাতের পর খুতবা প্রদান করবেন। কেননা, এটা ওয়াজ ও উপদেশের খুতবা। সুতরাং তা ঈদের খুতবার সদৃশ।

আমাদের দলীল হল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যে আমল আমরা বর্ণনা করেছি।

তা ছাড়া এই জন্য যে, এ খুতবার উদ্দেশ্য হলো হজ্জের কার্যাবলী শিক্ষা দেওয়া। আর এ দুই সালাত একত্রে আদায় করা উক্ত আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

যাহিরী মাযহাব অনুযায়ী ইমাম যখন মিম্বরে আরোহণ করেন এবং উপবেশন করেন তখন মুআয্‌যিনগণ আযান দিবেন। যেমন জুমুআর জন্য দেওয়া হয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম বের হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া হবে। তাঁর পক্ষ থেকে বর্ণিত আরেকটি মতে খুতবার পরে আযান দিবে। আর বিশুদ্ধ হলো আমরা যা উল্লেখ করেছি। কেননা নবী করীম (সা.) যখন বের হলেন এবং নিজ উটনীর উপর আরোহণ করলেন তখন মুআয্‌যিনগণ তাঁর সামনে আযান দিয়েছিলেন।

ইমাম খুতবা থেকে ফারিগ হওয়ার পর মুআয্‌যিন ইকামত বলবেন। কেননা এই হলো সালাত শুরু করার সময়। সুতরাং তা জুমুআর সদৃশ।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***আর ইমাম লোকদের নিয়ে যুহরের ওয়াকতের মধ্যে এক আযান ও দুই ইকামাতসহ যুহর ও আসরের সালাত আদায় করবেন।***

হাদীছ বর্ণনাকারিগণের ঐকমত্য অনুযায়ী দুই সালাত একত্র করা সম্পর্কিত বহু হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছে আছে যে, নবী করীম (সা.) উক্ত দুই সালাত এক আযান ও দুই ইকামাত দ্বারা আদায় করেছেন।

আবার বর্ণনা দিয়েছেন যে, প্রথমে যুহরের জন্য আযান দিবে এবং যুহরের জন্য ইকামাত বলবে, অতঃপর আসরের জন্য ইকামাত বলবে। কেননা আসরের সালাত কে তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আদায় করা হচ্ছে। সুতরাং মানুষের অবগতির জন্য আলাদা ইকামাত বলবে।

উভয় সালাতের মাঝে কোন নফল পড়বে না। উকূফের উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য। এ কারণেই আসরকে তার নির্ধারিত সময় থেকে এগিয়ে আনা হয়েছে।

যদি কেউ নফল আদায় করে, তাহলে সে মাকরূহ কাজ করল এবং যাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী আসরের সালাতের জন্য দ্বিতীয় আযান দিতে হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে অবশ্য ভিন্নমত বর্ণিত হয়েছে। কেননা নফল বা অন্য কোন আমলে নিয়োজিত হওয়া প্রথম আযানের সংযুক্তি নষ্ট করে দেয়। সুতরাং আসরের জন্য পুনরায় আযান দিতে হবে।

যদি খুতবা ছাড়া সালাত আদায় করে তাহলে সালাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা এ খুতবা ফরয নয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***যে ব্যক্তি নিজের অবস্থানে থেকে একা যুহর পড়বে, সে আসরের সালাত আসরের ওয়াকতেই আদায় করবে।***

এটি হলো আবূ হানীফা (র.)-এর মত। আর সাহেবাইন বলেন, মুনফারিদও উভয় সালাত একত্রে আদায় করবেন। কেননা উকূফকে প্রলম্বিত করার প্রয়োজনে একত্র করার বৈধতা এসেছে। আর মুনফারিদেরও সে প্রয়োজন রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, কুরআনের বাণী দ্বারা সালাতের ওয়াক্তের হিফাজত করা ফরয। সুতরাং যে ব্যাপারে শরীআতের বিধান এসেছে, এ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে এ ফরয তরক করা জাইয হবে না। আর তা হলো ইমাম ও জামা'আতের সংগে উভয় সালাতকে একত্র করা।

আসরকে অগ্রবর্তী করার কারণ হলো জামা'আত সংরক্ষণ করা। কেননা সকলে যার যার উকূফের স্থানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর আসরের জন্য পুনরায় একত্র হওয়া কঠিন হবে। সাহেবাইন একত্রে করার যে কারণ উল্লেখ করেছেন, তা নয়। কেননা (নামায ও উকূফের মাঝে তো) কোন বিরোধ নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উভয় সালাতের জন্যই ইমামের উপস্থিতির শর্ত রয়েছে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, শুধু আসরের জন্য এ শর্ত। কেননা আসরকেই তার নির্ধারিত সময় থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে। হজ্জের ইহরাম সম্পর্কেও একই মত ভিন্নতা রয়েছে।[১১]

তবে এক বর্ণনা মতে হজ্জের ইহরাম যাওয়ালের পূর্বে হওয়া জরুরী। যাতে (উভয় সালাত) একত্রে করার ওয়াক্ত আসার পূর্বে ইহরাম বিদ্যমান থাকে। অন্য বর্ণনা মতে সালাতের উপর অগ্রবর্তী করাই যথেষ্ট। কেননা সালাত হলো উদ্দেশ্য।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর ইমাম উকূফের স্থানের অভিমুখী হবেন এবং জাবালের নিকটে অবস্থান করবেন। আর লোকেরাও সালাত থেকে ফারিগ হওয়ার পরই ইমামের সংগে অবস্থান করবে। কেননা নবী করীম (সা.) সালাত থেকে ফারিগ হওয়ার পর উকূফের স্থানের

---

১১. অর্থাৎ দুই সালাত একত্র করার জন্য ইমাম আবূ হানীফার মতে পূর্ব ইহরাম শর্ত; আর ইমাম যুফারের মতে শুধু আসরের পূর্বে ইহরাম বেঁধে নেওয়া যথেষ্ট।

অভিমুখে গমন করেছেন। উক্ত পাহাড়কে 'জাবালে রাহমাত' বলে। আর উকূফের এ স্থান হল উকূফের প্রধান স্থান।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *বাতনে উরানাহ ছাড়া সমগ্র আরাফাত হলো উকূফের স্থান।* কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ عَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوْا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِف وَارْتَفِعوا عَن وادى مُحَسِّر –সমগ্র আরাফা উকূফের স্থান। তবে বাতনে উরানাহ থেকে দূরে থাকবে। তদ্রূপ সমগ্র মুহাসসার থেকে দূরে থাকবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *ইমামের কর্তব্য হলো আরাফায় সওয়ারির উপর অবস্থান করা।* কেননা নবী (সা.) তাঁর উষ্ট্রী উপর অবস্থান করেছিলেন।

তবে পায়ের উপর দাঁড়িয়ে অবস্থান করলেও জাইয হবে। কিন্তু আমাদের বর্ণিত হাদীছটির কারণে প্রথম সুরতটি উত্তম।

কেবলামুখী হয়ে অবস্থান করা উচিত। কেননা নবী করীম (সা.) এরূপই উকূফ করেছিলেন এবং তিনি বলেছেন ঃ خَيْرُ الْمَوَاقِفِ مَا اسْتَقْبِلَتْ بِهِ الْقِبْلَةُ –উত্তম উকূফ হলো যা কিবলামুখী হয়ে করা হয়।

আর তিনি দু'আ করবেন এবং মানুষকে হজ্জের আহকাম শিক্ষা দিবেন। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) আরাফা দিবসে হস্ত প্রসারিত করে দু'আ করতেন যেন এক মিসকীন আহার প্রার্থনা করছেন।

আর ইচ্ছা অনুযায়ী দু'আ করবেন।

যদিও কিছু কিছু দু'আ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এবং সেগুলোর বিশদ বিবরণ আমি عدة الناسك في عدة من المناسك নামক কিতাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত তাওফীক বলে বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন ঃ *মানুষের কর্তব্য হলো ইমামের কাছাকাছি অবস্থান করা।* কেননা তিনি তো দু'আ করবেন এবং শিক্ষা দান করবেন। ফলে লোকেরা তা শুনতে ও অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

আর এ-ও তাদের উচিত যে, ইমামের পিছনে অবস্থান গ্রহণ করবে। যাতে তারা কেবলামুখী হতে পারে। এটা হলো উত্তমতার বিবরণ। কেননা আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, সমগ্র আরাফা হলো উকূফের স্থান। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন ঃ

আরাফায় অবস্থানের পূর্বে গোসল করা এবং খুব মনোযোগ সহকারে দু'আ করা মুস্তাহাব।

গোসল করা সুন্নাত। ওয়াজিব নয়। সুতরাং যদি শুধু উযূই করে তাহলেও জাইয হবে, যেমন জুমুআ, দুই ঈদ, ও ইহরামের সময়। আর খুব মনোযোগ দিয়ে দু'আ করা এ কারণে

যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এই অবস্থান ক্ষেত্রে আপন উম্মতের জন্য অতি মনোযোগ দিয়ে দু'আ করেছিলেন। তখন খুন-খারাবী ও যুলুমের অপরাধ ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে তাঁর দু'আ কবূল করা হয়েছে।[১২]

আর উকূফের স্থানে মুহূর্তের পর মুহূর্তে তালবিয়া পড়তে থাকবে।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, আরাফায় উকূফের সাথে সাথেই তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিবে। কেননা মৌখিক সাড়াদানের সময় হলো রুকনসমূহে ব্যস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। আর আমাদের দলীল হলো এই মর্মে বর্ণিত হাদীছ যে, নবী করীম (সা.) জামরাতুল আকাবায় উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত লাগাতার তালবিয়া পড়েছেন।

তাছাড়া হজ্জের তালবিয়া হলো সালাতের তাকবীরের ন্যায়। সুতরাং ইহরামের শেষ ভাগ পর্যন্ত তা বলবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন ঃ *সূর্য অস্ত যাওয়ার পর ইমাম এবং তাঁর সংগে অন্যান্য লোকের ধীর-স্থির যাত্রা করে মুযদালিফায় আগমন করবে।* কেননা নবী করীম (সা.) সূর্যাস্তের পর রওয়ানা হয়েছিলেন। তাছাড়া এতে মুশরিকদের প্রতি বিরোধিতা প্রকাশ করা হয়।[১৩] আর নবী করীম (সা.) পথে তাঁর সওয়ারিতে ধীর-স্থিরভাবে চলতেন।

আর যদি ভিড়ের আশংকায় ইমামের পূর্বে সে যাত্রা করে কিন্তু আরাফার সীমানা অতিক্রম না করে তাহলে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা সে তো আরাফা ত্যাগ করেনি। তবে উত্তম এই যে, নিজের স্থানেই সে অবস্থান করবে, যদি সে যথাসময়ের পূর্বে যাত্রা শুরুকারী না হয়।

আর যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার এবং ইমামের যাত্রা করার পর ভিড়ের আশংকায় সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তাহলে কোন দোষ নেই। কেননা বর্ণিত আছে যে, হযরত 'আইশা (রা.) ইমামের যাত্রা করার পর পানীয় চেয়ে পাঠালেন এবং ইফতার করলেন এরপর রওয়ানা হলেন।

ইমাম কুদূরী বলেন ঃ *মুযদালিফায় আসার পর মুস্তাহাব হলো ঐ পাহাড়ের কাছাকাছি অবস্থান গ্রহণ করা, যার উপর অগ্নি প্রজ্বলিত করা হতো। ঐ পাহাড়ের নাম কুযাহ।* কেননা নবী করীম (সা.) এই পাহাড়ের নিকট অবস্থান করেছিলেন। তদ্রূপ উমর (রা.) ও (অবস্থান করেছিলেন)। চলাচলের পথে অবস্থান করা পরিহার করবে, যাতে চলাচলকারীদের কষ্ট না হয়। সুতরাং পথের ডানে কিংবা বামে অবস্থান করবে।

আরাফায় অবস্থান প্রসংগে যে কথা আমরা বলেছি, সেই একই কারণে (মুযদালিফায়ও) ইমামের কাছাকাছি অবস্থান করবে।

ইমাম কুদূরী বলেন ঃ *ইমাম এক আযান ও এক ইকামতে লোকদের নিয়ে মাগরিব ও 'ঈশার সালাত আদায় করবেন।*

ইমাম যুফার (র.) এক আযান ও দুই ইকামতের কথা বলেছেন, আরাফায় দুই সালাত একত্র করার উপর কিয়াস করে।

---

১২. অন্য বর্ণনায় আছে, মুযদালিফায় যখন তিনি দু'আ করলেন তখন ঐ দু'টি বিষয়েও তাঁর দু'আ কবূল করা হয়েছে। (ইবন মাজা)

১৩. কেননা মুশরিকরা সূর্যাস্তের পূর্বে যাত্রা করতো।

আমাদের দলীল হলো জাবির (রা.)-এর বর্ণনা যে, নবী করীম (সা.) এক আযান ও এক ইকামাতে উভয় সালাত একত্রে আদায় করেছিলেন।

তাছাড়া এই জন্য যে, 'ঈশার সালাত তার নিজ ওয়াকতে আদায় করা হচ্ছে। সুতরাং অবহিত করার জন্য আলাদা ইকামতের প্রয়োজন নেই। আরাফায় আসরের সালাত এর বিপরীত। কেননা সেটাকে তার নিজ ওয়াক্ত থেকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে। সুতরাং অতিরিক্ত ঘোষণার জন্য আলাদা ইকামাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আর উভয় সালাতের মাঝে নফল পড়বে না। কেননা তা উভয় সালাতের একত্রতায় ত্রুটি সৃষ্টি করবে।

আর যদি নফল পড়ে কিংবা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত হয় তাহলে ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার কারণে পুনরায় ইকামতে দিবে। আযানও পুনরায় দেওয়া উচিত ছিল, যেমন প্রথম একত্রীভূত সালাতের বেলায় (অর্থাৎ আরাফায়) তবে আমরা শুধু ইকামাত পুনরায় দেওয়াকে যথেষ্ট মনে করেছি, এই জন্য যে, নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত আছে ঃ মুযদালিফায় মাগরিবের সালাত পড়েছেন এরপর রাতের খাবার খেয়েছেন এরপর 'ঈশার সালাতের জন্য (শুধু) আলাদা ইকামাত দিয়েছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এই একত্রীকরণের জন্য জামাআতের শর্ত নেই। কেননা মাগরিবকে তার নিজ ওয়াকত থেকে বিলম্বিত করা হয়েছে। আরাফায় একত্রীকরণের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তথায় আদায়কে তার নিজ ওয়াক্ত থেকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি পথে মাগরিবের সালাত আদায় করবে, সে সালাত তার জন্য যথেষ্ট হবে না।

এটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে তা পুনরায় আদায় করতে হবে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এ সালাতই তার জন্য যথেষ্ট হবে। তবে সে মন্দ কাজ করল। একই মতভিন্নতা রয়েছে যদি মাগরিবের সালাত আরাফায় পড়ে থাকে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলীল এই যে সে তো উক্ত সালাত তার ওয়াক্তেই আদায় করেছে। সুতরাং পুনরায় তা আদায় করা ওয়াজিব হবে না। যেমন ফজর উদিত হওয়ার পরে আদায় করলে। তবে যেহেতু বিলম্ব করা সুন্নত ছিল, সেহেতু তা তরক করার কারণে গুনাহগার হবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর দলীল হলো নবী (সা.) থেকে বর্ণিত হাদীছ। তিনি উসামা (রা.)-কে মুযদালিফার পথে বলেছেন ঃ الصَّلٰوةُ أَمَامَكَ। (সালাত তোমার সম্মুখে)-এর অর্থ সালাতের ওয়াক্ত। এ কথা এদিকেই ইংগিত প্রদান করে যে, বিলম্ব করা ওয়াজিব। আর ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, যাতে মুযদালিফায় দুই সালাত একত্র করা সম্ভব হয়। সুতরাং যতক্ষণ না ফজর উদিত হয়, ততক্ষণ পুনরায় আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে, যাতে সে উভয় সালাতের মাঝে একত্রকারী হতে পারে। পক্ষান্তরে ফজর উদিত হয় পুনরায় আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে যাতে সে উভয় সালাতের মাঝে একত্রকারী হতে পারে। পক্ষান্তরে ফজর উদিত হয়ে গেলে তো একত্র করা সম্ভব নয়। সেহেতু পুনরায় আদায় করার হুকুম রহিত হয়ে যায়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *যখন ফজর উদিত হবে তখন ইমাম অন্ধকারেই লোকদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করবেন।* কেননা ইবন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) সে দিন ফজর অন্ধকারে পড়েছিলেন।

তাছাড়া এই জন্য যে, অন্ধকারে ফজর পড়ার মাঝে উকূফের (মুযদালিফায় অবস্থানের) প্রয়োজন পূর্ণ করা হয়। (কেননা ফজরের পরই হলো মুযদালিফায় অবস্থানের সময়) সুতরাং তা জাইয হবে। যেমন আরাফায় আসর অগ্রবর্তী করা হয়।

অতঃপর ইমাম উকূফ করবেন এবং লোকেরা তাঁর সংগে উকূফ করবে। তারপর তিনি দু'আ করবেন। কেননা নবী (সা.) এই স্থানে উকূফ করে দু'আ করেছিলেন। কেননা ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর হাদীছে বর্ণিত আছে যে, এখানে উম্মতের জন্য তাঁর দু'আ কবূল করা হয়। এমন কি হত্যা করা এবং যুলুম করার অপরাধের ব্যাপারেও।

আমাদের মতে এ উকূফ হলো ওয়াজিব, রুকন নয়। তাই কোন ওযর ছাড়া তা তরক করলে দম ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফিঈ (র.) একে রুকন বলেন, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ (মাশআরুল হারামের নিকট আল্লাহ্‌র স্মরণ কর); এই ধরনের আদেশ দ্বারা রুকন সাব্যস্ত হয়।

আমাদের দলীল এই যে, নবী (সা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদের আগেভাগে রাত্রেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যদি তা রুকন হতো তাহলে তিনি তা করতেন না।

আর ইমাম শাফিঈ (র.) যে আয়াত পেশ করেছেন, তাতে 'যিকির' শব্দটি রয়েছে। আর 'ইজমা' প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যে, যিকির রুকন নয়।

আমরা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি জেনেছি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিম্নোক্ত বাণী থেকে ঃ مَنْ وَقَفَ مَعَنَا هٰذَا الْمَوْقِفَ وَقَدْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ ذٰلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّه –যে আমাদের সংগে এই অবস্থান ক্ষেত্রে অবস্থান করল এবং সে ইতোপূর্বে আরাফা থেকে উকূফ করে এসেছে, তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হজ্জের পূর্ণতাকে এই উকূফের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এবার তা ওয়াজিবের আলামাত হওয়ার যোগ্য। তবে যদি ওযর, যেমন দুর্বলতা বা অসুস্থতা অথবা স্ত্রী লোক ভীড়ের কারণে তরক করে থাক, তাহলে তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। দলীল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *ওয়াদি মুহাস্‌সার ছাড়া সমগ্র মুযদালিফাই উকূফের স্থান।* দলীল হলো ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন সূর্য উদিত হবে, তখন ইমাম ও অন্যান্য লোকেরা রওয়ানা হয়ে মিনায় আগমন করবে।

নগণ্য বান্দা (অর্থাৎ গ্রন্থকার স্বয়ং) বলে– আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করুন– মুখ্‌তা ছারুল কুদূরীর বিভিন্ন নুসখায় এরূপই রয়েছে। কিন্তু এটা ভুল। সঠিক এই যে, যখন 'ইসফার' অর্থাৎ ফর্সা হয়ে যাবে, তখনই ইমাম ও অন্যান্য লোকেরা রওয়ানা দিবে। কেননা নবী করীম (সা.) সূর্যোদয়ের পূর্বে রওয়ানা দিয়েছিলেন।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *অতঃপর জামরাতুল আকাবা থেকে শুরু করবে। অর্থাৎ বাতনুল ওয়াদীর দিক থেকে উক্ত জামরাহর প্রতি আংগুলের মাথায় রেখে ছুঁড়ে মারার মত ছোট ছোট সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে।* কেননা নবী করীম (সা.) যখন মিনায় আগমন করলেন, তখন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত কোথাও নামেননি। এবং তিনি বলেছেন ঃ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ لَا يُؤْذِى بَعْضُكُمْ بَعْضًا –তোমরা আংগুলের মাথায় রেখে ছুঁড়ে মারার মত ছোট ছোট কংকর নাও, যাতে তোমাদের একে অপরকে আঘাত না দেয়।

যদি এর চাইতে বড় কংকর নিক্ষেপ করে তা হলেও জাইয হবে। কেননা রামীর (নিক্ষেপের) উদ্দেশ্য তো হাসিল হয়ে যায়। তবে বড় পাথর মোটেও নিক্ষেপ করবে না, যাতে অন্য কেউ তা দ্বারা কষ্ট না পায়।

যদি আকাবার উপরে দিক থেকে নিক্ষেপ করে তাহলেও যথেষ্ট হবে। কেননা তার চারিপার্শ্বই সংশ্লিষ্ট আমল আদায় করার স্থান। আমাদের বর্ণিত হাদীছের আলোকে বাতনুল ওয়াদি থেকে হওয়াই উত্তম।

প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলবে। ইব্‌ন মাস'উদ ও ইব্‌ন উমর (রা.) এরূপ বর্ণনা করেছেন।

যদি তাকবীরের স্থলে তাসবীহ পড়ে তবুও যথেষ্ট হবে। কেননা, এতে যিকির হাসিল হয়ে যায়। আর যিকিরই হলো কংকর নিক্ষেপের আদব।

আর এ স্থানে বিলম্ব করবে না। কেননা নবী করীম (সা.) এখানে বিলম্ব করেন নি।

প্রথম কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবিয়া বন্ধ করে দেবে।

আমাদের দলীল, ইতোপূর্বে উল্লেখিত ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) বর্ণিত হাদীছে একথা রয়েছে।

আর জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) জামরাতুল আকাবায় প্রথম কংকরটি নিক্ষেপের সময় তালবিয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

কংকর নিক্ষেপের নিয়ম এই যে, ডান হাতের বৃদ্ধাংগুলির পৃষ্ঠে কংকর স্থাপন করবে এবং শাহাদাত আংগুলির সাহায্যে নিক্ষেপ করবে। নিক্ষেপের দূরত্বের পরিমাণ এই যে, নিক্ষেপের স্থান এবং কংকর পড়ার স্থানের মাঝে পাঁচ হাত দূরত্ব হবে। হাসান (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। কেননা এর কম পরিমাণে নিক্ষেপ হবে না, (বরং) ফেলে দেয়া হবে।

আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে দেয়, তাহলেও যথেষ্ট হবে। কেননা এটা পায়ের দিকে নিক্ষেপ করা হলো। তবে সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণের কারণে সে গুনাহ্‌গার হবে।

আর যদি জামরার উপর কংকর রেখে দেয়, তবে যথেষ্ট হবে না। কেননা তা-তো রামী হলো না।

যদি কংকর নিক্ষেপ করে আর তা জামরাহর নিকটে গিয়ে পড়ে, তাহলেও জাইয হবে। কেননা এই পরিমাণ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভবপর নয়।

যদি জামরাহ্ থেকে দূরে গিয়ে পড়ে, তাহলে তা যথেষ্ট হবে না। কেননা কংকর নিক্ষেপ নির্দিষ্টস্থান ছাড়া ইবাদত রূপে গণ্য নয়।

যদি সাতটি কংকর একত্রে নিক্ষেপ করে, তাহলে তা একবার গণ্য হবে। কেননা শরীআতের স্পষ্ট নির্দেশ হলো কাজটি পৃথক ভাবে করা।

কংকর যে কোন স্থান থেকে ইচ্ছা সংগ্রহ করবে। তবে জামরাহ্র নিকট থেকে নয়। কেননা, তা মাকরূহ হবে। কারণ জামারাহর নিকটে পতিত কংকরগুলো হল প্রত্যাখ্যাত। হাদীছে এরূপই এসেছে। সুতরাং এগুলো কুলক্ষণ রূপে বিবেচিত। তা সত্ত্বেও যদি তা করে তবে যথেষ্ট হবে। রামীর কর্ম বিদ্যমান থাকার কারণে।

মৃত্তিকার যে কোন অংশ বিশেষের দ্বারা রামী জাইয।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। (তাঁর মতে কংকর ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা জাইয হবে না।) কেননা রামী ক্রিয়াই হলো উদ্দেশ্য। আর তা মাটির দ্বারাও হাছিল হয়, যেমন পাথর দ্বারা হাছিল হয়।

আর সোনা বা রূপার টুকরা দ্বারা রামীর হুকুম এর বিপরীত। কেননা একে ছিটানো বলা হয়, রামী নয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *তারপর আগ্রহ থাকলে কুরবানী করবে। তারপর মাথা মুড়াবে কিংবা ছাঁটবে।* কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِيْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نَرْمِيَ ثُمَّ نَذْبَحَ ثُمَّ نَحْلِقَ –আমাদের আজকের দিনে প্রথম কাজ হলো রামী করা, তারপর কুরবানী করা তারপর মাথা মুড়ানো।

তাছাড়া মাথা মুড়ানো হলো হালাল হওয়ার (অর্থাৎ ইহরামমুক্ত হওয়ার) অন্যতম উপায়। তদ্রূপ যাব্হ করাও একটি উপায়। তাইতো অবরুদ্ধ ব্যক্তি 'যাব্হ'-এর মাধ্যমে হালাল হয়ে যায়। সুতরাং কংকর মারাকে উভয়ের উপর অগ্রবর্তী করা হবে। আর মাথা মুড়ানো হলো ইহ্রামের নিষিদ্ধ কার্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কুরবানীকে তার উপর অগ্রবর্তী করা হবে।

কুরবানীকে তার আগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ এই যে, হজ্জে ইফরাদকারী যে কুরবানী করে, তা হল নফল; আর আমাদের আলোচনা হচ্ছে ইফরাদকারী সম্পর্কে।

আর মাথা মুড়ানো উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তিন বার বলেছেন ঃ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ (আল্লাহ্ হলককারীদের প্রতি রহম করুন।) হাদীছটিতে অধিক বার হলককারীদের প্রতি রহমের দু'আ করা হয়েছে।

তাছাড়া হলক হলো ময়লা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর। আর এ-ই হলো উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে চুল ছাঁটার মধ্যে কিছুটা ত্রুটি রয়েছে। সুতরাং তা (ছাঁটার তুলনায় মুড়ানো) উযূর তুলনায় গোসলের সদৃশ হলো। হলকের ক্ষেত্রে মাথার চার ভাগের এক ভাগই যথেষ্ট হবে।

'মাথা মাস্‌হ'-এর উপর কিয়াস করে একথা বলা হয়। *তবে পুরো মাথা মুড়ানোই উত্তম রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণে।*

চুল ছাঁটার নিয়ম হলো চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আংগুল পরিমাণ ছেঁটে ফেলা। এরপর তার জন্য স্ত্রী সহবাস ছাড়া আর সব কিছু হালাল হয়ে গেছে।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, তবে 'খুশ্‌বু'ও ছাড়া। কেননা তা সহবাসের প্রতি আকর্ষণকারী।

আমাদের দলীল হলো এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءُ –স্ত্রী সহবাস ছাড়া আর সব কিছু তার জন্য হালাল হয়ে গেছে; আর হাদীছ কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য।

আমাদের মতে লজ্জাস্থান ছাড়া অন্য ভাবেও সহবাস করা তার জন্য হালাল নয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। আমাদের দলীল হল, এটাও তো স্ত্রী দ্বারা শাহওয়াত পুরা করার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পূর্ণ হালাল হওয়া পর্যন্ত তা বিলম্বিত করা হবে।

আমাদের মতে হালাল হওয়ার জন্য কংকর নিক্ষেপ কোন উপায় নয়। ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, হলকের ন্যায় এটাও কুরবানীর দিনের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং ইহ্‌রামমুক্ত করার ক্ষেত্রে এটা হলকের সমপর্যায়ের।

আমাদের দলীল এই যে, যেটা ইহ্‌রাম মুক্তকারী হবে, সেটা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। যেমন মাথা মুড়ানোর বিষয়টি। অথচ রামী তো অপরাধ রূপে বিবেচিত নয়। তাওয়াফের বিষয়টি এর বিপরীত।[১৪] কেননা পূর্ববর্তী হলফ দ্বারা হালা হয়ে গেছে, তাওয়াফ দ্বারা নয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *অতঃপর সেই দিন কিংবা তার পরের দিন কিংবা তার পরবর্তী দিন মক্কায় গমন করবে; এবং সাত চক্কর বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফে যিয়ারত করবে।* কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) যখন মাথা মুড়ালেন, তখন মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করলেন। অতঃপর মিনায় ফিরে এসে সেখানে যুহরের সালাত আদায় করলেন। আর তাওয়াফে যিয়ারাতের সময় হলো কুরবানীর দিনগুলো। (দশ, এগার ও বার তারিখ)।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাওয়াফকে 'যবাহ'-এর উপর عطف (সংযুক্ত) করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ فَكُلُوا مِنْهَا (অনন্তর তোমরা তা থেকে আহার কর।) অতঃপর তিনি ইরশাদ করেছেন وَلْيَطَّوَّفُوا (আর তারা যেন তাওয়াফ করে)। সুতরাং উভয়টির সময় একই হবে।

---

১৪. এটি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন এই যে, তাওয়াফ তো স্ত্রী সহবাসের ক্ষেত্রে হালালকারী, যেমন হলক অন্য সকল ক্ষেত্রে হালালকারী। আর তাওয়াফ তো ইহ্‌রামের সময় অপরাধ নয়। উত্তর এই যে, মূল হালালকারী হলো মাথা মুড়ানো। স্ত্রী সহবাসের ক্ষেত্রে সেটি তাওয়াফ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে।

আর তাওয়াফের প্রথম সময় হলো ইয়াওমুন্-নহরের ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে। কেননা এর পূর্বে রাত্রের যে সময় রয়েছে, তা হলো আরাফায় অবস্থানের সময়। আর তাওয়াফ হলো তার পরবর্তী পর্যায়ে।

আর এ দিনগুলোর মাঝে (তাওয়াফের জন্য) সর্বোত্তম হলো প্রথম দিন, যেমন কুরবানীর বেলায়। এবং হাদীছ শরীফে রয়েছে أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا (তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো প্রথম দিনটি)।

যদি তাওয়াফুল কুদূমের পর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করে থাকে, তাহলে এই তাওয়াফে রামাল করবে না। এবং তার উপর সাঈও নেই। আর যদি পূর্বে সাঈ না করে থাকে তাহলে এই তাওয়াফে রামাল করবে এবং তারপরে সাঈ করবে। কেননা হজ্জের মধ্যে সাঈ শুধু একবার ব্যতীত শরীআতে প্রমাণিত নয়। আর রামাল শুধু ঐ তওয়াফে একবার প্রমাণিত, যার পরে সাঈ রয়েছে।

আর এই তাওয়াফের পরও দুই রাকাআত সালাত আদায় করবে। কেননা আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী প্রতিটি তাওয়াফের সমাপ্তি হবে দুই রাকাআত সালাতের দ্বারা। তাওয়াফ ফরয হোক বা নফল।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এখন তার জন্য স্ত্রী সহবাসও হালাল হয়ে গেলো। তবে তা পূর্ববর্তী হলকের মাধ্যমে। কেননা সেটাই হলো হালালকারী। তাওয়াফের মাধ্যমে নয়। অবশ্য হলকের কার্যকারিতাকে স্ত্রী সহবাসের ক্ষেত্রে বিলম্বিত করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর এ তাওয়াফই হজ্জের ফরয তাওয়াফ এবং তা হজ্জের রুকন। কেননা এ তাওয়াফই হলো নির্দেশিতত আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীতে ঃ وليطوفوا بالبيت العتيق (তারা যেন প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে।) আর একে طواف الافاضة এবং طَوَافُ يَومَ النَّحرِ ও বলা হয়।

আর তাওয়াফে যিয়ারাতকে এই দিনগুলো থেকে বিলম্বিত করা মাকরূহ। কেননা আমরা বলে এসেছি যে, এই তাওয়াফ এই দিনগুলোর সময়ের সাথে সীমিত। যদি এই দিনগুলো থেকে বিলম্বিত করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। জিনায়াত (হজ্জের ত্রুটি বিষয়ক) অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ্ আমরা তা আলোচনা করবো।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *অতঃপর মিনায় ফিরে এসে সেখানেই অবস্থান করবে।* কেননা আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, নবী করীম (সা.) মিনায় ফিরে এসেছিলেন। তাছাড়া এই জন্য যে, তার যিম্মায় রামী রয়ে গেছে, আর রামীর স্থান হলো মিনা।

কুরবানীর তিনদিনের দ্বিতীয় দিনে যখন সূর্য হেলে পড়বে, তখন তিনটি জামারায় রামী করবে। মসজিদে খায়ফের নিকটবর্তী জামরাহ থেকে শুরু করবে। সে জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কংকরের সাথে তাকবীর বলবে। এবং সেখানে একটু থামবে (ও দু'আ-তসবীহ পাঠ করবে)। অতঃপর তার পরবর্তী জামরায় একইভাবে রামী করবে। এবং সেখানেও একটু থামবে। অতঃপর জামরাতুল আকাবায় রামী করবে। একইভাবে রামী করবে। কিন্তু সেখানে থামবে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হজ্জের আমলসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করার সময় জাবির (রা.)-এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

উভয় জামরাহ্র নিকট ঐ স্থানে দাঁড়াবে, যেখানে লোকেরা দাঁড়ায় এবং আল্লাহ্ তা'আলার হাম্‌দ-সানা করবে, তাহলীল তাকবীর বলবে,[১৫] এবং নবী করীম (সা.)-এর উপর দুরূদ পড়বে। আর নিজের যাবতীয় প্রয়োজনের জন্য দু'আ করবে। (দু'আয় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে) কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ لَاتُرْفَعُ الْاَيْدِى اِلاَّ فِىْ سَبْعِ مَوَاطِنَ –সাতটি স্থানে ব্যতীত যেন হাত তোলা না হয়। তন্মধ্যে দুই জামরাহ্র নিকটের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাত তোলার মানে দু'আর জন্য হাত তোলা।

এই অবস্থান ক্ষেত্রসমূহে ইমামের কর্তব্য হলো দু'আর সময় সকল মু'মিনের জন্য ইস্তিগফার করা। কেননা নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ –হে আল্লাহ্, হাজীকে ক্ষমা করুন এবং হাজী যার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাকে ক্ষমা করুন।

মূলনীতি এই যে, যে রামীর পরে আরেকটি রামী রয়েছে, সে রামীর পরে থামবে। কেননা এটা হলো ইবাদতের মধ্যবর্তী সময়। সুতরাং এ সময় দু'আ করাই সমীচীন আর যে রামীর পরে আর কোন রামী নেই, তার পরে থামবে না, কেননা ইবাদত শেষ হয়ে গেছে। এ জন্যই ইয়াওমুন্-নহরেও জামরাতুল আকাবার পরে থামবে না।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এর পরবর্তী দিন সূর্য হেলে পড়ার পর একই ভাবে তিনটি রামী করবে। অতঃপর যদি মীনা থেকে জলদী চলে যেতে চায়, তাহলে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করবে। আর যদি মিনায় অবস্থান করতে চায়, তাহলে চতুর্থ দিন সূর্য হেলে পড়ার পর তিনটি রামী করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقٰى –যে ব্যক্তি দু'দিনের মাথায় জলদী চলে যেতে চায়, তার কোন গুনাহ্ নেই। আবার যে বিলম্ব করতে চায়, তারও কোন গুনাহ নেই। এ বিধান ঐ ব্যক্তির জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করে।

তবে উত্তম হলো মিনায় অবস্থান করা। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) চতুর্থ দিনও অপেক্ষা করেছেন, তিনিটি জামরাহ্র রামী করা পর্যন্ত।

চতুর্থ দিনের ফজর উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তার জন্য যাত্রা করার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু ফজর উদিত হওয়ার পর যাত্রা করার অবকাশ নেই। কেননা রামী করার ওয়াক্ত এসে যাওয়ার কারণে। তবে এ বিষয়ে ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

যদি এই দিনে (অর্থাৎ চতুর্থ দিনে) ***ফজর উদিত হওয়ার পর যাওয়ালের পূর্বে রামী করে ফেলে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা জাইয হবে।*** এ হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের কথা।

---

১৫. তাহলীল অর্থ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা। তাকবীর অর্থ আল্লাহ্ আকবার বলা।

অন্যান্য দিনের উপর কিয়াস করে সাহেবাইন বলেন যে, তা জাইয হবে না। কেননা অন্যান্য দিনের সাথে পার্থক্য ছিলো শুধু (মক্কা অভিমুখে) যাত্রার অবকাশের ক্ষেত্রে। আর যখন সে অবকাশ গ্রহণ করলো না তখন এ দিনটিও অন্যান্য দিনের নিয়মের সংগে যুক্ত হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া এই জন্য যে, রামী না করার ক্ষেত্রেই যখন এই দিনটিতে শিথিলতার ক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে, তখন যে কোন সময় রামী করার বৈধতার ক্ষেত্রে শিথিলতার ক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া আরো স্বাভাবিক। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে ঐ দু'টি দিনে যাওয়ালের পরে ছাড়া রামী জাইয নয়। কেননা দিন দু'টিতে রামী ত্যাগ করা বৈধ নয়। সুতরাং তা বর্ণিত মূল অবস্থার উপর বহাল থাকবে।

কুরবানীর দিন রামীর প্রথম ওয়াক্ত হলো ফজর উদিত হওয়ার সময় থেকে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, রামীর প্রথম ওয়াক্ত হলো মধ্যরাতের পর থেকে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) রাখালদের রাতে রামী করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

আমাদের দলীল হলো নবী করীম (সা.)-এর বাণী ঃ لا تَرْمُوْا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ اِلاَّ مُصْبِحِيْنَ (ويروى حتى تطلع الشمس) –তোমরা ভোরে উপনীত হওয়া ছাড়া জামরাতুল আকাবার রামী করবে না। অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে রামী করবে না।

সুতরাং প্রথম বর্ণনা দ্বারা মূল ওয়াক্ত সাব্যস্ত হবে, আর দ্বিতীয় বর্ণনা দ্বারা উত্তম হওয়া সাব্যস্ত হবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তার ব্যাখ্যা হলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাত্র। তাছাড়া এই জন্য যে, ইয়াওমুন্-নহরের রাত্র হলো মুযদালিফায় অবস্থানের রাত্র। আর রামী তো উকুফের পরবর্তী পর্যায়ের। সুতরাং অনিবার্যভাবেই রামীর ওয়াক্ত উকুফের পরেই হবে।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে (রামীর) এই সময় সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ اِنَّ اَوَّلَ نُسُكِنَا فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ الرمىُ নিশ্চয় –এই দিনে আমাদের প্রথম আমল হলো রামী।

এখানে পূর্ণ দিবসকেই রামীর সময় সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর দিবস শেষ হয় সূর্যাস্তের মাধ্যমে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যাওয়ালের সময় পর্যন্ত তা প্রলম্বিত হবে। আমাদের বর্ণিত হাদীছটি হলো তাঁর বিপক্ষে প্রমাণ।

যদি রাত্র পর্যন্ত বিলম্ব করে তবে রাত্রেই রামী করবে। এজন্য তার উপর কোন দম নেই।

প্রমাণ হলো (ইতোপূর্বে বর্ণিত) রাখালদের অনুমতি দান সংক্রান্ত হাদীছ।

যদি আগামী দিন পর্যন্ত বিলম্ব করে তাহলে আগামী দিনেই রামী করবে। কেননা তা মৌলিকভাবে রামীর সময়।

তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে রামীকে তার নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত করার কারণে। আর এ-ই হলো তাঁর মাযহাব।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *যদি সওয়ার অবস্থায় রামী করে, তাহলে যথেষ্ট হবে।* কেননা, কংকর নিক্ষেপের আমল তো হাছিল হয়েছে।

আর যে রামীর পর আরেকটি রামী রয়েছে, সেক্ষেত্রে উত্তম হলো পায়ে হেটে রামী করা। আর যে রামীর পরে রামী নেই, সেক্ষেত্রে সওয়ার অবস্থায় রামী করতে পারে। কেননা, প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে রামীর পরে অবস্থান ও দু'আ রয়েছে, যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। সুতরাং পায়ে হেঁটে রামী করবে, যাতে তা বিনয় প্রকাশের অধিকতর নিকবর্তী হয়

উত্তমতার বিষয়টি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। কংকর নিক্ষেপের রাত্রগুলো মিনায় অবস্থান না করা মাকরূহ। কেননা, নবী (সা.) মিনাতেই রাত্রি যাপন করেছেন আর উমর (রা.) মিনাতে না থাকার কারণে শাস্তি দিতেন।

যদি স্বেচ্ছায় (বিনা ওযরে) অন্যত্র রাত্রি যাপন করে, তাহলে আমাদের মতে তার উপর কোন দণ্ড আসবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

আমাদের যুক্তি এই যে, কেননা রাত্রগুলো মিনায় অবস্থান সাব্যস্ত হয়েছে, যাতে দিনগুলোতে রামী করা সহজ হয়। সুতরাং এই অবস্থান হজ্জের অন্তর্ভুক্ত আমল নয়। সুতরাং তা তরক ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করবে না।

আর এটা মাকরূহ যে, কেউ তার সামা-পাত্র আগেভাগে মক্কায় পাঠিয়ে দেয় এবং মীনায় অবস্থান করে রামী করা পর্যন্ত। কেননা বর্ণিত আছে যে, উমর (রা.) এরূপ করতে নিষেধ করতেন এবং এজন্য শাস্তি দিতেন।

আর এ জন্য যে, তার মন সে দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। *যখন মক্কার দিকে যাত্রা করবে, তখন মুহাছ্ছাব অর্থাৎ আবতাহ নামক স্থানে অবতরণ করবে।*

এটা একটা জায়গার নাম, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অবতরণ করেছিলেন। আর তাঁর অবতরণ ছিলো ইচ্ছাকৃত। এ-ই বিশুদ্ধ মত। তাই এখানে অবস্থান করা সুন্নত হবে। যেমন বর্ণিত আছ যে, নবী করীম (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে বলেছিলেন, আগামীকাল আমরা খায়ফে বনী কানানা-তে অবতরণ করবো, যেখানে মুশরিকরা তাদের শিরকের উপর থাকার পরস্পর শপথ নিয়েছিল।

তিনি একথা বলে বনূ হাশিমকে বর্জনের ব্যাপারে তাদের চরম তৎপরতার প্রতি ইংগিত করেছিলেন। সুতরাং আমরা জানতে পারলাম যে, তিনি তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ মুশরিকদের দেখানোর ইচ্ছা করেছিলেন। সুতরাং তাওয়াফের রামালের ন্যায় এটিও সুন্নাত হবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *অতঃপর মক্কায় প্রবেশ করবে এবং বায়তুল্লাহ্র সাত চক্কর তাওয়াফ করবে, তাতে রামাল করবে না।*

এটা হলো طواف الصدر বা প্রত্যাবর্তনের তাওয়াফ এটাকে طواف الوداع বা বিদায়ী তাওয়াফও বলা হয়। এবং বায়তুল্লাহ্র সংগে শেষ সাক্ষাতের তাওয়াফও বলা হয়। কেননা এই তাওয়াফের মাধ্যমে সে বায়তুল্লাহ্কে বিদায় জানাচ্ছে এবং বায়তুল্লাহ্ থেকে প্রত্যাবর্তন করছে।

আমাদের মতে এটি ওয়াজিব।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

আমাদের দলীল হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ বাণী ঃ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ اٰخِرُ عَهْدِهٖ بِالْبَيْتِ الطَّوَافُ –যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করবে, বায়তুল্লাহ্র সংগে তার শেষ সাক্ষাৎ যেন হয় তাওয়াফের মাধ্যমে। ঋতুগ্রস্ত নারীদের তিনি (এই তাওয়াফ না করার) রুখসত দিয়েছেন।

তবে মক্কাবাসীদের উপর এ তাওয়াফ ওয়াজিব নয়। কেননা তারা তো প্রত্যাবর্তন করছেন না এবং বিদায়ও জানাচ্ছেন না।

এই তাওয়াফে রামাল নেই। কেননা আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, রামাল শুধু একবারই অনুমোদিত হয়েছে।

এরপর অবশ্য তাওয়াফের দুই রাকাআত সালাত আদায় করবে। এর কারণ পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।[১৬]

অতঃপর যমযমের নিকট এসে যমযমের পানি পান করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) নিজ হাতে বালতি করে পানি তুলেছেন এবং পান করেছেন। অতঃপর বালতির অবশিষ্ট পানি কুয়ায় ফেলে দিয়েছেন।

আর মুস্তাহাব হলো বায়তুল্লাহ্র দরজায় আসবে এবং চৌকাঠে চুম্বন করবে। এরপর আসবে মুলতাযামে আর তাহলো দরজা। আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান সে স্থানে বুক ও চেহারা লাগাবে এবং কিছু সময় বায়তুল্লাহ্র গিলাফ জড়িয়ে ধরবে। অতঃপর তার বাড়ির দিকে ফিরবে।

এভাবেই বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) মুলতাযিমের সংগে এরূপ করেছেন।

আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন, এ-ও উচিত যে, বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে পিছনের দিকে হেঁটে ফিরবে বায়তুল্লাহ্র বিচ্ছেদে ক্রন্দনরত শোকাভিভূত অবস্থায়। এভাবে বায়তুল্লাহ্ শরীফ থেকে বের হয়ে আসবে। এই হলো হজ্জের পূর্ণ বিবরণ।

---

১৬. কেননা পিছনে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তাওয়াফকারী প্রতি সাত চক্কর তাওয়াফের জন্য দুই রাকাআত নামায পড়বে।

পরিচ্ছেদ ঃ উকূফের সাথে সংশ্লিষ্ট

মুহরিম যদি মক্কায় প্রবেশ না করেই আরাফা অভিমুখে গমন করে এবং আমাদের পূর্ব বর্ণিত নিয়ম অনুসারে সেখানে উকূফ করে তাহলে তার, যিম্মা থেকে তাওয়াফুল কুদূম রহিত হয়ে যাবে। কেননা তাওয়াফুল কুদূম হজ্জের শুরুতে এমনভাবে শরীআতের বিধান সাব্যস্ত হয়েছে যে, তার উপর হজ্জের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম পরম্পরায় আবর্তিত হয়ে থাকে। সুতরাং ঐ রূপ ছাড়া অন্য কোন রূপে তা আদায় করা সুন্নত হবে না।

আর এটা তরক করার কারণে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা এটা সুন্নাত। আর সুন্নাত তরক করার কারণে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না।

যে ব্যক্তি নয় তারিখের সূর্য হেলে পড়া থেকে দশ তারিখের ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী যে কোন সময়ে আরফায় উকূফ করতে পারে, সে হজ্জ পেয়ে গেলো।

সুতরাং আমাদের মতে উকূফের প্রথম ওয়াক্ত হলো যাওয়ালের পর। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) যাওয়ালের পর উকূফ করেছেন, আর এ হলো প্রথম ওয়াক্তের পর।[১৭]

আর নবী (সা.) বলেছেন ঃ مَنْ اَدْرَكَ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ –যে ব্যক্তি অন্ততঃ রাত্রে আরাফার অবস্থান লাভ করতে পারে সে হজ্জ পেয়ে গেলো, আর যে রাত্রেও আরফার অবস্থান লাত করতে না, পারে তার হজ্জ ফাওত হয়ে গেলো। এ হলো ওকূফের শেষ সময়ের বিবরণ।

ইমাম মালিক (র.) যদিও বলতেন যে, উকূফের প্রথম ওয়াক্ত হলো ফজর উদিত হওয়ার কিংবা সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে, কিন্তু আমাদের এইমাত্র বর্ণিত হাদীছ তার বিপক্ষে দলীল।

যদি যাওয়ালের পর উকূফ করে সেই মুহূর্তে রওয়ানা দিয়ে দেয়, তাহলে আমাদের মতে যথেষ্ট হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিষয়টিকে اَوْ অব্যয় যোগে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ اَلْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّه –হজ্জ হলো আরাফার অবস্থান। সুতরাং যে ব্যক্তি রাত্রের বা দিনের কিছু সময় আরাফায় অবস্থান করলো, তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেলো। اَوْ অব্যয়টি হলো ইচ্ছা প্রদানমূলক অব্যয়।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, দিনের সহিত রাত্রের কিছু অংশে উকূফ না করলে যথেষ্ট হবে না। কিন্তু আমাদের বর্ণিত হাদীছ তাঁর বিপক্ষে দলীল।

যে ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় কিংবা বেহুঁশ অবস্থায় কিংবা সে আরাফা না জেনে আরাফা অতিক্রম করে, তবে তার উকূফ জাইয হয়ে যাবে। কেননা যা হজ্জের রুকন অর্থাৎ উকূফ, তা তো পাওয়া গেছে। অজ্ঞানাবস্থা কিংবা ঘুমের অবস্থার কারণে তো সেটা ব্যাহত হয় না; যেমন সাওমের রুকনের বেলায়[১৮] সালাতের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা অজ্ঞান অবস্থায় সালাত অব্যাহত থাকতে পারে না।

---

১৭. অর্থাৎ কিতাবুল্লায় বিষয়টি মুজমাল(বা অবিশদিত)ছিলো। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আমলকে ব্যাখ্যা রূপে গণ্য করা হয়।

১৮. সাওমের নিয়্যাত করার পর সারা দিন ঘুম বা অজ্ঞানতার কারণে পানাহার থেকে সংযম দ্বারা সাওমের রুকন আদায় হয়ে যায়।

আর অজ্ঞান অবস্থায় আরাফা অতিক্রমের বেলায় উকূফের নিয়্যত অনুপস্থিত, কিন্তু নিয়্যত তো হজ্জের প্রতিটি রুকনের জন্য শর্ত নয়।

কেউ যদি অজ্ঞান হয়ে যায় আর তার সাথীরা তার পক্ষ হতে ইহরাম বেঁধে দেয় তাহলে তা জাইয হবে।

এ হল আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব। সাহেবাইনের মতে তা জাইয হবে না।

যদি কোন মানুষকে বলে রাখে যে, সে অজ্ঞান হয়ে গেলে কিংবা ঘুমিয়ে গেলে সে যেন তার পক্ষ থেকে ইহরাম বেঁধে দেয় আর আদিষ্ট ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে ইহরাম বেঁধে নেয়, তাহলে তা শুদ্ধ হবে। এর উপর ফকীহ্দের ইজমা রয়েছে। সুতরাং যদি সে সংজ্ঞা ফিরে পায় কিংবা জাগ্রত হয় এবং হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করে, তাহলে জাইয হয়ে যাবে।

সাহেবাইনের দলীল এই যে, (প্রথমোক্ত সুরতে) সে নিজেও ইহরাম বাঁধেনি আবার কাউকে ইহরাম বেঁধে দেয়ার আদেশও করেনি। কেননা সে তো স্পষ্টতঃ অনুমতি প্রদান করেনি। আর লক্ষণগত[১৯] অনুমতি নির্ভর করে বিষয়টি তার জানা থাকার উপর। তাছাড়া লক্ষণগত অনুমতির বৈধতা তো অনেক ফকীহ্ এরই জানা নেই। সুতরাং সাধারণ মানুষ তা জানবে কিভাবে। অন্যকে এ বিষয়ে স্পষ্ট আদেশ দানের অবস্থা এর বিপরীত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, যখন সে তাদের সফর সংগী হওয়ার ব্যাপারে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তখন সে ঐ সকল বিষয়ে তাদের প্রত্যেকের নিকট সাহায্যের আশা পোষণ করেছে, যা সে নিজে সম্পাদন করতে সক্ষম নয়। আর এই সফরের উদ্দেশ্যমূলক বিষয় হলো ইহরাম। সুতরাং লক্ষণগতভাবে ইহরাম বেঁধে দেয়ার অনুমতি সাব্যস্ত হবে। আর প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞাত রয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। আর হুকুম তো প্রমাণের উপরই নির্ভরশীল।

ইমাম কুদূরী বলেন ঃ *এই সকল বিষয়ে স্ত্রী লোকের হুকুম পুরুষের অনুরূপ।* কেননা পুরুষদের মতই তারাও সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত।

তবে সে তার মাথা খুলে রাখবে না। কেননা সেটা তার সতরের অন্তর্ভুক্ত।

আর তার চেহারা খোলা রাখবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, স্ত্রী লোকের ইহরাম হলো তার চেহারার মধ্যে।

যদি মুখের উপর কোন কিছু ঝুলিয়ে দেয় এবং তা চেহারা থেকে পৃথক রাখে তাহলে জাইয হবে।

'আইশা (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এটা হলো হাওদার ছায়া গ্রহণের মত।

আর সে উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়বে না। কেননা তাতে ফিতনার আশংকা রয়েছে।

সে রামাল করবে না এবং সাঈ করার সময় উভয় চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়াবে না। কেননা তা সতর ঢেকে রাখার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

---

১৯. অর্থাৎ যদিও স্পষ্টতঃ অনুমতি দেয়া হয়নি, কিন্তু লক্ষণের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, তার থেকে অনুমতি রয়েছে; কেননা এতে তো তারই স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে।

আর সে মাথা মুড়াবে না, বরং চুল ছাঁটবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) স্ত্রী লোকদেরকে হক করা থেকে নিষেধ করেছেন। এবং তাদের ছাঁটার আদেশ দান করেছেন।

তাছাড়া দলীল এই যে, তাদের ক্ষেত্রে মাথা মুড়ানো মুসলার (বিকৃতি সাধনের) হুকুম রাখে, পুরুষের ক্ষেত্রে দাড়ি চাঁছা যেমন।

আর সে ইচ্ছামত সেলাই করা কাপড় পরিধান করবে। কেননা সেলাই বিহীন কাপড় পরিধানে ছতর খুলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

ফকীহ্গণ বলেছেন, ভিড় থাকলে তারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে যাবে না। কেননা পুরুষদের সংস্পর্শে যেতে তাদের নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি ফাঁকা জায়গা পেয়ে যায় তাহলে স্পর্শ করতে পারে।

জামে' সগীর প্রণেতা বলেন, যে ব্যক্তি নফল কুরবানী, কিংবা মান্নতের কিংবা কোন শিকারের ক্ষতি পূরণের অথবা অন্য যে কোন উদ্দেশ্যের উটনীকে কালাদা (কুরবানীর পশুর চিহ্ন) পরাল এবং তা নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলো তার ইহরাম হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে।

কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ مَنْ قَلَّدَ بَدَنَةً فَقَدْ أَحْرَمَ –যে ব্যক্তি উটনীকে কালাদা পরাল, সে ইহরাম বেঁধে নিল। তাছাড়া এই জন্য যে, [হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আহবানে] সাড়াদান প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কুরবানীর পশু সংগে নিয়ে যাওয়া তালবিয়া পাঠের সমতুল্য। কেননা এ কাজ সে ব্যক্তিই করে, যে হজ্জ বা উমরার ইচ্ছা করে। আর সাড়াদানের প্রকাশ কখনো কর্ম দ্বারাও হয়, যেমন কথা দ্বারা হয়। সুতরাং এমন কাজের সংগে নিয়্যতের দ্বারা সে মুহরিম হয়ে যাবে, যে কাজ ইহরামের বৈশিষ্ট্যভুক্ত।

কালাদা পরানোর সুরত এই যে, উটনীর গলায় ছেঁড়া জুতা, ডোলের রশি কিংবা গাছের ছাল ঝুলিয়ে দেওয়া।

যদি পশুকে কালাদা পরিয়ে লোক মারফত পাঠিয়ে দেয়, নিজে সংগে না নেয় তাহলে সে মুহরিম হবে না। কেননা 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদী (হারাম অভিমুখী যাবাহ করার পশু)-এর 'কালাদা' পাকিয়ে দিয়েছিলাম। আর তিনি লোক মারফত তা পাঠিয়ে দেন এবং হালাল অবস্থায় পরিবারের মধ্যে অবস্থান করেছেন।

লোক মারফত প্রেরণের পর যদি রওয়ানা হয় তাহলে উক্ত পশুর সংগে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত সে মুহরিম হবে না। কেননা রওয়ানা হওয়ার সময় তার সংগে যদি কোন হাদী না থাকে, যা সে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে, তাহলে তো তার পক্ষ হতে নিয়্যত ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেলো না। আর শুধু নিয়্যতে মুহরিম হয় না।

যদি পথিমধ্যে সে প্রেরিত পশু পেয়ে যায় এবং তা হাঁকিয়ে নিয়ে যায় কিংবা শুধু পেয়ে গেলো, তাহলে যেহেতু তার নিয়্যত এমন একটি আমলের সংগে যুক্ত হয়েছে, যা ইহরামের বৈশিষ্ট্যভুক্ত, সেহেতু সে মুহরিম হয়ে যাবে। যেমন শুরু থেকে হাঁকিয়ে নিলে হয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, হজ্জে তামাত্তু-এর উটনী এর ব্যতিক্রম। কেননা সে ক্ষেত্রে রওয়ানা দেওয়া মাত্র সে মুহরিম হয়ে যাবে। অর্থাৎ যদি ইহরামের নিয়্যত করে থাকে। এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াস। সাধারণ কিয়াস তাই, যা ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।[২০]

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, তামাত্তু-এর হাদী শরীআতের পক্ষ থেকে নির্ধারিত রূপে শুরু থেকেই হজ্জের আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি আমল রূপে নির্ধারিত। কেননা এটা মক্কার সাথে বিশিষ্ট। এবং (হজ্জ ও উমরা এই) দুই ইবাদত একত্রে আদায়ের শোকর হিসাবে তা ওয়াজিব হয়েছে।

আর অন্যান্য হাদী তো (ক্ষেত্র বিশেষে) অপরাধ জনিত কারণেও ওয়াজিব হতে পারে। যদিও তা মক্কা পর্যন্ত না পৌছে। এ কারণেই তামাত্তু-এর হাদীর ক্ষেত্রে হাজীর রওয়ানা হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য হাদীর ক্ষেত্রে প্রকৃত আমলের উপর (অর্থাৎ যুক্ত হয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপর) নির্ভরশীল থাকবে।

যদি উটনীকে চট পরিয়ে দেয় কিংবা اشعار। (কুঁজে আঁচড় কেটে দেয়া) করে, কিংবা বকরীর গলায় কালাদা ঝুলিয়ে দেয়, তাহলে মুহরিম হবে না। কেননা চট পরানো গরম বা শীত বা মাছি থেকে রক্ষার জন্যেও হতে পারে। সুতরাং তা হজ্জের বৈশিষ্ট্য হলো না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে اشعار। করা মাকরূহ। সুতরাং তা হজ্জের আমলের মধ্যে গণ্য নয়।

সাহেবাইনের মতে যদিও তা উত্তম তবে তা কখনো চিকিৎসার জন্যও হয়ে থাকে। আর কালাদা ঝুলানোর বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা হাদীর সাথেই বিশিষ্ট।

আর বকরীর গলায় কালাদা ঝুলানো প্রচলিত নয়। এবং তা সুন্নতও নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, (হজ্জ প্রসংগে যেখানে 'বুদন' এর কথা এসেছে সেখানে) বুদন অর্থ উট এবং গরু।

---

২০. অর্থাৎ রওয়ানা হওয়ার সময় যদি সংগে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন হাদী না থাকে তাহলে তার নিয়্যত এমন কোন আমলের সংগে যুক্ত হলো না, যা ইহরামের সাথে বিশিষ্ট। কাজেই হাদীর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত মুহরিম হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন শুধু উট। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জুমুআর সালাত প্রসংগে বলেছেন ঃ فَالْمُسْتَعْجِلُ مِنْهُمْ كَالْمَهْدِي بَدَنَةً وَالَّذِي يَلِيهِ كَالْمَهْدِي بَقَرَةً -যে তাড়াতাড়ি হাযির হয়, সে যেন 'বাদানাহ' (উটনী) কুরবানী করলো, আর যে তার পরে হাযির হলো, সে যেন গাভী কুরবানী করলো।

এখানে তিনি উটনী ও গাভীর সাঝে পার্থক্য করেছেন। (সুতরাং বোঝা গেলো যে, গাভী বাদানাহ্ নয়)।

আমাদের দলীল এই যে, 'বদনা' শব্দটি 'বাদানাহ' থেকে উদ্ভুত যার অর্থ স্থূলদেহী। আর এই অর্থের দিক থেকে উটনী ও গাভী দুটোই সমতুল্য। এজন্যই তো উভয়ের প্রতিটি সাতজনের জন্য যথেষ্ট হয়।

আর হাদীছের বিশুদ্ধ বর্ণনায় كالمهدى جزوراً (বকরী প্রেরণকারীর ন্যায়) রয়েছে। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

কিরান

হজ্জে কিরান হলো হজ্জে তামাত্তু ও হজ্জে ইফরাদ থেকে উত্তম।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তামাত্তু কিরান থেকে উত্তম। কেননা কুরআনে তামাত্তু-এর উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু কিরানের কোন উল্লেখ নেই।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী : اَلْقِرَانُ رُخْصَةٌ। (কিরান হলো শরীআত প্রদত্ত একটি রুখসত বা অবকাশ)।

আর এ জন্য যে, পৃথক পৃথক হজ্জ ও উমরা আদায়ের মধ্যে অধিক তালবিয়া, দীর্ঘ সফর এবং অধিক হলক (মাথা মুড়ানো) রয়েছে।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী : يَا اٰلَ مُحَمَّدٍ اَهِلُّوا بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا –হে মুহাম্মদের অনুসারিগণ! তোমরা এক সাথে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধ।

তাছাড়া এই জন্য যে, তাতে দু'টি ইবাদত একত্রি করা হয়। সুতরাং এটা যুগপৎ ই'তিকাফ ও রোযার সাদাকা এবং তাহাজ্জুদসহ আল্লাহ্র রাস্তায় প্রহরাদানের সদৃশ হলো। আর তালবিয়ার তো নির্ধারিত কোন সংখ্যা নেই।

আর সফর উদ্দেশ্য মূলক ইবাদত নয়। আর হলক তো হলো ইবাদত হতে বের হওয়ার প্রক্রিয়া।[১] সুতরাং ইমাম শাফিঈ (র.) যে তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, তা দ্বারা হজ্জে ইফরাদ অগ্রগণ্য হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তার উদ্দেশ্য হলো জাহেলিয়াত যুগের অধিবাসীদের এ মন্তব্য নাকচ করা যে, হজ্জের মাসগুলোতে উমরা করা নিকৃষ্টতম পাপ।

[মালিক (র.)-এর বক্তব্যের জবাব এই যে,] কুরআনে কিরানের উল্লেখ রয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (তোমরা আল্লাহ্র জন্য হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করো) এর অর্থ হলো আপন পরিবার-পরিজনের নিকট থেকে উভয়ের জন্য ইহরাম বাধা, যেমন ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

তাছাড়া এতে আগে থেকে ইহরাম বাঁধা হয়। এবং হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম মীকাত থেকে শুরু করে উভয় ইবাদত থেকে ফারিগ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অথচ হজ্জে তামাত্তু এরূপ নয়। সুতরাং কিরান তামাত্তু থেকে উত্তম হবে।

---

১. অর্থাৎ হলক নিজস্ব সত্তায় কোন ইবাদত নয়, বরং ইবাদত থেকে বের হওয়ার উপায়। পক্ষান্তরে নামাযের সালাম ইবাদত থেকে বের হওয়ার উপায় হওয়ার সাথে সাথে নিজস্বভাবে একটি ইবাদতও।

আর কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের মধ্যে ও ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মধ্যে মত পার্থক্যের ভিত্তি এই যে, আমাদের মতে কিরান হজ্জকারীকে দু'টি তাওয়াফ এবং দু'টি সাঈ করতে হয়। আর ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে একটি তাওয়াফ ও একটি সাঈ করতে হয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *কিরানের বিবরণ এই যে, মীকাত থেকে এক সঙ্গে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধবে এবং (ইহরামের দুই রাকাআত) সালাতের পর বলবে ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي -হে আল্লাহ্! আমি হজ্জ ও উমরার নিয়্যত করেছি। সুতরাং এ দু'টি আপনি আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে এ দু'টি গ্রহণ করুন।* কেননা কিরান অর্থই হলো হজ্জ ও উমরাকে একত্র করা। যেমন বলা হয় قرنت الشئ بالشئ (এই জিনিসটি ঐ জিনিসটির সংগে যুক্ত করলাম) যখন দু'জিনিষকে একত্র করা হয়। একই ভাবে কিরান হয়ে যাবে।

যদি উমরার তাওয়াফের চার চক্কর শেষ হওয়ার পূর্বে হজ্জকে উমরার মাঝে দাখিল করে দেয়। যেহেতু উভয় ইবাদতকে একত্র করা বাস্তবায়িত হয়েছে। কেননা তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর এখনো বিদ্যমান রয়েছে।

আর যখন উভয়টি আদায় করার প্রতিজ্ঞা নিলো তখন উভয়টিকে সহজ করে দেওয়ার জন্য (আল্লাহ্র নিকট) প্রার্থনা করবে। এবং আদায়ের ক্ষেত্রে উমরাকে হজ্জের উপর অগ্রবর্তী করবে।

তদ্রূপ (তালবিয়ার ক্ষেত্রে) এক সাথে বলবে ঃ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَ حَجَّةٍ কেননা সেতো উমরার কাজ আগে করবে, সুতরাং তালবিয়াতেও উমরার কথা আগে উল্লেখ করবে।

অবশ্য যদি দু'আ ও তালবিয়ায় উমরার কথা পরে উল্লেখ করে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। কেননা واو অব্যয়টি নিছক যুক্ত করার অর্থে ব্যবহৃত (অগ্র-পশ্চাত অর্থে নয়।)

যদি শুধু অন্তরে নিয়্যত করে এবং তালবিয়াতে হজ্জ ও উমরার কথা উল্লেখ না করে, তাহলেও যথেষ্ট হবে। সালাতের উপর কিয়াস করে।[২]

মক্কায় প্রবেশ করার পর প্রথম কাজ হিসাবে বায়তুল্লাহ্র সাত চক্কর তাওয়াফ করবে। এবং সাতের প্রথম তিনটিতে রামাল করবে। তারপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করবে। এগুলো হলো উমরার কার্যসমূহ।

অতঃপর হজ্জের আমল শুরু করবে। অর্থাৎ সাত চক্কর তাওয়াফুল কুদূম করবে। তারপর সাঈ করবে। যেমন হজ্জে ইফরাদকারীর ক্ষেত্রে আমরা বয়ান করে এসেছি।

আর উমরার কার্যসমূহকে অগ্রবর্তী করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ আর কিরানে তো (কার্যতঃ) তামাত্তু-এরই মর্ম রয়েছে।

হজ্জ আর উমরার মাঝখানে মাথা মুড়াবে না। কেননা হজ্জের ইহরামের প্রতি এটি অপরাধ। আর সে কুরবানীর দিন মাথা মুড়াবে। যেমন ইফরাদকারী মাথা মুড়ায়।

---

২. অর্থাৎ নামাযের নিয়্যতের ক্ষেত্রে যেমন মৌখিক উচ্চারণ জরুরী নয়, শুধু সতর্কতার খাতিরে তা করা হয়, তেমনি হজ্জের ক্ষেত্রেও মৌখিক উচ্চারণ জরুরী নয়।

আমাদের মতে সে হালাকের (মাথা মুড়ানোর) মাধ্যমে হালাল হবে, যাবাহ করার মাধ্যমে নয়। যেমন হজ্জে ইফরাদকারী (হলকের মাধ্যমে) হালাল হয়। এ হলো আমাদের মাযহাব।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, কিরানকারী একটি তাওয়াফ ও একটি সাঈ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত উমরা হজ্জের মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে।

তাছাড়া হজ্জে কিরানের ভিত্তিই হলো পরস্পর প্রবিষ্টতার উপর। এ কারণেই তো তাতে এক তালবিয়া ও এক সফর এবং এক হলক যথেষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং রুকনসমূহ (তথা তাওয়াফ সাঈ)-এর ব্যাপারেও এরূপ হবে।

আমাদের প্রমাণ এই যে, সুবাই ইব্‌ন মা'বাদ যখন দু'টি তাওয়াফ ও দু'টি সাঈ করেছিলেন, তখন উমর (রা.) তাঁকে বলেছিলেন, তুমি তোমার নবীর সুন্নাতের দিকে পথপ্রাপ্ত হয়েছো।

তাছাড়া কারণ এই যে, কিরান অর্থই হলো একটি ইবাদতকে অন্য একটি ইবাদতের সংগে যুক্ত করা। আর সেটা প্রতিটি ইবাদতের আমল আলাদাভাবে পূর্ণরূপে আদায় করার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে।

আর এ জন্য যে, নির্দিষ্ট ইবাদতের মধ্যে প্রবিষ্টতা প্রয়োগ হয় না।

আর সফর তো হলো ইবাদত পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যমে এবং তালবিয়া হলো ইহরাম বাঁধার জন্য, আর মাথা মুড়ানো হলো ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য। সুতরাং এ সকল কাজ তো উদ্দেশ্যমূলক নয়। পক্ষান্তরে রুকনসমূহ হলো উদ্দিষ্ট। তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, নফল সালাতের দুই দুই রাকাআত একত্রে আদায় করলে পরস্পর প্রবিষ্ট হয় না, অথচ এক তাহরীমা দ্বারাই তা আদায় করা যায়।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়াতের অর্থ হলো উমরার ওয়াক্ত হজ্জের ওয়াক্তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কিরানকারী উমরা ও হজ্জের জন্য প্রথমেই দুই তাওয়াফ করে নেয় এবং এরপর দুই সাঈ করে, তাহলে তার জন্য যথেষ্ট। কেননা তার উপর যা কর্তব্য ছিলো, তা সে আদায় করেছে। তবে উমরার সাঈ বিলম্বিত করায় এবং তাওয়াফে কুদূমকে উমরার সাঈ'র উপর অগ্রবর্তী করায় সে মন্দ কাজ করল। তবে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

সাহেবাইনের মতে এ হুকুম স্পষ্ট। কেননা তাদের মতে উমরা ও হজ্জের কোন কাজ অগ্রবর্তী বা বিলম্বিত করার কারণে দম ওয়াজিব হয় না।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তাওয়াফে কুদূম হলো সুন্নাত। আর তা তরকের দ্বারা দম ওয়াজিব হয় না। সুতরাং সুন্নাতকে অগ্রবর্তী করার দ্বারা দম ওয়াজিব না হওয়া আরো স্বাভাবিক। আর অন্য আমলে ব্যস্ত হওয়ার কারণে সাঈকে বিলম্বিত করার দ্বারা দম ওয়াজিব হয় না। সুতরাং তাওয়াফ সম্পাদনের সাঈ বিলম্বিত হওয়ার কারণে দম ওয়াজিব হবে না।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *কুরবানীর দিন যখন জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে ফেলবে তখন এক বকরী কিংবা এক গরু কিংবা এক উট কিংবা বাদানার (উটের)*

এক-সপ্তমাংশ কুরবানী দিবে। এ হলো কিরানের দম। কেননা কিরানে তামাত্তু-এর অর্থ রয়েছে। আর তামাত্তু-এর ক্ষেত্রে হাদী ওয়াজিব হওয়া কুরআনের ভাষ্যে প্রমাণিত। আর হাদী উট দ্বারা কিংবা গরু দ্বারা কিংবা বকরী দ্বারা হয়ে থাকে। হাদী অধ্যায়ে এ প্রসংগে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ্।

ইমাম কুদূরী (র.) বাদানাহ্ দ্বারা এখানে উট উদ্দেশ্যে করেছেন। যদিও বাদানাহ শব্দটি উট ও গরু উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করে এসেছি। উটের সাতভাগের একভাগ যেমন জাইয তেমনি গরুর সাতভাগের একভাগও জাইয।

যদি যাবাহ্ করার মতো কিছু তার না থাকে, তাহলে হজ্জের দিনগুলোতে তিন দিন রোযা রাখবে, যার শেষ দিন হবে আরাফার দিন। আর সাতদিন রোযা রাখবে আপন পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসার পর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ"

–যে ব্যক্তি যাবাহ্ করার মতো কিছু না পায় সে হজ্জের সময় তিন দিন রেযা রাখবে আর সাতটি রোযা রাখবে যখন তোমরা ফিরে আসবে। এ-ই হলো পূর্ণ দশটি।

'নাস্' যদিও তামাত্তু সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, কিন্তু কিরানও তার সমতুল্য। কেননা (এখানেও) সে দু'টি ইবাদত আদায়ের দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। আর আয়াতের 'হজ্জ' শব্দটি দ্বারা হজ্জের সময় উদ্দেশ্য। আর তা আল্লাহ্ই বেশী জানেন। কেননা হজ্জ নিজস্বভাবে রোযার কাল হতে পারে না। তবে সর্বোত্তম হলো ইয়াওমুত্তারবিয়ার একদিন পূর্ব থেকে অর্থাৎ সাত তারিখ থেকে এবং ইয়ামুত্তারবিয়াতে (আট তারিখে) এবং ইয়াওমে আরাফায় (নয় তারিখে) এই তিন দিনে রোযা রাখা। কেননা রোযা হলো হাদীর স্থলবর্তী। সুতরাং মূল জিনিস তথা হাদী সংগ্রহে সক্ষম হওয়ার প্রত্যাশা শেষ সময় পর্যন্ত রোযাকে বিলম্বিত করাই মুস্তাহাব হবে।

যদি হজ্জ থেকে ফারিগ হওয়ার পর মক্কায় থাকা অবস্থায় সাতটি রোযা রেখে নেয় তাহলে তাও জাইয হবে। এর অর্থ হলো আইয়ামে তাশরীক অতিক্রান্ত হওয়ার পর। কেননা এ দিনগুলোতে রোযা রাখা নিষিদ্ধ।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তা জাইয হবে না। কেননা তা প্রত্যাবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। তবে যদি মক্কায় থেকে যাওয়ার নিয়্যত করে, তাহলে প্রত্যাবর্তন সম্ভাবনা রহিত হওয়ার কারণে মক্কাতে রোযা রাখা যথেষ্ট হবে।

আমাদের দলীল এই যে, (আয়াতে উল্লেখিত رجعتم) এর অর্থ হলো যখন তোমরা হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করো অর্থাৎ হজ্জ সম্পন্ন করে ফেল। কেননা সম্পন্ন হওয়া পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তনের কারণ। কারণ সাব্যস্ত হওয়ার পরই রোযা আদায় করা হচ্ছে। সুতরাং তা জাইয হবে।

যদি তার রোযা ফউত হয়ে যায় আর ইয়াওমুন নহর এসে পড়ে তাহলে দম ছাড়া আর কিছু যথেষ্ট হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এ তাশরীকের দিনগুলোর পরে রোযা রেখে যাবে। কেননা এগুলো নির্ধারিত সময়ের সিয়াম। সুতরাং রমাযানের সাওমের ন্যায় এগুলো কাযা করা হবে।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, আইয়ামে তাশরীকেই সিয়াম পালন করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ –যে ব্যক্তি কিছু না পায় তার জন্য বিধান হলো হজ্জের সময় তিন দিনের সিয়াম পালন। আর এই দিনগুলো হজ্জের সময়।

আমাদের দলীল হলো এই দিনগুলোতে সিয়াম পালনের নিষেধ সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ হাদীছ রয়েছে। সুতরাং 'নাস' এই হাদীছ দ্বারা শর্তযুক্ত হবে। অথবা এ জন্য যে (নিষিদ্ধ দিনে আদায় করলে) তা ক্রটিযুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং তা দ্বারা এ রোযা আদায় হবে না, যা পূর্ণ আকারে ওয়াজিব হয়েছে।

কিন্তু এর পরে আর কাযা করবে না। কেননা রোযা হলো (হাদী যবাহ্ করার) স্থলবর্তী আর স্থলবর্তী শুধু শরীআত কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়। আর 'নাস' সেটাকে হজ্জের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। আর 'দম' জাইয হওয়া হল মৌলিক বিধান অনুসারে।

উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ ধরনের ক্ষেত্রে তিনি বকরী যবাহ্ করার আদেশ করেছেন।

যদি হাদী সংগ্রহ করতে সক্ষম না হয় তাহলে হালাল হয়ে যাবে আর তার উপর দু'টি দম ওয়াজিব হবে। একটি তো হলো দুই ইবাদত একত্র করার সুবিধা ভোগের দম আর দ্বিতীয়টি হলো হাদী যবাহ্ করার পূর্বে হালাল হওয়ার দম।

কিরান হজ্জকারী যদি মক্কা প্রবেশ না করে আরাফাত অভিমুখে চলে যায়, তাহলে সে উকুফের মাধ্যমে[৩] *উমরা তরককারী হয়ে গেলো।* কেননা এখন তার পক্ষে উমরা আদায় করা সম্ভব নয়। কারণ তাহলে সে উমরার কার্যগুলোকে হজ্জের কার্যগুলোর উপর ভিত্তিকারী হবে। অথচ সেটা শরীআত সম্মত নয়।

তবে শুধু আরাফা অভিমুখে যাত্রা করা দ্বারাই সে উমরা তরককারী হয়ে যাবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবের এ-ই বিশুদ্ধ মত। তাঁর মতে এই ব্যক্তির মাঝে এবং জুমুআর দিন যুহর আদায় করার পর জুমুআর জন্য যাত্রাকারী ব্যক্তির মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, জুমুআর ক্ষেত্রে যুহর আদায় করার পরও জুমুআ আদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার কুরআনী আদেশ তার উপর আরোপিত হয়। পক্ষান্তরে কিরান ও তামাত্তু এর ক্ষেত্রে উমরা আদায়ের পূর্বে যাত্রা করা নিষিদ্ধ। সুতরাং উভয় অবস্থার মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *আর তার যিম্মা থেকে কিরানের দম রহিত হয়ে যাবে।* কেননা যখন উমরা বর্জিত হলো তখন দুই ইবাদাত আদায়ের সুবিধা সে লাভ করেনি।

তবে উমরা শুরু করে তা তরক করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এবং উমরা কাযা করতে হবে। কেননা উমরা শুরু করা বিশুদ্ধ ছিলো। সুতরাং সে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সদৃশ হলো। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

---

৩. অর্থাৎ কিরান হজ্জকারী যদি হাদী সংগ্রহ করতে না পারে আর রোযাও না রেখে থাকে এমন কি আইয়ামে তাশরীক এসে যায়, এ ধরনের ক্ষেত্রে।

হজ্জে তামাত্তু

হজ্জে তামাত্তু হজ্জে ইফরাদ থেকে উত্তম।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, হজ্জে ইফরাদ উত্তম। কেননা তামাত্তুকারীর সফর তো হয় তার উমরার জন্য। আর হজ্জে ইফরাদকারীর সফর হয় হজ্জের জন্য।

যাহেরি রিওয়ায়াতের দলীল এই যে, তামাত্তু-এর মধ্যে দুই ইবাদত একত্র করার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং তা কিরানের সদৃশ হলো। তদুপরি তাতে অতিরিক্ত একটি আমল রয়েছে। আর তা হলো রক্ত প্রবাহিত করা। আর তার সফর মূলতঃ হজ্জের জন্যই হচ্ছে, যদিও মাঝখানে উমরা আদায় করা হচ্ছে। কেননা, এই উমরা তো হজ্জের অনুবর্তী। যেমন জুমুআ এবং জুমুআ অভিমুখে যাত্রার মাঝখানে সুন্নাত সালাত আদায় করা হয়।

তামাত্তুকারী দুই প্রকার। প্রথমতঃ যে কুরবানীর পশু সংগে হাঁকিয়ে নেয়, দ্বিতীয়তঃ যে কুরবানীর পশু নেয় না। আর তামাত্তুর অর্থ হলো একই সফরে দু'টি ইবাদত এমনভাবে আদায় করার সুবিধা গ্রহণ করা যে, এ উভয় ইবাদতের মধ্যবর্তী সময়ে পুরোপুরিভাবে পরিবারের মধ্যে দিয়ে অবস্থান না করা।[১]

এ বিষয়ে বেশ কিছু মত পার্থক্য রয়েছে। যা আমরা পূর্ববর্তীতে ইনসাআল্লাহ্ বর্ণনা করবো।

তামাত্তু-এর নিয়ম এই যে, হজ্জের মাসগুলোতে মীকাত থেকে কাজ শুরু করবে। অর্থাৎ প্রথমে উমরার ইহরাম করবে, এবং মক্কায় প্রবেশ করবে, এবং উমরার জন্য তাওয়াফ ও সাঈ করবে এবং মাথা-মুড়াবে কিংবা চুল ছাঁটবে। তখন সে তার উমরা থেকে হালাল হয়ে যাবে। এই হলো উমরার বিবরণ।

তদ্রূপ যদি কেউ আলাহিদাভাবে উমরা করতে চায় তাহলে আমাদের উল্লেখিত নিয়মগুলো পালন করবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উমরাতুল কাযা আদায় করার সময় এরূপই করেছেন। ইমাম মালিক (র.) বলেন, তার উপর মাথা মুড়ানো নেই। উমরা অর্থ শুধু তাওয়াফে সাঈ। তাঁর বিপক্ষে আমাদের দলীল হলো আমাদের উল্লিখিত হাদীছ।

---

১. পূর্ণমাত্রায় এর অর্থ ইহরামের অবস্থা ছাড়া পরিবারের মধ্যে দিয়ে অবস্থান করা। আর হাদী সংগে না নিয়ে থাকলে ইহরামের অবস্থা বিদ্যমান থাকে না। কিন্তু হাদী সংগে নিয়ে সকলে ইহরামের অবস্থা বহাল থাকে। সুতরাং তখন পুরাপুরি অবস্থান সাব্যস্ত হয় না।

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ (এমন অবস্থায় যে, তোমরা তোমাদের মস্তক মুণ্ডনকারী হবে) উমরাতুল কাযা প্রসংগেই নাযিল হয়েছে।

তাছাড়া যেহেতু উমরাতে তালবিয়ার মাধ্যমে ইহরাম বেঁধেছে সেহেতু হলকের মাধ্যমে হালাল হওয়া সাব্যস্ত হবে। যেমন হজ্জে রয়েছে।

তাওয়াফ শুরু করার সংগে সংগে তালবিয়া বন্ধ করে দেবে। ইমাম মালিক (র.) বলেন, বায়তুল্লাহ্‌র প্রতি নযর পড়া মাত্র তালবিয়া বন্ধ করে দিবে। কেননা উমরা অর্থ বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারত। এবং তা দ্বারাই উমরা সম্পূর্ণ হয়।

আমাদের দলীল এই যে, নবী (সা.) উমরাতুল কাযা আদায় করার সময় যখন হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেছিলেন তখন তালবিয়া বন্ধ করেছিলেন।

তাছাড়া কারণ এই যে, আসল উদ্দেশ্য হলো তাওয়াফ। সুতরাং তাওয়াফ শুরু হওয়ার সংগে সংগে তালবিয়া বন্ধ করে দিবে। এ কারণেই হজ্জ আদায়কারী রামী শুরু করার সংগে সংগে তালবিয়া বন্ধ করে দেয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *এরপর সে মক্কায় হালাল অবস্থায় অবস্থান করবে।* কেননা সে তো উমরা থেকে হালাল হয়ে গেছে। অতঃপর যেদিন ইয়াওমুত্তারবিয়া (আট তারিখ) হবে সেদিন মাসজিদুল হারাম থেকে ইহরাম বাঁধবে।

আসল শর্ত হলো হরম শরীফ থেকে ইহরাম বাঁধা। মসজিদ থেকে জরুরী নয়। (তবে উত্তম।) এর কারণ এই যে, সে মক্কাবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আর আমরা এর পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি যে, মক্কার অধিবাসীদের মীকাত হলো হরম শরীফ।

অতঃপর হজ্জে ইফরাদকারী যা যা করে, সেও তা করবে। কেননা সে তো এখন হজ্জ আদায় করছে। তবে তাওয়াফে যিয়ারাতের সময় সে রামাল করবে। এরপর সাঈ করবে। কেননা হজ্জের ক্ষেত্রে এটা তার প্রথম তাওয়াফ। হজ্জে ইফরাদ-কারীর বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা একবার সে সাঈ করে ফেলেছে।

এই তামাত্তুকারী যদি হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বেই তাওয়াফ ও সাঈ করে থাকে, তাহলে তাওয়াফে যিয়ারাতের মাঝে রামাল করবে না। এবং তার পরে সাঈ করবেন না। কেননা তা সে একবার করেছে। তবে আমাদের উদ্ধৃত আয়াতের প্রেক্ষিতে তার উপর তামাত্তু-এর দম ওয়াজিব হবে।

যদি কোন হাদী না পায় তাহলে সে হজ্জের সময় তিন দিন সিয়াম পালন করবে এবং প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন সিয়াম পালন করবে। কিরান প্রসংগে যেভাবে আমরা বর্ণনা করেছি, সেভাবে।

যদি শাওয়ালে তিনটি সাওম পালন করে, এরপর উমরা আদায় করে তবে ঐ সাওম এই তিন সাওমের জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা এই রোযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো তামাত্তু। আর এটা তো দমের স্থলবর্তী। আর এই অবস্থায় তো সে তামাত্তুকারী নয়। সুতরাং সবব বা কারণ সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে সিয়াম পালন করা তার জন্য বৈধ হবে না।

আর যদি সিয়ামগুলো উমরার ইহ্রাম বাধার পর তাওয়াফ করার পূর্বে আদায় করে তবে জাইয হবে। এ হল আমাদের মাযহাব।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ –হজ্জের সময় তিন সিয়াম পালন করবে। (অর্থাৎ হজ্জের ইহ্রামের পর)।

আমাদের দলীল এই যে, সে রোযায় সবব বা কারণ সাব্যস্ত হওয়ার পর তা আদায় করেছে।

আর আয়াতে উল্লেখিত হজ্জ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হজ্জের সময় (তা হজ্জের ইহ্রামের পূর্বে হোক বা পরে) যেমন ইতোপূর্বে আমরা বয়ান করে এসেছি।

তবে সাওমকে শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা উত্তম। আর শেষ সময় হলো আরাফার দিবস। আমরা কিরান প্রসংগে এর কারণ বর্ণনা করে এসেছি।

আর তামাত্তুকারী যদি নিজের সাথে 'হাদী' নিতে চায় তাহলে (উমরার) ইহ্রাম বাঁধবে এবং হাদী সাথে নিয়ে যাবে। এটা উত্তম। কেননা নবী (সা.) হাদীসমূহ নিজের সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া এতে (নেক কাজের প্রতি) প্রস্তুতি ও তরান্বিত করার আগ্রহ প্রকাশ পায়।

হাদী যদি উট বা গরু হয় তাহলে চামড়ার টুকরা কিংবা ছেড়া জুতা তার গলায় ঝুলিয়ে দিবে। এর দলীল হলো ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হযরত 'আইশা (রা.)-এর হাদীছ। কালাদা ঝুলিয়ে দেওয়া চট বা কাপড় দ্বারা আবৃত করা থেকে উত্তম। কেননা কালাদা পরানোর কথা কিতাবুল্লায় উল্লেখিত রয়েছে।[২]

তাছাড়া কালাদা পরানো হয় ঘোষণার জন্য আর চট বা কাপড় দ্বারা আবৃত করা হয় সাজ-সজ্জার জন্য।

আগে তালবিয়া পড়বে তারপর কালাদা ঝুলাবে। কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হাদীকে কালদা পরানো এবং তা সংগে করে রওয়ানা দেয়ার মাধ্যমে ইহ্রাম শুরু হয়ে যায়। আর তালবিয়ার মাধ্যমে ইহ্রাম বাঁধা হলো উত্তম।

হাদীকে পিছন থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। এটা হাদীকে সামনে থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া থেকে উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যিল হুলায়ফাতে ইহ্রাম বেঁধে ছিলেন, আর তাঁর হাদীগুলোকে তাঁর সামনে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

তাছাড়া এতে অধিক ঘোষণা ও প্রচার হয়। তবে যদি পশু অবাধ্য হয়, তাহলে সামনে থেকেই টেনে নেবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে اشعار করবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে اشعار করবে না। اشعار করা মাকরূহ।*** আভিধানিক অর্থে اشعار অর্থ জখম করে রক্ত প্রবাহিত করা।

---

২. আয়াতটি হলো جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد

আর তার বিবরণ এই যে, উটনীর কুঁজ চিরে দিবে। অর্থাৎ বর্শাদ্বারা কুঁজের ডান দিকে নীচের অংশে জখম করে দেবে। তবে রিওয়ায়াত হিসাবে বাম দিকে জখম করার বিষয়টি অধিক বিশুদ্ধ। কেননা নবী (সা.) বাম দিকে জখম করেছিলেন ইচ্ছাকৃতভাবে, এবং ডান দিকে জখম করেছিলেন ঘটনাক্রমে। আর অবহিত করার জন্য উটনীর কুঁজে রক্ত মেখে দেবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এরূপ করা মাকরূহ। সাহেবাইনের মতে এরূপ করা ভাল।

আর ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে এরূপ করা সুন্নাত। কেননা তা নবী (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশিদীন থেকে এরূপ বর্ণিত রয়েছে।

সাহেবাইনের যুক্তি এই যে, কালাদা ঝুলানোর উদ্দেশ্য তো হলো এই যে, পানি খেতে নামলে কিংবা ঘাস খেতে গেলে যেন তাকে উত্যক্ত না করা হয়। কিংবা পথ হারিয়ে ফেললে যেন ফিরিয়ে দেয়া হয়। আর এটা اشعار দ্বারা অধিক অর্জিত হয়, যেহেতু চিহ্নটি স্থায়ী থাকে। এ দিক থেকে এটা সুন্নাত হওয়ার কথা,[৩] কিন্তু বিকৃত ঘটার দিকটি তার পরিপন্থী। তাই আমরা বলেছি যে, এটা ভালো।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, এ হল বিকৃতি স্বরূপ। আর তা নিষিদ্ধ।

আর যদি (বিকৃতি সাধন ও সুন্নাত হওয়ার মাঝে) বিরোধ দেখা দেয় তাহলে নিষেধাজ্ঞাই অগ্রাধিকার পায়।

আর নবী (সা.) اشعار করেছিলেন, হাদীর হিফাজতের জন্য। কেননা মুশরিকরা এটা ছাড়া হাদীকে উত্যক্ত করা হতে বিরত হতো না।

কোন কোন মতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সমকালীন লোকদের اشعار কে মাকরূহ বলতেন। কেননা তারা বেশী মাত্রায় জখম করে ফেলতো; এমনভাবে যে, জখম ছড়িয়ে পড়ার আশংকা হতো।

আর কোন কোন মতে কালাদা ঝুলানোর উপর اشعار কে অগ্রাধিকার প্রদান করাকে তিনি মাকরূহ মনে করতেন।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***যখন মক্কায় প্রবেশ করবে তখন তাওয়াফ ও সাঈ করবে।*** এটা হলো উমরার জন্য – যেমন আমরা ঐ তামাত্তুকারী সম্পর্কে বর্ণনা করেছি, যে হাদী সংগে নেয় না।

তবে সে হালাল হবে না। বরং তারবিয়া দিবসে (আট তারিখে) হজ্জের ইহরাম বেঁধে নিবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْىَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً وَتَحَلَّلْتُ مِنْهَا ـ

আমি আমার বিষয় যা পরে অনুধাবন করেছি, তা যদি আগে অনুধাবন করতাম তাহলে হাদী

---

৩. এটা কিয়াসের মাধ্যমে সুন্নাত সাব্যস্ত করার মতো হচ্ছে। অথচ কিয়াস দ্বারা তো সুন্নাত ছাবিত হতে পারে না। বরং রিওয়ায়াত দ্বারা সাব্যস্ত হতে পারে। আর সিহাহ্ সিত্তায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) اشعار করেছেন। সুতরাং সুন্নাত বলাই অপরিহার্য।

সংগে আনতাম না। আর এটাকে উমরা গণ্য করে তা থেকে হালাল হয়ে যেতাম। এই হাদীছ দ্বারা হাদী সংগে আনা অবস্থায় হালাল হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

আর তরবিয়া দিবসে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে, যেভাবে মক্কাবাসীরা ইহরাম বাঁধে, যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

যদি উক্ত সময়ের আগে ইহরাম বাঁধে তাহলে তা জাইয হবে। বরং তামাত্তুকারী হজ্জের ইহরাম যত তাড়াতাড়ি করবে ততই তা উত্তম। কেননা এতে সে কাজের দিকে অগ্রগামিতা ও অতিরিক্ত কষ্ট রয়েছে।

আর এই উত্তমতা যেমন ঐ ব্যক্তির জন্য, যে হাদী সংগে এনেছে, তেমনি ঐ ব্যক্তির জন্য যে হাদী সংগে আনেনি। আর তার উপর একটি দম ওয়াজিব। তা হলো তামাত্তু এর দম, যেমন ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

ইয়াওমুন্-নহরে (দশ তারিখে) যখন হলক করবে তখন উভয় ইহরাম থেকে সে হালাল হয়ে যাবে। কেননা যেমন সালাতের ক্ষেত্রে সালাম তেমনি হজ্জের ক্ষেত্রে হলক হল হালালকারী। সুতরাং হলক দ্বারা উভয় ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে।

মক্কাবাসীদের জন্য তামাত্তু ও কিরান নেই। তাদের জন্য শুধু হজ্জে ইফরাদ রয়েছে।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর বিপক্ষে প্রমাণ হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ –আর তা (তামাত্তু) ঐ ব্যক্তির জন্য, যার পরিবার-পরিজন মাসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়।

তাছাড়া তামাত্তু ও কিরান শরীআতে অনুমোদিত হয়েছে, দুই সফরের একটিকে রহিত করে সুবিধা গ্রহণ করার জন্য। আর তা বহিরাগতদের জন্যই প্রযুক্ত।

আর যে ব্যক্তি মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারী, তার হুকুম মক্কাবাসীদের মত। ফলে তার ক্ষেত্রেও হজ্জে তামাত্তু ও হজ্জে কিরান হবে না।

পক্ষান্তরে মক্কী যদি কূফায় গিয়ে (অর্থাৎ মীকাতের বাইরে) হজ্জে কিরান করে তাহলে তা শুদ্ধ হবে।[৪] কেননা তার উমরা ও হজ্জ দুটোই মীকাতের সংগে সম্পৃক্ত। সুতরাং সে বহিরাগতের ন্যায় হবে।

আর তামাত্তুকারী যদি উমরা থেকে ফারিগ হয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে যায়, অথচ সে হাদী সংগে নেয়নি, তখন তার তামাত্তু বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে দুই ইবাদতের মাঝে তার পরিবারের কাছে বৈধভাবে ফিরে গেছে, আর তা দ্বারা তামাত্তু বাতিল হয়ে যায়। কয়েকজন তাবিঈ থেকে তা বর্ণিত হয়েছে।

আর যদি হাদী সংগে এনে থাকে তাহলে পরিবারের কাছে আসা তার জন্য বৈধ নয়। এবং তার তামাত্তু বাতিল হবে না।

---

৪. কিরানের সংগে বিশিষ্ট করার কারণ এই যে, মক্কী যদি হজ্জের মাসে মীকাতের বাইরে গিয়ে তামাত্তু করে তাহলে শুদ্ধ হবে না। কেননা সে তখন বহিরাগতের ন্যায় হয়ে গেলো। আর বহিরাগত যদি দুই ইবাদতের মাঝে পরিবারের কাছে ফিরে যায় তবে তার তামাত্তু বাতিল হয়ে যায়। তেমনি মক্কীরও তামাত্তু বাতিল হয়ে যাবে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তামাত্তু বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে দুই সফরে উমরা ও হজ্জ আদায় করেছে।

শায়খাইনের দলীল এই যে, প্রত্যাবর্তন তার পক্ষে ওয়াজিব, যতক্ষণ সে তামাত্তু -এর নিয়্যত বজায় রাখে। কেননা হাদী সংগে আনা তার হালাল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক। সুতরাং তার বাড়িতে ফিরে আসা বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে মক্কী যদি কূফায় গিয়ে উমরার ইহরাম করে এবং হাদী সংগে আনে, তাহলে সে তামাত্তুকারী হবে না। কেননা প্রত্যাবর্তন তার উপর ওয়াজিব নয়। সুতরাং তার পরিবারে উপস্থিত হওয়া বৈধ গণ্য হবে।

যে ব্যক্তি হজ্জের মাসগুলোর পূর্বে উমরার ইহরাম বেঁধে নেয় এবং উক্ত উমরার জন্য চার চক্করের কম তাওয়াফ করে, এরপর হজ্জের মাস শুরু হলে উমরার তাওয়াফ পূর্ণ করে এবং হজ্জের ইহরাম বেধে নেয়, সে তামাত্তুকারী রূপে গণ্য হবে। কেননা আমাদের মতে ইহরাম হলো উমরার শর্ত। সুতরাং এটাকে হজ্জের মাসগুলোর উপর অগ্রবর্তী করা যায়। শুধু উমরার আমলগুলো হজ্জের মাসে আদায় করাটা হলো বিবেচ্য।

আর তাওয়াফের অধিকাংশটুকু হজ্জের মাসের মধ্যে পাওয়া গেছে। আর অধিকাংশের উপর সমগ্রের হুকুম আরোপ করা হয়ে থাকে।

যদি হজ্জের মাস শুরু হওয়ার পূর্বে তাওয়াফের চার চক্কর কিংবা তার বেশী করে ফেলে অতঃপর সেই বছরই হজ্জ আদায় করে, তাহলে সে তামাত্তুকারী হবে না। কেননা হজ্জের মাসের পূর্বেই সে অধিকাংশটুকু আদায় করে ফেলেছে।

এ হুকুম এজন্য যে, (তাওয়াফের অধিকাংশটুকু আদায় করার মাধ্যমে) উমরাকারী এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছে যে, স্ত্রী সহবাসের কারণেও তার উমরা বাতিল হবে না (বরং শুধু দম ওয়াজিব হবে)। সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেলো যে, হজ্জের মাসের পূর্বে উমরা থেকে হালাল হয়ে গেলো।

ইমাম মালিক (র.) হজ্জের মাসে পূর্ণ হওয়ার বিষয় বিবেচনা করেন। তাঁর বিপক্ষে দলীল হলো যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

আর এ জন্য যে, সুযোগ লাভ সাব্যস্ত হয় কর্মসমূহের আদায়ের মাধ্যমে। সুতরাং হজ্জের মাসে এক সফরে দুই ইবাদতের কর্মসমূহ আদায় করার সুযোগ লাভকারীই তামাত্তুকারী হবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***হজ্জের মাসগুলো হলো শাওয়াল, যিলকাদ ও যিল-হজ্জের দশদিন।***

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা.) প্রমুখ থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া এই জন্য যে, যিলহজ্জের দশ তারিখ অতিক্রান্ত হলে হজ্জ ফউত হয়ে যায়। অথচ সময় বাকি অবস্থায় ফউত হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

আর এটা একথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ (হজ্জের সময় হলো নির্ধারিত কয়েক মাস) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুই মাস এবং তৃতীয় মাসের অংশ বিশেষ। সমগ্র তৃতীয় মাস নয়।

যদি হজ্জের ইহরামকে হজ্জের মাসগুলোর উপর অগ্রবর্তী করে তাহলে তার ইহরাম জাইয হয়ে যাবে এবং হজ্জের ইহরাম হিসাবে তা গৃহীত হবে। ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে তা উমরার ইহরাম হবে। কেননা তার মতে ইহরাম হলো রুকন আর আমাদের মতে শর্ত। সুতরাং সময়ের উপর অগ্রবর্তী করার বৈধতার ক্ষেত্রে তা তাহারাতের সদৃশ হবে।

তা ছাড়া এ জন্য যে, ইহরাম অর্থ কিছু বিষয় (নিজের উপর) হারাম করা। আর কিছু বিষয় নিজের উপর ওয়াজিব করা আর তা সকল সময়ে হতে পারে। সুতরাং সময়ের অগ্রবর্তী মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধার অগ্রবর্তী হলো।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, কূফার অধিবাসী (অর্থাৎ বহিরাগত) যদি হজ্জের মাসগুলোতে উমরার ইহরাম বেঁধে আসে এবং তা থেকে ফারিগ হয়ে হলক করে বা চুল ছাঁটে অতঃপর মক্কা কিংবা বসরা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে এবং সে বছরেই সে হজ্জ করে, তাহলে সে তামাত্তুকারী হবে।

প্রথম সুরতে কারণ এই যে, সে হজ্জের মাসগুলোর মধ্যে একই সফরে দু'টি ইবাদতের সুযোগ লাভ করেছে। দ্বিতীয় সুরত সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আবার কারো কারো মতে এটা শুধু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইনের মতে সে তামাত্তুকারী হবে না। কেননা তামাত্তুকারী হলো সেই ব্যক্তি, যার উমরার ইহরাম হবে মীকাত থেকে। এবং হজ্জের ইহরাম হবে মক্কা থেকে অথচ তার উভয়টির ইবাদতের দু'টি ইহরামই হচ্ছে মীকাত থেকে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, যতক্ষণ না সে নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করবে, ততক্ষণ প্রথম সফরই অব্যাহত থাকবে। সুতরাং তার উভয় ইবাদতই প্রথম সফরে সংঘটিত। ফলে তামাত্তু এর দম ওয়াজিব হবে।

আর যদি উমরার ইহরাম বেঁধে আগমন করে তা নষ্ট করে ফেলে, তারপর তা থেকে ফারিগ হয়ে চুল ছেঁটে নেয় পরে বসরায় বসবাস শুরু করে অতঃপর হজ্জের আগে উমরা করে এবং সেই বছরেই হজ্জ আদায় করে, তাহলে সে তামাত্তুকারী হবে না। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত।

সাহেবাইন বলেন, সে তামাত্তুকারী হবে। কেননা সে (বসরা থেকে যাত্রার মাধ্যমে) নতুন সফর করল। আর এই সফরে সে দু'টি ইবাদতের সুযোগ লাভ করেছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত সে

তার পূর্ব সফর নিরস্ত রয়েছে।[৫]

আর যদি সে আপন পরিবারের নিকট ফিরে যায় এবং হজ্জের মাসে উমরা করে এবং সেই মাসেই হজ্জ করে, তাহলে সকলেরই মতে সে তামাত্তুকারী হবে। কেননা এটি হলো নতুন সফর। যেহেতু (বাড়িতে যাওয়ার কারণে) প্রথম সফর সমাপ্ত হয়ে গেছে। আর নতুন সফরে দু'টি সহীহ্ ইবাদত সে সম্পন্ন করেছে।

সে যদি বসরায় গমন না করে মক্কাতেই অবস্থান করে এবং হজ্জের মাসে উমরা করে আর সে বছরই হজ্জ করে, তাহলে সকলের মতেই সে তামাত্তুকারী হবে না। কেননা তার উমরার ইহ্রাম হয়েছে মক্কা থেকে। এবং ফাসিদ উমরা দ্বারা তার প্রথম সফর সমাপ্ত হয়ে গেছে। আর মক্কাবাসীদের জন্য তামাত্তু নেই।

যে ব্যক্তি হজ্জের মাসে উমরা করে এবং সে বছর হজ্জও করে, সে দু'টোর যে কোনটি ফাসিদ করলে সেটির কর্মসমূহ পূর্ণ করবে। কেননা যাবতীয় আমল সম্পন্ন করা ছাড়া তো ইহরামের দায় থেকে সে মুক্ত হতে পারে না।

তবে তামাত্তু -এর দম রহিত হয়ে যাবে। কেননা এক সফরে দু'টি সহীহ্ ইবাদত আদায় করার সুযোগ সে লাভ করেনি।

কোন স্ত্রী লোক যদি তামাত্তু করে, এরপর বকরী কুরবানী দেয়, তাহলে তামাত্তু -এর দমের ব্যাপারে তা যথেষ্ট হবে না।[৬] কেননা যা ওয়াজিব নয়, তা সে আদায় করেছে। পুরুষের ক্ষেত্রেও এ হুকুম রয়েছে।[৭]

ইহরামের সময় যদি স্ত্রী লোক ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সে গোসল করে ইহরাম বেঁধে নিবে এবং একজন হাজীর ন্যায় যাবতীয় কাজ করে যাবে। তবে পবিত্র হওয়ার আগে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করবে না।

এর দলীল 'আইশা (রা.)-এর হাদীছ, যিনি সারিফ নামক স্থানে ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।[৮] তাছাড়া এজন্য যে, তাওয়াফের স্থান হল মসজিদ আর উকুফের স্থান হল খোলা মাঠ। আর এ গোসল হল ইহরামের জন্য, সালাতের জন্য নয়। সুতরাং গোসলের উদ্দেশ্য সফল হবে।

---

৫. সুতরাং উমরা ফাসিদ হয়ে যাওয়ার কারণে এক সফরে দু'টি সহীহ্ ইবাদত হাসিল হলো না, বিধায় সে তামাত্তুকারী হলো না।

৬. কেননা তার উপর তো ওয়াজিব ছিলো তামাত্তু -এর দম। আর সে দিয়েছে কুরবানী, যা মুসাফির হওয়ার কারণে তার উপর ওয়াজিব নয়।

৭. মূল পাঠে স্ত্রীলোকের উল্লেখের কারণ হলো ঃ ইমাম আবূ হানীফাকে জনৈক স্ত্রীলোক প্রশ্ন করার পর তাকে ফাতওয়া দিয়েছিলেন।

৮. বুখারী-মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, 'আইশা (রা.) বলেন, আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। কিন্তু সারিফ স্থানে পৌঁছে আমি ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাশরীফ আনলেন। আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে, তুমি কি ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়েছো? আমি বললাম, হাঁ, তিনি বললেন, এটা আল্লাহ্র ফায়সালা, যা তিনি আদম কন্যাদের উপর আরোপ করেছেন। সুতরাং একজন হাজী যা যা আদায় করে, তুমিও তা আদায় করে যাও। তবে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করো না।

যদি উকূফের পরে এবং তাওয়াফে যিয়ারাতের পরে ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। বিদায়ী তাওয়াফ না করার কারণে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা নবী (সা.) ঋতুগ্রস্ত নারীদের বিদায়ী হজ্জ তরক করার অনুমতি দান করেছেন।

যে ব্যক্তি মক্কাকে বাসস্থান রূপে গ্রহণ করে নেয়, তার উপর বিদায়ী তাওয়াফ নেই। কেননা বিদায়ী তওয়াফ ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যে মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, কুরবানীর তৃতীয় দিন এসে যাওয়ার পর যদি বাসস্থান রূপে গ্রহণ করার নিয়্যত করে, তা হলে বিদায়ী তাওয়াফ রহিত হবে না।

কেউ কেউ ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকেও এটি বর্ণনা করেছেন। কেননা বিদায়ী তাওয়াফের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে তা তার উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। সুতরাং এরপর ইকামতের নিয়্যত করার কারণে তা রহিত হবে না। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

অপরাধ ও ত্রুটি

মুহরিম যদি খুশবু ব্যবহার করে তাহলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। যদি পূর্ণ একটি অংগ কিংবা তার অধিক স্থানে খুশবু ব্যবহার করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

আর পূর্ণ অংগ হল যেমন মাথা, গোছা, উরু কিংবা এ ধরনের কোন অংগ। কেননা অপরাধ পূর্ণ গণ্য হয় সুযোগ গ্রহণের পূর্ণতার মাধ্যমে। আর তা হয় পূর্ণ এক অংগের মধ্যে ব্যবহারে। অতএব এর উপরই পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত (দম) ওয়াজিব হবে।

যদি এক অংগ থেকেও কম পরিমাণে খুশবু ব্যবহার করে তাহলে তার উপর সাদকা ওয়াজিব হবে। –ত্রুটি কম হওয়ার কারণে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, অংগের পরিমাণ অনুপাতে দম ওয়াজেব হবে ঃ– অংশকে সমগ্রের সাথে তুলনা করে।[১]

মুনতাকা গ্রন্থে রয়েছে যে, একটি অংগের চতুর্থাংশে খুশবু ব্যবহার করলে তার উপর পূর্ণ দম ওয়াজিব হবে, মাথার চতুর্থাংশ হলক করার উপর কিয়াস করে। আমরা পরবর্তীতে উভয়ের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করবো, ইনশাআল্লাহ্।

দু'টি ক্ষেত্রে ছাড়া সকল ক্ষেত্রে ওয়াজিব দম বকরী দ্বারা আদায় হয়ে যাবে। আমরা ক্ষেত্র দু'টির উল্লেখ করব, হাদী অধ্যায়ে, ইনশাআল্লাহ।

ইহরামের ক্ষেত্রে যে কোন অনির্ধারিত সাদাকা হল অর্ধ সা'আ গম। তবে উকুন বা টিড্ডি জাতীয় কিছু হত্যা করলে যা ওয়াজিব হয়[২] (তা অর্ধ সা'আ নয়।) .

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ মেহেদি দ্বারা মাথার চুল রঞ্জিত করে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা এটা খুশবু। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ الحناء طيب –মেহেদি হলো খুশবু।

আর যদি তাতে মাথা প্রলিপ্ত হয়ে যায় তাহলে তার উপর দু'টি দম ওয়াজিব হবে। একটি হলো খুশবু ব্যবহার করার দম, অন্যটি হলো মাথা আবৃত করার দম।

---

১. যদি অর্ধেক অংগে মাখে তাহলে অর্ধেক দম আর এক-চতুর্থাংশে মেখে থাকে তাহলে একটি দমের এক-চতুর্থাংশ দম ওয়াজিব হবে।

২. এক্ষেত্রে নির্ধারিত কোন পরিমাণ নেই। বরং যৎসামান্য ইচ্ছা দান করে দেবে।

আর যদি ওয়াসমাহ[৩] দ্বারা চুল রঞ্জিত করে, তাহলে তার উপর কোন দম ওয়াজিব হবে না। কেননা তা সুগন্ধি নয়। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি মাথা ব্যথায় চিকিৎসার জন্য ওয়াসমাহর খেযাব লাগায়, তাহলে তার উপর দণ্ড (দম) ওয়াজিব –এ বিবেচনায় যে, তা মাথা আবৃত করে ফেলে। এ-ই বিশুদ্ধ মত।

মাবসূত কিতাবে এ প্রসংগে মাথা ও দাড়ির কথা একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আর জামেউস-সাগীর কিতাবে শুধু মাথার কথা বলা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উভয়ের প্রত্যেকটির উপর ভিন্ন দম ওয়াজিব হবে।

যদি কেউ যয়তুন তেল ব্যবহার করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে।

আর ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যদি চুলের মধ্যে ব্যবহার করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা তা উষ্কখুষ্কতা দূর করে। আর যদি চুল ছাড়া অন্যত্র ব্যবহার করে তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত।

সাহেবাইনের দলীল এই যে, এটি ভোগ্য দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে তাতে কিছুটা উপকার লাভ রয়েছে। যেমন কীট ধ্বংস করা ও খুষ্কতা দূর করা। সুতরাং তা লঘু ক্রটির মধ্যে গণ্য। (সুতরাং দমের পরিবর্তে সাদাকা ওয়াজিব হবে।)

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, যয়তুন তৈল হলো খুশবুর মূল। আর তাতেও কিছু না কিছু সুঘ্রাণ থাকে। তাছাড়া কীট ধ্বংস করে, চুল নরম করে, ময়লা ও উষ্ক-খুষ্কতা দূর করে। সুতরাং এই সব মিলে অপরাধের পূর্ণতা সাধিত হয়, কাজেই দম ওয়াজিব হবে। আর ভোগ্যদ্রব্য হওয়া খুশবু হওয়ার বিপরীত নয়। যেমন জাফরান।

আর এই মতভিন্নতা হলো অবিমিশ্র যয়তুনের তেল এবং অবিমিশ্র তিলের তেল সম্পর্কে। আর এর মধ্যে খুশবু মিশ্রিত হলে তা ব্যবহারে সর্বসম্মত ভাবেই তার উপর দম ওয়াজিব হবে। যেমন, বনস্পতি, ইয়াসমীন ও অন্যান্য সুগন্ধি জাতীয় তেল। কেননা এটি খুশবু। এই হুকুম তখন হবে, যখন খুশবু হিসাবে তা ব্যবহার করা হবে।

আর যদি তা দ্বারা জখম কিংবা পায়ের কাটার চিকিৎসা করা হয়, তাহলে তার উপর কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা এগুলো স্বয়ং সুগন্ধি নয়, বরং সুগন্ধির মূল। কিংবা এক প্রেক্ষিতে সুগন্ধি। সুতরাং সুগন্ধি হিসাবে ব্যবাহর করা শর্ত হবে। পক্ষান্তরে মিশক ও এই জাতীয় জিনিস দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণের বিষয়টি এর বিপরীত। (এখানে সর্বাবস্থায় দম ওয়াজিব হবে।)

যদি পূর্ণ একদিন সেলাই করা কাপড় পরিধান করে কিংবা মাথা ঢেকে রাখে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি এর চেয়ে কম সময় হয় তাহলে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে।

---

৩. আনযায়ী বলেন, ওয়াসমাহ্ হলো এক প্রকার ঘাস, যার পাতা খেযাব রূপে ব্যবহার করা হয়, এর কোন সুঘ্রাণ নেই।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি অর্ধদিনের বেশী সময় পরিধান করে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এটি ছিল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রথম দিকের মত।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন যে, শুধু পরিধান করলেই দম ওয়াজিব হবে। কেননা বস্ত্র শরীরের সংগে জড়িত হওয়া মাত্রই উপকারিতা পূর্ণ হয়ে যায়।

আমাদের দলীল এই যে, বস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্য হলো (ঠাণ্ডা বা গরম দূর করার) উপকার লাভ। সুতরাং একটা নির্দিষ্ট সময় বা মিয়াদ বিবেচনা করতে হবে, যাতে তা পূর্ণমাত্রায় হাসিল হয়। এবং তাতে দম ওয়াজিব হয়। সুতরাং সেই মিয়াদ একদিন দ্বারা ধার্য করা হয়েছে। কেননা সাধারণতঃ একদিনের জন্য বস্ত্র পরিধান করা হয়, এরপর খুলে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে একদিনের কমে অপরাধ লঘু হয়ে যায়। তাই সাদাকা ওয়াজিব হবে।

তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) অধিকাংশ সময়কে সমগ্রের স্থলবর্তী বিবেচনা করেছেন।

যদি জামা চাদর রূপে ব্যবহার করে কিংবা বগল তলায় দিয়ে অপর কাঁধের উপর ফেলে রাখে কিংবা পায়জামাকে তহবন্দরূপে ব্যবহার করে, তাহলে কোন দোষ নেই। কেননা সে তা সেলাই করা কাপড় রূপে পরিধান করে নি। অদ্রূপ যদি দুই কাঁধ আবার ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় এবং উভয় হাত আস্তিনে প্রবেশ না করায়।

ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

আমাদের দলীল এই যে, সে এটাকে আবা রূপে ব্যবহার করেনি। এ কারণেই এটি রক্ষা করতে কষ্ট স্বীকার করতে হয়।

আর মাথা ঢাকার ব্যাপারেও সময়ের পরিমাণ তাই হবে, যা আমরা বর্ণনা করেছি। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, যদি সম্পর্ণ মাথা পূর্ণ একদিন ঢেকে রাখে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, এটা নিষিদ্ধ। আর যদি মাথার অংশ বিশেষ ঢেকে রাখে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক-চতুর্থাংশকে অপরাধ গণ্য করেছেন, মাথা মুড়ানো ও সতরের উপর কিয়াস করে।[৪] কেননা আংশিক আবরিত করা এমন উপকার ভোগ যা উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে। কোন কোন মানুষ এরূপ করায়ই অভ্যস্তও হয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আধিক্যের প্রকৃত অর্থ লক্ষ্য করে মাথার অধিকাংশও বিবেচনা করেন।[৫]

যদি মাথার চতুর্থাংশ কিংবা দাড়ির চতুর্থাংশ বা তার বেশী হলক করে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর যদি চতুর্থাংশের কম হয় তাহলে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, সবটুকু হলক না করলে দম ওয়াজিব হবে না।

---

৪. অর্থাৎ মাথার চতুর্থাংশ হলক করলে যেমন পূর্ণ দম ওয়াজিব হয় এবং নামাযের মাঝে কোন অংগের চতুর্থাংশ সতর খুলে গেলে যেমন নামায ফাসিদ হয়ে যায়, তদ্রূপ এ ক্ষেত্রেও মাথার চতুর্থাংশ ঢেকে রাখলে পূর্ণ দম ওয়াজিব হবে।

৫. অর্থাৎ আধিক্যের প্রকৃত অর্থ তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন তার বিপরীতে তার চেয়ে কম পরিমাণ থাকে। সেই হিসাবে চতুর্থাংশে বা তৃতীয়াংশে গুণগতভাবে অধিক, কিন্তু প্রকৃত অর্থে অধিক নয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, সামান্য পরিমাণ হলক করলেও দম ওয়াজিব হবে। তিনি এরূপ হারাম শরীফের ঘাস-বৃক্ষের উপর কিয়াস করেছেন।[৬]

আমাদের দলীল এই যে, মাথার চতুর্থাংশ হলক করা পূর্ণ উপকার লাভের শামিল। কেননা এটি প্রচলিত রয়েছে। সুতরাং এতে পূর্ণ অপরাধ গণ্য হবে। কিন্তু চতুর্থাংশের কম হলে অপরাধ লঘু হবে। অংগের চতুর্থাংশে খুশবু মাখার ব্যাপারটি-এর বিপরীত। কেননা (সচরাচর) তা উদ্দেশ্য হয় না। তদ্রূপ ইরাকে ও আরব দেশেও দাড়ির অংশ বিশেষ হলক করার প্রচলন রয়েছে।

যদি সম্পূর্ণ ঘাড় হলক করে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা এটি আলাদা অংগ, যা উদ্দেশ্য মূলকভাবে হলক করা হয়।

যদি উভয় বগল কিংবা একটি বগল হলক করা হয় তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা ময়লা দূর করা এবং স্বস্তি লাভের জন্য উভয়ের প্রত্যেকটিই হলকের উদ্দেশ্য হয়ে যাবে। সুতরাং (দম ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে) নাভির নীচের চুলের হুকুমের অনুরূপ হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)এখানে (অর্থাৎ জামে সাগীরের বর্ণনায়) বগলদ্বয়ের ক্ষেত্রে মুড়ানোর কথা বলেছেন। কিন্তু মাবসূতের বর্ণনায় উপড়ানোর কথা রয়েছে আর সেটিই হলো সুন্নাত।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি পূর্ণ একটি অংগ হলক করে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। তার চেয়ে কম হলে খাদ্য সামগ্রী সাদাকা করবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) পূর্ণ অংগ দ্বারা বুক, পায়ের গোছা ইত্যাদি বুঝিয়েছেন। কেননা এ সকল অংগে উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই লোমনাশক ব্যবহার করা হয়। সুতরাং পূর্ণ অংগ হলক করলে অপরাধ পূর্ণ হবে আর আংশিক হলক করলে অপরাধ লঘু হবে।

যদি মোচ ছাঁটে তাহলে একজন ন্যায়পরায়ণ মানুষের বিচার অনুসারে খাদ্যশস্য সাদাকা করা ওয়াজিব। অর্থাৎ তিনি বিবেচনা করে দেখবেন যে, দাড়ির চতুর্থাংশের তুলনায় ছাঁটা মোচ কী পরিমাণ হচ্ছে; সেই অনুপাতে খাদ্যশস্য ওয়াজিব হবে। এমন কি যদি ছাঁটা মোচ চতুর্থাংশের এক-চতুর্থাংশও হয় তাহলে একটি বকরীর চতুর্থাংশের মূল্য ওয়াজিব হবে। ছাঁটা শব্দটি প্রমাণ করে যে, মোচের ক্ষেত্রে এটাই সুন্নাত। হলক সুন্নাত নয়। বস্তুতঃ উপরের ঠোঁটের সীমা বরাবর ছাঁটা সুন্নাত।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***যদি কেউ শিংগা লাগাবার স্থান হলক করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তাঁর উপর দম ওয়াজিব।*** সাহেবাইন বলেন, তার উপর সাদাকা ওয়াজিব। কেননা, হলক তো করা হয় শিংগা লাগানোর উদ্দেশ্যে। আর তা ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ নয়। সুতরাং শিংগা লাগানের সহায়কেরও একই হুকুম হবে। তবে যেহেতু এতে কিছুটা ময়লা দূর করা হয়, তাই সাদাকা ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, এ স্থানের হলকও উদ্দীষ্ট। কেননা তা ছাড়া

৬. অর্থাৎ হারাম শরীফের ঘাস যেমন অল্প বা বেশী যে পরিমাণই কর্তন করা হোক অপরাধ গণ্য করা হয়, তদ্রূপ মাথার চুলও যে পরিমাণই হলক করা হোক তা অপরাধ গণ্য হবে।

মূল উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। অতএব একটি পূর্ণ অংগ থেকে ময়লা দূর করার বিষয় সংঘটিত হয়েছে। তাই দম ওয়াজিব হবে।

যদি কোন মুহরিমের মাথা সে তার আদেশে কিংবা বিনা আদেশে মুড়িয়ে দেয় তবে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। আর যার মাথা মুড়ানো হলো তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যদি তার আদেশ ছাড়া হয়ে থাকে, যেমন ঘুমন্ত অবস্থায়, তাহলে দম ওয়াজিব হবে না। কেননা ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মূলনীতি হলো বল প্রয়োগ, ঐ ব্যক্তিকে, যার উপর বল প্রয়োগ করা হয়েছে, উক্ত কাজের দায়-দায়িত্বের পাকড়াও থেকে মুক্ত রাখে। আর ঘুম (অনিচ্ছার বিবেচনায়) বল প্রয়োগের চাইতেও অধিক।

আমাদের মতে ঘুম এবং বল প্রয়োগ গুনাহ্ রহিত করে, কিন্তু ফলাফল রহিত করে না। তাছাড়া দম ওয়াজিব হওয়ার কারণ তো সংঘটিত হয়েছে। আর তা হলো আরাম ও সৌন্দর্য লাভ। সুতরাং তার উপর দম ওয়াজিবই হবে নির্ধারিত।

অসহায় ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত। এক্ষেত্রে সে ইচ্ছাধীন।[৭] কেননা এক্ষেত্রে বিপদ আসমানী। আর বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে তো এসেছ বান্দার পক্ষ থেকে।

আর যার মাথা মুড়ানো হয়েছে, সে মুণ্ডনকারীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে না। কেননা দম তো ওয়াজিব হয়েছে, সে যে আরাম লাভ করেছে, এ কারণে। সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে সংগম জনিত 'অর্থদণ্ড'-এর ক্ষেত্রে ধোঁকার সম্মুখীন হয়।[৮] অদ্রূপ মুণ্ডনকারী যদি হালাল অবস্থায় থাকে তবু যে মুহরিমের মাথা মুড়ানো হয়েছে, তার ক্ষেত্রে বিধান ভিন্ন হবে না। পক্ষান্তরে আমাদের বর্ণিত মাস'আলায় উভয় অবস্থায়[৯] মুণ্ডনকারী উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। এরূপ মতভিন্নতা রয়েছে যখন মুহরিম কোন হালাল ব্যক্তির মাথা মুড়িয়ে থাকে।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর দলীল এই যে, অন্যের চুল মুড়ানো দ্বারা উপকার লাভ সাব্যস্ত হয় না। আর সেটাই হলো দম ওয়াজিবের কারণ।

---

৭. অর্থাৎ কোন মুহরিম যদি বাধ্য হয়ে হলক করে তবে তাকে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের ইচ্ছা প্রদান করা হয়। ইচ্ছা করলে সে বকরী যবাহ্ করতে পারে বা ইচ্ছা করলে ছয়জন মিসকীনকে সাদাকা করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে তিন দিন রোযা রাখতে পারে।

৮. মাসআলাটির বিবরণ এই যে, এক ব্যক্তি একটি দাসী খরিদ করলো অতঃপর তার থেকে সন্তান লাভ করলো কিন্তু পরে দাসীর হকদার বের হলো। এমতাবস্থায় তাকে সন্তানের মূল্য প্রদান করতে হবে এবং ভুল সংগমের কারণে মাহর (অর্থদণ্ড) দিতে হবে। অতঃপর বিক্রেতার নিকট হতে সন্তানের মূল্য ফেরত নিবে কিন্তু মাহরের অর্থ ফেরত নিতে পারবে না। কেননা সেটা তো ওয়াজিব হয়েছে সংগম সুখের বিনিময়ে।

৯. অর্থাৎ মুণ্ডনকারী যদি মুহরিম হয় আর যার মাথা মুড়ানো হয়েছে সে আদেশ করা বা না করুক।

আমাদের দলীল এই যে, মানুষের শরীরে যা কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তা দূর করা ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা ঐ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশগুলো নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। যেমন হারাম শরীফের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে। সুতরাং তার ও অন্যের চুলের ব্যাপারে হুকুমের কোন পার্থক্য হবে না। তবে নিজের চুলের ব্যাপারে অপরাধ হয় পূর্ণমাত্রায়।

যদি কোন হালাল ব্যক্তির মোচ ছেঁটে দেয় কিংবা তার নখ কেটে দেয় তাহলে যে পরিমাণ ইচ্ছা খাদ্যশস্য দান করে দেবে। কারণ ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। আর এটাও এক ধরনের উপকার লাভ থেকে মুক্ত নয়। কেননা অন্যের ময়লা অবস্থা থেকেও মানুষ কষ্ট পায়, যদিও তা নিজের শরীরের ময়লা দ্বারা কষ্ট পাওয়ার তুলনায় কম। সুতরাং তাকে খাদ্যশস্য সাদাকা করতে হবে।

যদি তার দু'হাত ও দু'পায়ের নখ কাটে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা এটা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এতে ময়লা দূর করা এবং শরীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জিনিস দূর করা হচ্ছে। সুতরাং যদি সবগুলো নখ কাটে তাহলে পূর্ণ উপকার লাভ সাব্যস্ত হয়। কাজেই 'দম' ওয়াজিব হবে।

যদি একই মজলিশে হয় তাহলে একটি দমের অতিরিক্ত হবে না। কেননা অপরাধটি একই ধরনের। যদি কয়েকটি মজলিসে হয়ে থাকে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একই হুকুম হবে। কেননা এ অপরাধগুলোর ভিত্তি হলো একীভূত করার উপর। সুতরাং তা সাওম ভঙ্গের কাফ্ফারার সদৃশ হলো।[১০] তবে যদি কাফ্ফারা মাঝখানে আদায় করে দেয় (তখন পরবর্তীটির জন্য আলাদা কাফ্ফার দিতে হবে) কেননা কাফ্ফারা আদায়ে প্রথম অপরাধের নিরসন হয়।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে যদি প্রত্যেক মজলিসে একটি হাত বা একটি পায়ের নখ কেটে থাকে তাহলে চারটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা এক্ষেত্রে ইবাদতের অর্থ প্রবল। সুতরাং একীভূত করার বিষয়টি অভিন্ন মজলিসের সাথে শর্ত যুক্ত। যেমন সাজদার আয়াতের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

যদি এক হাত বা এক পায়ের নখ কেটে থাকে তাহলে একটি দম ওয়াজিব হবে।

এ হুকুমের ভিত্তি হলো চতুর্থাংশকে সমগ্রের স্থলবর্তী করার উপর। যেমন মাথা মুড়ানোর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

যদি পাঁচ আংগুলের কম নখ কেটে থাকে তাহলে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ প্রতিটি নখের পরিবর্তে একটি করে সাদাকা ওয়াজিব হবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, তিনটির নখ কেটে থাকলেও একটি দম ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রথম দিকের মত। কেননা হাতের পাঁচটি আংগুলের জন্য একটি দম ওয়াজিব হয়। আর তিনটি পাঁচটির অধিকাংশ।

---

১০. একাধিক রোযা ভংগ করলে একটি কাফ্ফারাই যথেষ্ট হয়ে থাকে।

কিতাবে যে হুকুম উল্লেখ করা হয়েছে, তার কারণ এই যে, এক হাতের পাঁচটি আংগুলের নখ কর্তন, যার উপর দম ওয়াজিব হয়-এর সর্বনিম্ন পরিমাণ। আর সেটাকে আমরা সমগ্র নখের স্থলবর্তী করেছি। সুতরাং এক হাতের অধিকাংশকে আবার তার সমগ্রের স্থলবর্তী করা যাবে না। কেননা তাহলে এ ধারা অনিঃশেষিত ভাবে চলতে থাকেব।

যদি দুই হাত-পায়ের বিভিন্ন আংগুলের পাঁচটি নখ কাটে তাহলে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দম ওয়াজিব হবে এক হাতের পাঁচটি নখ কাটলে আর মাথার বিভিন্ন স্থান থেকে এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ চুল মুড়ালে যেমন একটি দম ওয়াজিব হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও আবূ ইউসুফের (র.) দলীল এই যে, অপরাধের পূর্ণতা সাব্যস্ত হয় আরাম ও সৌন্দর্য লাভের মাধ্যমে। অথচ এভাবে কাটা দ্বারা অস্বস্তি ও অসৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। মাথার বিভিন্ন স্থান থেকে হলক করার বিষয়টি এর বিপরীত, কেননা এটি প্রচলিত, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। আর অপরাধ যখন লঘু হয় তখন তাতে সাদাকা ওয়াজিব হবে। সুতরাং প্রতিটি নখের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে আহার করাবে।

একই হুকুম হবে যদি বিক্ষিপ্তভাবে পাঁচটি নখের বেশী কেটে থাকে। তবে যদি সব কটি সাদাকা একটি দমের পরিমাণ হয়ে যায়, তখন যতটুকু ইচ্ছা সামান্য কম করে দিবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***যদি মুহরিমের নখ ভেংগে ঝুলে যায়, আর সে তা কেটে ফেলে দেয় তাহলে তার উপর কোন দণ্ড আসবে না।*** কেননা ভেংগে যাওয়ার পর তা আর বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং তা হারামের শুষ্ক বৃক্ষের সদৃশ হলো।

যদি কোন ওযরের কারণে খুশবু ব্যবহার করে কিংবা সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করে থাকে কিংবা মাথা মুড়ায়, তাহলে তার ইখতিয়ার রয়েছে। ইচ্ছা করলে সে একটি বকরী যবাহ্ করবে কিংবা ইচ্ছা করলে ছয়জন মিসকীনকে তিন সা'আ গম দান করবে। কিংবা ইচ্ছা করলে তিনদিন রোযা রাখবে।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ –তাহলে ফিদইয়া দিতে হবে রোযা দ্বারা কিংবা সাদাকা দ্বারা কিংবা যবাহ্ করা দ্বারা (২ ঃ ১৯৬)। أو অব্যায়টি ইচ্ছা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আয়াতটির ব্যাখ্যা এরূপই করেছেন, যেভাবে আমরা উল্লেখ করেছি। আয়াতটি মা'যূর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

সাওম যে কোন স্থানেই আদায় করা যেতে পারে। কেননা সাওম হলো সর্বস্থানের ইবাদত। আমাদের মতে সাদাকারও একই কারণে একই হুকুম। কিন্তু যবাহ্ করার বিষয়টি সকলের মতেই হরমের সাথে বিশিষ্ট। কেননা রক্ত প্রবাহিত করাকে নির্দিষ্ট সময়ে কিংবা নির্দিষ্ট স্থানেই শুধু ইবাদত রূপে গণ্য করা হয়েছে। আর এই দম কোন সময়ের সাথে বিশিষ্ট নয়। সুতরাং স্থানের সাথে বিশিষ্ট হওয়া অবধারিত হয়ে গেলো।

যদি খাদ্য সাদাকা করার ইচ্ছা করে থাকে তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে দুপুর ও রাত্রে দু'বেলা খাইয়ে দেয়া যথেষ্ট হবে। তিনি এটাকে কসমের কাফফারার উপর কিয়াস করেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা জাইয হবে না। কেননা সাদাকা শব্দটি মালিকানার ইংগিত বহন করে। আর আয়াতে সেটাই উল্লেখিত হয়েছে।

পরিচ্ছেদ ঃ ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সম্ভোগ

যদি আপন স্ত্রীর গুপ্তাংশের প্রতি কাম-দৃষ্টিতে তাকায় এবং বীর্যস্খলিত হয়ে যায় তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা হারাম হলো সহবাস করা আর তা এখানে পাওয়া যায়নি। সুতরাং এটা কাম-চিন্তার কারণে বীর্যস্খলিত হওয়ার অনুরূপ হলো।

যদি কামভাবে চুম্বন বা স্পর্শ করে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

জামেউস সাগীরে বলা হয়েছে, যদি কামভাবে স্পর্শ করে এবং বীর্যস্খলিত হয় (তবে দম ওয়াজিব হবে)। আর মাবসূত কিতাবে রয়েছে, বীর্যস্খলিত হওয়া না হওয়ায় কোন পার্থক্য নেই। আর অনুরূপ হুকুম লজ্জাস্থানের বাইরে সংগম করার ক্ষেত্রেও। একই হুকুম (অর্থাৎ স্খলন হওয়া না হওয়া উভয় অবস্থাতেই দম ওয়াজিব হবে।)

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এই সকল অবস্থায় বীর্যস্খলন হলে তার ইহরাম ফাসিদ হয়ে যাবে। তিনি এটাকে সাওমের উপর কিয়াস করেছেন।

আমাদের দলীল এই যে, হজ্জ নষ্ট হওয়ার সম্পর্ক হলো সংগমের সংগে। এ কারণেই অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজের কোনটির কারণেই হজ্জ নষ্ট হয় না। আর এগুলো তো উদ্দিষ্ট সংগম নয়। সুতরাং যা মূল সংগমের সংগে সম্পৃক্ত তা এগুলোর সংগে যুক্ত হবে না। তবে এগুলোতে স্ত্রী থেকে আনন্দ লাভ ও সঙ্গমের অর্থ বিদ্যমান আর তা হজ্জের নিষিদ্ধ বিষয়: এ জন্য দম ওয়াজিব হবে। সাওমের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সাওমে নিষিদ্ধ বিষয় হলো শাহওয়াত পূর্ণ করা। আর লজ্জাস্থান ছাড়া অন্যত্রের সংগমে বীর্যস্খলন ছাড়া তা পূর্ণ হয় না।

যদি কেউ আরাফায় অবস্থানের পূর্বে 'দুই পথের' কোন একটিতে সংগম করে তাহলে তার হজ্জ ফাসিদ হয়ে যাবে এবং একটি বকরী যবাহ করা তার উপর ওয়াজিব আর সে ঐ ব্যক্তির মতোই হজ্জের ক্রিয়াকর্ম করে যাবে, যার হজ্জ নষ্ট হয়নি।

এ বিষয়ে মূল দলীল হলো বর্ণিত হাদীছ যে, নবী করীম (সা.)-কে ঐ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে তার স্ত্রীর সংগে উভয়ে হজ্জের ইহরামে থাকা অবস্থায় সহবাস করেছে। তিনি বললেন, উভয়ে একটি দম দিবে এবং নিজেদের হজ্জের ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যাবে। আর আগামী বছর তাদের উপর হজ্জ করা ওয়াজিব। সাহাবায়ে কিরামের এক জামা'আতের থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, একটি উট ওয়াজিব হবে ঐ ব্যক্তির উপর কিয়ায় করে যে, আরাফার উকুফের পরে যদি সে সহবাস করে বাদানাহ ওয়াজিব হবে। তাঁর বিপক্ষে দলীল হলো আমাদের বর্ণিত হাদীছের নিঃশর্ততা।[১১]

তা ছাড়া এ কারণে যে, হজ্জের কাযা যখন ওয়াজিব হয়েছে– আর তা কল্যাণ পুনঃ অর্জনের জন্যই ওয়াজিব হয়ে থাকে– তখন অপরাধের দিকটি লঘু হয়ে গেল। সুতরাং বকরী যবাহ্ করাই যথেষ্ট হবে। উকুফের পরের অবস্থা এর বিপরীত। কেননা, তখন হজ্জের কাযা করা ওয়াজিব হয় না।

ইমাম কুদূরী (র.) উভয় পথের সংগমকে অভিন্ন ধরেছেন।

আর আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, সম্মুখ পথ ছাড়া হলে সংগমের অপূর্ণতার কারণে হজ্জ ফাসিদ হবে না। সুতরাং তাঁর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে দু'টি বর্ণনা হলো।

আমাদের মতে তাদের নষ্টকৃত হজ্জ কাযা করার সময় স্ত্রীকে দূরে রাখা তার জন্য জরুরী নয়।

ইমাম মালিক (র.) ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, তারা যখন ঘর থেকে বের হবে তখন থেকে আলাদা হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, যখন উভয়ে ইহরাম বাঁধবে (তখন থেকে বিচ্ছিন্ন হবে)।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যখন ঐ স্থানে উপনীত হবে, যেখানে সহবাস করেছিল (তখন বিচ্ছিন্ন হবে)।

তাঁর দলীল এই যে, (সেই স্থানে পৌঁছায়) স্বামী-স্ত্রী বিগত হজ্জের সহবাসের কথা স্মরণ করতে এবং সহবাসে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। সুতরাং উভয়ে বিচ্ছিন্ন থাকবে।

আমাদের দলীল এই যে, উভয়ের মাঝে সংযোগকারী গুণ তথা 'বিবাহ' তাদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং ইহরামের পূর্বে তাদের বিচ্ছিন্ন থাকার কোন অর্থ নেই। কেননা তখন তো সহবাস করা জাইয রয়েছে। ইহরামের পরেও একই কথা। কেননা তারা আলোচনা করবে যে, ক্ষণিক আনন্দের মাশুল হিসাবে কি কঠিন কষ্ট আর ভোগান্তি তাদের হচ্ছে। ফলে স্বভাবতঃই তাদের লজ্জা ও অনুতাপ বৃদ্ধি পাবে এবং তা পরিহার করে চলবে। সুতরাং বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

যে ব্যক্তি উকুফে আরাফার পরে সহবাস করবে তার হজ্জ ফাসিদ হবে না, তবে তার উপর উট কুরবানী ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, যদি রামীর পূর্বে সহবাস করে তাহলেও তার হজ্জ নষ্ট হয়ে যাবে।

আমাদের দলীল হল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ বাণী ঃ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ –যে ব্যক্তি আরাফায় উকূফ করল, তার হজ্জ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। তবে উট ওয়াজিব হবে ইব্‌ন

১১. অর্থাৎ হাদীছে يريقان دما বলা হয়েছে; সুতরাং বুঝা গেল যে, উট হওয়ার শর্ত নেই, যে কোন দম হলেই চলবে।

'আব্বাস (রা.)-এর ফাতওয়ার কারণে। কিংবা এই কারণে যে, সহবাস হলো উপকার লাভের সর্বোচ্চ পর্যায়। সুতরাং তার ওয়াজিবও হবে গুরুতর।

যদি হলকের পরে সহবাস করে তাহলে তার উপর একটি বকরী ওয়াজিব হবে। কেননা স্ত্রী সহবাসের ক্ষেত্রে তার ইহরাম বহাল রয়েছে; সেলাই করা কাপড় পরিধান করা এবং এই জাতীয় অন্যান্য ব্যাপারে বহাল নেই। সুতরাং অপরাধ অপেক্ষাকৃত লঘু হয়ে গেলো। ফলে বকরীই যথেষ্ট।

যে ব্যক্তি উমরার চার চক্কর তাওয়াফ সম্পন্ন করার পূর্বে সহবাস করবে, তার উমরা ফাসিদ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সে উমরার ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যাবে এবং তা কাযা করবে আর তার উপর একটি বকরী ওয়াজিব। আর যদি চার বা তার বেশী চক্কর তাওয়াফ করার পর সহবাস করে, তাহলে তার উপর একটি বকরী ওয়াজিব হবে। কিন্তু তার উমরা ফাসিদ হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, উভয় অবস্থাতেই ফাসিদ হয়ে যাবে এবং হজ্জের উপর কিয়াস করে তার উপর একটি উট ওয়াজিব হবে। কেননা তার মতে হজ্জের ন্যায় উমরাও ফরয। আমাদের দলীল এই যে, উমরা হলো সুন্নাত। সুতরাং এর মর্যাদা হজ্জের চেয়ে নিম্নতর। সুতরাং উভয়ের পার্থক্য প্রকাশ করার জন্য উমরার ক্ষেত্রে বকরী ওয়াজিব হবে এবং হজ্জের ক্ষেত্রে উট ওয়াজিব হবে।

যে ব্যক্তি ইহরামের কথা ভুলে গিয়ে সহবাস করে, তার হুকুম ঐ ব্যক্তির মতই যে, ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করল।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, ভুলে গিয়ে সহবাস করা হজ্জকে নষ্ট করে না। একই রকম মতভিন্নতা রয়েছে ঘুমন্ত ও বল প্রয়োগকৃত স্ত্রীলোকের সংগে সহবাসের ক্ষেত্রে।

তিনি বলেন, এ সকল উপসর্গের কারণে নিষেধাজ্ঞা বিলুপ্ত হয়ে যায়, সুতরাং তার এ কর্মটি 'অপরাধ' বলে গণ্য নয়।

আমাদের দলীল এই যে, হজ্জ নষ্ট হওয়ার কারণ ইহরাম অবস্থায় বিশেষ উপকার ভোগ করা।[১২] আর তা এ সকল উপসর্গের কারণে বিলুপ্ত হয় না।

আর হজ্জ সাওমের সমপর্যায়ের নয়। কেননা ইহরামের অবস্থাই হলো স্মরণ প্রদানকারী, যেমন সালাতের অবস্থা। পক্ষান্তরে সিয়ামের বিষয়টি বিপরীত। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

---

১২. অর্থাৎ হজ্জ নষ্ট হওয়ার হুকুম মূল সহবাসের সংগে সম্পৃক্ত। আর যেহেতু মূল সহবাস সাব্যস্ত হয়েছে, সেহেতু এ সকল উপসর্গের কারণে হজ্জ নষ্ট হওয়া রহিত হবে না।

পরিচ্ছেদ ঃ তাহারাত ব্যতীত তাওয়াফ সংশ্লিষ্ট বিষয়

যে ব্যক্তি হাদাছ অবস্থায় তাওয়াফে কুদূম করে, তার উপর সাদাকা ওয়াজিব।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, উক্ত তাওয়াফ গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ اَلطَّوَافُ صَلٰوةٌ اِلَّا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَبَاحَ فِيْهِ الْمَنْطِقَ –তাওয়াফ হলো নামায, কিন্তু (পার্থক্য এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা তাতে কথা বলা বৈধ করেছেন। সুতরাং তাহারাত তাওয়াফের শর্ত হবে।

আমাদের দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ –তোমরা প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করো (২২ ঃ ২৯)। এখানে তাহারাতের শর্ত আরোপ করা হয়নি। সুতরাং তা ফরয হবে না। তবে কেউ কেউ তাহারাতকে সুন্নাত বলেছেন। আর বিশুদ্ধতম মত এই যে, তা ওয়াজিব। কেননা তা তরক করলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়।

তাছাড়া এই কারণে যে, ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদীছ আমল ওয়াজিব করে। সুতরাং এ দ্বারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হবে।

সুতরাং যখন তাওয়াফে কুদূম শুরু করবে, তখন সুন্নাত হওয়া সত্ত্বেও শুরু করার কারণে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং তাহারাত তরক করার কারণে তাতে ত্রুটি আসবে। সুতরাং সাদাকা দ্বারা তা পূরণ করতে হবে। (দমের পরিবর্তে সাদাকা ধার্য করার কারণ হলো) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা ওয়াজিবকৃত অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারত, তার চেয়ে এর মর্যাদার নিম্নতা প্রকাশ করা। অনুরূপ হুকুম যে কোন নফল তাওয়াফের বেলায়ও।

যদি হাদাছ অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারাত করে তাহলে তার উপর একটি বকরী ওয়াজিব হবে। কেননা সে রুকনের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করেছে; সুতরাং তা প্রথমটির চেয়ে গুরুতর হবে। সুতরাং দম দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

আর যদি সে জুনুবী অবস্থায় তাওয়াফ করে, তবে তার উপর উট ওয়াজিব হবে। ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে এরূপই বর্ণিত আছে। তাছাড়া এ কারণে যে, জানাবাত হলো হাদাছের চেয়ে গুরুতর। সুতরাং পার্থক্য প্রকাশ করার জন্য এক্ষেত্রে উট দ্বারা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

অনুরূপ হুকুম যখন তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর জানাবাতের অবস্থায় কিংবা হাদাছের অবস্থায় করে। কেননা কোন কিছুর অধিকাংশটুকু তার সম্পূর্ণের হুকুম ধারণ করে।

তবে যতক্ষণ মক্কায় থাকে ততক্ষণ তাওয়াফ পুনরায় করে নেওয়াই উত্তম। তখন তার উপর দম ওয়াজিব নয়। কোন কোন অনুলিপিতে রয়েছে যে, পুনরায় তাওয়াফ করা তার উপর ওয়াজিব।

তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, হাদাছের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব পর্যায়ে তাকে পুনরায় তাওয়াফ করার নির্দেশ দেয়া হবে। আর জানাবাতের ক্ষেত্রে ওয়াজিব পর্যায়ে আদেশ করা হবে। কেননা জানাবাতের কারণে ত্রুটি গুরুতর এবং হাদাছের কারণে ত্রুটি-লঘু।

যাহোক যদি পূর্বে হাদাছ অবস্থায় তাওয়াফ করার পর পুনরায় তাওয়াফ করে তাহলে তার উপর যবাহ্ করা ওয়াজিব হবে না। যদিও সে কুরবানীর দিনগুলোর পর পুনঃ তাওয়াফ করে থাকে। কেননা পুনরায় সম্পন্ন করার পর ত্রুটির সন্দেহ ছাড়া আর কিছুই বিদ্যমান থাকে না।

আর যদি জানাবাতের অবস্থায় তাওয়াফ করার পর কুরবানীর দিনগুলোতে পুনরায় তাওয়াফ করে ফেলে, তাহলে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা নির্ধারিত সময়ের ভিতরেই সে পুনঃ তাওয়াফ করেছে। যদি কুরবানীর দিনগুলোর পর সে পুনঃ তাওয়াফ করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী বিলম্বের কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

আর যদি কেউ জানাবাতের অবস্থায় তাওয়াফ করার পর বাড়িতে ফিরে যায়, তাহলে তার ফিরে আসা আবশ্যক। কেননা ত্রুটি অনেক বেশী। সুতরাং এর ক্ষতি পুরণের জন্য তাকে ফিরে আসার আদেশ করা হবে। আর নতুন ইহরাম বেঁধে ফিরবে।

আর যদি ফিরে না গিয়ে উট পাঠিয়ে দেয়, তাহলে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। কেননা আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, এটা উক্ত তাওয়াফের জন্য ক্ষতিপূরণকারী। তবে ফিরে এসে তাওয়াফ করাই উত্তম।

যদি হাদাছের অবস্থায় তাওয়াফের পর বাড়ীতে ফিরে এসে আবার গিয়ে পুনঃ তাওয়াফ করে নিলে জাইয হয়ে যাবে। আর যদি (দম হিসাবে) বকরী প্রেরণ করে তাহলে তা উত্তম। কেননা ত্রুটির দিকটি লঘু। আর বকরী প্রেরণে ফকীরদের উপকার রয়েছে।

যদি তাওয়াফে যিয়ারত মোটেই না করে বাড়িতে ফিরে এসে থাকে তাহলে তাকে ঐ ইহরাম নিয়েই (মক্কায়) ফিরে যেতে হবে। কেননা পূর্ব ইহরাম থেকে হালাল হওয়া পাওয়া যায়নি। সুতরাং তাওয়াফ করা পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস থেকে সে মুহরিম অবস্থায়ই থেকে যাবে।

যে ব্যক্তি হাদাছ অবস্থায় (বিদায়ী তাওয়াফ) করল, তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। কেননা এ তাওয়াফ ওয়াজিব হলেও তার স্থান তাওয়াফে যিয়ারাতের নিম্নে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকা জরুরী।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে আরেক মতে রয়েছে যে, এক বর্ণিত বকরী ওয়াজিব হবে। তবে প্রথমোক্ত মতটি অধিক বিশুদ্ধ। যদি বিদায়ী তাওয়াফ জানাবাতের অবস্থায় করে থাকে তাহলে বকরী ওয়াজিব হবে। কেননা এটি গুরুতর ত্রুটি। তার বিদায়ী তাওয়াফ তাওয়াফে যিয়ারাতের চাইতে নিম্নতর। তাই বকরীই যথেষ্ট হবে।

যে ব্যক্তি তাওয়াফে যিয়ারাতের তিন চক্কর বা এর চাইতে কম চক্কর ছেড়ে দেয় তার উপর বকরী ওয়াজিব। কেননা কম পরিমাণ তরক করার ত্রুটি সামান্য। সুতরাং তা হাদাছের কারণে সৃষ্ট ত্রুটির সদৃশ হবে। সুতরাং তার উপর বকরী ওয়াজিব।

যদি বাড়িতে ফিরে আসে তাহলে আবার না গিয়ে বকরী প্রেরণ করা যথেষ্ট হবে। আমরা পূর্বে এর কারণ বর্ণনা করেছি।

আর যে ব্যক্তি তাওয়াফের চার চক্কর তরক করলো, সে থেকে যাবে। যতক্ষণ না পুনরায় তাওয়াফ করবে। কেননা অধিকাংশ পরিমাণই বর্জিত হয়েছে। কাজেই সে যেন তাওয়াফ করেই নি।

যে ব্যক্তি বিদায়ী তাওয়াফ তরক করলো কিংবা তার চার চক্কর তরক করলো, তার উপর একটি বকরী ওয়াজিব হবে। কেননা সে ওয়াজিব তরক করেছে কিংবা ওয়াজিবের অধিকাংশ তরক করেছে। আর যতক্ষণ সে মক্কায় থাকবে, ততক্ষণ সে পুনরায় তাওয়াফ করার জন্য আদিষ্ট। যাতে ওয়াজিব তার সময় মত আদায় করা হয়ে যায়।[১৩]

যে ব্যক্তি বিদায়ী তাওয়াফের তিন চক্কর তরক করলো, তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। যে ব্যক্তি হাতীমের ভিতর দিয়ে ওয়াজিব তাওয়াফ আদায় করলো, সে যদি মক্কায় অবস্থানরত থাকে, তাহলে পুনঃ তাওয়াফ করে নেবে। কেননা আগেই আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, হাতীমের বাহির দিয়ে তাওয়াফ করা ওয়াজিব।

হাতীমের ভিতর দিয়ে তাওয়াফ করার অর্থ হলো কা'বা শরীফের পার্শ্ব দিয়ে তাওয়াফ করার সময় কা'বা শরীফ ও হাতীমের মধ্যবর্তী উভয় করিডোরে দিয়ে প্রবেশ করে। এরূপ করলে সে তার তাওয়াফে ক্রটি সৃষ্টি করলো। সুতরাং সে যতক্ষণ মক্কায় থাকবে ততক্ষণ সম্পূর্ণ তাওয়াফ পুনরায় করে নেবে, যাতে তার তাওয়াফ শরীআত সম্মতভাবে আদায় হয়ে যায়।

যদি শুধু হাতীমের অংশটিতে পুনঃ তাওয়াফ করে তাহলেও যথেষ্ট হবে। কেননা সে বর্জিত অংশটি আদায় করে ফেলেছে। এর সুরত এই যে, হাতীমের বাইরে ডান থেকে আরম্ভ করে হাতীমের শেষ মাথায় যাবে। অতঃপর করিডোর দিয়ে হাতীমের ভিতরে প্রবেশ করে, অন্য দিক দিয়ে বের হয়ে যাবে। এভাবে সাতবার করবে।

যদি পুনঃ তাওয়াফ না করে বাড়িতে ফিরে আসে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা প্রায় চতুর্থাংশ আমল তরক করার কারণে তার তাওয়াফ ক্রটিপূর্ণ রয়ে গেছে। সুতরাং সাদাকা তার জন্য যথেষ্ট হবে না।

যে ব্যক্তি উযূ ছাড়া তাওয়াফে যিয়ারাত করলো এবং আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিকে তাহারাতের অবস্থা, বিদায়ী তাওয়াফ করে, তার উপর একটি দম ওয়াজিব। আর যদি জুনুবী অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারাত করে থাকে, তাহলে তার উপর দু'টি দম ওয়াজিব।

এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে।

উভয় অবস্থার মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, প্রথম সুরতে তার বিদায়ী তাওয়াফ

---

১৩. তাওয়াফে সাদর অবশ্য কুরবানীর দিনগুলো দ্বারা আবদ্ধ নয়; একারণেই বিলম্বে কোন দণ্ড আসে না। সুতরাং তার সময়ে আদায় করার কথা বলা ঠিক নয়।

তাওয়াফে যিয়ারাতে রূপান্তরিত হয়নি। কেননা বিদায়ী তাওয়াফ হলো ওয়াজিব। আর হাদাছের কারণে তাওয়াফে যিয়ারাত পুনরায় করা ওয়াজিব নয়, বরং তা মুস্তাহাব। সুতরাং বিদায়ী তাওয়াফকে তাওয়াফে যিয়ারাতে রূপান্তরিত করা হবে না।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সুরতে বিদায়ী তাওয়াফকে তাওয়াফে যিয়ারাতে রূপান্তরিত করা হবে কেননা এ অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারাত দোহরানো ওয়াজিব। সুতরাং সে বিদায়ী তাওয়াফ তরক করল এবং তাওয়াফে যিয়ারাতকে কুরবানীর দিনগুলো থেকে বিলম্ব করল। এমতাবস্থায় বিদায়ী তাওয়াফ তরক করার কারণে সর্বসম্মতিক্রমে দম ওয়াজিব হবে। আর তাওয়াফে যিয়ারাত বিলম্ব করার কারণে দম ওয়াজিব হওয়ার সম্পর্কে মত পার্থক্যে রয়েছে। তবে যতদিন মক্কায় অবস্থান করবে, ততদিন পুনরায় তার উপর বিদায়ী তাওয়াফ করার হুকুম রয়েছে। কিন্তু বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পর সে হুকুম আর থাকবে না। যেমন আমরা বয়ান করে এসেছি।

যে ব্যক্তি উযূ ছাড়া উমরার তাওয়াফ ও সাঈ করলো এবং ইহরামমুক্ত হয়ে গেলো সে মক্কায় অবস্থান কালে উভয়টি পুনরায় আদায় করে নিবে। আর তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

তাওয়াফ পুনরায় করার কারণ এই যে, হাদাছের কারণে তাতে ত্রুটি এসেছে। আর সাঈ পুনরায় করার কারণ এই যে, তা তাওয়াফের অনুগত। যখন উভয়টি পুনরায় আদায় করবে, তখন ত্রুটি রহিত হওয়ার কারণে তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না।

আর যদি পুনরায় আদায় করার আগে বাড়িতে ফিরে আসে, তাহলে তার উপর এক দম ওয়াজিব হবে, – এতে তাহারাত তরক করার কারণে।

আর তাকে ফিরে আসার আদেশ দেওয়া হবে না। কেননা তার হালাল হওয়া সংঘটিত হয়েছে উমরার রুকন আদায়ের পর। আর যে ত্রুটি হয়েছে, তা সামান্য।

আর সাঈর ক্ষেত্রেও তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা সে একটি গ্রহণযোগ্য তাওয়াফের পর সাঈ করেছে।

তদ্রূপ (কোন দণ্ড আসবে না) যদি তাওয়াফ পুনরায় করে, কিন্তু সাঈ পুনরায় না করে। এটাই বিশুদ্ধ মত।

যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ তরক করে, তার উপর দম ওয়াজিব হবে আর তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা আমাদের মতে সাঈ হলো ওয়াজিব আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এটা তরক করার কারণে দম ওয়াজিব হবে, কিন্তু হজ্জ ফাসিদ হবে না।

যে ব্যক্তি (হজ্জের) ইমামের পূর্বে (সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে) আরাফাত থেকে ফিরে আসে, তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা রুকন হলো আরাফার মূল অবস্থান। সুতরাং অবস্থান দীর্ঘায়িত না করার কারণে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান অব্যাহত রাখা ওয়াজিব। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমরা সূর্যাস্তের পর রওয়ানা হবে। সুতরাং তা তরক করার কারণে দম

ওয়াজিব হবে। আর যদি কেউ রাত্রে উকূফ করে, তার অবস্থা এর বিপরীত। কেননা উকূফ অব্যাহত রাখা ঐ ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব, যে ব্যক্তি দিনে অবস্থান করে, রাত্রে নয়।

যদি সূর্যাস্তের পর আরাফায় ফিরে আসে, তাহলে তার উপর থেকে দম রহিত হবে না। এ হলো জাহিরে রিওয়ায়াত অনুযায়ী। কেননা যা ছুটে গেছে, তার পুনঃ প্রাপ্তি হবে না। আর যদি সূর্যাস্তের পূর্বে ফিরে আসে, তবে এতে মতভিন্নতা রয়েছে।

যে ব্যক্তি মুযদালিফার অবস্থান তরক করবে, তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা এ হল ওয়াজিব আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

যে ব্যক্তি সবক'টি দিনের কংকর নিক্ষেপ তরক করলো, তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা ওয়াজিব তরক করা সংঘটিত হয়েছে। তবে একটি দমই তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা প্রতি দিনের কংকর নিক্ষেপ একই শ্রেণীভুক্ত, যেমন চুল মুণ্ডনের ব্যাপার। (সমস্ত শরীরের চুল মুণ্ডনের কারণে একই দম ওয়াজিব হয়)।

কংকর নিক্ষেপ তরক করা সাব্যস্ত হবে শেষ দিন (তের তারিখের) সূর্যাস্ত দ্বারা। কেননা শুধু ঐ দিনগুলোতেই কংকর নিক্ষেপ ইবাদত হিসাবে গৃহীত। সুতরাং উক্ত দিনগুলো যতক্ষণ অবশিষ্ট রয়েছে, ততক্ষণ রামী পুনরায় করা সম্ভব। সুতরাং সে ধারাবাহিকভাবে কংকর পুনঃ নিক্ষেপ করে নিবে।

তবে বিলম্বের কারণে দম ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে। সাহেবাইন ভিন্নমত পোষণ করেন।

যদি একদিনের রামী তরক করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা এটা একটা হজ্জের আমল।

আর যে ব্যক্তি (এক দিনের) তিনটি জামরার কোন একটি রামী তরক করে, তবে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। কেননা, প্রতি দিনের সবক'টি মিলে হলো হজ্জের একটি পূর্ণ আমল। সুতরাং যা ছেড়ে দিয়েছে, তা হলো এক আমল থেকে কম। তবে যদি অর্ধেকের বেশী ছেড়ে দেয় তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। যেহেতু অধিকাংশ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আর যদি কুরবানীর দিনের (দশ তারিখের) জামরাতুল আকাবার রামী ছেড়ে দেয় তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা রামীর ক্ষেত্রে সে এই দিনের পূর্ণ আমল তরক করেছে। একই হুকুম হবে যদি সে উক্ত রামীর অধিকাংশ ছেড়ে দেয়।

যদি একটি দু'টি বা তিনটি কংকর তরক করে, তাহলে প্রতিটি কংকরের জন্য অর্ধ সা'আ গম সাদাকা করবে। তবে যদি তা একটি দমের পরিমাণে পৌঁছে যায়, তাহলে নিজ বিবেচনায় কিছু কম করে দেবে। কেননা ছেড়ে দেওয়া অংশ হলো কম। সুতরাং তার জন্য সাদাকা যথেষ্ট হবে।

যে ব্যক্তি মাথা মুড়ানো বিলম্বিত করলো, এমন কি কুরবানীর দিনগুলো অতিক্রান্ত হয়ে গেলো তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। একই হুকুম হবে যদি তাওয়াফে যিয়ারাত বিলম্বিত করে।

সাহেবাইন বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। এরূপ মতভিন্নতা রয়েছে রামী বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে এবং একটি আমলকে আরেকটি আমলের উপর অগ্রবর্তী করার ব্যাপারে। যেমন, রামীর পূর্বে হলক করা, হজ্জে কিরানকারীর রামীর পূর্বে কুরবানী করা এবং যবাহ্ করার পূর্বে হলক করার ক্ষেত্রেও।

সাহেবাউনের দলীল এই যে, যা ফউত হয়েছে (সর্বসম্মতিক্রমেই) তা কাযা করার মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছে। আর 'কাযা' এর সাথে অন্য কোন দণ্ড ওয়াজিব হয় না। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো হযরত ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর হাদীছ। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জের কোন একটি আমলের উপর অন্য আমলকে অগ্রবর্তী করবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

তাছাড়া এ কারণে যে, যে আমল স্থানের সাথে নির্দিষ্ট, যেমন ইহরাম, তা উক্ত স্থান থেকে বিলম্বিত করলে দম ওয়াজিব হয়। তেমনি সময়ের সাথে নির্ধারিত যে আমল, তা উক্ত সময় থেকে বিলম্বিত করলে অনুরূপ হুকুম হবে।

যদি কুরবানীর দিনগুলোতে হারামের বাইরে হলক করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর যে ব্যক্তি উমরা করে হারাম থেকে বের হয়ে গেলো, অতঃপর চুল ছাঁটলো, তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামেউস্ সাগীর কিতাবে উমরাকারীর ক্ষেত্রে আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত উল্লেখ করেছেন আর হজ্জকারীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেননি।

কোন কোন মতে (দম ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি) সর্বসম্মত। কেননা হজ্জের ক্ষেত্রে মিনায় হলক করার সুন্নাত ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। আর মীনা হল হারামের অন্তর্ভুক্ত।

তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, এতে মতপার্থক্য রয়েছে। আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলীল এই যে, হলক করার হুকুম হারামের সাথে খাস নয়। কেননা নবী (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম হুদায়বিয়াতে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং হারামের বাইরেই হলক করেন।

সাহেবাইনের দলীল এই যে, হলককে যখন (ইহরাম থেকে) হালালকারী রূপে সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখন তা সালাতের শেষে সালামের ন্যায় হয়ে গেলো। কেননা সালাম (সালাত থেকে) হালালকারী হওয়া সত্ত্বেও সালাতের ওয়াজিবসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ইহরাম যখন হজ্জের আমল রূপে সাব্যস্ত হলো, তখন যবাহ্র মত তা হারামের সাথেই বিশিষ্ট হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলীলের জবাব এই যে হুদায়বিয়ার কিছু অংশ তো হারামে অবস্থিত। সুতরাং হয়ত তাঁরা হারামভুক্ত অংশে হলক করেছেন।

মোট কথা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে 'হলক' হলো 'কাল' (কুরবানীর দিনসমূহ) ও স্থান (হারাম)-এর সাথে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা কোনটির সাথেই সীমাবদ্ধ নয়। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে স্থানের সাথে সীমাবদ্ধ,

কিন্তু কালের সাথে নয়। আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে কালের সাথে সীমাবদ্ধ, স্থানের সাথে নয়। (স্থান বা কালের সাথে) সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এই মতভিন্নতা দম দ্বারা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমেই তা স্থান বা কাল কোনটির সাথেই বিশিষ্ট নয়।[১৪]

উমরার ক্ষেত্রে চুল ছাঁটা বা চাঁছা সর্বসম্মতিক্রমেই কোন সময়ের সাথে আবদ্ধ নয়। কেননা মূল উমরাই তো কোন সময়ের সাথে আবদ্ধ নয়। স্থানের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা উমরার পুরো আমলই নির্ধারিত স্থানের সাথে সীমাবদ্ধ।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি চুল না ছেঁটে চলে যায়, অতঃপর ফিরে আসে এবং ছাঁটে তাহলে সকলের মতেই তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ উমরাকারী যদি হরমের বাইরে চলে যায় অতঃপর ফিরে আসে। কেননা সে তো চাঁছা বা ছাঁটার কাজটি যথাস্থানেই করেছে। সুতরাং তার উপর ক্ষতিপূরণ আরোপিত হবে না।

হজ্জে কিরানকারী যদি যবাহ করার পূর্বে হলক করে, তাহলে তার উপর দু'টি দম ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। একটি দম হলো অসময়ে হলক করার কারণে। কেননা হলকের যথা সময় হলো 'যবাহ'-এর পরে। আরেকটি দম হলো যবাহ্কে হলক থেকে বিলম্বিত করার কারণে।

সাহেবাইনের মতে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। আর তা প্রথমটি[১৫] বিলম্বের কারণে কিছুই ওয়াজিব হবে না। এর কারণ ইতোপূর্বে আমরা বলে এসেছি।

পরিচ্ছেদ ঃ শিকার

জেনে রাখা উচিত যে, স্থলের শিকার মুহরিমের জন্য হারাম। আর পানির শিকার তার জন্য হালাল। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ الى اخر الاية) তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে। স্থলের শিকার বলতে ঐ সমস্ত প্রাণীকে বোঝানো হয়েছে, যে গুলোর জন্ম ও বাস স্থলে হয়। আর সমুদ্রের শিকার দ্বারা ঐ সকল প্রাণী বোঝায়, যার জন্ম ও বাস পানিতে।

আর শিকার অর্থ আত্মরক্ষাকারী এবং জন্মগতভাবে বন্য প্রাণী। তন্মধ্যে পাঁচটি দুষ্ট প্রাণীকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন। সেগুলো হলো দংশনকারী কুকুর, নেকড়ে, চিল, কাক ও সাপ-বিচ্ছু। কেননা এগুলো নিজে থেকেই প্রথমে আক্রমণ করে।

আর কাক দ্বারা ঐ কাক উদ্দেশ্যে, যা মরা খায়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে একথাই বর্ণিত রয়েছে।

---

১৪. অর্থাৎ নির্ধারিত স্থানে বা নির্ধারিত সময়ে হলক না করলে দম ওয়াজিব হবে কিনা, এই বিষয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু সর্বাবস্থায় উক্ত হলক দ্বারা যে হালাল হয়ে যাবে, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

১৫. প্রথমটি দ্বারা উদ্দেশ্যে হল কিরানের দম। কারণ প্রথমতঃ এটিই ওয়াজিব হয় হজ্জে কিরানের কারণে। এখানে ধারণা হতে পারে যে, প্রথমটি দ্বারা অসময়ে হলকের কারণে ওয়াজিব দম উদ্দেশ্য। আসলে তা নয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***মুহরিম যদি কোন শিকার হত্যা করে কিংবা যে হত্যা করবে তাকে বাতলিয়ে দেয়, তবে তার উপর দণ্ড ওয়াজিব হবে।***

হত্যা করার ক্ষেত্রে দণ্ড ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ (الاية) –ইহরাম অবস্থায় তোমরা শিকার হত্যা কর না। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার হত্যা করল, তার উপর দণ্ড ওয়াজিব।

এখানে দণ্ড ওয়াজিব হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলা রয়েছে। শিকার দেখিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। তিনি বলেন, (আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে,) দণ্ডের সম্পর্ক হলো হত্যার সাথে। আর শিকার বাতলে দেওয়া হত্যা করা নয়। সুতরাং এটা হালাল ব্যক্তি হালাল ব্যক্তিকে শিকার দেখিয়ে দেয়ার সদৃশ হলো।

আমাদের দলীল হলো (ইহরাম অধ্যায়ের শুরুতে) বর্ণিত আবূ কাতাদা (রা.)-এর হাদীছ।

আর 'আতা বলেন, এ বিষয়ে লোকদের ইজমা রয়েছে যে, শিকার যে দেখিয়ে দেবে, তার উপর দণ্ড ওয়াজিব হবে।

তাছাড়া এই জন্য যে, শিকার দেখিয়ে দেওয়া ইহরামের নিষিদ্ধ কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এতে শিকারের নিরাপত্তা নষ্ট করা হয়। কেননা সে তার বন্যতা ও আত্মগোপনতা দ্বারা নিরাপদ ছিলো। সুতরাং দেখিয়ে দেওয়া হত্যা করার মতই হলো।

আরেকটি কারণ এই যে, মুহরিম তার ইহরামের মাধ্যমে শিকারের সাথে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকা নিজের উপর অনিবার্য করে নিয়েছে। সুতরাং অনিবার্যকৃত দায়িত্ব বর্জন করার কারণে ক্ষতিপূরণ দিবে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার নিকট কিছু আমানত রাখা হয়ে থাকে।

হালাল ব্যক্তির বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তার পক্ষ থেকে তো কোন দায়িত্ব বদ্ধতা নেই। তদুপরি ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম যুফার (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হালাল ব্যক্তির উপরও দণ্ড ওয়াজিব হবে।

বাতলিয়ে দেয়ার কারণে দণ্ড ওয়াজিব হওয়ার শর্ত এই যে, যাকে দেখিয়ে দেওয়া হলো, সে শিকারের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল না আর দেখিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তাকে সে বিশ্বাস করেছে। সুতরাং যদি সে তাকে অবিশ্বাস করে এবং অন্যকে বিশ্বাস করে তবে যাকে অবিশ্বাস করা হলো, তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

আর যে দেখিয়ে দিচ্ছে, ঐ হালাল ব্যক্তি যদি হারামেরও হয় তবুও তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। আমরা এর কারণ উপরে বলেছি।

দণ্ড ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে দেখিয়ে দেওয়া আর ভুলে দেখিয়ে দেওয়া সমান। কেননা এটা এমন ক্ষতিপূরণ, যার ভিত্তি হলো প্রাণনাশ করা। সুতরাং এটা মাল

নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ সদৃশ হলো।[১৬]

আর প্রথমবার অন্যায়কারী এবং দ্বিতীয়বার অন্যায়কারীর হুকুম অভিন্ন। কেননা ওয়াজিব হওয়ার কারণ অভিন্ন।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে দণ্ড এই যে, যে স্থানে শিকার হত্যা করা হয়েছে, সে স্থানে কিংবা (জঙ্গল এলাকা হলে) তার নিকটতম স্থানে শিকারকৃত প্রাণীর মূল্য নির্ধারণ করা হবে। দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মূল্য নির্ধারণ করবেন। অতঃপর জাযা আদায় করার ব্যাপারে শিকারীর ইচ্ছার উপর ন্যস্ত। যদি উক্ত প্রাণীর মূল্য একটি হাদী ক্রয় করার সমপরিমাণ হয়ে যায় তাহলে ইচ্ছা করলে উক্ত মূল্য দ্বারা একটি হাদী ক্রয় করে যবাহ্ করবে। কিংবা ইচ্ছা করলে উক্ত মূল্য দ্বারা খাদ্য সামগ্রী খরিদ করে প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা'আ গম কিংবা এক সা'আ খেজুর বা যব সাদাকা করবে। কিংবা চাইলে সিয়াম পালন করবে। যেমন সামনে আমরা বর্ণনা করবো।

ইমাম মুহাম্মদ ও শাফিঈ (র.) বলেন, যে সকল 'শিকার' কৃত জন্তুর সমতুল্য 'গঠনের' জন্তু রয়েছে, সেক্ষেত্রে সমতুল্য জন্তু জাযা রূপে ওয়াজিব হবে। সুতরাং হরিণের ক্ষেত্রে বকরী, হায়েনার ক্ষেত্রে বকরী, খরগোশের ক্ষেত্রে এক বছর বয়স্ক মেষশাবক, বন্য ইঁদুর এর ক্ষেত্রে চারমাস বয়স্ক মেষ শাবক ওয়াজিব হবে। আর উটপাখীর ক্ষেত্রে এক উট, এবং বন্য গাধার ক্ষেত্রে এক গাভী ওয়াজিব হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ –যে প্রাণী হত্যা করা হয়েছে, তার সমতুল্য প্রাণী জাযারূপে ওয়াজিব হবে।

আর শিকারের সমতুল্য প্রাণী সেটাই হবে, যেটা দৃশ্যতঃ হত্যাকৃত প্রাণীর সদৃশ। কেননা মূল্যকে তো نعم বলা যায় না। আর সাহাবায়ে কিরাম আকৃতিগত দিক থেকে সমতুল্য সাব্যস্ত করেছেন।

আর উটপাখী, হরিণ, বন্যগাধা ও খরগোশের সদৃশ প্রাণী সেগুলোই, যা আমরা বর্ণনা করেছি। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, হায়েনা একটি শিকার এবং তার ক্ষেত্রে বকরী ওয়াজিব হবে।

আর যে সকল প্রাণীর আকৃতিগত সদৃশ প্রাণী নেই, সেগুলোর ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মূল্য ওয়াজিব হবে। যেমন চড়ুইপাখী, কবুতর ইত্যাদি। আর যখন মূল্য ওয়াজিব হবে, তখন ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ (র.)-এর মত অনুযায়ী হবে।

---

১৬. অর্থাৎ যদি কারো মাল নষ্ট করা হয় তাহলে এটা দেখা হয় না যে, ইচ্ছাকৃত ভাবে নষ্ট করেছে, না ভুলক্রমে। বরং নষ্ট করার উপরই ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এখানেই নষ্ট করার উপরই ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) কবুতরের ক্ষেত্রে বকরী ওয়াজিব বলে মত প্রকাশ করেন এবং উভয়ের মাঝে সাদৃশ্য প্রমাণ করেন এদিক থেকে যে, উভয়ের প্রতিটি লম্বা চুমুকে পানি পান করে এবং প্রায় অভিন্ন রকম শব্দ করে।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলীল এই যে, নিঃশর্ত সমতুল্যতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আকৃতিগতভাবে এবং গুণগতভাবে সমতুল্য হওয়া।

আর আলোচ্য ক্ষেত্রে যেহেতু আকৃতিগত সমতুল্য পাওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু গুণগত সমতুল্যই গ্রহণ করা হবে। কেননা শরীআতে এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, যেমন হক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে।[১৭]

কিংবা এ কারণে যে, সর্বসম্মতভাবে গুণগত সমতুল্যতার অর্থ উদ্দেশ্য। কিংবা এ কারণে যে, গুণগত সমতুল্যতার মধ্যে ব্যাপকতা রয়েছে। আর বিপরীত ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা রয়েছে

আর– আল্লাহ্ অধিক অবগত– 'নাস'-এর উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই যে, জাযা হলো যে বন্যপ্রাণী হত্যা করা হয়েছে, তার মূল্য।[১৮]

আর نعم শব্দটি বন্য ও গৃহপালিত উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এরূপ বলেছেন, আবূ উবায়দ ও আছমায়ী। আর যে হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য মূল্য নিরূপণ করা, নির্দিষ্ট প্রাণী সাব্যস্ত করা নয়।[১৯]

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে হাদী কিংবা খাদ্য সামগ্রী কিংবা সিয়ামকে ভাষা হিসাবে সাব্যস্ত করার ইখতিয়ার হলো হত্যাকারীর।

ইমাম মুহাম্মদ ও শাফিঈ (র.) বলেন, এ বিষয়ে ইখতিয়ার হলো ন্যায়পরায়ণ বিচারকদ্বয়ের। যদি তারা হাদী-এর ফায়সালা করেন, তাহলে আকৃতিগত সমতুল্য প্রাণী ওয়াজিব হবে, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। আর যদি তাঁরা খাদ্য সামগ্রী বা সিয়ামের ফায়সালা করেন, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.) যেমন বলেছেন (অর্থাৎ শিকারের মূল্য নির্ধারণ করে তা দ্বারা খাদ্য সামগ্রী খরিদ করে সাদাকা করা হবে)।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলীল এই যে, ইখতিয়ার প্রদানের বিষয়টি শরীআতে অনুমোদিত হয়েছে দায়গ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি আহসানীর জন্য। সুতরাং শিকারের হাতেই ইখতিয়ার থাকা উচিত, যেমন কাসমের কাফ্ফারার ইখতিয়ারের ব্যাপারে।

ইমাম মুহাম্মদ ও শাফিঈ (র.)-এর দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ اَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ اَوعَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ۔

১৭. যেমন কেউ কারো কাপড় নষ্ট করে ফেললো, তখন নষ্টকারীর উপর কাপড়ের মূল্য ওয়াজিব হয়ে থাকে।

১৮. আবূ ইউসুফ (র.) যে বলেছেন যে, মূল্য তো نعم (বা প্রাণী) হতে পারেনা। অথচ আয়াতে জাযা হিসাবে نعم এর কথা বলা হয়েছে– এ বক্তব্যের উত্তরে আলোচনা অংশটুকু বলা হয়েছে।

১৯. হায়েনা একটি শিকার এবং তাকে বকরী ওয়াজিব– মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে; তার ব্যাখ্যা দান করা এখানে উদ্দেশ্য।

(তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তা ফায়সালা করবে অর্থাৎ হাদী যা কা'বা পর্যন্ত উপনীত হবে কিংবা মিসকীনদের খাদ্য রূপে কাফ্ফারা কিংবা সেই পরিমাণ রোযা, যাতে সে তার কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করে।)

هديا শব্দটিকে منصوبا রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা তা আয়াতের يحكم به -এর ব্যাখ্যা রূপে এবং বিচারকের حكم বা বিচার ক্রিয়ার مفعول (ক্রিয়ামূলগত কর্মকারক) রূপে এসেছে। অতঃপর او অব্যয় দ্বারা খাদ্য সাদাকা এবং সিয়াম পালনের বিষয় দু'টিকে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ইখতিয়ারের বিষয়টি বিচারকদ্বয়ের হাতেই থাকবে।

আমরা বলি, كفارة শব্দটিকে عطف করা হয়েছে جزاء -এর উপর, هدى -এর উপর নয়। প্রমাণ এই যে, كفارة শব্দটি مرفوع হয়েছে। তদ্রূপ عدل ذلك صياما -এর عدل শব্দটি مرفوع হয়েছে। সুতরাং এ দুটিতে বিচারকদ্বয়ের ইখতিয়ারের কোন প্রমাণ নেই। বরং বিচারকদ্বয়ের শরণাপন্ন হতে হবে শুধু কতলকৃত পশুর মূল্য নির্ধারণের জন্য। অতঃপর ইখতিয়ার থাকবে ঐ ব্যক্তির হাতে, যার উপর জাযা ওয়াজিব হয়েছে।

ঐ স্থানেই বিচারকদ্বয় মূল্য নির্ধারণ করবেন, যেখানে মুহরিম শিকার হত্যা করেছে। কেননা স্থানের বিভিন্নতার কারণে মূল্যের পার্থক্য হয়ে থাকে।

যদি স্থানটি মরু প্রান্তর হয় যেখানে শিকার বেচাকেনা হয় না, তাহলে তার নিকটতম এমন স্থান বিবেচনায় আনা হবে, যেখানে পশু বেচাকেনা হয়।

মাশায়েখগণ বলেছেন, মূল্য নির্ধরণের ক্ষেত্রে একজন যথেষ্ট তবে দু'জন হওয়া উত্তম। কেননা তা অধিক সতর্কতাপূর্ণ এবং ভুল হওয়া থেকে অধিক নিরাপদ। যেমন হক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে।

আর কেউ কেউ বলেছেন, উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে এখানে দু'জনের হওয়া আবশ্যক রূপে বিবেচনা করা হবে।

'হাদী' মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও যবাহ করা যাবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ هديا بالغ الكعبة –হাদী যা কা'বায় উপনীত হবে।

তবে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান মক্কা ছাড়া অন্যত্র জাইয হবে। ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি এটাকেও হাদী-এর উপর কিয়াস করেন। উভয়ের মাঝে এ ব্যাপারে সমন্বয় হলো হারামের অধিবাসীদের জন্য সচ্ছলতা বিধান।

আমরা বলি, হাদী যবাহ্ করা এমন একটি বিশেষ ইবাদত, যা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। সুতরাং তা স্থান ও কালের সাথে বিশিষ্ট হবে। আর ছাদাকা হলো সর্ব সময়ে ও সর্বস্তানে বুদ্ধিগ্রাহ্য একটি ইবাদত।

আর সাওম মক্কায় পালন করা জাইয হবে। কেননা তা সর্বস্থানেই ইবাদত রূপে অনুমোদিত।

যদি কূফায় (অর্থাৎ মক্কা ছাড়া অন্যত্র) যবাহ করে তাহলে তা খাদ্য সামগ্রী প্রদানের বিকল্প হিসাবে জাইয হবে। অর্থাৎ যদি এ পরিমাণ গোশ্ত (প্রতি মিসিকীনকে) সাদাকা করে আর তা ওয়াজিব খাদ্য সামগ্রীর মূল্যের সম সমপরিমাণ হয়।[২০] কেননা 'যবাহ' করা খাদ্যসামগ্রী সাদাকা করার স্থলবর্তী হয় না।

২০. অর্থাৎ এই সূরতে সাদাকা দ্বারা দায়িত্বমুক্ত হতে পারে যদি প্রত্যেক মিসকীন এই পরিমাণ গোশত পায়, যা অর্ধ সা'আ গমের মূল্যের সমপরিমাণ হয়।

যদি শিকারী হাদী যবাহ্ করা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে কুরবানী রূপে যা যথেষ্ট তা হাদী রূপে যবাহ্ করবে। কেননা নিঃশর্তভাবে হাদী শব্দটি কুরবানীর পশুকেই বোঝায়।

ইমাম মুহাম্মদ ও শাফিঈ (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে ছোট পশুও জাইয হবে। কেননা, সাহাবায়ে কিরাম (খরগোশের ক্ষেত্রে) এক বছরী মেষশাবক এবং (বন্য ইঁদুরের ক্ষেত্রে) চার মাস বয়সের মেষশাবক ওয়াজিব করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে খাদ্য সামগ্রী প্রদান হিসাবে ছোট পশু জাইয হবে, যদি তা সাদাকা করে। (যবাহ্ হিসাবে নয়)।

যদি খাদ্যসামগ্রী সাদাকা করাকে গ্রহণ করে নেয় তাহলে আমাদের মতে খাদ্য সামগ্রীর মাধ্যমে হত্যাকৃত পশুটির মূল্য নির্ধারণ করা হবে। কেননা, হত্যাকৃত পশুরই ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব, সুতরাং তার মূল্যই বিবেচনা করা হবে।

যখন মূল্য ছাড়া খাদ্য সামগ্রী খরিদ করবে, তখন প্রত্যেক মিসকীনকে 'অর্ধ সা'আ গম কিংবা এক সা'আ খেজুর বা যব সাদাকা করবে। কোন মিসকীনকে অর্ধ সা'আ-এর কম খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা জাইয হবে না। কেননা কুরআন শরীফে উল্লেখিত طعام দ্বারা শরীআতের নির্ধারিত পরিমাণই উদ্দেশ্য হবে।[২১]

আর যদি সিয়াম পালনই গ্রহণ করে তাহলে হত্যাকৃত পশুর মূল্য নির্ধারণ করবে খাদ্যসামগ্রীর মাধ্যমে। অতঃপর প্রত্যেক অর্ধ সা'আ গম কিংবা এক সা'আ খেজুর বা যবের পরিবর্তে একদিন রোযা রাখবে। কেননা, সিয়াম দ্বারা হত্যাকৃত পশুর মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ, সাওমের কোন অর্থমূল্য নেই। তাই আমরা খাদ্য সামগ্রীর দ্বারাই তার মূল্য নির্ধারণ করলাম।

আর এইভাবে (অর্ধ সা'আ দ্বারা রোযার) মূল্য নির্ধারণ করা শরীআতে প্রচলিত, যেমন, সিয়ামের ফিদইয়ার ক্ষেত্রে।[২২]

যদি অর্ধ সা'আ -এর কম খাদ্য সামগ্রী বেঁচে যায়, তা হলে সে ইচ্ছাধীন। চাইলে সে অবশিষ্ট খাদ্য (গম) সাদাকা করে দেবে কিংবা চাইলে তার পরিবর্তে একদিনের সাওম পালন করবে। কেননা এক দিনের কম সময়ের সাওম তো শরীআতসম্মত নয়।

একই হুকুম হবে[২৩] যদি খাদ্য সামগ্রী একজন মিসকীনের খাদ্য পরিমাণ থেকে কম হয় তাহলে ওয়াজিব পরিমাণই দান করবে, অথবা পূর্ণ একদিন রোযা রাখবে।

উপরে আমরা এর কারণ বলেছি। যদি কোন শিকারকে আহত করে কিংবা তার পশম উপড়ে ফেলে কিংবা তার কোন অংগ কর্তন করে, তাহলে একারণে তার যে পরিমাণ ক্ষতি

---

২১. আর তা হলো অর্ধ সা'আ গম, যেমন সাদাকাতুল ফিত্‌র ও কসমের কাফ্‌ফারায় উক্ত পরিমাণ শরীআতের পক্ষ হতে নির্ধারণ করা হয়েছে।

২২. অক্ষম বৃদ্ধ প্রতি সাওমের জন্য অর্ধ সা'আ গম ফিদইয়া দিয়ে থাকে।

২৩. যেমন একটি চড়ুই হত্যা করলো আর তার মূল্য হল এক সা'আ-এর চার ভাগের এক ভাগ হলো।

হয়েছে, সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অংশবিশেষকে সমগ্রের উপর কিয়াস করে এ হুকুম আরোপ করা হয়েছে। যেমন, হক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে হয়।

যদি কোন পাখীর পালক উপড়ে ফেলে কিংবা কোন শিকারের হাত-পা কেটে ফেলে, যার ফলে সে আত্মরক্ষার অবস্থা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়,[২৪] *তাহলে তার পূর্ণ মূল্য তার উপর ওয়াজিব হবে।* কেননা সে আত্মরক্ষার উপায় নষ্ট করে দেওয়ার মাধ্যমে সে শিকারের নিরাপত্তা বিনষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং সে তার পূর্ণ মূল্য ক্ষতিপূরণ দিবে।

যে ব্যক্তি উটপাখীর ডিম ভেংগে ফেললো তাকে তার মূল্য দান করতে হবে। 'আলী ও ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া এই কারণে যে, এ হলো শিকার উটপাখীর মূল এবং তাতে শিকারে (তথা উটপাখীতে) রূপান্তরিত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। সুতরাং যদি তা নষ্ট না হয়ে থাকে তাহলে সতর্কতা হিসাবে সেটিকে শিকারের স্থলবর্তী ধরা হবে।

যদি ডিম থেকে মৃতছানা বের হয় তাহেল তাকে উক্ত ছানার মূল্য দান করতে হবে। এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী সাধারণ কিয়াসের দাবী হলো শুধু ডিমের ক্ষতিপূরণ দেওয়া। কেননা ছানাটির প্রাণ অজ্ঞাত।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, (কুদরতের পক্ষ হতে) ডিমকে প্রস্তুতই করা হয়েছে তা থেকে জীবিত ছানা বের হয়ে আসার জন্য। আর সময়ের পূর্বে ভেংগে ফেলাই হচ্ছে (দৃশ্যতঃ) তার মৃত্যুর কারণ। সুতরাং সর্তকতা হিসাবে মৃত্যুকে ডিম ভাংগার সাথেই সম্পৃক্ত করা হবে।

(বাহ্যিক কারণের সাথে সম্পৃক্ত করার) এই নীতির ভিত্তিতেই (বলা হয় যে,) যদি কেউ হরিণের পেটে আঘাত করে, ফলে হরিণ মৃত বাচ্চা প্রসব করে এবং নিজেও মারা যায়, তাহলে তার উপর উভয়ের মূল্য ওয়াজিব হবে।

কাক, চিল (শকুন) নেকড়ে, সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর ও দংশনকারী কুকুর হত্যা করার কারণে কোন জাযা আসবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, পাঁচটি প্রাণী হলো দুষ্ট প্রকৃতির। এগুলোকে হিল (হরমের বাইরে) হরম সর্বত্র হত্যা করা হবে। এগুলো হলো চিল, সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর ও দংশণকারী কুকুর।

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, মুহরিম (তার ইহরামের অবস্থায়) ইঁদুর, কাক, চিল, বিচ্ছু, সাপ ও দংশনকারী কুকুর হত্যা করতে পারবে।

কোন কোন বর্ণনায় নেকড়ের কথাও উল্লেখিত হয়েছে। কারো কারো মতে দংশনকারী কুকুর দ্বারা নেকড়ে উদ্দেশ্য। কিংবা বলা যেতে পারে যে, নেকড়ে দংশনকারী কুকুরের সমপর্যায়ভুক্ত।

হাদীছে উল্লেখিত কাক দ্বারা ঐ কাক উদ্দেশ্য, যে মুর্দার খায় আবার শস্য দানাও খায়। কেননা এই কাক প্রারম্ভেই কষ্ট দেয়। পক্ষান্তরে عقعق নামক (ছাতার জাতীয়) পাখি এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এটাকে কাক বলা হয় না। এবং তা প্রারম্ভে কষ্ট দেয় না।

---

২৪. আত্মরক্ষা উড়ে যাওয়ার মাধ্যমে হতে পারে, আবার পলায়নের মাধ্যমে হতে পারে। কিংবা গর্তে প্রবেশের মাধ্যমে হতে পারে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দংশনকারী কুকুর এবং সাধারণ কুকুর, তদ্রূপ গৃহপালিত কুকুর এবং বন্য কুকুর সবই অভিন্ন। কেননা কুকুর শ্রেণীটাই মূলতঃ উদ্দেশ্য। তদ্রূপ গৃহেবাসকারী ইঁদুর ও বন্য ইঁদুর অভিন্ন। গুই সাপ ও কাঠবিড়ালী ব্যতীত পাঁচটি প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এগুলো নিজে প্রারম্ভে কষ্ট দেয় না।

মশা, পিঁপড়া, বোলতা ও আঁঠালি হত্যা করলে দণ্ড আসবে না। কেননা, এগুলো 'শিকার' এর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এগুলো শরীর থেকে সৃষ্ট নয়। তাছাড়া এগুলো স্বভাবগত ভাবেই কষ্টদানকারী।

পিঁপড়া দ্বারা কালো ও লাল পিঁপড়া উদ্দেশ্য, যে গুলো কামড়ায়। যে সমস্ত পিঁপড়া কামড়ায় না, সেগুলোকে হত্যা করা জাইয হবে না। তবে প্রথমোক্ত কারণে (অর্থাৎ শিকারভুক্ত না হওয়ার কারণে) কোন 'জাযা' ওয়াজিব হবে না।

যে ব্যক্তি উকুন হত্যা করবে সে একমুঠ গমের মতো যৎসামান্য যা ইচ্ছা সাদকা করে দেবে। কেননা তা শরীরের ময়লা থেকে সৃষ্ট।

জামেউস-সাগীরের মতে 'কিছু খাদ্য দান করবে'। এটা প্রমাণ করে যে, একটুকরা রুটির মতো কোন্ মিসকীনকে সামান্য কিছু খাদ্য দান করাই যথেষ্ট হবে, যদিও তা উদর পূর্তির পরিমাণ না হয়।

যে ব্যক্তি টিড্‌ডি হত্যা করে সে ইচ্ছা মাফিক কিছু পরিমাণ সাদাকা দিবে। কেননা টিড্‌ডি হলো স্থলচর শিকার। কেননা শিকার বলা হয় ঐ প্রাণীকে, যাকে কৌশল ছাড়া ধরা যায় না। আর শিকারী ইচ্ছাকৃত ভাবে তাকে ধরতে চায়।

একটি খেজুরও একটি টিড্‌ডি থেকে উত্তম। কেননা উমর (রা.) বলেছেন, একটি খেজুর একটি টিড্‌ডি থেকে উত্তম।

কচ্ছপ ধরে হত্যা করলে কোন দণ্ড আসবে না। কেননা তা কীটপতংগভুক্ত। সুতরাং গাঁদি পোকা ও কাকলাস সমতুল্য। আর এগুলোকে বিনা কৌশলে ধরা যায়, এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলো কেউ ধরে না। সুতরাং এগুলো শিকার নয়।

যে ব্যক্তি হরমের শিকার ধরে দোহন করলো, তার উপর দুধের মূল্য ওয়াজিব হবে। কেননা দুধ শিকারের অংশ। সুতরাং তা পূর্ণ শিকারের সমতুল্য।

যে ব্যক্তি এমন শিকার হত্যা করলো, যার গোশত খাওয়া হয় না, যেমন (সিংহ, বাঘ ও নেকড়ে জাতীয়) হিংস্রপ্রাণী এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রাণী (যেমন বাজ, শকুন ইত্যাদি হিংস্রপাখী) তাহলে তার উপর 'জাযা' ওয়াজিব হবে, ঐগুলো ব্যতীত, যেগুলোকে শরীআত ব্যতিক্রমী সাব্যস্ত করেছে। আর এগুলো (ইতোপূর্বে) আমরা গণনা (বর্ণনা) করেছি।

আর ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, জাযা ওয়াজিব হবে না। কেননা এগুলো স্বভাবগত ভাবে কষ্টদায়ক। সুতরাং এগুলো ব্যতিতক্রমধর্মী দুষ্টপ্রাণী সমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে। তদ্রূপ আভিধানিক দিক থেকে كلب শব্দটি যাবতীয় হিংস্রপ্রাণীকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আমাদের দলীল এই যে, হিংস্রপ্রাণী তার বন্য স্বভাবের কারণে শিকার রূপে গণ্য। তাছাড়া এগুলোকে চামড়া সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কিংবা এগুলো দ্বারা অন্য শিকার ধরার উদ্দেশ্যে কিংবা এগুলোর জ্বালাতন রোধ করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ধরা হয়।

(হাদীছে উল্লেখিত) দুষ্ট প্রাণীসমূহের উপর কিয়াস করা সম্ভব নয়। কেননা তাতে হাদীছে বর্ণিত সংখ্যা অকার্যকর করা হয়। আর প্রচলিত ব্যবহারে كلب শব্দটি হিংস্রপ্রাণী সমূহের উপর প্রযুক্ত হয় না। আর প্রচলিত ব্যবহারই অধিক কার্যকর। আর তার মূল্য একটি বকরীর মূল্যকে অতিক্রম করবে না।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, ভক্ষণযোগ্য প্রাণীর উপর কিয়াস করে এখানেও মূল্য যে পরিমাণই পৌছাক, তাই ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ الضَّبُعُ صَيْدٌ وَفِيهِ الشَّاةُ –হায়েনাও শিকারভুক্ত এবং এতে এক বকরী ওয়াজিব।

তাছাড়া এ কারণে যে, এগুলোর মূল্য বিবেচনা করা হয় মূলতঃ চামড়া থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাব্যতার কারণে; এ কারণে নয় যে, তা হামলা করে এবং কষ্ট দেয়। এদিক থেকে বাহ্যতঃ তার মূল্য বকরীর মূল্যের অধিক হবে না।[২৫]

কোন হিংস্রপ্রাণী যদি মুহরিমের উপর হামলা করে আর সে তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব নয়।

ইমাম যুফার (র.) হামলাকারী উটের উপর কিয়াস করে বলেন, ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলীল হলো, উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছ যে, তিনি একটি হিংস্রপ্রাণী হত্যা করে একটি মেষ হাদী রূপে যবাহ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমরা আগে বেড়ে তাকে হত্যা করেছি।

আর এ কারণে যে, মুহরিমকে শিকারের পিছনে লাগতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু তার অত্যাচার রোধ করতে নিষেধ করা হয়নি। একারণেই তো যেগুলোর পক্ষ থেকে অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলোকে রোধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যেমন দুষ্ট প্রকৃতির প্রাণী সমূহের বেলায়। সুতরাং যে প্রাণীর অত্যাচার বাস্তব রূপ লাভ করেছে, তাকে রোধ করার বেলায় অনুমতি হওয়া আরো যুক্তিযুক্ত। আর শরীআতের পক্ষ হতে অনুমতি থাকা অবস্থায় শরীআতের অধিকার হিসাবে শাখা ওয়াজিব হবে না।

হামলাকারী উটের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা অধিকার যার, অর্থাৎ (উটের) মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতি নেই।

---

২৫. সিংহ ও বাঘের চামড়ার চড়ামূল্যের কারণ হলো আমীর বাদশাহদের বিলাসিতা। শিকারের নিজস্বগুণের কারণে নয়। সুতরাং মুহরিমের ইহরামের ক্ষেত্রে সেটা বিবেচ্য হবে না।

আর মুহরিম যদি (ক্ষুধার্ত অবস্থায়) বাধ্য হয়ে কোন শিকার হত্যা করে, তাহলে তার উপর জাযা ওয়াজিব হবে। কেননা এক্ষেত্রে স্পষ্ট বাণী দ্বারা অনুমতির বিষয়টি কাফ্‌ফারার সাথে আবদ্ধ, যেমন ইতোপূর্বে আমরা আয়াত তিলাওয়াত করে এসেছি।[২৬]

মুহরিমের গৃহপালিত বকরী, গরু, উট, মুরগী ও হাঁস জাইয করায় কোন দোষ নেই। কেননা বন্যতার বৈশিষ্ট্য না থাকাতে এই প্রাণীগুলো শিকার ভুক্ত নয়। আর হাঁস দ্বারা ঐ হাঁস উদ্দেশ্য, যা বাড়ীতে কিংবা জলাশয়ে থাকে। কেননা জন্মগতভাবেই তা প্রতিপালিত।

যদি কেউ রোম কবুতর হত্যা করে তাহলে তার উপর জাযা ওয়াজিব হবে।

ইমাম মালিক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর দলীল এই যে, তা পালিত, মানুষের সংগ লাভে আশক্ত এবং আপন ডানা দ্বারা আত্মরক্ষা সমর্থ নয়। কেননা সে ধীরগতিসম্পন্ন

আমরা বলি, কবুতর সৃষ্টিগত ভাবেই বন্য স্বভাবের এবং উড্ডয়ন দ্বারা আত্মরক্ষায় সমর্থ, যদিও তা ধীরগতি সম্পন্ন। আর মানুষের সংগ লাভে অভ্যস্ত হওয়াটা অস্থায়ী। সুতরাং তা বিবেচ্য নয়।

অদ্রূপ গৃহপালিত হরিণ হত্যা করলে (দণ্ড ওয়াজিব হবে।) কেননা মূলতঃ তা শিকার। সুতরাং সংগ লাভের সাময়িক অভ্যস্থতা তার শিকার-গুণ রহিত করবে না। যেমন উট যদি পালিয়ে গিয়ে বন্য হয়ে পড়ে, তাতে মুহারিমের জন্য হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে শিকারভুক্ত হবে না।

মুহরিম যদি কোন শিকার যবাহ্ করে, তাহলে তার যবাহকৃত পশু মুর্দার হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তা খাওয়া হালাল হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, মুহরিম যদি অন্য কারো জন্য যবাহ্ করে তাহলে তা হালাল হবে। কেননা সে তো হলো অপর ব্যক্তিটির পক্ষ থেকে কার্যসম্পাদনকারী। সুতরাং তার কর্ম উক্ত ব্যক্তিটির সংগেই সম্পৃক্ত হবে।

আমাদের দলীল এই যে, যবাহ্ হলো শরীআতসম্মত একটি কর্ম। আর এটি (মুহরিমের জন্য) হারাম কর্ম। সুতরাং যবেহ্ রূপে বিবেচিত হবে না, যেন মাজূসীর যবাহকৃত জন্তু।

এটি[২৭] এজন্য যে, বিধান রূপে শরীআতসম্মত যবাহ্‌কেই গোশ্‌ত ও রক্তের মাঝে পার্থক্যকারী স্থলবর্তী গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং শরীআতসম্মত যবেহ্ না হলে পার্থক্যকারীও থাকবে না।[২৮]

---

২৬. আয়াতটি হলো ففدية من طعام اوصدقة او نسك

২৭. অর্থাৎ মুহরিমের যবেহ হারাম হওয়া।

২৮. অর্থাৎ যতক্ষণ সম্পূর্ণ হারাম রক্ত বের না হবে, ততক্ষণ যবাহ দ্বারা পশু হালাল হবে না। কেননা মুরদার হারাম হওয়ার কারণ হলো গোশতের সংগে প্রবাহিত রক্ত মিশে থাকা। কিন্তু শরীআত যবেহকেই সমগ্র রক্ত বের হয়ে যাওয়ার স্থলবর্তী করেছেন।

যবাহ্কারী মুহরিম যদি উক্ত পশুর কোন কিছু ভক্ষণ করে, তাহলে ভক্ষিত অংশের মূল্য তার উপর ওয়াজিব হবে।

এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, যা খেয়েছে, তার জাযা দিতে হবে না। অন্য কোন মুহরিম যদি তা থেকে খায়, তাহলে সকলের মতেই তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না।

সাহেবাইনের দলীল এই যে, এটা তো মুর্দার। সুতরাং তা খাওয়ার কারণে তওবা করা ছাড়া অন্য কিছু তার উপর আবশ্যক হবে না। অন্য কোন মুহরিম খেলে যে হুকুম হয় এটির সে হুকুম হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, আমরা একথা উল্লেখ করে এসেছি যে, মুহরিমের যবাহ্কৃত পশু হারাম হওয়ার কারণ হলো তা মুর্দার হওয়া। এবং এ কারণে যবাহ্ করাটা তার ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তার ইহরামই শিকারকে যবাহ্ -এর পাত্র হওয়া থেকে এবং যবাহ্কারীকে যবাহ্র যোগ্যতা থেকে বের করে দিয়েছে। সুতরাং ভক্ষণ হারাম হওয়ার বিষয়টি এ সকল মাধ্যম বিদ্যমান থাকার কারণে তার ইহরামের সংগে যুক্ত হবে। অন্য মুহরিমের বেলায় এর হুকুম বিপরীত। মুহরিমের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তার ভক্ষণ করাটা তার ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কোন হালাল ব্যক্তি যে শিকার ধরেছে এবং যবাহ্ করেছে তা খাওয়া মুহরিমের জন্য নিষিদ্ধ নয়, যদি মুহরিম শিকারটি দেখিয়ে দিয়ে না থাকে এবং শিকার করার আদেশ দিয়ে না থাকে।

যদি মুহরিমের উদ্দেশ্যে শিকার করা হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ইমাম মালিক (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। তাঁর দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ صَيْدٍ مَالَمْ يَصِدْهُ وَيُصَادُ لَهُ -মুহরিম কোন শিকারের গোশত খেলে আপত্তি নেই, যদি সে নিজে শিকার না করে থাকে, কিংবা তার জন্য শিকার করা না হয়ে থাকে।

আমাদের দলীল এই যে, সাহাবায়ে কিরাম মুহরিমের ব্যাপারে শিকারে গোশতের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তাতে কোন অসুবিধা নেই।

আর ইমাম মালিক (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাতে ব্যবহৃত لم অব্যয়টি মালিকানা জ্ঞাপক। সুতরাং (তার জন্য শিকার করার) অর্থ হবে জীবন্ত শিকারটি তাকে দান করা (যবাহ্ করে) গোশত দান করা নয়। কিংবা অর্থ এই যে, তার আদেশে শিকার করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) শিকার না দেখিয়ে দেয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। এতে সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে (আমাদের মাযহাবে) শিকার দেখিয়ে দেয়া হারাম। কিন্তু মাশায়েখগণ বলেন যে, এ বিষয়ে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। হারাম হওয়ার দলীল হলো আবূ কাতাদা (রা.)-এর হাদীছ। আর তা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

কোন হালাল ব্যক্তি যদি হরম শরীফ এলাকায় শিকার যবাহ্ করে, তা হলে তার মূল্য ওয়াজিব হবে, যা সে দরিদ্রদের মাঝে সাদাকা করে দেবে। কেননা শিকার হরম

এলাকার হওয়ার কারণে নিরাপত্তার অধিকারী। এক দীর্ঘ হাদীছে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (হরমের শিকারকে তাড়া করা যাবে না।)

আর রোযা রাখা তার জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা এটা হলো অর্থদণ্ড, কাফফারা নয়। সুতরাং মালের ক্ষতিপূরণের সদৃশ হলো।

এ পার্থক্যের[২৯] কারণ এই যে, ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়েছে পাত্রের মাঝে (অর্থাৎ শিকারের মাঝে) বিদ্যমান একটি গুণ নষ্ট করার কারণে। আর তা হলো নিরাপত্তার অধিকার। পক্ষান্তরে কাফ্ফারার রূপে মুহরিমের উপর যা ওয়াজিব হয়েছে, তা হলো তার কর্মের শাস্তি। কেননা হুরমাত (বা হারাম হওয়া) সাব্যস্ত হয়েছে তার মাঝে বিদ্যমান একটি গুণের কারণে। সেটা হলো তার ইহরাম। আর রোযা কর্মের সাজা হওয়ার যোগ্যতা রাখে কিন্তু কোন বস্তুর ক্ষতিপূরণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

আর ইমাম যুফার (র.) বলেন যে, রোযা রাখা তার জন্য যথেষ্ট হবে, – মুহরিমের উপর যা ওয়াজিব হয়েছে, তার উপর কিয়াস করে। উভয় অবস্থার মাঝে পার্থক্য আমরা উল্লেখ করে এসেছি।

এ ক্ষেত্রে হাদী যথেষ্ট হবে কিনা, এ সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা রয়েছে।

যে ব্যক্তি হরম অঞ্চলে কোন শিকার সংগে করে প্রবেশ করলো, তার কর্তব্য হবে হরম অঞ্চলে তা ছেড়ে দেওয়া, যদি তা তার হাতে থাকে।

এ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। তিনি বলেন, বান্দার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বান্দার মালিকানাধীন জিনিসে শরীআতের হক প্রকাশ পায় না।

আমাদের দলীল এই যে, যখন সেটা হরম এলাকায় এসে গেছে তখন হরমের সম্মান রক্ষার্থে 'পাকড়াও' পরিহার করা তার অবশ্য কর্তব্য হবে। কিংবা (বলা যায় যে,) তা হরমের শিকার হয়ে গেছে; সুতরাং বর্ণিত হাদীছ (لا ينفر صيدها) -এর কারণে নিরাপত্তার অধিকারী হয়ে গেছে।

যদি সে তা বিক্রি করে থাকে তাহলে শিকার বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বিক্রয় প্রত্যাহার করতে হবে। কারণ বিক্রি জাইয হয়নি। কেননা এতে শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করার দিক রয়েছে, আর তা নিষিদ্ধ।

আর যদি শিকার অপ্রাপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তার উপর জাযা ওয়াজিব হবে। কেননা শিকার যে নিরাপত্তার অধিকারী হয়েছিলো, তা হরণ করার মাধ্যমে তার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে।

আর এরূপই হুকুম, যদি মুহরিম অন্য মুহরিমের নিকট কিংবা হালাল ব্যক্তির নিকট শিকার বিক্রি করে। এর কারণ তা-ই, যা আমরা বলে এসেছি।

আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় ইহরাম বেঁধেছে যে, তার বাড়ীতে কিংবা তার সংগের খাঁচায় কোন শিকার আটক রয়েছে, তার জন্য উক্ত শিকার ছেড়ে দেয়া জরুরী নয়।

---

২৯. অর্থাৎ মুহরিম শিকার হত্যা করলে রোযা দ্বারা ক্ষতিপূরণ জাইয হয়, অথচ হালাল ব্যক্তি হরমের শিকার হত্যা করলে রোযা দ্বারা ক্ষতিপূরণ জাইয নেই, এই পার্থক্যের কারণ।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তা ছেড়ে দেয়া তার উপর ওয়াজিব। কেননা শিকারকে নিজের মালিকানায় আটকে রাখার মাধ্যমে শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করছে। সুতরাং এটা হয়ে গেল, যেমন শিকার তার হাতে রয়েছে।

আমাদের দলীল এই যে, সাহাবায়ে কিরাম এমন অবস্থায় ইহরাম বাঁধতেন যে, তাদের বাড়ীঘরে শিকার ও গৃহপালিত পশুসমূহ আটক থাকতো। আর তাঁদের থেকে সেগুলো ছেড়ে দেয়ার কোন ঘটনা বর্ণিত নেই। আর এই ছেড়ে না দেয়াই ব্যাপক রীতি হিসাবে চলে এসেছে। আর তা শরীআতের একটি দলীলরূপে বিবেচিত।

তাছাড়া এ কারণে যে, কর্তব্য হলো শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ না করা। অথচ তার পক্ষ থেকে তো কোন রূপ হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না। কেননা শিকার তো তার হিফাজতে নেই বরং বাড়ীর এবং খাঁচার হিফাজতে রয়েছে। শুধু কথা এই যে, তার মালিকানায় রয়েছে। কিন্তু যদি সে খোলা প্রান্তরে ছেড়ে দেয় তবু তো সেটা তার মালিকানায়ই থেকে যায়, সুতরাং মালিকানায় থাকার বিষয়টি বিবেচ্য নয়।

কারো কারো মতে খাঁচা যদি তার হাতে থাকে তাহলে ছেড়ে দেয়া তার কর্তব্য হবে, তবে এমনভাবে যাতে তা নষ্ট না হয়।

ইমাম কুদূরী বলেন, ***কোন হালাল ব্যক্তি যদি শিকার ধরে, অতঃপর ইহরাম বাঁধে আর অন্য কেউ তার হাত থেকে শিকারটি ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।***

এটা আবূ ইমাম হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা যে ছেড়ে দিয়েছে, সে 'আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার'-এর পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছে। আর সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, সে ব্যক্তি শিকার ধরার মাধ্যমে এমন মালিকানা অর্জন করেছে, যা সংরক্ষণীয়। সতুরাং তার ইহরামের কারণে উক্ত মালিকানার সংরক্ষণাধিকার রহিত হবে না। আর যে ছেড়ে দিয়েছে, সে তা বিনষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং তাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এর বিপরীত হুকুম হবে যদি ইহরাম অবস্থায় শিকারটি ধরে থাকে। কেননা সে শিকারের মালিক হয়নি। তার উপর ওয়াজিব হয় হস্তক্ষেপ করণ পরিহার করা। আর তা এরূপ হতে পারে যে, সে নিজের শিকারকে তার আবাসে ছেড়ে দিবে। সুতরাং যখন অন্য ব্যক্তি তার মালিকানা নষ্ট করে দিলো, তখন সে সীমা লংঘনকারী হলো। এর নযীর হলো গান বাজনার উপকরণ ভেংগে ফেলা সংক্রান্ত ব্যাপারের মতবিরোধ।

কোন মুহরিম যদি শিকার ধরে আর অন্য কেউ তার হাত থেকে ছেড়ে দেয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমেই তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ আসবে না। কেননা এই ধরার মাধ্যমে সে শিকারের মালিক হয়নি। কারণ মুহরিমের ক্ষেত্রে শিকার মালিকানা অর্জনের বস্তু থাকে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا -স্থলের প্রাণী তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা মুহরিম থাকবে। সুতরাং তা হল

যেমন কেউ মদ খরিদ করল।[৩০]

যদি অন্য কোন মুহরিম উক্ত মুহরিমের হাতের শিকার হত্যা করে ফেলে তাহলে উভয়ের প্রত্যেকের উপর জাযা ওয়াজিব হবে। কেননা যে শিকার ধরেছে, সে নিরাপত্তা বিলুপ্ত করার মাধ্যমে শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করেছে। আর হত্যাকারী এর স্থায়িত্ব দান করেছে। আর ক্ষতিপূরণ প্রয়োগ হওয়ার ব্যাপারে স্থায়িত্ব দান করা প্রথম অপরাধের সমতুল্য। যেমন স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পূর্বে তালাক প্রদানের সাক্ষীগণ জামীন হয়, যখন তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়।

আর শিকার যে ধরেছে, সে হত্যাকারীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ উসূল করে নিবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে না। কেননা শিকার পাকড়াওকারী তার কর্মের কারণে নিজেই অপরাধী। সুতরাং সে অন্যের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে না।

আমাদের দলীল এই যে, শিকার পাকড়াও করা ক্ষতিপূরণের কারণরূপে সাব্যস্ত হবে, যখন তার সংগে 'বিনষ্টি' যুক্ত হয়। তাই হত্যাকারী হত্যা করার মাধ্যমে পাকড়াওকারীর কর্মটিকে কারণ-এ পরিণত করেছে। অতএব সে কারণের কারণ সম্পাদনকারীর সমপর্যায়ের হলো। সুতরাং ক্ষতিপূরণের বিষয়টি তার প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে।

যদি হরমের ঘাস বা মালিকানা বিহীন বৃক্ষ কেটে ফেলে, অর্থাৎ যে বৃক্ষ সাধারণতঃ মানুষ ফলায় না, তাহলে তার উপর উক্ত ঘাস বা বৃক্ষের মূল্য প্রদান ওয়াজিব হবে। তবে এগুলো শুকিয়ে গেলে (মূল্য-প্রদান) ওয়াজিব হবে না। কেননা উল্লেখিত ঘাস ও বৃক্ষের কর্তন হারাম হওয়া সাব্যস্ত হচ্ছে 'হরম'-এর কারণে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا -হরমের ঘাস উপড়ানো যাবে না এবং (কাঁটা ওয়ালা গাছ) ও কাটা যাবে না।

উক্ত মূল্যের ক্ষেত্রে রোযার কোন ভূমিকা নেই। কেননা ঘাস কর্তনের হুরমত 'হরম'-এর মর্যাদার কারণে, ইহরামের কারণে নয়। সুতরাং এ হলো স্থান হিসাবে ক্ষতিপূরণ, যেমন ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

আর তার মূল্য দরিদ্রদের মাঝে সাদাকা করবে।

আর যখন তা আদায় করবে, তখন সে উক্ত ঘাস বা বৃক্ষের মালিক হয়ে যাবে, যেমন হক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।[৩১]

অবশ্য কর্তনের পর তা বিক্রি করা মাকরূহ্। কেননা সে শরীআতের নিষিদ্ধ উপায়ে তার মালিক হয়েছে। এখন যদি তাকে বিক্রির অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে মানুষ এ ধরনের কাজে উৎসাহিত হয়ে পড়বে। তবে মাকরূহ হলেও এ বিক্রী বৈধ হবে। শিকারের বিষয়টি এর বিপরীত। উভয়ের মাঝে পার্থক্য আমরা সামনে বর্ণনা করবো।

আর মানুষ স্বাভাবিকভাবে যা রোপন করে থাকে, তা নিরাপত্তা লাভের অধিকারী নয়। এর উপর 'ইজমা' প্রতিষ্ঠিত। আর এ জন্য যে, নিষিদ্ধ হলো ঐ সমস্ত বৃক্ষ, যা হরম

---

৩০. অর্থাৎ কোন মুসলমান যদি মদ খরিদ করে তাহলে সে ঐ মদের মালিক হয় না। এমতাবস্থায় অন্য কেউ যদি তা বিনষ্ট করে ফেলে তাহলে তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

৩১. যেমন জবর দখলকারী যদি মালিককে দখলকৃত বস্তুটির মূল্য দিয়ে দেয় তাহলে সে উক্ত বস্তুটির মালিক হয়ে যাবে।

-এর সাথে সম্পৃক্ত। আর পূর্ণরূপে সম্পৃক্তি সাব্যস্ত হবে, রোপনের মাধ্যমে অন্যের দিকে সম্পৃক্তি সাব্যস্ত না হলে। যেগুলো সাধারণতঃ রোপন করা হয় না, সেগুলো যদি কোন মানুষ রোপন করে তাহলে তা-ও ঐ সকল উদ্ভিদের সংগে যুক্ত, যেগুলো সাধারণতঃ রোপন করা হয়।

(সাধারণতঃ রোপন করা হয় না এমনি উদ্ভিদ) যদি কারো মালিকানাধীন জমিতে নিজে নিজেই অংকুরিত হয়, তাহলে কর্তনকারীর উপর তারও মূল্য প্রদান ওয়াজিব হবে, হরমের সম্মান রক্ষার্থে শরীআতের হক হিসাবে।

আরেকটি মূল্য ওয়াজিব হবে, মালিকের ক্ষতিপূরণ হিসাবে। যেমন হরম-এর মালিকানাধীন শিকার হত্যা করলে হয়ে থাকে।

হরমের যে বৃক্ষ শুকিয়ে গেছে, তাতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই। কেননা তা বর্ধনশীল নয়। 'হরম' এর ঘাসে পশু চরানো যাবে না, আর ইযখির নামক উদ্ভিদ ব্যতীত কোন কিছু কাটাও যাবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ঘাসে পশু চরানোতে আপত্তি নেই। কেননা এর প্রয়োজন রয়েছে। এবং তা থেকে পশুদেরকে বিরত রাখা দুষ্কর।

আমাদের দলীল হলো ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ। আর পশুর দাঁতে কাটা কাস্তে দিয়ে কাটার সমতুল্য। আর 'হিল' (হরমের বাহির এলাকা) থেকে ঘাস বহন করে আনা সম্ভব। সুতরাং হরমের ঘাসে পশু চরানোর প্রয়োজন নেই।

ইযখির নামক ঘাসের হুকুম ভিন্ন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিষিদ্ধ ঘাস থেকে এটি বহির্ভূত করেছেন। সুতরাং তা কর্তন করা এবং তাতে পশু চরানো জাইয। 'ছত্রাক' এর ভিন্ন। কেননা মূলতঃ এটা উদ্ভিদভুক্ত নয়।

কিরান হজ্জকারী যদি এমন কোন অপরাধ করে বসে, যে সম্পর্কে আমরা বলে এসেছি যে, এতে হজ্জে ইফরাদকারীর উপর একটি দম ওয়াজিব হবে, *সেক্ষেত্রে তার উপর দু'টি দম ওয়াজিব হবে। একটি হলো হজ্জের কারণে দম আর একটি হলো উমরার কারণে দম।*

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, একটা দম ওয়াজিব হবে। এ কারণে যে, তাঁর মতে কিরানকারী একটি ইহরাম দ্বারা মুহরিম। পক্ষান্তরে আমাদের মতে সে দু'টি ইহরাম দ্বারা মুহরিম। (কিরান অধ্যায়ে) এ সম্পর্কিত আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী বলেন, *তবে যদি (কিরানের ইচ্ছুক ব্যক্তি) উমরার কিংবা হজ্জের ইহরাম না বেঁধেই মীকাত অতিক্রম করে থাকে, তবে তার উপর একটি দম ওয়াজিব।*

ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

(আমাদের দলীল এই যে,) মীকাতের সময় কর্তব্য ছিলো (হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য) একটি ইহরাম বাঁধা। আর একটি ওয়াজিব বিলম্বিত করার কারণে একটি মাত্র 'জাযাই' ওয়াজিব হতে পারে।

দুই মুহরিম যদি একটি শিকার হত্যায় শরীক হয়, তাহলে উভয়ের প্রত্যেকের উপর পূর্ণ জাযা ওয়াজিব হবে। কেননা হত্যা-কর্মে শরীক হওয়ার মাধ্যমে উভয়ের প্রত্যেকে এক একটি অপরাধকারী হলো, যা শিকার দেখিয়ে দেয়ার অপরাধের চেয়ে গুরুতর, সুতরাং অপরাধ একাধিক হওয়ার কারণে 'জাযা'ও একাধিক হবে।

পক্ষান্তরে দুই হালাল ব্যক্তি যদি হরমের কোন শিকার হত্যা করার কাজে শরীক হয়, তাহলে উভয়ের উপর একটি জাযা ওয়াজিব হবে। কেননা আলোচ্য ক্ষতিপূরণটি হলো স্থানের স্থলবর্তী, অপরাধের শাস্তি নয়। সুতরাং (হত্যার) স্থান এক হওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণও এক হবে। যেমন দু'জন লোক ভুলক্রমে একজন লোককে হত্যা করলে এ অবস্থায় উভয়ের উপর একটি দিয়্যত ওয়াজিব হয়ে থাকে। কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় উভয়ের প্রত্যেকের উপর আলাদাভাবে।[৩২]

মুহরিম যদি শিকার বিক্রি করে কিংবা খরিদ করে, তাহলে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা জীবিত অবস্থায় মুহরিমের বিক্রি করার অর্থ হলো নিরাপত্তা নষ্ট করার মাধ্যমে শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করা। পক্ষান্তরে হত্যা করার পর বিক্রি করার অর্থ হলো মুর্দা বিক্রি করা।

যে ব্যক্তি হরম অঞ্চল থেকে হরিণী ধরে নিয়ে গেল আর তা কয়েকটি বাচ্চা প্রসব করলো, অতঃপর হরিণীটি তার বাচ্চাগুলোসহ মারা গেল, তখন সব ক'টির মূল্য তার উপর ওয়াজিব হবে। কেননা হরম থেকে বের করার পরও শরীআতের দৃষ্টিতে উক্ত শিকার নিরাপত্তার অধিকারী রূপে বহাল থাকবে। এ কারণেই তাকে তার নিরাপদ স্থানে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। আর এটি একটি শরীআত অনুমোদিত গুণ। সুতরাং শিকারের বাচ্চার মাঝেও তা সম্প্রসারিত হবে।

যদি উক্ত শিকারের জাযা আদায় করার পর বাচ্চা প্রসব করে, তাহলে বাচ্চার জাযা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা জাযা আদায় করার পর তা আর নিরাপদ থাকে না। কেননা স্থলবর্তী পৌঁছে যাওয়া (অর্থাৎ মূল্য দরিদ্রদের নিকট পৌঁছে যাওয়া) মূল শিকার পৌঁছে যাওয়ার সমতুল্য।

সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

৩২. কেননা দিয়্যত হলো পাত্রের ক্ষতিপূরণ। সুতরাং পাত্র অভিন্ন হওয়ার কারণে একটি মাত্র দিয়্যত ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে কাফ্ফারা হলো কর্মের সাজা। সুতরাং কর্ম বিভিন্ন হওয়ার কারণে সাজাও বিভিন্ন হবে।

ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা

কূফার অধিবাসী কোন লোক যদি বনূ 'আমির এর উদ্যানে প্রবেশ করে[১] *এবং উমরার ইহরাম বাঁধে অতঃপর 'যাতে ইরক'-এ ফিরে গিয়ে তালবিয়া পড়ে, তাহলে (ইহরাম ছাড়া) মীকাত অতিক্রম করার দম রহিত হয়ে যাবে। আর যদি ফিরে আসে কিন্তু তালবিয়া না পড়ে এবং মক্কায় প্রবেশ করে উমরার তাওয়াফ করে ফেলে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।* এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত।

সাহেবাইন বলেন, যদি ইহরাম অবস্থায় (মীকাতে) ফিরে আসে, তাহলে তালবিয়া পাঠ করুক কিংবা তালবিয়া পাঠ না করুক, তার উপর কোন দম ওয়াজিব হবে না।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, তালবিয়া পাঠ করুক কিংবা পাঠ না করুক দম রহিত হবে না। কেননা ফিরে আসার কারণে মীকাত থেকে ইহরাম না করার অপরাধ রহিত হবে না। এটা (সূর্যাস্তের পূর্বে) আরফা থেকে বের হয়ে সূর্যাস্তের পর আবার ফিরে আসার ন্যায় হলো।

আমাদের দলীল এই যে, সে তো ছেড়ে দেওয়া আমলটি যথাসময়ে পূরণ করে নিয়েছে। আর যথা সময় হলো, হজ্জের ক্রিয়াকর্ম শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত। সুতরাং দম রহিত হয়ে যাবে।

আরাফা থেকে বের হয়ে আসার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা ছেড়ে দেওয়া আমলটি পূরণ করা হয় নি।[২] যেমন পূর্বে (জিনায়াত অধ্যায়ে) বলা হয়েছে। তবে সাহেবাইনের মতে ক্ষতিপূরণ হলো মুহরিম অবস্থায় ফিরে আসা। কেননা এভাবে সে মীকাতের হক প্রকাশ করেছে, যেমন, যদি সে ইহরাম বেঁধে নীরব অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে (ক্ষতিপূরণ হবে) ইহরাম অবস্থায় তালবিয়া পাঠসহ ফিরে আসার মাধ্যমে। কেননা ইহরামের ক্ষেত্রে আযীমাত হলো আপন বাড়ি থেকে ইহরাম বাধা। যখন সে মীকাত পর্যন্ত ইহরামকে বিলম্বিত করার মাধ্যমে রুখছাত গ্রহণ করলো, তখন তার অবশ্য কর্তব্য হবে তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে মীকাতের হক আদায় করা। আর ক্ষতিপূরণ হলো তালবিয়া পাঠ অবস্থায় ফিরে আসার মাধ্যমে।

---

১. কূফী দ্বারা বহিরাগত উদ্দেশ্য। আর বনূ 'আমিরের উদ্যান দ্বারা মীকাতের ভিতরে কিন্তু হরম -এর বাইরে অবস্থিত স্থান উদ্দেশ্য।

২. কেননা ছেড়ে দেয়া আমলটি ছিলো সূর্যাস্ত পর্যন্ত উকূফ বা অবস্থান বিলম্বিত করা। আর সূর্যাস্তের পর ফিরে আসার মাধ্যমে 'যথা সময়ে' আমলটির ক্ষতিপূরণ হয় না। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন, সূর্যাস্তের পূর্বে ফিরে আসলে দম রহিত হয়ে যাবে। কেননা তখন 'যথা সময়ে' ক্ষতি পূরণ হয়।

মীকাত অতিক্রম করার পরে উমরার পরিবর্তে যদি হজ্জের ইহরাম বেঁধে থাকে তাহলে উপরোল্লেখিত সকল ক্ষেত্রে একই রকম মতভিন্নতা রয়েছে।

আর যদি মীকাতের দিকে ফিরে আসে তাওয়াফ শুরু ও হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার পর, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর থেকে দম রহিত হবে না।

যদি ইহরাম বাঁধার পূর্বে ঐ (মীকাতে) ফিরে আসে, তাহলে সকলের মতেই দম রহিত হয়ে যাবে। এই যে বিধান আমরা উল্লেখ করলাম, তা ঐ ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য, যখন সে হজ্জ বা উমরার নিয়্যত করে থাকে।

যদি নিজস্ব প্রয়োজনে বনূ 'আমিরের উদ্যানে (অর্থাৎ মীকাতের অভ্যন্তরে) প্রবেশ করে থাকে, তাহলে (উক্ত এলাকায় বাসকারীর ন্যায় সেও) ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করতে পারে এবং তার মীকাত হবে উক্ত উদ্যান। অর্থাৎ সে এবং উক্ত স্থানের অধিবাসী সমপর্যায়ের হবে। কেননা উক্ত উদ্যানে (অর্থাৎ মীকাতের অভ্যন্তরস্থ এলাকা)-এর তা'যীম ওয়াজিব নয়। সুতরাং উক্ত এলাকার উদ্দেশ্যে আগমনের কারণে তার উপর ইহরাম ওয়াজিব হবে না। আর যখন সে উক্ত এলাকায় প্রবেশ করে ফেললো, তখন উক্ত এলাকার অধিবাসীদের মতই হয়ে গেলো। আর যেহেতু স্থানীয় ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনের জন্য ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশের অনুমতি রয়েছে, সেহেতু তার জন্যও অনুমতি থাকবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্য "তার মীকাত হলো উদ্যান"-এর অর্থ হলো মীকাত ও হরমের মধ্যবর্তী সকল হালাল অঞ্চল। ইতোপূর্বে এ আলোচনা এসে গেছে। সুতরাং যে উক্ত এলাকায় প্রবেশ করবে এবং স্থানীয়দের সংগে যুক্ত হয়ে যাবে, তারা মীকাত হবে এটি।

এরা উভয়ে যদি হালাল অঞ্চল থেকে ইহরাম বাঁধে এবং আরাফায় উকূফ করে নেয়, তাহলে তাদের উপর কোন দম আসবে না।

'উভয়' দ্বারা উক্ত উদ্যান এলাকার বাসিন্দা এবং সেখানে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে বুঝান হয়েছে। কেননা, তারা উভয়েই তাদের মীকাত থেকেই ইহরাম বেঁধেছে।

যে ব্যক্তি ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করলো অতঃপর সেই বছরেই মীকাতের উদ্দেশ্যে বের হলো এবং ফরজ হজ্জের[৩] ইহরাম বাঁধল, তার এই ইহরাম (ইতোপূর্বে) বিনা ইহরামে মক্কায় প্রবেশের (প্রতিকার রূপে) যথেষ্ট হবে।[৪]

৩. এ বিধান ফরজ হজ্জে ইসলামের সাথে খাস নয়, বরং মান্নতের ওয়াজিব হজ্জ বা উমরা হলেও যথেষ্ট হবে।

৪. অর্থাৎ বিনা ইহরামে মক্কায় প্রবেশের কারণে যে উমরা ও হজ্জ ওয়াজিব হয়েছিল, তা মা'ফ হয়ে যাবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, তা যথেষ্ট হবে না। এ-ই কিয়াসের দাবী। নযর বা মান্নাতের কারণে ওয়াজিব হওয়া হজ্জের উপর কিয়াস করে এটা বলা হয়েছে।[৫] সুতরাং এটা পরবর্তী বছরের হজ্জ করার মতো হলো।[৬]

আমাদের দলীল এই যে, সে যথা সময়ে[৭] ছেড়ে দেয়া আমলটি আদায় করে নিয়েছে। কেননা তার অবশ্য কর্তব্য ছিলো ইহরামের মধ্যমে পবিত্র ভূমির প্রতি তাযীম প্রকাশ করা (আর সে তা করেছে) যেমন শুরুতেই যদি ফরজ হজ্জের ইহরাম বেঁধে আসতো।

বছরান্তরে হজ্জ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা তার যিম্মায় অনাদায়ী রূপে রয়ে গেছে। সুতরাং উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে কৃত স্বতন্ত্র ইহরাম ছাড়া তা আদায় হবে না। যেমন মান্নাতের কারণে ওয়াজিব হওয়া ই'তিকাফের বিষয়টি। কেননা উক্ত ই'তিকাফ বর্তমান বছরের রমাযানের রোযার সংগে তো আদায় হতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় বছরের রোযার সংগে হবে না। (বরং আলাদা রোযার মাধ্যমে ই'তিকাফ আদায় করতে হবে।)

যে ব্যক্তি মীকাত অতিক্রম করার পর উমরার ইহরাম বাঁধল আবার (স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে) তা নষ্ট করে দিলো, সে উক্ত উমরা সম্পন্ন করবে এবং পরে কাযা করবে। কেননা ইহরামটি অবশ্য পালনীয় রূপে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং তা হজ্জ নষ্ট করার মতোই হলো।[৮]

তবে বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করার কারণে তার উপর কোন দম ওয়াজিব হবে না।

ইমাম যুফার (র.)-এর মতামতের উপর কিয়াসের আলোকে দম রহিত হবে না। এটা বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রমের পর হজ্জ ফউত হওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে মতভিন্নতার সমতুল্য এবং বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করার পর হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ নষ্ট করে দেয়া ব্যক্তি সম্পর্কে মতভিন্নতার সমতুল্য।

ইমাম যুফার (র.) এই মীকাত অতিক্রমকে অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজের সাথে তুলনা করেন।

আমাদের দলীল এই যে, কাযা করার সময় মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধার মাধ্যমে সে ইহরামের হক আদায় করে দিয়েছে। কেননা কাযার মাধ্যমে তো সে ফউত হওয়া আমলটিরই অনুরূপ আদায় করেছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজতো কাযা করার কারণে অস্তিত্বহীন হয়ে যাচ্ছে না। সুতরাং উভয়ের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেলো।

---

৫. অর্থাৎ যদি তার যিম্মায় মান্নাতের হজ্জ ওয়াজিব থাকে আর সে ফরয হজ্জ আদায় করে তাহলে ফরয হজ্জ দ্বারা নযরের হজ্জ মা'ফ হবে না।

৬. পরবর্তী বছর হজ্জ করলে সকলের মতেই তা বিনা ইহরামে দাখিল হওয়ার কারণে ওয়াজিব হওয়া হজ্জের স্থলবর্তী হতে পারে না।

৭. অর্থাৎ যে বছরে প্রবেশ করেছে, সেই একই বছর।

৮. অর্থাৎ হজ্জ নষ্ট করার পর যেমন (ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য) অবশিষ্ট ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যেতে হয় এবং পরে হজ্জ কাযা করতে হয়, তেমনি উমরার ক্ষেত্রেও করতে হবে।

মক্কী যদি হজ্জের উদ্দেশ্যে 'হিল' এর দিকে বের হয় এবং ইহরাম বাঁধে আর মক্কায় ফিরে না এসে আরাফায় উকূফ বা অবস্থান করে নেয়, তাহলে তার উপর একটি বকরী ওয়াজিব হবে। কেননা তার মীকাত হলো হরম। আর সে তা বিনা ইহরামে অতিক্রম করেছে।

যদি সে হরমে ফিরে আসে তাহলে বহিরাগত সম্পর্কে যে মতপার্থক্যের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, এখানেও সেই মতপার্থক্য বিদ্যমান থাকবে। তালবিয়া পাঠ করুক কিংবা না করুক।

তামাত্তুকারী যদি তার উমরা থেকে ফারেগ হওয়ার পর হরম থেকে বের হয় এবং ইহরাম বেঁধে আরাফায় অবস্থান করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। সে যখন মক্কায় প্রবেশ করে উমরার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করলো, তখন সে মক্কীর সমপর্যায়ের হয়ে গেলো। আর মক্কীর ইহরাম হরম থেকে হয়ে থাকে। এর কারণ (ইতোপূর্বে মীকাত পরিচ্ছেদে) আমরা উল্লেখ করেছি। সুতরাং ইহরামকে হরম থেকে বাইরে করার কারণে দম ওয়াজিব হবে।

যদি সে আরাফায় উকূফ করার পূর্বে হরমে ফিরে আসে এবং সেখান থেকে ইহরাম বাঁধে, তাহলে তার উপর কোন দম ওয়াজিব হবে না। বহিরাগতের ক্ষেত্রে পূর্বে যে মতপার্থক্য উল্লেখ করা হয়েছে, তা এখানেও বিদ্যমান রয়েছে।

ইহরামের সম্পর্ক সম্বন্ধে

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন মক্কী যদি উমরার ইহরাম বাঁধে এবং এক চক্কর তাওয়াফ করে ফেলে অতঃপর হজ্জের ইহরাম বাঁধে, তাহলে সে হজ্জ বর্জন করবে এবং তা বর্জন করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর তার উপর একটি হজ্জ ও একটি উমরা ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, উমরা বর্জন করা আমাদের মতে অধিক পসন্দনীয়। পরে উমরা কাযা করে নেবে এবং তা বর্জন করার কারণে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা দু'টির একটি বর্জন করা তো অনিবার্য। কেননা মক্কীর ক্ষেত্রে হজ্জ ও উমরা উভয়কে একত্র করা শরীআত সম্মত নয়। এমতাবস্থায় উমরা বর্জন করাই উত্তম। কারণ এটা মর্যাদার দিক থেকে নিম্নতর এবং ক্রিয়া কর্মের দিক থেকেও অপেক্ষাকৃত স্বল্প আর কাযা করার ব্যাপারেও সহজতর। কেননা তা নির্ধারিত সময়ের সাথে আবদ্ধ নয়।

একই বিধান হবে যদি প্রথমে উমরার এবং পরে হজ্জের ইহরাম বাঁধে কিন্তু উমরার কোন ক্রিয়াকর্ম শুরু না করে। এর দলীল তাই, যা আমরা এইমাত্র বলেছি।

যদি উমরার চার চক্কর তাওয়াফ করে ফেলে অতঃপর হজ্জের ইহরাম বাঁধে, তাহলে কোন দ্বিমত নেই যে, সে বর্জন করবে। কেননা অধিকাংশের জন্য সমগ্রের হুকুম রয়েছে। সুতরাং তা বর্জন করা কঠিন। যেমন, সে যদি উমরা থেকে পূর্ণ ফারেগ হয়ে যায়।

একই হুকুম হবে যদি উমরার জন্য এর চেয়ে কম চক্কর তাওয়াফ করে থাকে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, কিছু আমল আদায় করার মাধ্যমে উমরার ইহরাম জোরদার হয়ে গেছে, পক্ষান্তরে হজ্জের ইহরাম জোরদার হয়নি। আর যা জোরদার নয়, তা বর্জন করা সহজ। তাছাড়া এই অবস্থায় উমরা বর্জন করার অর্থ হলো আমল নষ্ট করা। পক্ষান্তরে হজ্জ বর্জন করার অর্থ হলো হজ্জ থেকে বিরত থাকা।

অবশ্যই যেটাই বর্জন করবে সেটা বর্জন করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা পরবর্তী ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হওয়ার কারণে সময়ের পূর্বেই সে হালাল হয়ে গেছে। সুতরাং সে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সম-পর্যায়ের হলো। তবে উমরা বর্জন করার ক্ষেত্রে শুধু উমরার কাযা করতে হবে। পক্ষান্তরে হজ্জ বর্জন করার ক্ষেত্রে হজ্জ কাযা করতে হবে এবং তদুপরি একটি উমরা আদায় করতে হবে। কেননা সে হজ্জ ফউতকারীর সমপর্যায়ে হয়েছে।

যদি সে হজ্জ-উমরা উভয়টি পালন করে যায়, তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা উভয় আমল যেভাবে সে নিজের জন্য নির্ধারণ করেছে, সেভাবেই আদায় করেছে, যদিও উভয়টি এক সঙ্গে আদায় করা (শরীআতের পক্ষ থেকে) নিষেধকৃত। আর আমাদের মূলনীতি জানা রয়েছে যে, 'নিষেধ' কর্মের অস্তিত্ব রোধ করে না।

তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা সে হজ্জ ও উমরা একত্রিত করেছে আর নিষিদ্ধ কাজ করার কারণে তার আমলের মধ্যে ত্রুটি এসে গেছে। মক্কীর ক্ষেত্রে এটা হলো ক্ষতিপূরণের দম। পক্ষান্তরে বহিরাগতের ক্ষেত্রে এটা হলো শোকরানার দম।

যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধল, অতঃপর দশ তারিখে আরেকটি হজ্জের ইহরাম বাঁধল, সে যদি প্রথম হজ্জের হলক করে ফেলে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় হজ্জও তার যিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যাবে। তবে তার উপর কোন দম আসবে না। যদি প্রথম হজ্জের হলক না করে থাকে তাহলেও দ্বিতীয় হজ্জটি তার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে, (দ্বিতীয় ইহরামের পর) তার উপর দম ওয়াজিব হবে– চুল ছাটুক কিংবা না ছাটুক।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, যদি চুল না ছাঁটে তাহলে তার উপর কোন দম ওয়াজিব হবে না। কেননা হজ্জের দুই ইহরাম একত্র করা কিংবা উমরার দুই ইহরাম একত্র করা বিদআত। সুতরাং যখন হলক করবে তখন সেই 'হলক' যদিও প্রথম ইহরামের জন্য একটি আমল, কিন্তু দ্বিতীয় ইহরামের জন্য তা অপরাধ। কেননা (দ্বিতীয় ইহরামের প্রেক্ষিতে) তা অসময়ে হয়েছে। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমেই তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর যদি আগামী বছর হজ্জ করার পূর্বে হলক না করে, তাহলে প্রথম ইহরামের ক্ষেত্রে হলক-কে সে যথা সময় থেকে বিলম্বিত করলো। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিলম্ব দম ওয়াজিব করে। সাহেবাইনের মতে তার উপর কোন দম আসে না। যেমন ইতোপূর্বে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করে এসেছি। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) চুল ছাঁটা না ছাঁটা উভয় অবস্থাকে অভিন্ন সাব্যস্ত করেছেন। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (দম ওয়াজিব হওয়ার জন্য) চুল ছাঁটার শর্ত আরোপ করেছেন।

যে ব্যক্তি চুল ছাঁটা ছাড়া উমরার যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম থেকে ফারেগ হয়ে গেছে অতঃপর অন্য উমরার ইহরাম বেঁধেছে, তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। কারণ হলো সময়ের পূর্বে ইহরাম বাঁধার কারণে। কেননা সে উমরার দুই ইহরামকে একত্র করেছে, আর তা মাকরূহ। সুতরাং তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর এটা হলো ক্ষতিপূরণ ও কাফফারার দম।

যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর উমরার ইহরাম বাঁধলো, তার উপর দু'টোই আদায় করা ওয়াজিব হবে। কেননা বহিরাগতের জন্য হজ্জ ও উমরা উভয়কে একত্র করা শরীআতে বৈধ। আর মাসআলাটি বহিরাগতের সম্পর্কেই। সুতরাং এর মাধ্যমে সে কিরান হজ্জকারী হলো। তবে সুন্নাতের বিপরীত করার কারণে গুনাহ্গার হবে।

যদি সে উমরার আমলগুলো না করে আরাফায় উকূফ করে ফেলে, তাহলে সে উমরা বর্জনকারী হলো। কারণ তার জন্য তা আদায় করা সম্ভব নয়। কেননা তা হজ্জের উপর ভিত্তিকৃত হচ্ছে, যা শরীআতের অনুমোদিত নয়।

তবে যদি সে আরাফা অভিমুখে রওয়ানা হয়, তাহলে উকূফ করার পূর্ব পর্যন্ত সে উমরা বর্জনকারী হবে না। ইতোপূর্বে আমরা তা উল্লেখ করেছি।

যদি সে হজ্জের জন্য তাওয়াফ করে, অতঃপর উমরার জন্য ইহরাম বাধে এবং উভয়টির ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যায়, তাহলে দু'টোই তার উপর ওয়াজিব হবে। এবং উভয়কে একত্র করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, আগেই বলে আসা হয়েছে যে, উভয়কে একত্র করা বৈধ। সুতরাং উভয়ের ইহরাম বাঁধাও শুদ্ধ হবে।

উল্লেখিত তাওয়াফ দ্বারা তাওয়াফে তাহিয়্যা উদ্দেশ্য। আর তা সুন্নাত। রুকন নয়। এমন কি তা তরক করলে কিছু ওয়াজিব হবে না। আর যখন সে কোন রুকন আদায় করেনি তখন তার পক্ষে প্রথমে উমরার কার্যসমূহ, অতঃপর হজ্জের কার্যসমূহ সম্পাদন করা সম্ভব। এ কারণেই যদি সে উভয়টি সম্পাদন করতে থাকে তাহলেও জাইয হয়। তবে উভয়টি একত্র করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর বিশুদ্ধ মতে এটি কাফ্‌ফারা ও ক্ষতিপূরণের দম। কেননা একদিক থেকে[১] সে উমরার কার্যসমূহকে হজ্জের কার্যসমূহের উপর ভিত্তি করেছে।

তবে তার জন্য উমরা ছেড়ে দেওয়া মুস্তাহাব। কেননা হজ্জের ইহরাম হজ্জের একটি আমল আদায় করার কারণে জোরদার হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যদি হজ্জের তাওয়াফ না করে থাকে তাহলে হুকুম বিপরীত হবে।[২]

আর যখন উমরা ছেড়ে দেবে তখন তা কাযা করতে হবে। কেননা তা শুরু করা শুদ্ধ ছিলো।

অবশ্য উমরা ছাড়ার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে যে ব্যক্তি ইয়াওমুন-নহরে কিংবা আইয়ামে তাশরীকে উমরার ইহরাম বাঁধল, ঐ উমরা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। (ইতোপূর্বে এর) কারণ আমরা বলে এসেছি।

তবে তা বর্জন করবে। অর্থাৎ বর্জন করা জরুরী হবে। কেননা সে হজ্জের রুকন আদায় করে ফেলেছে। সুতরাং সর্ব দিক থেকেই সে হজ্জের কার্যসমূহের উপর উমরার কার্যসমূহের ভিত্তিকারী হয়ে যাবে। তাছাড়া এই দিনগুলোতে উমরা মাকরূহ্। আমরা এটি বর্ণনা করবো। এ কারণেই উক্ত উমরা বর্জন করা তার উপর জাইয।

যদি সে উমরা বর্জন করে তাহলে বর্জন করার করণে একটি দম ওয়াজিব হবে এবং তদস্থলে একটি উমরা করা ওয়াজিব হবে। এর কারণ আমরা আগেই বর্ণনা করে এসেছি।

---

১. কেননা তাওয়াফে তাহিয়্যাহ যদিও সুন্নাত, কিন্তু তা সামগ্রিকভাবে হজ্জের কার্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই থেকে সে উভয়ের কার্যের উপর উমরার কর্মকে ভিত্তি করার মাকরূহ কাজ করল।

২. অর্থাৎ উমরা বর্জন করবে না। কেননা সে উমরার কার্যসমূহকে হজ্জের কার্যসমূহের উপর ভিত্তিকারী হচ্ছে না।

অবশ্য যদি সে উমরার কাজ চালিয়ে যায় তাহলে তা যথেষ্ট হবে। কেননা, উমরার হাকীকতের বাইরের কারণে কারাহাত এসেছে। আর তা এই যে, সে এই দিনগুলোতে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পদনে ব্যস্ত থাকবে। সুতরাং হজ্জের তাযীম রক্ষার জন্য সময়টাকে হজ্জের জন্য মুক্ত রাখা ওয়াজিব।

আর অবশ্য তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। উভয়কে একত্র করার কারণে ইহরামের মধ্যে কিংবা পরবর্তী কর্মসমূহের মধ্যে।[৩]

মাশায়েখগণ বলেছেন যে, এটিও কাফ্ফারার দম।

মাবসূতে যা বলা হয়েছে, বাহ্যতঃ সে আলোকে কেউ কেউ বলেছেন যে, যদি হজ্জের হলকের পর ইহরাম বাঁধে, তাহলে উমরা বর্জন করবে না।

কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, এই দিনগুলোতে উমরা করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা পরিহার করার জন্য তা বর্জন করবে। ফকীহ্ আবূ জাফর (র.) বলেছেন, আমাদের মাশায়েখগণ এ মতই পোষণ করেন।

যদি তার হজ্জ ফউত হয়ে যায়, অতঃপর সে উমরা বা হজ্জের ইহরাম বাঁধে তাহলে সে তা বর্জন করবে। কেননা যার হজ্জ ফউত হয় সে উমরার মাধ্যমে হালাল হয়। কিন্তু তার ইহরাম উমরার ইহরামে পরিবর্তিত হয় না। হজ্জ ফউত হওয়া অধ্যায়ে এ আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ। সুতরাং সে কার্যসমূহের ক্ষেত্রে দুই উমরা একত্রকারী হয়ে যাবে। তাই তার কর্তব্য হলো দ্বিতীয়টি বর্জন করা– যেমন যদি দুই উমরার জন্য ইহরাম বাঁধে।

আর যদি হজ্জের ইহরাম বেঁধে থাকে তাহলে সে ইহরামের দিক থেকে দুই হজ্জ একত্রকারী হলো। সুতরাং দ্বিতীয়টি বর্জন করা তার ওয়াজিব হবে। যেমন দুই হজ্জের ইহরাম বাঁধলে একটি তাকে বর্জন করতে হতো। তবে তা শুরু করা বৈধ হওয়ার কারণে কাযা করা তার উপর ওয়াজিব হবে। আবার সময়ের পূর্বে হালাল হওয়ার কারণে তা বর্জন করায় দম ওয়াজিব হবে।

৩. অর্থাৎ যদি হলকের পূর্বে উমরার ইহরাম বাঁধে তাহলে দুই ইহরামকে একত্রকারী হলো। আর যদি হলকের পর বাঁধে তাহলে কংকর নিক্ষেপ ইত্যাদি অবশিষ্ট আমলগুলোর ক্ষেত্রে একত্রকারী হলো।

অবরুদ্ধ হওয়া

মুহরিম যদি শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়, কিংবা অসুস্থতায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে হজ্জের কাজ পরিচালনায় বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তার জন্য ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাওয়া জাইয।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়া ছাড়া احصار। সাব্যস্ত হবে না। কেননা হাদী প্রেরণের মাধ্যমে হালাল হওয়ার বিধান অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য অনুমোদনের উদ্দেশ্য হলো রেহাই লাভ করা। আর হালাল হওয়ার মাধ্যমে শত্রু থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে, অসুস্থতা থেকে নয়।

আমাদের দলীল এই যে, ভাষাবিদের সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত হয়েছে যে, احصار। সংক্রান্ত আয়াতে শামিল হয়েছে অসুস্থতার কারণে অবরুদ্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে। কেননা তাঁরা বলেন الاحصار। শব্দটি অসুস্থতার এবং الحصر। শব্দটি দুশমন কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সময়ের পূর্বে হালাল হওয়ার উদ্দেশ্য হলো ইহরাম প্রলম্বিত হওয়ার কারণে উদ্ভূত কষ্ট দূর করা। আর অসুস্থ অবস্থায় ধৈর্যের সাথে ইহরাম আঁকড়ে ধরার কষ্ট তা থেকে বেশী।

যখন হালাল হয়ে যাওয়া তার জন্য জাইয হলো, তখন তাকে বলা হবে, একটি বকরী পাঠিয়ে দাও, যা হরমে যবাহ্ করা হবে এবং যাকে দিয়ে পাঠাবে তার নিকট থেকে একটি নির্ধারিত দিনে তা যবাহ্ করার ওয়াদা গ্রহণ করো। এরপর তুমি হালাল হবে।

হরমে পাঠানোর কারণ এই যে, احصار। এর দম হলো ইবাদত। আর বর্ণিত হয়েছে যে, নির্ধারিত স্থান বা সময় ছাড়া রক্ত প্রবাহিত করা ইবাদত রূপে বিবেচিত নয়। সুতরাং হরম ছাড়া এটা ইবাদত হবে না এবং তা দ্বারা হালাল হওয়া যাবে না। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এদিকেই ইশারা করেছেন ঃ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ -হাদী তার নির্ধারিত স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মাথা মুড়াবে না।

বস্তুতঃ হাদী ঐ পশুকেই বলা হয়, যাকে হরম-এ প্রেরণ করা হয়। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, হরমের সাথে আবদ্ধ হবে না। কেননা আবদ্ধ করা সহজ-সাধ্যতাকে রহিত করে। আমাদের দলীল এই যে, মূল সহজ-সাধ্যতার বিষয়টিই বিবেচনা করা হয়েছে, চূড়ান্ত সহজ-সাধ্যতার বিষয়টি নয়।

(হাদী হিসাবে) বকরীই জাইয হবে। কেননা আয়াতে হাদীর কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে আর সর্বনিম্ন হাদী হলো বকরী। তবে কুরবানীর মতো এখানেও গরু বা উট যথেষ্ট হবে।

আমাদের উল্লেখিত বক্তব্যর উদ্দেশ্য অবশ্য বকরী পশুটিই পাঠানো নয়; কেননা তা কখনো কষ্টকরও হতে পারে। বরং সে মূল্য পাঠিয়ে দিতে পারে, যাতে সেখানে বকরী খরিদ করে তার পক্ষ থেকে যবাহ্ করা হয়।

ইমাম কুদূরী (র.)-এর বক্তব্য 'অতঃপর হালাল হয়ে যাবে' এদিকে ইংগিত করে যে, হলক বা চুল ছাঁটা তার জন্য জরুরী নয়। এ হল ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মত ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তার উচিত হবে হলক করা বা চুল ছাঁটা। আর যদি তা না করে তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হুদায়বিয়ার বছর সেখানে অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় হলক করেছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে হলকের আদেশ দিয়েছিলেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলীল এই যে, হলক ইবাদত রূপে বিবেচিত হয়, যদি তা হজ্জের ক্রিয়াকর্মের পরে সম্পন্ন হয়। সুতরাং তার আগে ইবাদত রূপে গণ্য হবে না।

আর নবী করীম (সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম তা করে ছিলেন, যাতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছার দৃঢ়তা প্রকাশ পায়।

• ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *অবরুদ্ধ ব্যক্তি যদি কিরানকারী হয়, তাহলে দু'টি দম প্রেরণ করবে।* কেননা তার দু'টি ইহরাম থেকে হালাল হওয়া প্রয়োজন।

যদি হজ্জ থেকে হালাল হওয়ার জন্য একটি হাদী প্রেরণ করে আর উমরার ইহরাম বহাল রাখে, তাহলে কোন ইহরাম থেকেই হালাল হবে না। কেননা একই সাথে উভয় ইহরাম থেকে হালাল হওয়া শরীআত অনুমোদন করেছে।

احصار এর দম হরম ছাড়া অন্য কোথাও যবাহ্ করা জাইয নয়। তবে ইয়াওমুন-নহরের পূর্বে যবাহ্ করা জাইয রয়েছে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, হজ্জের অবস্থায় অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য ইয়াওমুন-নহর চাড়া অন্য সময় যবাহ্ করা জাইয নয়। পক্ষান্তরে উমরার অবস্থায় অবরুদ্ধ ব্যক্তি যখন ইচ্ছা যবাহ্ করতে পারে।

হজ্জ অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে এ বিধান দেওয়া হয়েছে তামাত্তু ও কিরানের হাদীর-এর উপর কিয়াস করে।

সাহেবাইন অবরুদ্ধ ব্যক্তির যবাহ্‌কে সম্ভবতঃ হলক-এর উপর কিয়াস করেছেন। কেননা উভয়ের প্রত্যেকটি ইহরাম থেকে হালালকারী।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এ হলো কাফ্‌ফারার দম। এজন্যই তা থেকে খাওয়া জাইয নেই। সুতরাং এটা স্থানের সাথে বিশিষ্ট হবে, কিন্তু কোন সময়ের সাথে আবদ্ধ হবে না, যেমন অন্যান্য কাফ্‌ফারার দম।

তামাত্তু ও কিরানের দম এর বিপরীত। কেননা সেটা হলো ইবাদতের দম। (কাফ্ফারার দম নয়।) হলকের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা সেটা যথাসময়ে হচ্ছে। কারণ হজ্জের প্রধান কাজ উকূফ হলকের মাধ্যমেই সমাপ্ত হয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *হজ্জ অবস্থায় অবরুদ্ধ ব্যক্তি যদি হালাল হয়ে যায়, তাহলে তাকে (পরবর্তীতে) একটি হজ্জ ও একটি উমরা করতে হবে।*

ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন উমর (রা.) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এ হেতু যে, হজ্জ কাযা করা তো ওয়াজিব হবে এই কারণে যে, তা শুরু করা সহীহ্ ছিলো। আর উমরা এই কারণে যে, সে হলো হজ্জ ফউতকারী ব্যক্তির সমপর্যায়ের।

উমরা অবস্থায় অবরুদ্ধ ব্যক্তির উপর পরে উমরা কাযা করা ওয়াজিব হবে।

আমাদের মতে উমরার ক্ষেত্রেও আবরোধ সাব্যস্ত হয়।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, সাব্যস্ত হবে না। কেননা, উমরা তো নির্ধারিত কোন সময়ের সাথে আবদ্ধ নয়।

আমাদের দলীল এই যে, নবী (সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম উমরা অবস্থায় হুদায়বিয়ায় অবরুদ্ধ হয়েছিলেন।

তাছাড়া অসুবিধা দূর করার জন্যই হালাল হওয়া অনুমোদন করা হয়েছে। আর এটা উমরার ইহরামেও বিদ্যমান রয়েছে। আর যখন احصار (বা অবরোধ) সাব্যস্ত হয়েছে, তখন তার উপর কাযা ওয়াজিব। যেহেতু সে হালাল হয়েছে, যেমন হজ্জের ক্ষেত্রে।

কিরানকারীর উপর একটি হজ্জ ও দু'টি উমরা ওয়াজিব হবে। হজ্জ এবং দু'টি উমরার একটি ওয়াজিব হওয়ার কারণ তো আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। আর দ্বিতীয় উমরা ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, শুরু করা শুদ্ধ হওয়ার পর সে তা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

কিরানকারী (অবরুদ্ধ ব্যক্তি) যদি হাদী প্রেরণ করে এবং সংশ্লিষ্ট লোকদের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে যে, একটি নির্ধারিত দিনে তারা তা যবাহ করবে, এরপর احصار বা অবরোধ উঠে যায়। এখন যদি অবস্থা এমন হয় যে, সে হজ্জ ও হাদী গিয়ে ধরতে পারবে না, তাহলে মক্কা অভিমুখে গমন করা তার জন্য জরুরী হবে না। বরং হাদী যবাহ্ করে হালাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কেননা মক্কা অভিমুখে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য তথা হজ্জের ক্রিয়াকর্ম আদায় করার সময় ফউত হয়ে গেছে।

আর যদি সে উমরার মাধ্যমে হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যে যায়, তাহলে সে তাও করতে পারে। কেননা সে তো হজ্জ ফউতকারী।

আর যদি হজ্জ ও হাদী দু'টোই পাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে যাওয়া তার জন্য জরুরী হবে। কেননা স্থলবর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার পূর্বে অক্ষমতা দূর হয়ে গেছে।

যদি (সেখানে গিয়ে) সে হাদী পেয়ে যায়, তাহলে সেটাকে (বিক্রি করা, সাদাকা করা ইত্যাদি) যা ইচ্ছা তা করতে পারে। কেননা সে তার মালিক, আর সেটা এমন একটা উদ্দেশ্যের জন্য নির্দিষ্ট করে ছিলো, যা থেকে সে এখন মুক্ত হয়ে গেছে।

যদি এমন হয় যে, হাদী পাবে কিন্তু হজ্জ পাবে না, তাহলে হালাল হয়ে যাবে। কেননা সে মূল বিষয় লাভে অপারগ। আর যদি হজ্জ পাওয়া সম্ভব হয়, হাদী পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তার জন্য হালাল হওয়া জাইয হবে।

এ সিদ্ধান্ত সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। এই শেষ প্রকারটি হজ্জ অবস্থায় অবরুদ্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে সাহেবাইনের মত অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে না। কেননা তাঁদের মতে احصار এর দম ইয়াওমুন নহরের সময় দ্বারা আবদ্ধ। সুতরাং যে হজ্জ পাবে সে হাদী অবশ্যই পাবে। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এই প্রকারটি প্রযোজ্য হবে। আর উমরা অবস্থায় অবরুদ্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে সঠিক হবে। কেননা, (উমরার ক্ষেত্রে) যবাহ্ করার বিষয়টি দশ তারিখের সাথে আবদ্ধ নয়।

কিয়াসের দলীল এই যে, আর এটা হলো ইমাম যুফার (র.)-এর মত, সে তো স্থলবর্তী তথা হাদী দ্বারা উদ্দেশ্য লাভের পূর্বে মূল তথা হজ্জ আদায় করতে সক্ষম।

সূক্ষ্ম কিয়াসের দলীল এই যে, যদি আমরা মক্কা অভিমুখে যাওয়াকে তার জন্য আবশ্যকীয় বলে সাব্যস্ত করি, তাহলে তার সম্পদ নষ্ট হবে। কেননা, সে যবাহ্ করার জন্য হাদী অগ্রে প্রেরণ করেছে, অথচ তার উদ্দেশ্য লাভ হচ্ছে না। আর মালের সম্মানতো জানের সম্মানের মতই।

আর তার অধিকার রয়েছে। ইচ্ছা করলে সে সেখানে কিংবা অন্যখানে অবস্থান করবে, যাতে তার পক্ষ থেকে যবাহ্ করা হয়। আর সে হালাল হতে পারে। আর চাইলে ইহরামের মাধ্যমে যে ইবাদত আদায়ের বাধ্যবাধকতা সে গ্রহণ করেছে তা আদায় করার জন্য মক্কায় যেতে পারে। আর এটাই উত্তম। কেননা এটা কৃত ওয়াদা পূর্ণ করার অধিক নিকটবর্তী।

যে ব্যক্তি আরাফায় উকূফ করার পর অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো, সে অবরুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে না। কেননা হজ্জ ফউত হওয়া থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি মক্কায় অবরুদ্ধ হয়েছে এবং তাকে তাওয়াফ ও উকূফ থেকে বাধা প্রাপ্ত হয়েছে, সে অবরুদ্ধ বলেই গণ্য হবে। কেননা তার জন্য হজ্জ পূর্ণ করা দুঃসাধ্য হয়ে গেছে। সুতরাং এটা হরমের বাইরে অবরুদ্ধ হওয়ার মতই হলো। যদি তাওয়াফ ও উকূফ এ দু'টির যে কোন একটি করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে অবরুদ্ধ বলে গণ্য হবে না।

তাওয়াফের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, হজ্জ ফউতকারী ব্যক্তি তাওয়াফ দ্বারাই হালাল হয়ে থাকে। আর হালাল হওয়ার জন্য দম ওয়াজিব হয় তাওয়াফের স্থলবর্তী হিসাবে। উকূফের ক্ষেত্রে কারণ আমরা আগে বর্ণনা করেছি (অর্থাৎ আরাফায় উকূফ করার পর احصار সাব্যস্ত হয় না।)

কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু আমি যে বিশদ বিবরণ তোমাকে অবহিত করেছি, তা-ই শুদ্ধ।

হজ্জ ফউত হওয়া

যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধল, কিন্তু আরাফার উকূফ ফউত হয়ে গেলো, এমন কি দশ তারিখের ফজর উদিত হয়ে গেলো, তাহলে তার হজ্জ ফউত হয়ে গিয়েছে। কেননা আমরা উল্লেখ করেছি যে, উকূফের সময় দশ তারিখের ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত প্রলম্বিত।

আর তার কর্তব্য তাওয়াফ ও সাঈ করে হালাল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বছর হজ্জ কাযা করবে। আর তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ– যে ব্যক্তি রাত্রেও আরাফার উকূফ ফউত করলো তার হজ্জ ফউত হয়ে গেলো। সুতরাং সে যেন উমরার মাধ্যমে হালাল হয়ে যায়। আর তার উপর পরবর্তী বছর হজ্জ (কাযা) করা ওয়াজিব। আর উমরা তো তাওয়াফ ও সাঈ ছাড়া আর কিছু নয়।

তাছাড়া ইহরাম বিশুদ্ধরূপে সংঘটিত হওয়ার পর দুই ইবাদাতের (হজ্জ ও উমরার) যে কোন একটি আদায় করা ছাড়া উক্ত ইহরাম থেকে বের হওয়ার কোন উপায় নেই। যেমন অনির্ধারিত ইহরামের ক্ষেত্রে।[১] তবে এখানে যেহেতু হজ্জ করতে সে অক্ষম হয়ে গেছে, সেহেতু তার জন্য উমরা নির্ধারিত হয়ে গেছে। আর তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। কেননা উমরার ক্রিয়াকর্ম দ্বারাই হালাল হওয়া সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং হজ্জ ফউতকারীর ক্ষেত্রে উক্ত উমরা অবরুদ্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যবাহ্-এর পর্যায়ে গণ্য। তাই উভয়টিকে একত্র করা হবে না।

উমরা কখনো ফউত হয় না। পাঁচটি দিন ছাড়া সারা বছর তা জাইয রয়েছে। ঐ পাঁচদিন উমরা করা মাকরূহ। দিনগুলো হলো আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এবং আইয়ামে তাশরীক। কেননা 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই পাঁচদিন তিনি উমরা মাকরূহ্ বলতেন। তাছাড়া এগুলো হলো হজ্জের দিন। সুতরাং সেগুলো হজ্জের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আরাফার দিন যাওয়ালের (সূর্য হেলে পড়ার) পূর্বে উমরা মাকরূহ্ হবে না। কেননা হজ্জের রুকন (অর্থাৎ আরাফার উকূফ) আরম্ভ হয় যাওয়ালে পরে, পূর্বে নয়। তবে আমরা যা উল্লেখ করেছি, তাই হলো প্রকাশ্য মাযহাব।

---

১. অর্থাৎ শুধু ইহরামের নিয়্যত করলো, হজ্জ বা উমরার নিয়্যত করলো না; তাহলে তার ইহরাম সহীহ্ হয়ে যাবে। এবং দু'টির যে কোন একটি আদায় না করলে ইহরাম থেকে মুক্ত হতে পারবে না। বাকী কোনটা করবে তাওয়াফ শুরু করায়, যাকে সে নিজেই নির্ধারণ করবে।

অবশ্য মাকরূহ্ হওয়া সত্ত্বেও যদি এই দিনগুলোতে উমরা আদায় করে, তাহলে শুদ্ধ হবে। এবং ঐ দিনগুলোতে সে উমরার কারণে মুহরিম থাকবে। কেননা মাকরূহ্ হওয়ার কারণ উমরা বহির্ভূত কারণে রয়েছে। আর তা হলো হজ্জের বিষয়টির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং হজ্জের সময়কে হজ্জের জন্য খালেস করে রাখা। সুতরাং উমরা শুরু করা শুদ্ধ হবে।

উমরা হলো সুন্নাত (মুআক্কাদাহ্)।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তা ফরয। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ اَلْعُمْرَةُ فَرِيْضَةٌ كَفَرِيْضَةِ الْحَجِّ –হজ্জের ফরযের মতো উমরাও একটি ফরয।

আমাদের প্রমাণ হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ اَلْحَجُّ فَرِيْضَةٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ। হজ্জ হলো ফরয এবং উমরা হলো নফল।

তাছাড়া উমরা কোন সময়ের সাথে আবদ্ধ নয়। তদুপরি তা উমরা ব্যতীত অন্য (যেমন, হজ্জের) নিয়্যত দ্বারাও আদায় হয়। যেমন হজ্জ ফউতকারীর ক্ষেত্রে। আর এটা হলো নফলের আলামত।

ইমাম শাফিঈ (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তার ব্যাখ্যা এই যে, উমরা হজ্জের ন্যায় কতিপয় আমলের মাঝে নির্ধারিত। কেননা পরস্পর বিপরীত হাদীছ দ্বারা ফরয ছাবিত হয় না

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***উমরা হলো তাওয়াফ ও সাঈ।*** তামাত্তু অধ্যায়ে আমরা তা আলোচনা করেছি। আল্লাহ্ সঠিক বিষয় অধিক অবগত।

অপরের পক্ষে হজ্জ করা

এ বিষয়ে মূলনীতি এই যে, মানুষ নিজের আমলের সাওয়াব অন্যের জন্য নির্ধারণ করতে পারে। চাই তা সালাত হোক, রোযা হোক, সাদাকা হোক বা অন্য আমল হোক। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) সাদা কালো মিশ্রিত রং এর দু'টি মেষ কুরবানী করেছেন। একটি নিজের পক্ষ থেকে আর দ্বিতীয়টি তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে– যারা আল্লাহ্‌র একত্ব স্বীকার করে এবং তিনি যে আল্লাহ্‌র বার্তা পৌঁছিয়েছেন তার সাক্ষ্য দেয়। এখানে তিনি দু'টি বকরীর একটিকে আপন উম্মতের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

আর ইবাদত কয়েক প্রকার ঃ (১) কেবলমাত্র আর্থিক, যেমন যাকাত; (২) কেবল দৈহিক, যেমন সালাত; (৩) উভয়টি জড়িত, যেমন, হজ্জ। প্রথম প্রকার ইবাদাতের ক্ষেত্রে আদায় করার সামর্থ্য থাকা ও অক্ষমতা উভয় অবস্থায় স্থলবর্তীতা প্রয়োগ হয়। কেননা স্থলভিত্তিক কার্য দ্বারাই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। দ্বিতীয় প্রকারে কোন অবস্থাতেই স্থলবর্তিতা কার্যকর হয় না। কেননা নফসের সাধনা যা এ ইবাদাতের উদ্দেশ্য, তা স্থলাভিষিক্ত দ্বারা অর্জিত হয় না।

তৃতীয় প্রকারে অক্ষমতার অবস্থায় স্থলবর্তিতা কার্যকর হয়। কেননা এতে দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ মাল খরচের মাধ্যমে কষ্ট লাভের বিষয়টি অর্জিত হয়। কিন্তু সক্ষমতার অবস্থায় তা কার্যকর হবে না। কেননা এতে সাধনা অর্জিত হয় না।

হজ্জের ক্ষেত্রে স্থলবর্তিতা জাইয হওয়ার জন্য মৃত্যুর সময় পর্যন্ত স্থায়ী অক্ষমতা শর্ত। কেননা হজ্জ হলো সারা জীবনের ফরয। পক্ষান্তরে নফল হজ্জের ক্ষেত্রে সক্ষম অবস্থায়ও স্থলবর্তিতা জাইয রয়েছে। কেননা নফলের বিষয়ে অধিকতর গোঞ্জায়েশ আছে।

হানাফী মাযহাবের প্রকাশিত মতে যার পক্ষ থেকে হজ্জ করা হচ্ছে, তার পক্ষ থেকেই হজ্জটি সংঘটিত হবে। আলোচ্য বিষয়ে বর্ণিত হাদীছসমূহ একথারই সাক্ষ্য দেয়। যেমন খাছআম গোত্রের জনৈকা স্ত্রী লোক সম্পর্কিত হাদীছ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে বলেছিলেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করো এবং উমরা করো।

মুহাম্মদ (র.) থেকে একটি বর্ণনা অবশ্য আছে যে, যে হজ্জ করবে, তারই পক্ষে সংঘটিত হবে। তবে আদেশদাতা খরচের সাওয়াব পাবে। কেননা হজ্জ হলো একটি দৈহিক ইবাদত। আর অক্ষমতার ক্ষেত্রে অর্থব্যয়কে হজ্জের স্থলবর্তী করা হয়, যেমন, রোযার ক্ষেত্রে ফিদ্‌ইয়া।

কুদূরীর লেখক বলেন, *যাকে দু'জন মানুষ আদেশ করলো যেন সে তাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একটি হজ্জ পালন করে। আর সে তাদের উভয়ের পক্ষ থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধলো। তবে এ হজ্জটি হজ্জকারীর পক্ষ থেকেই গণ্য হবে। আর*

তাকে খরচের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা, আদেশদাতার পক্ষ থেকেই হজ্জ সংঘটিত হয়। এ কারণেই হজ্জকারী ইসলামের ফরয হজ্জ থেকে মুক্ত হতে পারে না। আর এখানে উভয়ের প্রত্যেকে তাকে আদেশ করেছে, যেন সে হজ্জটিকে অন্য কারো শরিকানা ছাড়া তার একার জন্য আদায় করে। অথচ অগ্রাধিকারের কোন সম্ভাবনা না থাকার কারণে হজ্জকে দু'জনের কোন একজনের পক্ষ থেকে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

সুতরাং আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকেই তা সংঘটিত হবে। আর তার পক্ষ থেকে সংঘটিত হওয়ার পরে দু'জনের কোন একজনের মাঝে নির্ধারণ করার সম্ভাবনা নেই।

পক্ষান্তরে যদি নিজের আম্মা-আব্বার পক্ষ থেকে হজ্জ করে, তবে তার হুকুম ভিন্ন। সেক্ষেত্রে হজ্জটিকে সে দু'জনের যে কোন একজনের জন্য নির্ধারণ করতে পারে। কেননা, সে তো নিজের আমলের সাওয়াব দু'জনের একজনের জন্য কিংবা উভয়ের জন্য নির্ধারণ করার মাধ্যমে স্বেচ্ছায় দানকারী হচ্ছে, সুতরাং হজ্জটি তার সাওয়াবের সবব বা কারণ রূপে সম্পন্ন হওয়ার পর তার ইখতিয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তো সে আদেশদাতার আদেশের ভিত্তিতে আমলটি করছে। অথচ উভয়ের আদেশকেই সে লংঘন করেছে। সুতরাং আমলটি তার নিজের পক্ষ থেকে হবে। যদি সে তাদের প্রদত্ত অর্থ ব্যয় করে থাকে, তাহলে সে খরচের ক্ষতিপূরণ করবে। কেননা সে আদেশদাতার খরচের টাকা নিজের হজ্জে খরচ করেছে।

আর যদি ইহরামকে সে অনির্ধারিত রেখে থাকে, অর্থাৎ অনির্ধারিতভাবে দু'জনের একজনের নিয়্যত করে থাকে এবং এভাবেই হজ্জ করে যায়, তাহলে সে (আদেশ দাতার) কথা অমান্য করলো। অগ্রধিকার না থাকার কারণে। পক্ষান্তরে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম শুরু করার পূর্বে যদি একজনকে নির্ধারণ করে নেয় তাহলেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট একই হুকুম হবে।

আর এই হলো কিয়াস। কেননা সে নির্ধারণ করার জন্য আদিষ্ট ছিল। আর অনির্ধারিত রাখা মানে সে আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করা। সুতরাং তা নিজের পক্ষ থেকে হবে। পক্ষান্তরে হজ্জ বা উমরা নির্ধারণ না করার বিষয়টি ভিন্ন। এক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছা মতো নির্ধারণ করার ইখতিয়ার তার রয়েছে।[১] কেননা প্রথম সুরতে হজ্জের দায়িত্ব গ্রহণকারী অজ্ঞাত। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সুরতে ইহরামের হকদার অজ্ঞাত।

সূক্ষ্ম কিয়াসের যুক্তি এই যে, আমলের মাধ্যম বা উপায় রূপে ইহরাম শরীআত অনুযায়ী প্রবর্তিত হয়েছে। নিজস্ব সত্তায় মাকসূদ ও উদ্দেশ্য রূপে নয়। আর অস্পষ্ট ইহরাম পরবর্তীতে নির্ধারণের মাধ্যমে উপায় বা ওসীলা রূপে গণ্য হতে পারে। সুতরাং শর্ত রূপে তা যথেষ্ট হবে।

---

১. এটি একটি প্রশ্নের জবাব। কেননা প্রশ্ন হতে পারে যে, কেউ যদি হজ্জ বা উমরা নির্ধারণ না করে, অনির্ধারিত ভাবে ইহরাম করে তাহলে সে হজ্জ বা উমরা যেটা ইচ্ছা নির্ধারণ করে নেয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু কার পক্ষে থেকে হজ্জ করবে সেটা নির্ধারণ না করে ইহরাম করলে পরবর্তীতে সেটা নির্ধারণ করে নেয়ার ইখতিয়ার কেন থাকবে না।

উত্তর এই যে, পক্ষ নির্ধারণ না করে ইহরামের সুরতে ইহরামের দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তিটি অজ্ঞাত হচ্ছে। এই অজ্ঞাত আমল আদায়ের শুদ্ধতা ব্যাহত করে না। কিন্তু ইহরামটি যে আমলের হক তা অজ্ঞাত থাকা ইবাদত সম্পন্ন হওয়ার পথে অন্তরায়।

পক্ষান্তরে স্বয়ং ক্রিয়াকর্মগুলোই যদি অনির্ধারিতভাবে আদায় করে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা যা আদায় করা হয়ে গেছে, সেটাকে নির্ধারণ করার উপায় নেই। সুতরাং সে আদেশদাতার বিরুদ্ধাচরণকারী হলো।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ তাকে তার পক্ষ থেকে হজ্জে কিরান করার আদেশ করে, তাহলে ইহরামকারীর উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা এটা তো ওয়াজিব হয়েছে আল্লাহ্ পাক দু'টি আমল একত্র করার যে তাওফীক দান করেছেন। তার শোকর হিসাবে। আর এই নিয়ামত তো আদিষ্ট ব্যক্তির আপন সত্তার সংগে বিশিষ্ট। কেননা প্রকৃত কাজ তো তার পক্ষ থেকেই হচ্ছে।

আলোচ্য মাসআসাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে এ মর্মে বর্ণিত মতামতের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে যে, হজ্জ তো আসলে আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকেই সংঘটিত হয়।

তদ্রূপ যদি কেউ তাকে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করার আদেশ করে আর অন্য একজন তাকে তার পক্ষ থেকে উমরা করার আদেশ করে, এবং উভয়ে তাকে কিরানের অনুমতি প্রদান করে, তবে দম তারই উপর ওয়াজিব হবে। এর কারণ যা আমরা বলে এসেছি। বাধাগ্রস্ত হওয়ার (احصار এর) দম আদেশদাতার উপর ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মত। আর ইমাম আবূ ইউসফ (র.) বলেন, হজ্জকারীর উপর ওয়াজিব। কেননা এটা ইহরাম প্রলম্বিত হওয়ার কষ্ট দূর করার জন্য হালাল হওয়ার কারণে ওয়াজিব হয়েছে। আর এই কষ্টের সম্পর্ক তারই সাথে। সুতরাং দম তারই উপরই ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর দলীল এই যে, আদেশদাতাই তাকে এই যিম্মাদারিতে ঢুকিয়েছে। সুতরাং তারই কর্তব্য হবে তাকে মুক্ত করা।

যদি কোন মাইয়েতের পক্ষ থেকে সে হজ্জ করে থাকে আর অবরুদ্ধ (احصار) হয়ে পড়ে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মাইয়েতের মাল থেকে (احصار -এর) দম ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, মাইয়েতের মালের এক-তৃতীয়াংশ থেকে ওয়াজিব হবে। কেননা এটি দান। যেমন যাকাত ইত্যাদি।

আর কারো কারো মতে, সমগ্র মাল থেকে দম ওয়াজিব হবে। কেননা তা আদেশদাতার জন্য হক হিসাবে ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং তা ঋণ পর্যায়ের।

স্ত্রী সহবাস জনিত দম হজ্জকারীর উপর ওয়াজিব হবে। কেননা এটি অপরাধের দম। আর সে স্বেচ্ছায় অপরাধী হয়েছে।

এবং খরচের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। অর্থাৎ যদি উকূফের পূর্বে সহবাস করে থাকে। যে কারণে হজ্জ ফাসিদ হয়ে যায়। কেননা তাকে শুদ্ধ হজ্জ আদায় করার আদেশই করা হয়েছে। হজ্জ ফউত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। তখন হজ্জকারীকে খরচের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা সে তা স্বেচ্ছায় ফউত করেনি।

আর যদি উকূফের পরে সহবাস করে, তাহলে তার হজ্জ ফাসিদ হবে না এবং খরচের ক্ষতিপূরণও দিতে হবে না। কেননা আদেশদাতার উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে গেছে। আর আদিষ্ট ব্যক্তির নিজের মাল থেকেই তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি। তদ্রূপ কাফ্ফারার যাবতীয় দমও হজ্জকারীর উপর ওয়াজিব হবে। এর কারণও যা আমরা বলে এসেছি।

আর যদি কেউ ওসীয়ত করে যায় যে, তার পক্ষ থেকে যেন হজ্জ করান হয়। পরে ওয়ারিছগণ তার পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি দ্বারা হজ্জের জন্য পাঠান। যখন সে কূফায় উপনীত হওয়ার পর সে মারা গেল কিংবা তার খরচের অর্থ চুরি হয়ে গেলো অথচ ইতোমধ্যে সে অর্ধেক অর্থ ব্যয় করে ফেলেছে, তাহলে মাইয়েতের পক্ষ থেকে তার বাড়ী থেকে হজ্জ করানো হবে অবশিষ্ট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, যেখানে প্রথম ব্যক্তি মারা গেছে, সেখান থেকে হজ্জ করাতে হবে। তাহলে এখানে আলোচ্য বিষয় হল দু'টি ঃ পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ বিবেচনা করা এবং হজ্জের স্থান বিবেচনা করা।

প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে 'মতনে' যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যে মাল তাকে দেয়া হয়েছিল তার কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই অবশিষ্ট মাল দ্বারা তার পক্ষ হতে হজ্জ করানো হবে। অন্যথায় ওসীয়ত বাতিল হয়ে যাবে। তিনি একথা বলেন, ওসীয়তকারীর নিজের নির্ধারণ করার উপর কিয়াস করে।[২] কেননা তত্ত্বাবধানকারীর নির্ধারণ করা তার নিজের নির্ধারণ করার মতই।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে প্রথম তৃতীয়াংশ থেকে যা অবশিষ্ট আছে তা থেকেই তার পক্ষ হতে হজ্জ করান হবে। কেননা ঐ তৃতীয়াংশই হলো ওসীয়ত কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্র।

---

২. অর্থাৎ ওসীয়তকারী যদি নিজে কিছু পরিমাণ মাল নির্ধারণ করে তাহলে মাল শেষ হয়ে গেলে তার ওসীয়ত বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং এখানেও একই হুকুম হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, তত্ত্বাধায়কের মাল বন্টন করা এবং মাল পৃথক করা তখনই সহীহ্ হবে, যখন সে মাল ঐভাবে অর্পণ করবে, যেভাবে ওসীয়তকারী নির্ধারণ করেছে।[৩] কেননা মাল কবজা করার জন্য তার কোন দাবীদার নেই। আর এখানে (ওসীয়তকারীর নির্ধারিত সুরতে) সম্পদ অর্পণ করা পাওয়া যায়নি। তাই এটি হজ্জের খরচ আলাদা করার পূর্বে মারা যাওয়ার মত হলো। সুতরাং অবশিষ্ট মালের তৃতীয়াংশ থেকে হজ্জ করানো হবে।

দ্বিতীয় বিষয় সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতামতের দলীল এই যে, -আর কিয়াসের দাবীও তাই-সফরের যে পরিমাণ অংশ অস্তিত্ব লাভ করেছিল, তা দুনিয়ার কার্যকর বিধানের দিক থেকে বাতিল হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ اذَا مَاتَ ابْنُ اٰدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلٰثٍ ... -ইব্ন আদম যখন মারা যায়, তখন তার আমল নিঃশেষ হয়ে যায় তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া।

আর ওসীয়তের কার্যকারিতা হলো দুনিয়ার আহকামের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ওসীয়তকারীর বাড়ী থেকেই ওসীয়ত বহাল থাকবে এবং ধরে নেয়া হবে যেন সফরে বের হওয়ার অস্তিত্বই ঘটেনি।

সাহেবাইনের দলীল হল, -আর এই সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী-যে তার সফর বাতিল হয়নি। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ۔

-যে ব্যক্তি তার বাড়ী থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পথে বের হয় অতঃপর সে মারা যায়, তার আজর (ও সাওয়াব) আল্লাহ্র যিম্মায় থাকবে ৪ ঃ ১০০)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ مَنْ مَاتَ فِى طَرِيْقِ الْحَجِّ كُتِبَ لَهُ حَجَّةٌ مَبْرُوْرَةٌ -যে ব্যক্তি হজ্জের পথে মারা যায়, তার জন্য প্রতি বছর একটি হজ্জে মাবরূর লেখা হবে।

যখন তার সফর বাতিল হলো না তখন সেই স্থান থেকেই তার ওসীয়ত বিবেচনা করা হবে। মূল মতপার্থক্য হলো ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে নিজেই হজ্জ করতে রওয়ানা হয়েছে (আর পথে মারা গেছে। এবং তার পক্ষ থেকে হজ্জ করানোর ওসীয়ত করেছে।) এর উপর ভিত্তি হবে হজ্জ করার জন্য আদিষ্ট ব্যক্তির বিষয়টি (যে পথে মারা গেল।) ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি পিতামাতার পক্ষ থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধল, তার জন্য দু'জনের যে কোন

৩. এখানে ওসীয়তকারীর নির্ধারিত দূরত্ব হলো, এমনভাবে মাল প্রদান করা, যাতে তার হজ্জ পূর্ণ হয়। কিন্তু তা হয়নি।

একজনের জন্য হজ্জটি নির্ধারণ করে নেওয়াই যথেষ্ট হবে। কেননা যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষ থেকে তার অনুমতি ছাড়া হজ্জ করলো, সে মূলতঃ নিজের হজ্জের দাওয়াত তাকে প্রদান করল আর তা সম্ভব হতে পারে হজ্জ আদায় হওয়ার পর। সুতরাং হজ্জ আদায়ের পূর্বে তার নিয়্যত মূল্যহীন হলো। আর হজ্জ আদায়ের পর তার সাওয়াব দু'জনের যে কোন একজনের জন্য নির্ধারণ করা বৈধ হবে।

হজ্জ করার জন্য আদিষ্ট ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন। ইতোপূর্বে উভয়ের মাঝে পার্থক্য সম্পর্ক বর্ণনা করে এসেছি। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

হাদী সম্পর্কে

সর্বনিম্ন হাদী হলো বকরী। কেননা নবী (সা.)-কে হাদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, তার সর্বনিম্ন হলো বকরী।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *হাদী তিন প্রকার ঃ উট, গরু ও বকরী।* কেননা নবী (সা.) যখন বকরীকে সর্বনিম্ন সাব্যস্ত করেছেন, তখন তার উচ্চ পর্যায় পরিমাণ থাকাও জরুরী। আর তা হলো গরু ও উট।

আর এ কারণে যে, হাদী হল ঐ প্রাণী, যা হাদিয়া স্বরূপ হরম শরীফের দিকে প্রেরণ করা হয়, যাতে তথায় যবাহ্‌র মাধ্যমে তাকাররুব হাসিল করা যায়। আর এই অর্থের দিক দিয়ে তিনটিই সমান।

কুরবানীতে যা যবাহ্‌ করা জাইয, তাই হাদী রূপেও জাইয। কেননা এটা এমন এক ইবাদত, যার সম্পর্ক হলো রক্ত প্রবাহিত করার সাথে যেমন কুরবানীর বিষয়। সুতরাং একই রকম পশুর সংগে উভয়টি সম্পৃক্ত থাকবে।

হজ্জের সকল ব্যাপারে বকরীই যথেষ্ট। কেবল দু'টি ক্ষেত্র ব্যতীত। (এক) যে ব্যক্তি জানাবাতের অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারাত করলো এবং (দুই) যে ব্যক্তি উকুফের পরে স্ত্রী সহবাস করলো।

এদু'টি ক্ষেত্রে বাদানাহ (উট বা গরু) ছাড়া জাইয হবে না। এর কারণ পিছনে (জিনায়াত অধ্যায়ে) আমরা বলে এসেছি।

নফল তামাত্তু ও কিরামের হাদীর গোশত খাওয়া জাইয। কেননা এটা ইবাদত রূপে যবাহ্‌কৃত পশু। সুতরাং কুরবানীর ন্যায় এগুলোর গোশত খাওয়া জাইয। আর সহীহ্‌ হাদীছে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) তাঁর হাদীর গোশত আহার করেছেন এবং তার শুরুয়াও পান করেছেন।

আর হাজীদের জন্য হাদীর গোশত খাওয়া মুস্তাহাব। এর দলীল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ। তদ্রূপ কুরবানীতে যেভাবে বলা হয়েছে, সেইভাবে হাদীর গোশত সাদাকা করা মুস্তাহাব।

অন্যান্য হাদীর গোশত খাওয়া জাইয নেই। কেননা সেগুলো হলো কাফ্‌ফারার দম। আর সহীহ্‌ হাদীছে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) যখন হুদায়বিয়ায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং হযরত নাজিয়া আল-আসলামী (রা.)-এর হাতে হাদী প্রেরণ করেছিলেন, তখন তাকে বলে দিয়েছিলেন, তুমি এবং তোমার সাথীরা তা থেকে কিছু খাবে না।

নফল তামাত্তু ও কিরানের হাদী ইয়াওমুন নহর ছাড়া যবাহ্ করা জাইয নয়।

লেখক বলেন, *মাবসূত কিতাবে রয়েছে যে, নফল হাদী ইয়াওমুন নহরের পূর্বে যবাহ্ করা জাইয, তবে ইয়াওমুন নহরে যবাহ্ করা উত্তম।*

আর এ-ই সহীহ্ মত। কেননা নফলরূপে যবাহ্ করার ক্ষেত্রে ইবাদত হলো এই হিসাবে যে, সেগুলো হাদী। আর তা সাব্যস্ত হয়ে যায় হরমে পৌঁছানোর মাধ্যমে।

আর তা যখন পাওয়া গেলো তখন ইয়াওমুন নহরের বাইরেও যবাহ্ করা জাইয হবে। তবে কুরবানীর দিনগুলোতেই উত্তম। কেননা ঐ দিনগুলোতে যবাহ্ করার মাধ্যমে ইবাদতের গুণ অধিক প্রবল।

তামাত্তু ও কিরানের দমের ক্ষেত্রে কারণ হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ -অনন্তর তোমরা তা থেকে আহার কর। এবং দুস্থ-দরিদ্রদের আহার করাও। অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে (২২ ঃ ২৮-২৯)।

আর অপরিচ্ছন্নতা দূর করার বিষয়টি ইয়াওমুন-নহরের সংগে সম্পৃক্ত। তাছাড়া এটা হলো ইবাদতের দম। সুতরাং তা ইয়াওমুন-নহরের সাথে খাস হবে। যেমন, কুরবানী।

অন্যান্য হাদী যে কোন সময় ইচ্ছা যবাহ্ করা জাইয।

ইমাম শাফিঈ (র.) তামাত্তু ও কিরানের দমের উপর কিয়াস করে বলেন, ইয়াওমুন-নহর ছাড়া যবাহ্ করা জাইয নয়। কেননা তার মতে প্রতিটিই হলো ক্ষতিপূরণের দম।

আমাদের দলীল এই যে, এগুলো হলো কাফ্ফারার দম। সুতরাং ইয়াওমুন-নহরের সাথে তা বিশিষ্ট থাকবে না। কেননা এগুলো যখন ক্ষতি পূরণের জন্য ওয়াজিব হয়েছে, তখন অবিলম্বে তা দ্বারা ত্রুটি দূর করার জন্য তাড়াতাড়ি করাই উত্তম হবে। তামাত্তু ও কিরানের দম এর বিপরীত। কেননা, এ হলো ইবাদতের দম।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ***হরম ছাড়া অন্যত্র হাদী যবাহ্ করা জাইয হবে না।*** কেননা শিকারের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ هديا بالغ الكعبة এমন হাদী-যা কা'বায় উপনীত হবে।

সুতরাং কাফ্ফারা জাতীয় প্রতিটি দমের ক্ষেত্রেও এটা মূলনীতি হয়ে গেলো। তাছাড়া (অভিধানিক ভাবে) হাদী বলাই হয় এমন পশুকে, যা কোন স্থানে হাদিয়া স্বরূপ পাঠান হয়। আর তার স্থান হলো হরম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَفِجَاجُ مَكَّةَ كُلُّهَا مَنْحَرٌ -সমগ্র মীনা হলো যবাহ্স্থল এবং মক্কার সমগ্র পথ হলো যবাহর স্থল।

হাদীর গোশত হরম এবং অন্যান্য স্থানের মিসকীনদের মাঝে সাদাকা করা জাইয।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। (আমাদের দলীল এই যে,) কেননা সাদাকা হলো একটি বোধগম্য ইবাদত। আর যে কোন দরিদ্রকে সাদাকা করাই ইবাদত।

ইমাম কুদূরী বলেন, *হাদীসমূহকে আরাফায় নিয়ে যাওয়া (বা চিহ্নিত করা) জরুরী নয়।* কেননা হাদী শব্দটি বিশেষ স্থানে নিয়ে গিয়ে সেখানে যবাহ্ করার মাধ্যমে সাওয়াব অর্জনের অর্থ নির্দেশ করে, আরাফায় নিয়ে যাওয়া বা চিহ্নিত করার অর্থ জ্ঞাপন করে না। সুতরাং তা ওয়াজিব হবে না।

আর যদি তামাত্তুর হাদী আরাফায় নিয়ে যায়, তবে তা উত্তম। কেননা তা যবাহ্ করা 'ইয়াওমুন নহর'-এর সাথে নির্দিষ্ট। আর হয়ত সম্ভবতঃ সে তা রাখার জন্য কাউকে নাও পেতে পারে, তখন সংগে করে আরাফায় নিয়ে যেতে বাধ্য হবে।

তাছাড়া এটা হলো ইবাদতের দম। সুতরাং এর ভিত্তি হবে ঘোষণার উপর। কাফ্ফারার দম হলো এর বিপরীত। কেননা এগুলো ইয়াওমুন নহরের পূর্বে যবেহ করা জাইয রয়েছে। যেমন ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। এবার অপরাধই হলো তা (ওয়াজিব হওয়ার) কারণ। সুতরাং তা গোপন রাখাই সমীচীন।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উটের ক্ষেত্রে নহর এবং গরু ও বকীরর ক্ষেত্রে যবাহ্ই উত্তম। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ -তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং নহর কর। এখানে নহরের ব্যাখ্যায় উট বলা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন : اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً -আর তোমরা গরু যবাহ্ করবে।

আর আল্লাহ্ তা'আলা (বকরী সম্পর্কে) বলেছেন : وفديناه بذبح عظيم -আর আমরা তার পরিবর্তে ফিদ্ইয়া রূপে এক মহান যবিহা দান করেছি। আর 'যিব্হ' বলা হয় ঐ পশুকে, যা যবাহ্র জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আর সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) উটকে নহর করেছেন এবং গরু ও বকরী যবাহ্ করেছেন।

হাদীসমূহের ক্ষেত্রে যদি সে ইচ্ছা করে তবে উটকে দাঁড়ানো অবস্থায় নহর করতে পারে, কিংবা তাকে বসিয়ে নহর করতে পারে। সে যা-ই করবে, তা-ই ভাল। তবে উত্তম হলো, দাঁড়ানো অবস্থায় নহর করা। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে হাদীসমূহ নহর করেছেন। আর সাহাবা কিরামও সামনের বাঁ পা বেঁধে দাঁড়ানো অবস্থায় নহর করেছেন।

গরু ও বকরী দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে যবাহ্ করবে না। কেননা পার্শ্বে শোয়ানো অবস্থায় যবাহ্র স্থানটি অধিক স্পষ্ট থাকে। ফলে যবাহ্ করা সহজ হয়। আর এ দু'টির ক্ষেত্রে যবাহ্ই হলো সুন্নাত।

ভালোভাবে যবাহ করতে পারলে উত্তম হলো নিজেই যবাহ্ করা। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) বিদায় হজ্জের সময় একশ' উট নিয়েছিলেন এবং ষাটের কিছু উপরে

(তেষট্টিটি) নিজে নহর করেছেন। এবং অবশিষ্টগুলোর ব্যাপারে হযরত আলী (রা.)-কে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন।

তাছাড়া এটা হলো ইবাদত, আর ইবাদত নিজে আঞ্জাম দেওয়াই উত্তম। কেননা এতে অধিক বিনয় রয়েছে। তবে কোন ব্যক্তি তা ভালোরূপে করতে পারে না। তাই আমরা অন্যকে দায়িত্ব প্রদান অনুমোদন করেছি।

ইমাম কুদূরী বলেন, উটের গায়ের চট ও রশি সাদাকা করে দেবে আর এগুলো দ্বারা কসাইয়ের মজুরি প্রদান করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আলী (রা.)-কে বলেছেন ঃ تَصَدَّقْ بِجِلَالِهَا وَبِخُطُمِهَا ولاتعط أُجْرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا -তার গায়ের চট এবং রশি সাদাকা করে দাও। আর তার এগুলো দ্বারা কশাইয়ের মজুরি দিও না।

যে ব্যক্তি উট নিয়ে যাওয়ার সময় তাতে আরোহণ করতে বাধ্য হলো, সে তাতে আরোহণ করতে পারে। যদি তাতে আরোহণ না করার উপায় থাকে, তাহলে আরোহণ করবে না। কেননা, সে এটাকে আল্লাহ্র জন্য একান্তভাবে নির্ধারণ করেছে। সুতরাং তার সত্তা বা উপাকারের সংগে সম্পৃক্ত কিছু তার নিজের জন্য ব্যবহার করবে না– যতক্ষণ না যবাহ্র স্থানে পৌছে যায়। তবে শুধু এ অবস্থায় যখন সে এর উপর সওয়াব হতে বাধ্য হয়। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) জনৈক ব্যক্তিকে উট নিয়ে যেতে দেখে বলেছিলেন, তোমরা সর্বনাশ। এতে আরোহণ করো।

এর ব্যাখ্যা এই যে, লোকটি অক্ষম ও অভাবগ্রস্ত ছিলেন।

যদি তাতে আরোহণ করে আর সে কারণে তাতে খুঁত সৃষ্টি হয়, তাহলে তার যে পরিমাণ খুঁত সৃষ্টি হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর যদি তার দুধ থাকে তাহলে তা দোহন করবে না। কেননা দুধ তা থেকেই জন্মায়। সুতরাং তা নিজের কাজে লাগাবে না; বরং তার ওলানে ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দেবে, যাতে বন্ধ হয়ে যায়। তবে এ হুকুম হলো যবাহ্র সময় নিকটবর্তী হলে। পক্ষান্তরে যদি যবাহ্র সময় বিলম্বিত হয়, তাহলে দোহন করবে এবং দুধ সাদাকা করে দেবে। যেন দোহন না করায় তার ক্ষতি না হয়। আর যদি তা নিজের প্রয়োজনে খরচ করে ফেলে, তাহলে অনুরূপ পরিমাণ দুধ বা তার মূল্য সাদাকা করে দেবে। কেননা তার যিম্মায় ক্ষতিপূরণ রয়েছে।

হাদী নিয়ে যাওয়ার সময় যদি তা পথে হালাক হয়ে যায় আর তা নফল হাদী হয় তাহলে তার উপর অন্য হাদী ওয়াজিব হবে না। কেননা ইবাদতের সম্পর্ক হয়েছিলো এই জন্তু বিশেষের সংগে, আর তা ফউত হয়ে গিয়েছে।

যদি সে হাদী ওয়াজিব হিসাবে হয়ে থাকে তাহলে তার স্থলে অন্য একটি আদায় করা ওয়াজিব। কেননা ওয়াজিব তার যিম্মায় রয়ে গেছে।

যদি তাতে বড় ধরনের দোষ দেখা দেয়।[১] তাহলে তার স্থলে অন্য একটি আদায় করতে হবে। কেননা বড় ধরনের দোষযুক্ত হলে তা দ্বারা ওয়াজিব আদায় হয় না। সুতরাং অন্য একটি দ্বারা আদায় করা জরুরী। আর দোষযুক্ত পশুকে যা ইচ্ছা তাই করবে। কেননা এটা এখন তার অন্যান্য সম্পদের সংগে যুক্ত হয়ে গিয়েছে।

পথে যদি উট মুমূর্ষু হয়ে পড়ে, তবে নফল হলে নহর করবে আর তার (কালাদার) জুতা তার রক্ত দ্বারা রঞ্জিত করে দেবে। আর উহা দ্বারা তার কুঁজের পাশে ছাপ মেরে দেবে। সে কিংবা অন্য কোন মালদার তার গোশত খাবে না।

নজিয়া আসলামী (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরূপ করতে আদেশ করেছিলেন। মতনে বর্ণিত نعل শব্দটি দ্বারা তার গলায় ঝুলানো কালাদা উদ্দেশ্য। এর ফলে মানুষ জানতে পারবে যে, এটি হাদী, তখন দরিদ্র লোকেরা তা ব্যবহার করবে। আর ধনী লোকেরা করবে না। এর কারণ এই যে, এটা খাওয়ার অনুমতি যবাহ্ করার স্থানে পৌঁছার শর্তের সাথে যুক্ত। সুতরাং এর পূর্বে তা হালাল না হওয়াই উচিত। তবে হিংস্র প্রাণীদের ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়ার চেয়ে দরিদ্রদের মাঝে সাদাকা করে দেয়া উত্তম। আর তাতে এক ধরনের ইবাদত রয়েছে এবং ইবাদতই হলো উদ্দেশ্য।

যদি উক্ত বাদানাহ্ ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে তার স্থলে অন্য বাদানাহ্ আদায় করবে। আর মুমূর্ষুটিকে যা ইচ্ছা করতে পারে। কেননা যে কাজের জন্য সেটাকে নির্ধারণ করেছিল, সেটা সে কাজের উপযুক্ত থাকেনি। আর এতে তার মালিকানা রয়েছে অন্যান্য সম্পদের মত। নফল, তামাত্তু-ও কিরানের হাদীকে 'কালাদাহ্' পরাবে। কেননা এটা ইবাদতের দম। আর কালাদাহ (ছেঁড়া জুতা বা চামড়ার মালা) ঝুলিয়ে দেয়াতে প্রচার ও ঘোষণা হয়, যা ইবাদতের দমের জন্য উপযোগী।

অবরোধের ও দণ্ডসমূহের দম-এর হাদীকে কালাদাহ্ পরাবে না। কেননা অপরাধ হলো এর কারণ। আর অপরাধকে গোপন রাখাই সম্মত। আর অবরোধের দম হলো ক্ষতিপূরণের জন্য। সুতরাং এটাকে ক্ষতিপূরণ জাতীয় (অর্থাৎ অপরাধ জনিত) সংগে যুক্ত করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র.) হাদী শব্দটি উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ তার উদ্দেশ্য হলো বাদানাহ্। কেননা বকরীকে সাধারণতঃ কালাদাহ্ পরানো হয় না। আর আমাদের মতে বকরীকে কালাদাহ্ পরানো সুন্নাত নয়। বকরীর ক্ষেত্রে কালাদাহ্ পরানোর মধ্যে কোন ফায়দা নেই। যেমন, পূর্বে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

---

১. যেমন কানের এক-তৃতীয়াংশের কিংবা অর্ধেকের বেশী ছিঁড়ে গেলো।

বিবিধ মাসআলা

যদি এমন হয় যে, আরফায় লোকেরা একদিন অবস্থান করলো। আর একদল লোক সাক্ষ্য দান করলো[১] যে, তারা আসলে কুরবানীর দিন (দশই যিলহাজ্জ) উকূফ করেছে, তাহলে তাদের এ উকূফ যথেষ্ট হবে।

কিয়াসের দাবী এই যে, তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে না। এটাকে ইয়াওমুত্তার-বিয়া (অন্য তারিখে) উকূফের উপর বিবেচনার প্রেক্ষিতে।

এর কারণ এই যে, উকূফ হলো এমন একটি ইবাদত, যা নির্ধারিত সময় ও স্থানের সাথে বিশিষ্ট।[২] সুতরাং এ দু'টি বিশিষ্টতা ছাড়া 'উকূফ' ইবাদত হবে না।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, এ সাক্ষ্য নেতিবাচক বিষয়ের উপর হয়েছে এবং এমন একটি বিষয়ের উপর হয়েছে, যা বিচারের আওতাভুক্ত নয়। কেননা তাদের সাক্ষ্যের মূল উদ্দেশ্য লোকদের হজ্জ নাকচ করা। আর হজ্জ বিচারের আওতাভুক্ত কোন বিষয় নয়। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

তাছাড়া এ একটি ব্যাপক সমস্যা, যা পরিহার করা সম্ভব নয় এবং তার ক্ষতিপূরণ করাও সম্ভব নয়। আর পরবর্তীতে পুনরায় হজ্জ আদায় করার আদেশ দানে স্পষ্ট জটিলতা রয়েছে। সুতরাং সন্দেহজনক অবস্থায় সেটাকেই যথেষ্ট বলে সাব্যস্ত করা জরুরী।

কিন্তু ইয়ামুত্তার-বিয়া উকূফ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা আরাফার দিন উকূফ করে সন্দেহ নিরাসনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব।

তাছাড়া বিলম্বিত আমল জাইয হওয়ার নযীর রয়েছে, কিন্তু অগ্রবর্তী আমল জাইয হওয়ার নযীর নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুসারিগণ বলেছেন, শাসকের কর্তব্য হলো এ ধরনের সাক্ষ্য গ্রহণ না করা, এবং ঘোষণা দিয়ে দেয়া যে, লোকদের হজ্জ সম্পন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা সবাই ফিরে যাও। কেননা সাক্ষ্য গ্রহণ করায় কেবল ফিতনাই সৃষ্টি হয়।

তদ্রূপ যদি তারা আরাফা দিবসের আগের সন্ধ্যায় (অর্থাৎ ইয়ামুত্তারবিয়ায় একদিন আগে) চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় আর ইমামের পক্ষে অবশিষ্ট রাতে লোকদেরকে নিয়ে কিংবা তাদের অধিকাংশদের নিয়ে আরাফায় উকূফ করা সম্ভব না হয়, তাহলে ইমাম উক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না।

---

১. অর্থাৎ তারা বললো যে, আমরা অমুক দিন যিলহাজ্জের চাঁদ দেখেছি। যে, হিসাবে তাদের উকূফের দিনটি দশই যিলহাজ্জ হয়ে যায়।

২. অর্থাৎ তারা মূলতঃ এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, লোকদের উকূফ সহীহ্ হয়নি।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, *যে ব্যক্তি দ্বিতীয় দিন (অর্থাৎ যিলহাজ্জের এগার তারিখে) মধ্যবর্তী ও তৃতীয় জামারায় কংকর নিক্ষেপ করল, কিন্তু প্রথমটি করলো না; তাহলে প্রথমটি কাযা করার সময় যদি পরবর্তী দু'টিও করে নেয় তাহলে উত্তম হয়।* কেননা এতে মাসনূন তারতীবের সুন্নতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করল। আর যদি শুধু প্রথম জামারায় কংকর নিক্ষেপ করে তাহলেও তা যথেষ্ট হবে। কেননা সে যথা সময়ে ছেড়ে দেওয়া আমলটির ক্ষতিপূরণ করে নিয়েছে। শুধু তারতীব তরক করেছে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তা যথেষ্ট হবে না। যতক্ষণ না সকল রামী পুনরায় করে। কেননা এটা তারতীবের সংগেই শরীআত কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছে। সুতরাং এটা তাওয়াফের পূর্বে সাঈ করার মতো হলো। কিংবা সাফার পরিবর্তে মারওয়া থেকে সাঈ শুরু করার মতো হলো।

আমাদের দলীল এই যে, প্রতিটি জামারাহ্ হলো স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ইবাদত। সুতরাং একটার উপর অন্যটাকে অগ্রবর্তী করার সাথে তার বৈধতা সম্পৃক্ত হবে না। সাঈ-র বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা তাওয়াফের অনুগামী। কারণ তা তাওয়াফের চেয়ে নিম্নমর্যাদার। তদ্রূপ মারওয়া যে সাঈ-র শেষপ্রান্ত, এটা 'নাস' দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এর সাথে 'প্রারম্ভ'-এর সম্পর্ক হতে পারে ,না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি হেঁটে হজ্জ করবে বলে নিজের জন্য নির্ধারণ (মান্নত) করেছে, সে সওয়ারীতে আরোহণ করবে না, যে পর্যন্ত না তাওয়াফে যিয়ারতের শেষ করে।

মাবসূত কিতাবে অবশ্য তাকে পায়ে হাঁটা বা সওয়ার, যে কোন একটির ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। আর এখানে মতনের ভাষ্যে ওয়াজিব হওয়ার দিকে ইংগিত রয়েছে। এই হলো নীতিগত হুকুম।

কেননা সে পূর্ণবার গুণসহ নিজের উপর ইবাদত লাযেম করেছে। সুতরাং সে গুণসহ তা তার উপর লাযেম হবে। যেমন, যদি লাগাতার রোযা রাখার মান্নত করে থাকে।

আর হজ্জের কর্মসমূহ যেহেতু তাওয়াফে যিয়ারতের মাধ্যমে শেষ হয়, তাই উক্ত তাওয়াফ করা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে চলতে হবে।

আর কেউ বলেছেন, ইহরাম করার পর থেকে পায়ে হেঁটে চলা শুরু করবে। আবার কেউ বলেছেন, তার ঘর থেকে শুরু করবে। কেননা বাহ্যতঃ এটাই হলো উদ্দেশ্য।

যদি সওয়ার হয়ে চলে, তাহলে দম দিতে হবে, কেননা সে তাতে ত্রুটি স্পষ্ট করে ফেলেছে।

মাশায়েখ বলেছেন, দূরত্ব যখন অধিক হয় এবং হাঁটা কষ্টকর হয়, তখন আরোহণ করবে। আর স্থল নিকটবর্তী হলে এবং সে ব্যক্তি হাঁটায় অভ্যস্ত হলে এবং তা তার জন্য কষ্টকর না হলে আরোহণ না করাই উচিত।

আর কোন ব্যক্তি যদি ইহরাম অবস্থায় দাসীকে বিক্রি করে, যে তাকে ইহরামের অনুমতি দিয়েছিল, তবে ক্রেতার জন্য জাইয হবে তাকে ইহরামমুক্ত করে তার সাথে সহবাস করা।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, ক্রেতার জন্য তা জাইয হবে না। কেননা ইহরাম এমন এক 'আকদ', যা তার মালিকানার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং তা সে বাতিল করতে পারে না। যেমন, কেউ যদি বিবাহিতা দাসী খরিদ করে।

আমাদের দলীল এই যে, এখানে ক্রেতা বিক্রেতার স্থলবর্তী হয়েছে। আর বিক্রেতার জন্য তাকে ইহরামমুক্ত করে নেওয়া জাইয ছিল। সুতরাং ক্রেতার জন্যও তা জাইয হবে। অবশ্য বিক্রেতার জন্য তা মাকরূহ। কেননা তাতে ওয়াদা খিলাফী রয়েছে। আর এ কারণ ক্রেতার ক্ষেত্রে নেই।

বিবাহের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা বিক্রেতার অনুমতি ক্রমে বিবাহ হয়ে থাকলে তা বাতিল করার অধিকার তার ছিল না। সুতরাং ক্রেতারও সে অধিকার থাকবে না।

ক্রেতার যখন তাকে ইহরাম মুক্ত করে নেয়ার অধিকার রয়েছে, তখন আমাদের মতে, 'ইহরামের দোষের' কারণে তাকে ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে না। আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে সে ফেরত দিতে পারবে।

কোন কোন নুসখায় এরূপ রয়েছে ঃ 'অথবা তার সাথে সহবাস করতে পারবে।'

প্রথম মতনের ভাষ্যে বোঝা যায় যে, সহবাস ছাড়া চুল ছাঁটা কিংবা নখ কর্তন করার মাধ্যমে তাকে ইহরাম মুক্ত করবে। অতঃপর সহবাস করবে।

আর দ্বিতীয় এ বারত দ্বারা বোঝা যায় যে, সহবাস দ্বারা তার ইহরাম ভংগ করাবে। কেননা সহবাসের পূর্বে স্পর্শ সাধারণতঃ হয়েই থাকে। যার দ্বারা ইহরাম ভংগ হয়ে যাবে। আর উত্তম হবে হজ্জের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে সহবাস ব্যতীত তাকে ইহ্‌রাম মুক্ত করা। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥